পরিবেশ : রাসায়নিক গঠন ও দূষণ

বাসুদেব কুমার দাস

পরিবেশ : রাসায়নিক গঠন ও দূষণ

[ENVIRONMENT : CHEMICAL COMPOSITIONS AND POLLUTION]

BARSDOC Library
Dhaka

ড. বাসুদেব কুমার দাস
এম. এসসি (রাজশাহী)
পিএইচ. ডি (এস. আই. ইউ. সি, ইলিয়ন)
প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

সমি-৬
BANSDOC Library
Accession No. 17788
Date 10.6.04

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৪০৯
এপ্রিল ২০০৩

বাএ ৪৩৩৪

(২০০২-২০০৩ পাঠ্যপুস্তক : ভৌ ও প্র ২)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ

ভৌ ও প্র ২১৮

প্রকাশক
মুহম্মদ নূরুল হুদা
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
শচীন্দ্রলাল বড়ুয়া

মূল্য : ১৫৫.০০

PARIBESH : RASAYANIK GATHAN O DUSHAN (Environment : Chemical Compositions and Pollution) by Dr. Basudev Kumar Das. Published by Mohammad Nurul Huda, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition, April 2003. Price : Taka 155.00 only .

ISBN 984-07-4343-0

ভূমিকা

জীব যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাঝে অবস্থান করে সেটি তার পরিবেশ। জড় ও জীব এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্ম পরিবেশের এক একটি নিয়ামক। নিয়ামকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং সম্পর্কটির ভারসাম্য অবস্থা পরিবেশের সুস্থতা নিশ্চিত করে। পরিবেশের ভারসাম্য বিভিন্ন কারণে কম-বেশি ব্যাহত হতে পারে, তবে সাম্প্রতিককালে মানুষ নিজেই, কখনো না বুঝে, কখনো সচেতনভাবে, এমন কিছু কাজ করে চলেছে যাতে পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভারসাম্যের মারাত্মক বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি বিশ্বের সব দেশে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন এবং শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

পরিবেশে রসায়ন-এর ভূমিকা বিরাট। সে ভূমিকা দূষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও তেমন। উচ্চতর রসায়নবিজ্ঞান শিক্ষায় বিষয়টির অন্যান্য শাখার পাশাপাশি পরিবেশ রসায়নও সমান গুরুত্ব পেয়েছে এবং সঙ্গত কারণেই অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন পাঠ্য নির্ঘণ্টে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত তা নিয়ে বিতর্ক যেমনই থাক,বাস্তব অবস্থা হলো, আমাদের উচ্চশিক্ষায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এখন মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বাংলাকে বেছে নিয়েছে অথচ প্রয়োজনীয় বাংলা বই তারা পাচ্ছে না। শিক্ষার্থীরা তাই বাধ্য হয়ে 'নোট' নির্ভর হয়ে পড়েছে। যে সমস্যায় আমাদের উচ্চ শিক্ষা আজ জর্জরিত, বাংলা বই-এর অভাব তার অন্যতম। সমস্যাটির কথা বিবেচনা করে 'পরিবেশ : রাসায়নিক গঠন ও দূষণ' শিরোনামের এই গ্রন্থটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বইটি পড়ে উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

বইটিতে মোট আটটি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলোর প্রথম সাতটিতে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের সংজ্ঞা, বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকার বস্তুগত গঠন (রাসায়নিক গঠন), দূষণ ও দূষণ ব্যবস্থাপনা এবং অষ্টম অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার পানি দূষক ও বায়ু দূষক বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। যে কোনো প্রকার বস্তু-দূষণ এর মতো শব্দ দূষণও আমাদের দেশে, বিশেষ করে নাগরিক জীবনে ভয়াবহ একটি সমস্যা। সমস্যাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে শব্দ দূষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু শব্দ দূষণ যেহেতু বস্তু দূষণ নয় তাই পরিশিষ্টে একে স্থান দেয়া হয়েছে।

গ্রন্থটি রচনার কাজে আমার সহকর্মী ও স্নেহভাজন ছাত্র এস.এম. মঞ্জুরুল আলমের সাহায্য পেয়েছি। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি রচনাকালে আমার স্ত্রী আলপনা রায়, সহোদরা শুভ্রা ও বেলা অসীম ধৈর্য ধারণ করে আমাকে সহায়তা করেছেন ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থটির দ্রুত প্রকাশনা ও মুদ্রণ সৌকর্যের জন্য বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগের সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. বাসুদেব কুমার দাস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : পরিবেশের সাধারণ ধারণা ১-১৫

১.১ পরিবেশ ; ১.২ পরিবেশ রসায়ন ; ১.৩ পরিবেশ দূষণ ; ১.৪ পরিবেশ সচেতনতা–অতীত ও বর্তমান ; ১.৫ পরিবেশ বিষয়ক কিছু পদের সংজ্ঞা ; প্রশ্নমালা ; গ্রন্থপঞ্জি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বারিমন্ডল ১৬-৬৭

২.১ ভূমিকা ; ২.২ পানির বিশেষত্ব ; ২.৩ প্রাকৃতিক পানিতে বায়ুমণ্ডলের গ্যাস ; ২.৪ প্রাকৃতিক পানির pH ; ২.৫ প্রাকৃতিক পানির অম্লত্ব–ক্ষারকত্ব ; ২.৬ প্রাকৃতিক পানিতে নাইট্রোজেন ; ২.৭ প্রাকৃতিকে পানিতে ফসফরাস ; ২.৮ প্রাকৃতিক পানিতে সালফার ; ২.৯ প্রাকৃতিক পানিতে ক্লোরিন ও ফ্লোরিন ; ২.১০ প্রাকৃতিক পানিতে Ca ও Mg ; ২.১১ প্রাকৃতিক পানিতে ক্ষারধাতু ; ২.১২ প্রাকৃতিক পানিতে অ্যালুমিনিয়াম (Al) ; ২.১৩ প্রাকৃতিক পানিতে লৌহ (Fe) ; ২.১৪ প্রাকৃতিক পানিতে জটিল যৌগ গঠনকারী পদার্থ; ২.১৫ জীবাণু; ২.১৬ জীবাণুর অনুঘটনে প্রকৃতিতে রাসায়নিক পরিবর্তন ; ২.১৭ অম্লখনির পানি ; ২.১৮ প্রাকৃতিক পানিতে বস্তুকণা ; ২.১৯ ইউট্রোফিকেশন ; ২.২০ প্রাকৃতিক পানিতে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া ও ইলেকট্রন সক্রিয়তা, PE ; ২.২১ সামুদ্রিক পানিতে রাসায়নিক দ্রব্য ; ২.২২ টাটকা পানিতে রাসায়নিক দ্রব্য ; প্রশ্নমালা ; গ্রন্থপঞ্জি।

তৃতীয় অধ্যায় : পানি দূষণ ও পানি পরিশোধন ৬৮-১১০

৩.১ ভূমিকা; ৩.২ পানির দূষক; ৩.৩ পেস্টিসাইড; ৩.৪ ডিটারজেন্ট; ৩.৫ পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল ; ৩.৬ পলিঅ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, PAH ; ৩.৭ বর্জ্যপানির বৈশিষ্ট্য ; ৩.৮ পানি পরিশোধন ; প্রশ্নমালা ; গ্রন্থপঞ্জি।

চতুর্থ অধ্যায় : বায়ুমণ্ডল ১১১-১৩৭

৪.১ ভূমিকা ; ৪.২ বায়ুর উপাদান ; ৪.৩ বায়ুমণ্ডলের গঠন ; ৪.৪ বায়ুমণ্ডলের অভিব্যক্তি ; ৪.৫ গ্রীন হাউজ প্রভাব ; ৪.৬ পৃথিবীতে তাপমাত্রার ভারসাম্য ; ৪.৭ বায়ুমণ্ডলে রাসায়নিক ও আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ; ৪.৮ বায়ুমণ্ডলে মুক্ত রেডিকেল ; ৪.৯ বায়ুমণ্ডলে

অক্সিজেন ; ৪.১০ বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন রসায়ন ; ৪.১১ বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ; প্রশ্নমালা ; গ্রন্থপঞ্জি।

পঞ্চম অধ্যায় : **বায়ুমণ্ডলের দূষণ** ১৩৮–১৯৬

৫.১ ভূমিকা ; ৫.২ বায়ু দূষক-এর ঘনমাত্রার একক ; ৫.৩ বায়ু দূষণের উপর আবহাওয়ার প্রভাব ; ৫.৪ দূষকের শ্রেণীবিভাগ ; ৫.৫ প্রাকৃতিক দূষক ; ৫.৬ কার্বন মনোক্সাইড, CO ; ৫.৭ নাইট্রোজেনের অক্সাইড ; ৫.৮ সালফার ডাইঅক্সাইড ; ৫.৯ বায়ুমণ্ডলে H_2S ও জৈব সালফাইডের দূষণ ; ৫.১০ অম্ল বৃষ্টি ; ৫.১১ বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোকার্বন ; ৫.১২ আলোক রাসায়নিক স্মগ ; ৫.১৩ ওজোনস্তরের ক্ষয় ; ৫.১৪ বায়ুমণ্ডলের বস্তুকণা ; ৫.১৫ বায়ুমণ্ডলের তেজস্ক্রিয়তার দূষণ ; ৫.১৬ গার্হস্থ্য বায়ু দূষণ ; ৫.১৭ ধূমপানজনিত দূষণ ; ৫.১৮ কর্মক্ষেত্রে বায়ুদূষণ ; প্রশ্নমালা ; গ্রন্থপঞ্জি।

ষষ্ঠ অধ্যায় : **মৃত্তিকা ও কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা** ১৯৭–২১২

৬.১ ভূমিকা ; ৬.২ পরিবেশ দূষণ ও মৃত্তিকা ; ৬.৩ মৃত্তিকায় কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ; প্রশ্নমালা ; গ্রন্থপঞ্জি।

সপ্তম অধ্যায় : **ট্রেস* মৌলের দূষণ** ২১৩–২৩৬

৭.১ ভূমিকা ; ৭.২ পারদ ; ৭.৩ সীসা ; ৭.৪ ক্যাডমিয়াম ; ৭.৫ আর্সেনিক ; ৭.৬ ক্রোমিয়াম ; প্রশ্নমালা ; গ্রন্থপঞ্জি।

অষ্টম অধ্যায় : **পরিবেশ দূষণ বিশ্লেষণ** ২৩৭–৩০৫

৮.১ ভূমিকা ; ৮.ক সাধারণ আলোচনা ; ৮.খ বায়ুর দূষক বিশ্লেষণ ; ৮.গ পানির দূষণ বিশ্লেষণ ; গ্রন্থপঞ্জি।

পরিশিষ্ট : ৩০৯–৩২৫

পরিশিষ্ট ১ শব্দ দূষণ; পরিশিষ্ট ২ পানির স্ট্যান্ডার্ড; পরিশিষ্ট ৩ বায়ুমানের স্ট্যান্ডার্ড ; পরিশিষ্ট ৪ সাধারণ কিছু গ্যাস ও বাষ্পীয় দূষকের TLV ; পরিশিষ্ট ৫ বায়ু ফিল্টারকরণের কিছু ফিল্টার আস্তরণ ; পরিশিষ্ট ৬ পরমাণু শোষণ বর্ণালি রেখা ; পরিশিষ্ট ৭ ট্রেস বিশ্লেষণে মজুত প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতকরণ–1000 ppm IL ; পরিশিষ্ট ৮ রাসায়নিক দ্রব্যের মান ; পরিশিষ্ট ৯ বাণিজ্যিক বিকারক মানের অম্ল ও ক্ষারকের ঘনমাত্রা।

সারণি ৩২৭

প্রথম অধ্যায়
পরিবেশের সাধারণ ধারণা
(Elementary Idea on Environment)

১.১ পরিবেশ (Environment)

জীব যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাঝে অবস্থান করে তাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশের চারটি অঙ্গ- যথা, বায়ুমণ্ডল, শিলামণ্ডল, বারিমণ্ডল ও জীবমণ্ডল।

বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) : গ্যাসীয় পদার্থের একটি আবরণ দ্বারা পৃথিবী পরিবেষ্ঠিত; উক্ত আবরণকে বায়ুমণ্ডল বলে। বায়ুমণ্ডলের মুখ্য উপাদান চারটি - নাইট্রোজেন (৭৮.০৮%), অক্সিজেন (২০.৯৫%), আর্গন (০.৯৩%) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (০.০৩৬%)। এ ছাড়া আরো কিছু গ্যাস, যেমন- হিলিয়াম, নিয়ন, মিথেন, হাইড্রোজেন, জেনন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণে (trace amount) এবং কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প (০.১ - ৫%) বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত থাকে। বায়ুমণ্ডলের ভর ৫.১৩৬ $\times$ ১০^{১৫} মেট্রিক টন ।

শিলামণ্ডল (Lithosphere) : ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গড়ে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি স্তর কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত; উক্ত স্তরকে শিলামণ্ডল বলে। শিলামণ্ডলের উপর স্তরের শিলা প্রাকৃতিক, ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মৃত্তিকা (soil) সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশ রসায়নে শিলামণ্ডল বলতে সাধারণত মৃত্তিকাকে বুঝানো হয়। মৃত্তিকা অজৈব ও জৈব কঠিন পদার্থ এবং বায়ু ও পানির একটি মিশ্রণ। মৃত্তিকার প্রকারভেদে তার গঠন (composition) ভিন্ন হয় তবে সাধারণ উর্বর একটি মৃত্তিকার (দো-আঁশ মৃত্তিকা) মোট যে আয়তন, তার ৫০% কঠিন বস্তু, বাকি ৫০% বায়ু ও পানি এবং মোট যে ভর তার ৯৫% অজৈব ও ৫% জৈব বস্তু দিয়ে গঠিত। মৃত্তিকা প্রাণী ও উদ্ভিদকে ধারণ করে। শিলামণ্ডলের ভর ২.৩৬৭ $\times$ ১০^{১৯} মেট্রিক টন ।

বারিমণ্ডল (Hydrosphere) : পৃথিবী-পৃষ্ঠের যে অংশ পানি (তরল ও কঠিন) দ্বারা আবৃত তাকে বারিমণ্ডল বলে। সমুদ্র,মহাসমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, হ্রদ ও মেরু প্রদেশীয় বরফ ঢাকা অঞ্চল (ice-cap) বারিমণ্ডলের এক একটি একক। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প, মৃত্তিকার আর্দ্রতা এবং ভূগর্ভস্থ পানিকেও বারিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বারিমণ্ডল পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭১% স্থান (৩৭.৫ কোটি বর্গ কিলোমিটারের বেশি) দখল করে আছে অর্থাৎ, বারিমণ্ডল পৃথিবীর স্থলভাগের যে আয়তন তার প্রায় আড়াই

গুণ। বারিমণ্ডলের ভর ১.৬৬৪ × $১০^{১৮}$ মেট্রিক টন, যার প্রায় ৯৭% সমুদ্র-মহাসমুদ্র, ২% নদ-নদী, খাল-বিল, হ্রদ ও ভূ-গর্ভ এবং ১% হিমবাহ ও তুষার স্তর ধারণ করে। বিশাল এ পানিরাশির ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ (১%-এর কম) মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে এবং অবশিষ্ট পানি হয় অতি লবণাক্ততার কারণে (সমুদ্র মহাসমুদ্রের পানি) অন্যথায় আহরণের অযোগ্য বলে মানুষের সরাসরি কোনো প্রয়োজনে আসে না।

জীবমণ্ডল (Biosphere) : পৃথিবীর যে অংশে জীবের বাস তাকে জীবমণ্ডল বলে। শিলামণ্ডলের উপরস্তর (মৃত্তিকা), বারিমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর মিলে জীবমণ্ডল গঠিত। উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবমণ্ডলের অধিবাসী, এদের জৈবিক ক্রিয়া কর্ম থেকে শুরু করে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় দ্বারা জীবমণ্ডল নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবমণ্ডলের ভর প্রায় ১.১৪৮ × $১০^{১৩}$ মেট্রিক টন।

পরিবেশের সাথে জীবের সম্পর্ক অতিশয় নিবিড়; পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা উক্ত সম্পর্কের ভিত্তি। পরিবেশ সুস্থ না থাকলে জীব সুস্থ থাকতে পারে না; পরিবেশের সুস্থতা বলতে জীব ও পরিবেশের মাঝে একটি ভারসাম্য অবস্থা বুঝায় যা তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে।

ইকোসিস্টেম (Ecosystem) : জীব (biotic) ও অজীব (abiotic)-এর সমন্বয়ে পৃথিবীতে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যে এক একটি ভূখণ্ড গড়ে ওঠে তাকে ইকোসিস্টেম বলে। বস্তুত, সমগ্র পৃথিবীকে ইকোসিস্টেমের একটি একক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে সাধারণভাবে, ইকোসিস্টেমের এক একটি একক বলতে জীবমণ্ডলের এক একটি অংশকে বুঝানো হয়। ঘরের মাঝে স্থাপিত ছোট একটি অ্যাকোয়ারিয়াম (aquarium) থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল হ্রদ, তৃণভূমি, বনভূমি, লোকালয় প্রভৃতি এক একটি ইকোসিস্টেম হতে পারে। ইকোসিস্টেমে জীব ও অজীব উপাদান সুতার বুনুনির মতো একটির সাথে অপরটি এমনভাবে মিশে থাকে যে, বিচ্ছিন্নভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করা যায় না। শক্তি ও বস্তুর প্রবাহ এবং জীবের জন্ম, প্রবৃদ্ধি, মৃত্যু ও ক্ষয় ইকোসিস্টেমে অবিরাম চলতে থাকে।

ইকোসিস্টেমের প্রধান উপাদান চারটি; যথা- অজীব, আদি উৎপাদক (primary producer), ভোক্তা (consumer) ও বিনাশক (decomposer)। শেষোক্ত তিনটি উপাদান জীব (biotic)। মৃত্তিকা, বায়ু ও পানি এবং সূর্যালোক ও তাপমাত্রার মতো ভৌত বৈশিষ্ট্য অজীব অংশের নিয়ামক। ইকোসিস্টেমের আদি উৎপাদক উদ্ভিদ। বায়ু থেকে CO_2 ও H_2O, মৃত্তিকা থেকে পুষ্টি ও পানি এবং সূর্যালোক থেকে শক্তি শোষণ করে উদ্ভিদ জৈবিকভর (biomass) উৎপাদন করে, পরবর্তী ধাপে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোক্তার (তৃণভোজী, মাংসভোজী ও সর্বভুক) খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'বিনাশক' উদ্ভিদ ও ভোক্তার বর্জ্য এবং তাদের মৃতদেহ ক্ষয় করে এবং সেখান থেকে

যাবতীয় পুষ্টি উপাদান আবার মৃত্তিকায় ফেরত আনে। ব্যাকটেরিয়া ও ফানজি (fungi) গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিনাশক। যাহোক, এভাবে ইকোসিস্টেমে জীব ও অজীবের ক্রিয়া চক্রাকারে চলতে থাকে এবং ক্ষেত্রটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি এককে পরিণত হয়। নিচে ইকোসিস্টেমে উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো (চিত্র ১.১)। উপাদানগুলোর একটি অপরটির সাথে এমন নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে যে, একটিতে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটলে অন্যটির উপর তথা সমগ্র ইকোসিস্টেমের উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তার প্রভাব পড়ে।

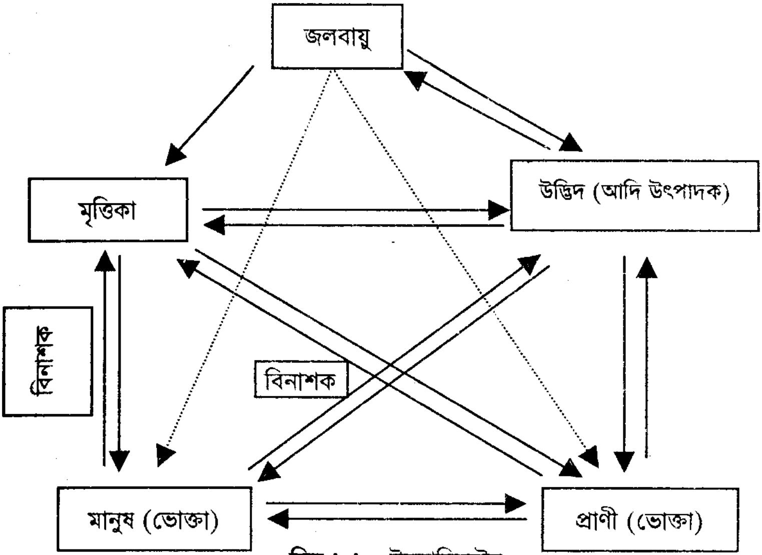

চিত্র ১.১ : ইকোসিস্টেম।

অধিকাংশ প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম সাম্যাবস্থায় থাকে। প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের (flora and fauna) তাই সেখানে সামান্যই পরিবর্তন ঘটে। তবে আবহগত বিরাট কোনো পরিবর্তন কিংবা জীবের সামান্য কোনো পরিবর্তনেও ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ইকোসিস্টেমে তখন একটির পর একটি পরিবর্তন ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলে এবং এভাবে একসময় তা নতুন এক সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়। নতুন সাম্যাবস্থায় পৌঁছাতে একটি ইকোসিস্টেমের কয়েক বছর থেকে শত-সহস্র বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

প্রকৃতি স্থিতিশীল একটি ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে লক্ষ কোটি বছর ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছে। প্রাকৃতিক যে কোনো পরিবর্তন সাধারণত মন্থর ও ক্রমান্বয়িক। তবে মানুষ কখনো কখনো তাতে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটায়। নির্বিচারে বনরাজি ধ্বংসকরণ, স্রোতস্বিনী দূষিতকরণ, সুস্থ পরিবেশে রোগব্যাধির সংক্রমণ এরূপ এক একটি ঘটনা। ইকোসিস্টেমের উপর এ জাতীয় ঘটনার যে প্রভাব তা দ্রুত ও অনুভমুখী। তবে

বিশ্বব্যাপী এ জাতীয় পরিবর্তন আজ পর্যন্ত তেমন সঙ্কটজনক আকার ধারণ করেনি। পৃথিবীতে বর্তমানে যেসব জীবের বাস তারা পরিবেশের সূক্ষ্ম এক ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশে এমন কোনো পরিবর্তন যদি ঘটে, যা বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলতে সক্ষম তাহলে মানুষ তথা সমগ্র জীবকূলের জন্য তা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডে উক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে ।

১.২ পরিবেশ রসায়ন (Environmental Chemistry)

পরিবেশসংশ্লিষ্ট বস্তুর রসায়নকে পরিবেশ রসায়ন বলে। পরিবেশসংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রকৃতি, পরিমাণ, উৎস, বিক্রিয়া, পরিবহণ (transport), প্রভাব ও পরিণতি পরিবেশ রসায়নের এক একটি পর্যবেক্ষণীয় বিষয় । বায়ুমণ্ডলে ওজোনের স্তর কিভাবে সৃষ্টি হয়, কিভাবে তা ক্ষয় হয়, ওজোন-স্তরের ক্ষয় ভূপৃষ্ঠে জীবের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক কিভাবে আসে, কোন রাসায়নিক অবস্থা ও প্রাচুর্যে তা সেখানে অবস্থান করে, যানবাহনের ধোঁয়া থেকে প্রতিদিন কি পরিমাণ কার্বন মনোঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, প্রাণীর শরীরে তা কিভাবে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াতে পরিবেশের উপর কিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, পানিতে পারদ কিভাবে তীব্র বিষাক্ত মিথাইল যৌগে পরিণত হয়, মানুষের শরীরে কিভাবে তার সংক্রমণ ঘটে ইত্যাদি পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা পরিবেশ রসায়নের কাজ । পরিবেশ রসায়নে রসায়ন বিজ্ঞানের সকল শাখার ভূমিকা থাকে তবে বৈশ্লেষিক রসায়নের ভূমিকা এতে সবচেয়ে বেশি কেননা বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা পরিবেশ রসায়নের মুখ্য দুটি দিক ।

শুদ্ধ রসায়নবিজ্ঞান ও পরিবেশ রসায়নের মাঝে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিরাট এবং শুদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানের তুলনায় পরিবেশ রসায়ন অনেক বেশি জটিল। শুদ্ধ রসায়নের একটি সিস্টেম তাপমাত্রা, চাপ, দ্রবের ঘনমাত্রা প্রভৃতি স্থিতিমাপ দ্বারা সাধারণত সীমিত থাকে কিন্তু পরিবেশ রসায়নে যেসব সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে হয় তাদের সুস্পষ্ট কোনো সীমানা (boundary) প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না । উদাহরণস্বরূপ, বায়ুতে CO_2-এর কথা ধরা যাক, বায়ুতে CO_2 -এর প্রাচুর্য যেসব নিয়ামক দ্বারা নির্ধারিত হয় তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এরূপ:

১. গ্যাসের উৎস এবং সময়, বাতাসের বেগ, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, চাপ প্রভৃতি;

২. পানিতে CO_2-এর দ্রবীভবন এবং H_2CO_3, HCO_3^- ও CO_3^{2-}-এ দ্রবীভূত CO_2 এর রূপান্তর:

$$CO_2(g) + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \underset{+H^+}{\overset{-H^+}{\rightleftharpoons}} HCO_3^- \underset{+H^+}{\overset{-H^+}{\rightleftharpoons}} CO_3^{2-}$$

৩. মৃত্তিকায় CO_2 এর ধাতুর কঠিন বাইকার্বোনেট (HCO_3^-) ও কার্বোনেটে (CO_3^{2-}) রূপান্তর;

৪. মৃত্তিকায় CO_2 গ্যাসের পরিশোষণ এবং

৫. উদ্ভিদ কর্তৃক CO_2 শোষণ: $CO_2 + H_2O \xrightarrow{h\nu} [CH_2O] + O_2\uparrow$

ঘটনাগুলোর একটিও সাম্যাবস্থায় থাকে না তাই কোনো স্থানের বায়ুতে CO_2 এর প্রাচুর্য নির্ণয় করা হলে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিংবা একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে মান পাওয়া যায় তাদের মাঝে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। শুদ্ধ রসায়নের একটি সিস্টেমে ঐরূপ ঘটনা সাধারণত ঘটে না। পরিবেশ-রসায়নের সিস্টেম-সংশ্লিষ্ট যে জটিলতা তা আরো প্রকট হয় নির্ণয়করণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে। দূষণ সৃষ্টিকারী অধিকাংশ বস্তু পরিবেশে এত ক্ষুদ্র পরিমাণে উপস্থিত থাকে যে (সাধারণত ppm / ppb মাত্রায়), সহজলভ্য প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মাপনসীমার (detection limit) নিচে তারা অবস্থান করে। মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও ঘনমাত্রার ঐরূপ স্তরে একটি পদার্থকে নির্ণয় করার নির্ভরযোগ্য যন্ত্র বা পদ্ধতি ছিল না। এখন যদিও বহু যন্ত্র বা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে কিন্তু সেগুলো এতই ব্যয়বহুল যে, সাধারণ একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা সংগ্রহ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরিবেশ পর্যবেক্ষণের ঐসব জটিলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গত কয়েক দশকে পরিবেশের উপর যেসব গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আজ একজন বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক একটি সিস্টেম সম্পর্কে আস্থার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

শুদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানের তুলনায় পরিবেশ রসায়ন যতই জটিল হোক না কেন রসায়নের ছাত্র মাত্রেরই পরিবেশ রসায়ন সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক একটি ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক; কেননা, পরিবেশে বস্তুগত যে দূষণ প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তার অধিকাংশ ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রসায়নবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড জড়িত থাকে। একজন রসায়ন বিজ্ঞানী রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার-কন্ডিশনারের জন্য ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC) প্রস্তুত করেন, সেই CFC এক সময় ওজোন স্তর ধ্বংসের কারণ হয়। কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে শস্যকে রক্ষা করার জন্য রসায়নবিজ্ঞানী কীটনাশক প্রস্তুত করেন, সেই কীটনাশক একসময় বহু উপকারী প্রাণীকেও ধ্বংস করে এমনকি মানুষের শরীরেও রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে। মানুষের প্রয়োজনে একজন রসায়ন বিজ্ঞানী শিল্পকারখানায় বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করেন, একদিন সেই পণ্য ও তার উপজাত বর্জ্য আবার মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটায়। রসায়নবিজ্ঞানী যখন পরিবেশ সচেতন হন তখন তিনি তার উৎপাদিত পণ্য পরিবেশের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে তা অনুসন্ধান করেন এবং পণ্য ব্যবহারকারীকে তা জানানোর তাগিদ অনুভব করেন। পাশাপাশি তিনি নিজেও তার রাসায়নিক কাজ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যাতে দূষণের আক্রমণ থেকে পরিবেশ রক্ষা পায়। পরিবেশ সচেতন হওয়া এবং সে লক্ষ্যে

পরিবেশ রসায়নের পাঠ গ্রহণ করা রসায়ন বিজ্ঞানের একজন ছাত্রের জন্য তাই নৈতিক একটি দায়িত্ব ।

১.৩ পরিবেশ দূষণ (Pollution of Environment)

জীব, প্রকৃতি, সম্পদ, শিল্প, সংস্কৃতি সব কিছু মিলে পরিবেশ। উপাদানগুলোর মাঝে যতক্ষণ ভারসাম্য বজায় থাকে ততক্ষণ পরিবেশে সুস্থ, ভারসাম্য নষ্ট হলে পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি হয়। বাস্তবে, পরিবেশ দূষণের একটি ঘটনাকে সাধারণভাবে উপলব্ধি করা গেলেও দূষণের অনন্য একটি সংজ্ঞা প্রদান করা বেশ কঠিন; কেননা দূষক (pollutant) বহুলাংশে স্থান কাল পাত্র সাপেক্ষ একটি বস্তু / বিষয়। যাহোক, মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান উপদেষ্টা কমিটির পরিবেশ বিষয়ক প্যানেল কর্তৃক পরিবেশ দূষণ এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো (1):

'যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাঝে আমরা বাস করি তাতে সুস্থভাবে জীবধারণের অনুকূল নয় এমন কোনো পরিবর্তন যদি ঘটে তাহলে সে পরিবর্তনকে পরিবেশ-দূষণ বলে। পরিবেশ দূষণ সম্পূর্ণত কিংবা প্রধানত মানুষের কর্মকাণ্ডের উপজাত একটি ঘটনা। কর্মকাণ্ডগুলো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পরিবেশে শক্তির বিন্যাস (energy pattern), বিকিরণের মাত্রা, ভৌত ও রাসায়নিক কাঠামো এবং জীব বৈচিত্র্যের পরিবর্তন ঘটায়। এসব কর্মকাণ্ড কখনো সরাসরিভাবে, কখনো পানি, কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং কখনো সম্পদ ও বিনোদন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করে।'

সংজ্ঞাটি নির্দেশ করে, পরিবেশ দূষণ কেবল বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধেয় কিংবা অপ্রাকৃতিক কোনো ঘটনা নয় । পরিবেশ দূষণ মানুষের জীবন মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় তাই এটি স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত একটি সমস্যা। পরিবেশ দূষণে সম্পদের ক্ষতি হয় তাই এটি অর্থনৈতিক একটি সমস্যা। পরিবেশ দূষণ জৈবিক বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে তাই এটি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক একটি সমস্যা। পরিবেশ দূষণ মানুষের আবেগ অনুভূতির উপর প্রভাব ফেলে তাই এটি জীবনের নান্দনিক দিকেরও একটি সমস্যা।

মানুষ একটি সামাজিক জীব । খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক ও বিনোদন ব্যবস্থার প্রয়োজনে প্রকৃতি থেকে মানুষ প্রতিনিয়ত সম্পদ তুলে নেয় এবং ভোগের পর তার বর্জ্য আবার প্রকৃতিতে যুক্ত করে। উক্ত গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় পরিবেশে সর্বদা কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে। একটি অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব যতদিন নিম্ন থাকে, পরিবেশ ততদিন ঐসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে নিতে পারে। কিন্তু লোকবসতি খুব ঘন হলে পরিবর্তনগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়, এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও তাতে দূষণ সৃষ্টি হয়। গত দুই বা তিন দশকে পরিবেশের যে দূষণ ঘটেছে, লোকবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়া তার অন্যতম একটি কারণ। তবে তা একমাত্র কারণ নয়। পৃথিবীতে লোকবসতির গড় ঘনত্ব যেমন বিপুল হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি উন্নত জীবনযাপনের ও

ভোগবিলাসের লোভও মানুষের বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত লোভ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মানুষ বনভূমি নির্মূল করে নগর ও শিল্পকারখানা নির্মাণ করে চলেছে। ফলে একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যেমন প্রবল টান পড়ছে অন্যদিকে আবার বিশাল পরিমাণ বর্জ্য প্রতিনিয়ত পরিবেশে যোগ হচ্ছে। ঘটনাগুলোর প্রভাবে পরিবেশের যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা এতই গভীর যে, প্রাকৃতিক উপায়ে সেসব পরিবর্তন পূরণ হতে পারছে না। ফলে পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে।

কোনো কোনো চিন্তাবিদের অভিমত, মানুষ যে পরিবেশের একটি অংশ, এ সত্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে মানুষের ব্যর্থতা পরিবেশ-দূষণের অন্যতম একটি কারণ। যুগ যুগ ধরে মানুষ মনে করে এসেছে, প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্ক 'সংগ্রামের'। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন সে সংগ্রামে নেতৃত্বদান করে প্রকৃতিকে মানুষের অনুগত করার পন্থা উদ্ভাবন করেছে, সমাজ তাকে পুরস্কৃত করেছে এবং অপ্রতিরোধ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমাজের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে সর্বদা বিবেচিত হয়েছে। পরিবেশ দূষণ ঐ অপ্রতিরোধ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অনিবার্য ও অবাঞ্ছিত এক পরিণতি।

'পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার' সম্পর্কে বুঝতে হলে প্রকৃতি ও জীবের পারস্পরিক যে সম্পর্ক তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। ইকোসিস্টেমের আলোকে (চিত্র ১.১) বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ইকোসিস্টেমের একটি উপাদান, 'উদ্ভিদ' এর কথা ধরা যাক। উদ্ভিদ ইকোসিস্টেমের 'আদি উৎপাদক' (primary producer)। বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 এবং মৃত্তিকা থেকে H_2O, N, P, K, S প্রভৃতি উপাদান শোষণ করে উদ্ভিদ জৈবিকভর ও খাদ্য (গ্লুকোজ, প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড) প্রস্তুত করে। গ্লুকোজ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপজাত অক্সিজেন (O_2)। এটি বায়ুমণ্ডলীয় O_2-এর একমাত্র উৎস এবং বায়ুজীবী (aerobic) জীবের জীবনধারণের (শ্বাস-প্রশ্বাস) অপরিহার্য একটি উপাদান :

$$6CO_2(g) + 6H_2O \xrightarrow{h\nu} C_6H_{12}O_6 + O_2(g)\uparrow$$

উদ্ভিদ সকল প্রাণীর (তৃণভোজী, মাংসভোজী ও সর্বভুক) খাদ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগান দেয়। উদ্ভিদ মৃত্তিকার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে; যেমন- উদ্ভিদ মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করে, আর্দ্রতা ধরে রাখতে মৃত্তিকাকে সাহায্য করে, আবার মৃত উদ্ভিদের যখন জৈবিক বিভাজন ঘটে তখন মৃত্তিকায় C, H, O, N, P, S, K প্রভৃতি উপাদান যুক্ত হয় যা মৃত্তিকার উৎপাদনশীলতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। ইকোসিস্টেমটির উদ্ভিদ নির্বিচারে ধ্বংস করা হলে ক্ষেত্রটির অন্যান্য অংশের পরে তার প্রভাব পড়ে; যেমন-

১. উদ্ভিদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং O_2-এর পরিমাণ হ্রাস পায়, এতে বায়ু-দূষণ ঘটে (জলবায়ুর উপর প্রভাব)।
২. বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী, বিশেষ করে তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্য কমে যায়, এতে তৃণভোজী প্রাণী নিশ্চিহ্ন হতে পারে (মানুষ তথা প্রাণিকুলের উপর প্রভাব)।

৩. মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত ও আর্দ্রতা শূন্য হয়ে শুষ্ক মরু প্রকৃতি ধারণ করতে পারে (মৃত্তিকার উপর প্রভাব)।

উদ্ভিদের ন্যায় ইকোসিস্টেমটির অন্য যে কোনো উপাদানের যদি কোনো পরিবর্তন ঘটে, অবশিষ্ট উপাদানগুলোর পরে একইভাবে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত কাজের ফলে পরিবেশে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। এদের মাঝে এমন কিছু কিছু কাজ আছে যার দরুন বিশ্ব পরিবেশও আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। নির্বিচারে গাছ-কাটা, ভূগর্ভস্থ পানি অতিমাত্রায় তুলে নেয়া, যানবাহন, শিল্প-কারখানা থেকে অতিমাত্রায় CO_2 ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস এবং শিল্প-কারখানার বর্জ্য পরিবেশে যুক্ত করা ঐসব কাজের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ। বিশ্ব পরিবেশ দূষণ বিষয়ে বর্তমানে বহুল আলোচিত দুটি ঘটনা গ্রীন হাউজ প্রভাব (greenhouse effect) ও ওজোন স্তরের ক্ষয় (depletion of ozone layer) উভয় ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কর্মকাণ্ডই দায়ী (ঘটনা দুটি সম্পর্কে পরে বায়ু-দূষণ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

পরিবেশ দূষণজনিত ভয়াবহ অনেক দুর্ঘটনা আজ পর্যন্ত সারাবিশ্বে ঘটেছে। ফলে একদিকে যেমন তাৎক্ষণিকভাবে অসংখ্য জীবন ও বিপুল সম্পদ নষ্ট হয়েছে অন্যদিকে তেমনি পরিবেশের উপর দীর্ঘস্থায়ী এক ক্ষতিকর প্রভাব কাজ করেছে। 'ভারতের ইউনিয়ন কারবাইড' দুর্ঘটনা এ জাতীয় দুর্ঘটনার অন্যতম একটি। ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভূপাল নগরীতে স্থাপিত 'ইউনিয়ন কারবাইড' কোম্পানির কীটনাশক (কার্বারিল) প্রস্তুতির কারখানা থেকে দুর্ঘটনাটির সূচনা হয় (ডিসেম্বর ৩, ১৯৮৪)। কীটনাশকটির কাঁচামাল হিসেবে মিথাইল আইসোসায়ানেট ব্যবহৃত হতো। মিথাইল আইসোসায়ানেট (b.p. 43 - 45°C) একটি তীব্র বিষ (TLV 0.02 ppm); জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে তা থেকে 'ফসজিন' ($COCl_2$) নামক আর একটি বিষাক্ত গ্যাস (TLV 0.1 ppm) সৃষ্টি হয়। মিথাইল আইসোসায়ানেট ঠাণ্ডা ভাণ্ডারে সংরক্ষিত থাকে। ভূপাল কীটনাশক কারখানায় শীতলকরণের যে ব্যবস্থা ছিল তাতে ত্রুটি ঘটে। ফলে ভাণ্ডারের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে উচ্চ চাপে তাতে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং সংরক্ষিত প্রায় পাঁচ হাজার পাউন্ড 'আইসোসায়ানেট' গ্যাস আকারে বাইরে বেরিয়ে আসে। আর্দ্রতার সংস্পর্শে এসে গ্যাসটি ফসজিন ও আইসোসায়ানেট গ্যাসের এক বিষাক্ত মিশ্রণ সৃষ্টি করে এবং মুহূর্তের মধ্যে কারখানার চতুর্দিকে প্রায় ৪০ বর্গমাইলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্যাসটি গ্রহণ করে মাত্র পাঁচ / ছয় ঘণ্টা সময়ের মাঝে কয়েক হাজার মানুষ ও পশুপাখি ঘরের ভিতর ও বাইরে পথের পাশে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। বেশ কয়েকদিন ধরে একই প্রকার নারকীয় ঘটনা চলতে থাকে এবং মাত্র এক সপ্তাহের মাঝে প্রায় দশ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে, এক হাজার লোক দৃষ্টিশক্তি হারায় এবং প্রায় এক লাখ লোক বিভিন্ন মাত্রায় শারীরিক অসুস্থতার শিকার হয়। দুর্ঘটনার একশ দিন পর পরিচালিত এক মেডিকেল সমীক্ষায়

দেখানো হয়েছে, প্রায় আড়াই লক্ষ লোক গ্যাসের সংস্পর্শে আসে যার প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার মারাত্মক বিকলাঙ্গতা এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার বিভিন্ন প্রকার অসুস্থতায় ভুগতে থাকে। এদের মাঝে যেসব হতভাগ্য ব্যক্তি শ্বাসকষ্ট, নিদ্রাহীনতা ও পরিপাকতন্ত্র বৈকল্যের শিকার হয় সারা জীবনের জন্য তারা কর্মক্ষমতা হারাতে পারে। দুর্ঘটনাটির সুদূরপ্রসারী প্রভাব সবচেয়ে বেশি মারাত্মক হয় গর্ভবতী মায়েদের জন্য - হয় তাদের গর্ভপাত ঘটে অন্যথায় তারা মৃত, বিকলাঙ্গ কিংবা অসুস্থ শিশু জন্ম দেয়।

ভূপালের দুর্ঘটনা স্পষ্টত একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, সচরাচর এরূপ ঘটেনা। কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞানতা ও অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পরিবেশের যে ক্ষতিসাধন করে চলেছে তার মন্থর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব একত্রিত করা হলে ভূপাল ঘটনার বিভৎসতাকে তা বহুগুণে ছাড়িয়ে যাবে এবং ঐরূপ কর্মকাণ্ড অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকলে মানব সভ্যতা কেবল পরিবেশ দূষণের কারণে একদিন ধ্বংসের মুখোমুখি উপনীত হবে । তবে আশার কথা পরিবেশ সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ আজ উপলব্ধি করতে পারছে, পরিবেশের সুস্থতা তার নিজের সুস্থতার জন্য অপরিহার্য একটি শর্ত এবং পরিবেশের ক্ষতি হলে তার নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। পরিবেশকে সুস্থ রাখতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একে জানা এবং বোঝা। সারা বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে 'পরিবেশ' তাই আজ পঠনীয় একটি বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং গুরুত্ব সহকারে তার পাঠদান ও গবেষণা চলছে।

১.৪ পরিবেশ সচেতনতা - অতীত ও বর্তমান (Awareness of Environment-Past and Present)

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, 'বিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিস্তার' ও 'পরিবেশের ক্ষতি' সমান্তরাল দুটি ঘটনা। মানুষ একদিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শিল্প-কারখানার প্রসার ঘটাচ্ছে অন্যদিকে সে নিজের অস্তিত্ব বিনাশী পরিবেশ-দূষণ সৃষ্টি করে চলেছে। অভিযোগটির মাঝে সত্যতা যেমন আছে, সত্যের বিকৃতিও তেমনি কিছুটা আছে।এতে কেবল শিল্প-কারখানার বিস্তারকে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী করা হয়েছে যা সত্যের একটি বিকৃতি। শিল্প-কারখানার বিস্তার যখন ঘটে নি, পরিবেশের ক্ষতি মানুষের দ্বারা তখনও হয়েছে এবং মানুষকে তার ফলভোগ করতে হয়েছে। তবে শিল্প বিস্তারের পূর্বে পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে এবং পরে যে ক্ষতি হয়েছে বা হচ্ছে, এ দুয়ের মাঝে প্রকৃতিগত বিরাট পার্থক্য আছে। পূর্বে পরিবেশ দূষণজনিত কোনো বিপর্যয়ের পটভূমি তৈরি হতে যে সময় লাগতো এখন তা লাগে না। উদাহরণস্বরূপ, এরি হ্রদ (lake erie) এর কথা ধরা যাক। 'এরি' উত্তর আমেরিকার বিশাল একটি হ্রদ (আয়তন ৯,৯১০ বর্গমাইল)। এর তীরে যেসব শহর ও শিল্পকারখানা আছে তা থেকে এমন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য হ্রদের পানিতে প্রতিদিন যুক্ত হয় যে, আশঙ্কা করা হচ্ছে, হ্রদটি অচিরে

ভরাট হয়ে কর্দমময় জলাভূমিতে পরিণত হবে। গত পঞ্চাশ বছরে হ্রদটির যে পরিবর্তন ঘটেছে, বিজ্ঞানীদের ধারণা শিল্প ও নগর সভ্যতার কাল না হলে তা ঘটতে প্রায় পনেরো হাজার বছর সময় লেগে যেতো। পূর্বে মানুষের কাজের মাধ্যমে পরিবেশের যে পরিবর্তন ঘটতো তা প্রায় ক্ষেত্রে এত মন্থর হতো যে, হয় প্রকৃতি নিজেই সে পরিবর্তন আত্মস্থ করে নিত অন্যথায় একজন মানুষের জীবদ্দশায় তা কার্যত দৃশ্যমান হতো না। তাছাড়া, পরিবর্তন দৃশ্যমান হলেও তার কারণ উদঘাটন কিংবা প্রতিকারের পন্থা উদ্ভাবন করা প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হতো না। কেননা, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে তখন মানুষ যে ধারণা পোষণ করত তা যেমন ছিল অস্বচ্ছ তেমনি অবৈজ্ঞানিক। প্রকৃতির যে কোনো বিপর্যয়কে সে এক অলৌকিক শক্তির খেয়াল ও অভিশাপ বলে গণ্য করতো ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের ধারণা অনেক বেশি স্বচ্ছ হয়েছে। আজ একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী পরিবেশের কোনো ঘটনার কার্যকারণ উদঘাটন করতে পারেন এবং তার পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করারও ক্ষমতা রাখেন। এরূপ পটভূমিতে ষাটের দশকে উত্তর আমেরিকায় পরিবেশ বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে ধরা পড়ে, পরিবেশ দূষণের কারণে প্রায় দুশত প্রকার পাখি ও স্তন্যপায়ী জীব হয় ইতিপূর্বে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, না হয় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। উত্তর আমেরিকায় বিশাল হ্রদপুঞ্জের (মোট আয়তন প্রায় সাতানব্বই হাজার বর্গমাইল) এক বিরাট অংশে পানিতে মারাত্মক পারদ-দূষণ ঘটেছে। কোনো কোনো হ্রদ জলাভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। একদা যেসব স্রোতস্বিনী পরিষ্কার ঝকঝকে পানি ধারণ করত সেগুলো ডিটারজেন্ট, কীটনাশক ও শিল্পকারখানার বর্জ্যে পূর্ণ হয়ে নর্দমায় পর্যবসিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু মূল্যবান স্থাপত্য শিল্প নষ্ট হতে চলেছে এবং এমনি আরও ছোট বড় অনেক দুর্ঘটনা হয় ইতিপূর্বে ঘটে গেছে, না হয় ঘটতে চলেছে। বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেন, ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটির পিছনে মানুষের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছে এবং পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞানতা, অবিবেচনা কিংবা তাচ্ছিল্যের কারণে সেগুলো ঘটতে পেরেছে। বিজ্ঞানীদের ঐসব পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭০ সালে ধরিত্রী দিবস (earthday) উদযাপিত এবং ১৯৭২ সালে স্টকহোমে মানব পরিবেশের উপর জাতিসংঘের সম্মেলন (United Nations Conference on Human Environment) অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরো শহরে 'ধরিত্রী মহাসম্মেলন' (earth summit) অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মানুষের পাশাপাশি পরিবেশের জৈবিক বৈচিত্র্য (biological diversity) রক্ষার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ঐসব আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি পৃথিবীর উন্নত অনুন্নত সকল দেশে পরিবেশ সম্পর্কে আজ ঐকান্তিক ভাবনাচিন্তা, নীতি প্রণয়ন ও নীতি অনুসরণ শুরু হয়েছে এবং সাধারণ জনগণের মাঝেও

পরিবেশ সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে পৃথিবীতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং একদিকে জনসংখ্যার বিরাট এক অংশের আকাশচুম্বী ভোগলিপ্সা ও অন্যদিকে বিরাট আর এক অংশের অতলান্ত দারিদ্র্য, এই ত্রিমুখী সমস্যা পরিবেশ-সংরক্ষণ বিষয়টিকে এমন জটিল করে তুলেছে যে উন্নত ও অনুন্নত কোনো দেশের পক্ষেই বিষয়টির সরল কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এরূপ বাস্তবতার মাঝেও আশার কথা, দেশে দেশে সাধারণ মানুষের মাঝেও এ উপলব্ধি ক্রমশ জাগ্রত হচ্ছে যে, পরিবেশকে সুস্থ রাখতে না পারলে মানুষ নিজেও সুস্থ থাকতে পারবে না এমনকি তার অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে।

১.৫ পরিবেশ বিষয়ক কিছু পদের সংজ্ঞা (Definition of Some Terms Related to Enviornment)

দূষক (pollutant) : কোনো বস্তু বা ঘটনা সার্বিক বিচারে যা পরিবেশের কিংবা পরিবেশের অন্তর্গত উপকারী কোনো জীব বা বস্তুর উপর 'নিট' ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তাকে পরিবেশের একটি 'দূষক' বলে। দূষক প্রায়ই স্থান-কাল-পাত্র সাপেক্ষ একটি বস্তু বা ঘটনা। এক ক্ষেত্রের দূষক ভিন্ন ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ও হিতকর হতে পারে। অসংখ্য উদাহরণ উক্তিটির স্বপক্ষে উপস্থাপন করা যায়। যেমন, একদল তরুণ লাউডস্পিকার লাগিয়ে উচ্চ শব্দের যে রক সংগীত শোনে, তরুণদের কাছে তা বিনোদন হতে পারে কিন্তু অনেকের কাছেই তা তীব্র শব্দ দূষণ ও ক্ষতিকর। বস্তু-দূষকের ক্ষেত্রে একটি কথা সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, আজকের দূষক পূর্ববর্তী কোনো একসময়ে সম্পদ ছিল, সময়ের ব্যবধানে আজ যা আবর্জনায় পর্যবসিত হয়েছে। কেবল সময়ের ব্যবধানে নয়, স্থানভেদেও হিতকর দূষক কিংবা দূষক হিতকর হতে পারে। শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক যখন কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে শস্যকে রক্ষা করে তখন তা হিতকর কিন্তু ঐ কীটনাশকই যখন মাছ ও অন্যান্য উপকারী জীবকে ধ্বংস করে কিংবা শস্যের মাধ্যমে ভোক্তার দেহে প্রবেশ করে তার স্বাস্থ্যহানির কারণ হয় তখন তা পরিবেশের একটি দূষক। একইভাবে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ফসফেট সার যখন শস্যের ফলন বাড়ায় তখন তা হিতকর কিন্তু ঐ ফসফেট সার যখন জলাধারে যুক্ত হয়ে সেখানে বিপুল পরিমাণে শৈবাল সৃষ্টি করে এবং পানি দূষণ ঘটায় তখন তা পরিবেশের দূষক হিসেবে গণ্য হয়। একই বস্তু বা ঘটনার পরিবেশের উপর ঐরূপ বিপরীতধর্মী দুই প্রকার প্রভাব প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। একটি বস্তু বা ঘটনাকে সাধারণভাবে দূষক কিংবা হিতকর হিসেবে চিহ্নিত করা তাই প্রায়ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

মিশাল (contaminant) : যে বস্তু পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থায় এতে উপস্থিত থাকে না, মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশে যুক্ত হয় তাকে পরিবেশের একটি মিশাল বলে। মিশালের কারণে পরিবেশে যদি ক্ষতিকর কোনো পরিবর্তন ঘটে তাহলে মিশাল 'দূষক' হিসেবে গণ্য হয়। পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থায় এতে Cl_2 গ্যাস উপস্থিত থাকে

না। গ্যাসটি যদি কোনো উৎস থেকে (যেমন, পরিবহন সিলিন্ডার) পরিবেশে প্রবেশ করে তখন তা পরিবেশের একটি 'মিশাল' এবং প্রবিষ্ট ক্লোরিনের পরিমাণ যখন জীব ও সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন মাত্রায় পৌঁছে তখন তা পরিবেশের একটি দূষক হয়।

গ্রাহক (receptor) : দূষক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এমন বস্তু বা জীবকে দূষকের গ্রাহক বলে। পানীয় পানিতে আর্সেনিক উচ্চমাত্রায় (> 0.05 ppm) উপস্থিত থাকলে তা পানীয় পানির একটি দূষক হিসেবে গণ্য হয়। মানুষ As - দূষিত পানি পান করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে মানুষ As-এর একটি গ্রাহক।

আধার (sink) : যে বস্তু বা মাধ্যমে একটি দূষক বহুদিন পর্যন্ত আটকা থাকে তাকে দূষকটির একটি আধার বলে। সালফার ডাই-অক্সাইড তথা সালফিউরিক অ্যাসিড বায়ুমণ্ডলের একটি দূষক। ভূপৃষ্ঠে নেমে আসার পর চুনাপাথরের সাথে বিক্রিয়ায় $CaSO_4$ আকারে এটি আটকা পড়ে, চুনাপাথর তাই H_2SO_4-এর একটি আধার:

$$CaCO_3(s) + H_2SO_4 = CaSO_4(s) + H_2O + CO_2(g)$$ ।

দূষকের চলার পথ (pathway) : একটি দূষক যে কৌশলে পরিবেশের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তারলাভ করে তাকে দূষকটির চলার পথ বলে; যেমন- পরিবেশে পারদের চলার পথ:

$$Hg^{2+} \xrightarrow[\text{ব্যাকটেরিয়া}]{\text{অবায়ুজীবী}} CH_3Hg^+ \longrightarrow \text{প্ল্যাঙ্কটন} \longrightarrow \text{ছোটমাছ} \longrightarrow \text{বড়মাছ} \longrightarrow \text{মানুষ}$$ ।

স্পেসিয়েশন (speciation) : একই মৌল জৈব, অজৈব, জৈব-ধাতব, জারিত, বিজারিত প্রভৃতি নানাবিধ রাসায়নিক অবস্থায় পরিবেশে অবস্থান করতে পারে এবং রাসায়নিক অবস্থাভেদে পরিবেশের উপর তার প্রভাবও সাধারণত ভিন্ন হয়। পরিবেশের সাপেক্ষে একটি মৌলের বৈশিষ্ট্য জানার জন্য তাই মৌলটির রাসায়নিক অবস্থা জানতে হয়। মৌলের রাসায়নিক অবস্থা নির্ণয়করণকে তার স্পেসিয়েশন বলে। পারদ পরিবেশের একটি দূষক হিসেবে সাধারণভাবে পরিচিত। ধাতুটি বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থায় (যেমন, Hg^0, Hg_2^{2+}, Hg^{2+}, CH_3Hg^+, $(CH_3)_2Hg$, প্রভৃতি) পরিবেশে উপস্থিত থাকতে পারে যার মাঝে CH_3Hg^+ ও $(CH_3)_2Hg(g)$ সবচেয়ে বেশি বিষাক্ত। বস্তুত, পারদের পানি দূষণ বলতে মূলত উক্ত দুই রাসায়নিক অবস্থায় পারদের পানি দূষণ বুঝায়। অতএব, জলাশয়ে পারদ প্রবেশ করলে পানিতে পারদ দূষণ ঘটেছে কিনা তা জানার জন্য পারদের রাসায়নিক অবস্থাও জানার প্রয়োজন হয়। তবে, পানিতে অজৈব পারদ ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে একসময় জৈব পারদে (যেমন RHg^+, R_2Hg) রূপান্তরিত হতে পারে।

ক্ষতিকর প্রান্তীয় মান (Threshold Limiting Value, TLV) : একজন স্বাস্থ্যবান শ্রমিক যদি একটি গ্যাস / বাষ্পের সংস্পর্শে থেকে দিনে আট ঘণ্টা করে সপ্তাহে চল্লিশ

ঘণ্টা হিসাবে সারাজীবন কাজ করে তাহলে কর্মস্থলের বায়ুতে গ্যাস / বাষ্পটির গড় ঘনমাত্রা যে মান-এর ঊর্ধ্বে থাকলে শ্রমিকটির স্বাস্থ্যের জন্য তা ক্ষতিকর হয় (ঘনমাত্রার) সেই মানকে সংশ্লিষ্ট বস্তুটির ক্ষতিকর প্রান্তীয় মান বা TLV বলে। TLV সরাসরি মানুষের উপর নির্ণয় করা হয় না; জন্তুর (যেমন গিনিপিগ) উপর পরীক্ষা করে স্থিতিমাপটির মান নির্ধারণ করা হয়। পরিশিষ্টে কিছু পদার্থের TLV লিপিবদ্ধ করা হলো (পরিশিষ্ট - ৪)।

এলডি 50 (LD_{50}): একটি দূষকের বিষক্রিয়ার মাত্রা (toxicity) নির্ধারণ এবং অন্যান্য দূষকের সাথে তা তুলনা করার জন্য LD_{50} স্থিতিমাপটি ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষণীয় পশুর দেহে একটি রাসায়নিক পদার্থ যে মাত্রায় প্রবেশ করানো হলে একশটির মাঝে পঞ্চাশটি পশু মারা যায় তাকে উক্ত পদার্থের LD_{50} (Lethal Dose – 50) বলে। পরীক্ষায় ব্যবহৃত পশুর শ্রেণী, পরীক্ষণ সময়ের ব্যাপ্তি, পশুদেহে কেমিক্যাল প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়া, পশুর খাদ্য, পরিবেশ প্রভৃতি নিয়ামকের উপর LD_{50} - এর মান নির্ভর করে। নিয়ামকগুলোর যে কোনোটির পরিবর্তন ঘটলে LD_{50} মানেরও পরিবর্তন ঘটতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে উক্ত মান অভিক্ষিপ্ত (extrapolate) করা যায় না; কেবল পরীক্ষণীয় পদার্থের বিষক্রিয়ার ধরন, বিষক্রিয়া সৃষ্টির কৌশল এবং বিভিন্ন পদার্থের যে বিষক্রিয়া তার আপেক্ষিক মাত্রা নির্ধারণ করার জন্য স্থিতিমাপটি ব্যবহার করা হয়। পদার্থের LD_{50} যত নিম্ন তার বিষক্রিয়া তত বেশি তীব্র হয়।

সহনীয় মাত্রা ও অনুমোদিত মাত্রা (tolerance level and recommended level): কোনো মিশালের সাপেক্ষে পানীয় পানির গুণগত মান প্রকাশ করতে স্থিতিমাপ দুটি ব্যবহার করা হয়। পানিতে একটি মিশাল যে মাত্রার ঊর্ধ্বে উপস্থিত থাকলে পানীয় হিসেবে সে পানি ব্যবহার না করার পক্ষে সঙ্গত কারণ সৃষ্টি হয়, মিশালের সে মাত্রাকে পানীয় পানির জন্য তার সহনীয় মাত্রা বলে। মিশালের অনুমোদিত মাত্রা তার সহনীয় মাত্রার নিচে নির্ধারিত থাকে। যেখানে পানীয় পানির উন্নততর উৎস লভ্য সেখানে এমন একটি উৎসের পানি ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে মিশালটি তার অনুমোদিত মাত্রার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে।

স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পানীয় পানির জন্য একটি পদার্থের সহনীয় ও অনুমোদিত মাত্রা নির্ধারিত হয়। যথোপযুক্ত পানির লভ্যতা, ব্যবহারকারীর আর্থিক সামর্থ্য, পদার্থের বিষক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার বিশ্লেষণ করে ঐসব প্রতিষ্ঠান পদার্থটির একটি মাত্রা নির্ধারণ করে। যেমন, পানীয় পানির জন্য আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা WHO ও USEPA কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে 0.05 ppm। পাশাপাশি ভারতীয় স্বাস্থ্যবিভাগ কর্তৃক সেদেশের জন্য মাত্রাটি নির্ধারণ করা হয়েছে 0.2 ppm। আমাদের দেশে সাধারণত WHO-এর স্টান্ডার্ড

অনুসরণ করা হয়। যাহোক, বায়ু দূষকের ক্ষেত্রেও 'সহনীয় মাত্রা' ও 'অনুমোদিত মাত্রা' স্থিতিমাপ দুটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মিশালের প্রবহন (flux of contaminant) : পরিবেশের একটি মিশাল এক ক্ষেত্র (domain) থেকে অপর একটি ক্ষেত্রে যে হারে স্থানান্তরিত হয় তাকে মিশালটির প্রবহন বলে। প্রবহন সাধারণত বার্ষিক টেরাগ্রাম এককে ($T_g = 10^{12}$-g = 10^6 মেট্রিক টন) প্রকাশ করা হয়।

পিপিএম (ppm) **ও পিপিবি** (ppb) : পিপিএম (ppm- parts per million) ও পিপিবি (ppb- parts per billion) ঘনমাত্রার দুটি একক যা কঠিন বস্তু ও অতিমাত্রায় লঘু জলীয় দ্রবণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং পরিবেশ রসায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ জনপ্রিয়। প্রতি লিটার জলীয় দ্রবণে বিদ্যমান একটি দ্রবের মিলিগ্রাম সংখ্যাকে তার পিপিএম এবং মাইক্রোগ্রাম (μg) সংখ্যাকে তার পিপিবি ঘনমাত্রা বলে। কঠিন নমুনার ক্ষেত্রে একক দুটি ভর-ভর অনুপাতে প্রকাশ করা হয়:

$$\text{পিপিএম (ppm)} = \frac{\text{দ্রবের মিলিগ্রাম}}{\text{দ্রবণের (জলীয়) লিটার}} = \text{mg/L};$$

$$= \frac{\text{দ্রবের মাইক্রোগ্রাম}}{\text{দ্রবণের (জলীয়) মিলিলিটার}} = \mu\text{g/mL};$$

$$= \frac{\text{দ্রবের মিলিগ্রাম}}{\text{নমুনার কিলোগ্রাম}} = \text{mg/kg} = \mu\text{g/g};$$

$$\text{পিপিবি (ppb)} = \frac{\text{দ্রবের মাইক্রোগ্রাম}}{\text{দ্রবণের (জলীয়) লিটার}} = \mu\text{g/L};$$

$$= \frac{\text{দ্রবের মাইক্রোগ্রাম}}{\text{নমুনার কিলোগ্রাম}} = \mu\text{g/kg}$$

প্রশ্নমালা

১. পরিবেশের অংশ কি কি? তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২. ইকোসিস্টেম বলতে কি বুঝায়? ইকোসিস্টেমের এককগুলো পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত - উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৩. পরিবেশ রসায়ন বলতে কি বুঝায়? প্রচলিত শুদ্ধ রসায়নের তুলনায় পরিবেশ রসায়ন অনেক বেশি জটিল - কারণ ব্যাখা কর।

৪. রসায়ন বিজ্ঞানের একজন ছাত্রের জন্য পরিবেশ রসায়ন অবশ্য পঠনীয় একটি বিষয় - উক্তিটির যৌক্তিকতা দেখাও।

৫. পরিবেশ দূষণের সংজ্ঞা দাও এবং সংজ্ঞার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৬. পরিবেশের দূষক স্থান-কাল-পাত্র সাপেক্ষ একটি বস্তু বা ঘটনা - ব্যাখ্যা কর।

৭. পরিবেশকে সুস্থ রাখতে না পারলে মানব সভ্যতা হুমকির মুখোমুখি হবে- ব্যাখ্যা কর।

৮. সংজ্ঞা লিখ : দূষক, মিশাল, গ্রাহক, আধার, স্পেসিয়েশন, TLV, LD_{50}, সহনীয় মাত্রা, অনুমোদিত মাত্রা, পিপিএম ও পিপিবি।

গ্রন্থপঞ্জি

- A Guide to the Study of Environmental Pollution, Editor W.A. Andrews, Prentice Hall Inc., USA. 1972
- CRC Handbook of Chemistry and Physics, 63rd Ed., Editor R.C. Weast, CRC Press Inc., USA, 1983
- The New American Desk Encyclopedia, Editor in Chief R.A. Rosenbaum, A Signet Book, USA, 1984
- Encyclopedia Americana, Intern. Edn, V-14, Grolier Inc., USA, 1981
- McGraw Hill Encyclopedia of Science and Technology, V-8, 6th Ed., McGraw Hill, USA, 1987.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বারিমণ্ডল

(Hydrosphere)

২.১ ভূমিকা

ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশ তরল ও কঠিন পানি দ্বারা আবৃত থাকে তাকে বারিমণ্ডল বলে। সমুদ্র, মহাসমুদ্র, নদ-নদী, খাল, পুকুর, হ্রদ, মেরুপ্রদেশীয় বরফ-ঢাকনা (ice-cap) ও হিমবাহ মিলে বারিমণ্ডল গঠিত। এছাড়া ভূ-গর্ভে ও বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে যে পানি আছে, তাও বারিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভূ-পৃষ্ঠের মোট যে আয়তন তার প্রায় ৭১% তরল ও কঠিন পানি দ্বারা আবৃত এবং তরল, কঠিন ও বাষ্পাকারে মোট যে পানি পৃথিবীতে বিদ্যমান তার পরিমাণ ১.৬৬৪×১০^{১৮} মেট্রিক টন। বিশাল ঐ পানিরাশির বণ্টন মোটামুটি নিম্নরূপ:

সমুদ্র ও মহাসমুদ্র	৯৭%
ভূ-গর্ভ, হ্রদ, পুকুর, নদ-নদী, খাল প্রভৃতি	২%
তুষারস্তুপ, হিমবাহ ও বায়ুমণ্ডল	১%

পানির বণ্টন প্রকাশ করার আরও একটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রত্যেকটি আধারে বিভিন্ন আকারে যে পানি বিদ্যমান তা যদি পৃথক পৃথকভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বত্র (5.1×10^8 km^2) সমভাবে অবস্থান করে তাহলে পানির যে গভীরতা হয় সে হিসাবে পানির বণ্টন এরূপ:

সমুদ্র ও মহাসমুদ্র	২৭০০ - ২৮০০ মিটার (মি:)
তুষারস্তুপ ও বরফ	৫০ - ১২০ মি.
ভূ-গর্ভ	১৫ - ৪৫ মি.
হ্রদ	০.৪ - ১.০ মি.
বায়ুমণ্ডল	০.০৩ মি.

তরল পানিরাশির (মোট পানির ৯৮%) প্রায় সম্পূর্ণ অংশ সমুদ্র ও মহাসমুদ্র ধারণ করে কিন্তু উক্ত পানি এতই লবণাক্ত যে (সারণি ২.৫ দ্র:) তা ব্যবহারের উপযোগী নয়। অন্যান্য উৎস থেকে যে সামান্য তরল পানি পাওয়া যায় (১% এরও কম) কেবল তা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে আসে। তবে শুষ্ক ভূ-খণ্ডে যে পানি ব্যবহৃত হয় তার একটি ভগ্নাংশ সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

২.২ পানির বিশেষত্ব

পরিবেশের উপর বারিমণ্ডলের প্রভাব অত্যন্ত গভীর এবং পানির উৎস, পরিবহণ ও ভৌত-রাসায়নিক গঠন দ্বারা প্রভাবের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে, পরিবেশও পানির ভৌত-রাসায়নিক গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবেশের উপর বারিমণ্ডলের যে প্রভাব তাতে পানির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

তাপমাত্রার বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তিতে পানির তরল অবস্থা : পানির গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে ০° ও ১০০° সেলসিয়াস (চাপ 1 atm) অর্থাৎ তাপমাত্রার ১০০° ব্যাপ্তিতে পানি তরল অবস্থায় অবস্থান করে। পানির একটি অণু (H_2O) অপর একটি অণুর সাথে দৃঢ় H-বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে বলে পানির গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের মাঝে ঐরূপ বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। তাপমাত্রার বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তিতে পানির তরল অবস্থা দ্রাবক ও পরিবাহক হিসেবে পানিকে বিশেষ সুবিধা দান করে।

পানির দ্রাবক বৈশিষ্ট্য : পানি একটি পোলার যৌগ, প্রায় সকল প্রকার পদার্থ এতে কম-বেশি দ্রবীভূত হয়। তবে আয়নিক ও পোলার যৌগের দ্রাব্যতা এতে সবচেয়ে বেশি। পানির ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক, ε খুব উচ্চ (ε=81)। চার্জ বহনকারী দুটি কণার মাঝে যে স্থিরতাড়িত (electrostatic) বল (F) কাজ করে তা দ্রাবকের ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবকের সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক অনুসরণ করে ($F = q_1q_2 / \varepsilon r^2$) অর্থাৎ দ্রাবকের ε যত উচ্চ হয়, একই দূরত্বে (r ধ্রবক) অবস্থিত কণা দুটির মাঝে ক্রিয়াশীল বল তত হ্রাস পায়। তাই, পানির মাঝে একটি পদার্থ একবার দ্রবীভূত হলে দ্রবণের মাঝে অবস্থান করার তার প্রবল প্রবণতা থাকে। যাহোক, পোলারিটি ও উচ্চ ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক বৈশিষ্ট্য দুটির প্রভাবে বিভিন্ন শ্রেণী পদার্থের জন্য পানি উত্তম একটি দ্রাবক হিসেবে কাজ করে। দ্রবীভূত অবস্থায় দ্রাবকের মাঝে একটি পদার্থের চলাফেরা সহজ হয়; তাই পানির মাঝে যেসব জৈবিক প্রক্রিয়া (biological process) ঘটে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি যেমন সহজে জীবের কাছে পৌঁছতে পারে, জৈবিক প্রক্রিয়া থেকে নিঃসৃত বর্জ্যও তেমনি জীবের কাছ থেকে সহজে দূরে সরে যেতে পারে।

পানির উচ্চ তাপধারণ ক্ষমতা ও উচ্চ বাষ্পীভবন তাপ : একটি পদার্থের তাপমাত্রা 1°C (বা 1K) বৃদ্ধি পেতে এবং একটি তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হতে যে পরিমাণ তাপশক্তি প্রয়োজন হয় তাকে যথাক্রমে পদার্থের তাপধারণ ক্ষমতা (heat capacity) ও বাষ্পীভবন তাপ (heat of vaporization) বলে। পানির তাপধারণ ক্ষমতা ও বাষ্পীভবন তাপ উভয়ই উচ্চ, প্রতিগ্রামে যথাক্রমে 4.184 J ও 2.4 kJ (20°C তাপমাত্রায়)। পানির তাপধারণ ক্ষমতা NH_3 বাদে সব পদার্থের তুলনায় বেশি অর্থাৎ একই হারে যদি সকল পদার্থে তাপশক্তির শোষণ বা বর্জন ঘটে তাহলে পানির ক্ষেত্রেই তাপমাত্রার পরিবর্তন সবচেয়ে কম হয়। যেমন, যে তাপে এক খণ্ড লৌহে (তাপধারণ ক্ষমতা 0.444 J/g) তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় 9.5^0 সেলসিয়াস সে তাপে

সমপরিমাণ পানিতে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে মাত্র 1°। পানির উচ্চ তাপধারণ ক্ষমতা ও উচ্চ বাষ্পীভবন তাপ, বৈশিষ্ট্য দুটির তাৎপর্য পরিবেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীর, যেমন-

ক. পানির তাপধারণ ক্ষমতা উচ্চ বলে জলজ প্রাণীকে তাপীয় কিংবা শৈত্য আঘাতের শিকার হতে হয় না কেননা দিন ও রাতের মাঝে কিংবা শীত ও গ্রীষ্মের মাঝে পানিতে তাপমাত্রার আকস্মিক বিরাট কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না।

খ. পানির বাষ্পীভবন তাপ উচ্চ বলে সমগ্র পৃথিবীতে তাপমাত্রা সহনীয় স্তরে ক্ষুদ্র ব্যাপ্তির মাঝে সীমিত থাকে। সূর্য থেকে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি পৃথিবীতে পৌঁছায়, তার প্রায় 30% (1×10^{24} J/yr) পানির বাষ্পীভবনে ব্যয় হয়। শোষিত শক্তি বহন করে জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে হাজার হাজার মাইল দূরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং একসময় তা বৃষ্টি / তুষারপাত আকারে আবার ভূ-পৃষ্ঠ ও জলাধারে নেমে আসে। জলীয় বাষ্প যখন বৃষ্টির ফোঁটায় / তুষারে ঘনীভূত হয় তখন সে তার ধারণকৃত শক্তিকে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। এভাবে পানির বাষ্পীভবন, দূর দূরান্তে জলীয় বাষ্পের বিচরণ এবং তরল পানিতে আবার তার ঘনীভবন এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের তাপ একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং পানির বাষ্পীভবন তাপ উচ্চ বলে স্থানান্তরিত তাপের পরিমাণও বেশি হয়। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা 15°C এবং কোনো একটি স্থানে তাপমাত্রা এমন ছোট এক গণ্ডির মাঝে সীমিত থাকে যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য তা বিশেষ অনুকূল হয়। সমগ্র ঘটনাটির পিছনে পানির উচ্চ বাষ্পীভবন তাপ বৈশিষ্ট্যটির বিরাট ভূমিকা থাকে।

পানির তুলনায় বরফ হালকা : যে কোনো পদার্থের মতো পানিও যত শীতল হয়, তার ঘনআয়তন তত হ্রাস পায়। তবে 4°C তাপমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছলে পানির সংকোচন বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখান থেকে 0°C তাপমাত্রায় বরফে পরিণত হওয়া পর্যন্ত পানির ঘনআয়তন বাড়তে থাকে। উক্ত তাপমাত্রায় (0°C) বরফের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি কিন্তু পানির ঘনত্বের তুলনায় তা কম (পানির ঘনত্বের 0.92 ভগ্নাংশ)। বরফ তাই তরল পানির উপর ভাসতে থকে। শীতপ্রধান দেশের পরিবেশে বিশেষ করে জলজ প্রাণীর জন্য ঘটনাটির তাৎপর্য বিশেষ কল্যাণকর; যেমন,

ক. বরফ পানির উপর ভেসে থাকে বলে জলজ প্রাণীর পক্ষে শীতপ্রধান দেশে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। সেখানে শীতের ঋতুতে যে শৈত্য প্রবাহ চলতে থাকে, তার প্রভাবে প্রাকৃতিক জলাধারে বরফ জমে এবং পানির উপর স্তর থেকে বরফ জমা শুরু হয়। বরফ পানির তুলনায় হালকা বলে পানির উপরে তা সর্বদা ভেসে থাকে এবং নিচের স্তরের পানিকে ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শ থেকে বাঁচায়। নিচের স্তরের পানি তাই সহজে বরফ হয় না, বরফের ঢাকনার নিচে তা তরল অবস্থায় থাকে এবং জলজ প্রাণীর পক্ষে তাতে বেঁচে থাকাও সম্ভব হয়। বরফ পানির তুলনায় ভারি হলে (ঘনত্ব বেশি) জলাধারের তলদেশে তা জমা হতো এবং সেখান থেকে উচ্চতর স্তরে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে সমগ্র জলাধারকে একসময় কঠিন বরফে পূর্ণ করে ফেলত। কঠিন বরফের নিচে

যেহেতু কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না, বরফে পূর্ণ জলাধার থেকে জলজ প্রাণী তাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

খ. বরফ পানির তুলনায় হালকা না হলে শীতপ্রধান দেশে প্রাকৃতিক জলাধার সম্ভবত সর্বদা বরফে পূর্ণ থাকত। বরফ পানির তুলনায় ভারি হলে জলাধারের তলদেশে তা জমা হতো এবং উপরে তরল পানির স্তর দ্বারা তা ঢাকা থাকত অন্যথায় সম্পূর্ণ জলাধার বরফে পূর্ণ হতো। শীতের শেষে সূর্যতাপের প্রখরতা যখন বাড়তে থাকে, জলাধারে বরফের গলন তখন শুরু হয়। পানি বরফের তুলনায় হালকা হলে সর্বদা তা বরফের উপরে থেকে সৌরতাপের সংস্পর্শ থেকে বরফকে ঢেকে রাখতো। এতে জলাধারে বরফের গলন প্রলম্বিত হতো এবং হয়ত সারা বছরই জলাধারের তলদেশে বিরাট একটি স্তর সর্বদা বরফে পূর্ণ থাকত।

পানিরাশিতে তাপীয় স্তরায়ণ (thermal stratification) : পানির তাপমাত্রা 4°C এর ঊর্ধ্বে যত বৃদ্ধি পায় তত তার ঘনত্ব কমতে থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর তাপ যখন বিরাট একটি জলাধারের উপর পড়ে তখন পানিরাশির উপর স্তর উত্তপ্ত হয় এবং সেখানে পানির ঘনত্ব হ্রাস পায়। সূর্যের তাপ পানিরাশির নিম্নতর স্তরে পৌঁছতে পারে না ফলে উপর স্তরের তুলনায় নিম্নস্তরের পানি অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘন থাকে এবং দুটি স্তরের মাঝে সুস্পষ্ট একটি বিভাজন সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে সূর্যতাপের প্রভাবে সংরক্ষিত বিশাল পানিরাশির মাঝে ঐরূপ বিভাজন সৃষ্টি হওয়ার ঘটনাকে পানির তাপীয় স্তরায়ণ বলে।

জলাধারে পানিরাশির মাঝে যে সকল রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়া ঘটে, পানির তাপীয় স্তরায়ণ সেগুলোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উপরের স্তর (epilimnion) সূর্যালোকের সংস্পর্শে থাকে বলে সেখানে প্রচুর পরিমাণে শৈবাল জন্ম নেয়। শৈবালের সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় যা পানিরাশির উপরস্তরকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ ও বায়ুজীবী জলজ প্রাণীর অনুকূল আবাসস্থলে পরিণত করে। অন্যদিকে, পানিরাশির নিম্নস্তরে (hypolimnion) জৈব পদার্থের জৈবিক বিভাজন (bio-degradation) ঘটে। ফলে নিম্নস্তরের পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি সৃষ্টি হয় এবং অধিকতর বিজারিত অবস্থার যৌগ সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। শরৎকালে সূর্যের প্রখরতা যখন কমে আসে তখন পানিরাশির উপরস্তর ও নিচের স্তরের মাঝে তাপের পার্থক্য তথা পানির স্তরায়ণ লোপ পায় এবং একস্তরের পুষ্টি উপাদান অন্যস্তরে প্রবেশ করে সমগ্র পানিরাশিকে পুষ্টিসমৃদ্ধ সমসত্ত্ব একটি দ্রবণে পরিণত করে। ফলে সমগ্র জলাধারে জৈবিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়।

২.৩ প্রাকৃতিক পানিতে বায়ুমণ্ডলের গ্যাস

বায়ুমণ্ডলের এক একটি গ্যাস প্রাকৃতিক পানিতে এক এক মাত্রায় দ্রবীভূত হয়:

$x(g)$ বায়ুমণ্ডল $\rightarrow$ $x(aq)$ বারিমণ্ডল ।

পরস্পর সংলগ্ন একটি তরল ও একটি গ্যাসীয় দশার (phase) মাঝে একটি গ্যাসের যে বণ্টন ঘটে তা হেনরির সূত্র (Henry's law) অনুসরণ করে। সূত্রটি নির্দেশ

করে, বণ্টন প্রক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তরল দশায় দ্রবীভূত গ্যাসের ঘনমাত্রা গ্যাসীয় দশায় গ্যাসটির যে আংশিক চাপ (partial pressure) তার সমানুপাতিক।

$$[\, x(aq)\,] = K\, p_x \qquad (২.১)$$

যখন [x (aq)] , জলীয় দশায় দ্রবীভূত গ্যাস x এর মোলার ঘনমাত্রা

p_x, গ্যাসীয় দশায় গ্যাস x এর আংশিক চাপ এবং

K, হেনরির ধ্রুবক। সারণিতে (সারণি ২.১) কয়েকটি গ্যাসের **K** - এর মান প্রদান করা হলো।

সারণি ২.১: পানিতে কিছু গ্যাসের হেনরির ধ্রুবক।

গ্যাস	K, mol/L/atm (25°C)
O_2	1.28×10^{-3}
CO_2	3.38×10^{-2}
N_2	6.46×10^{-4}
H_2	7.90×10^{-4}

হেনরির সূত্র কেবল সেসব গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, গ্যাসীয় কিংবা তরল কোনো দশায় যাদের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিছু কিছু গ্যাস আছে যেগুলো পানির সাথে বিক্রিয়া করে; যেমন, CO_2, SO_2 প্রভৃতি। বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডলের মাঝে ঐসব গ্যাসের যে বণ্টন ঘটে তা হেনরির সূত্র দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

জলাধারে উপর-স্তরের পানি বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে থাকে এবং বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস তাতে দ্রবীভূত হয়। পানিরাশি শান্ত থাকলে দ্রবীভূত গ্যাস কেবল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় (diffusion) নিম্নস্তরে বিস্তার লাভ করে। 'ব্যাপন' অতিশয় মন্থর একটি প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে দ্রবীভূত গ্যাস উপরস্তর থেকে ৫০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত সমভাবে বণ্টন হতে সময় লাগে প্রায় দশ বছর। তবে বাস্তবে অনেক বেশি দ্রুততার সাথে ঘটনাটি ঘটে। পানির তরঙ্গজনিত ও তাপীয় আলোড়নের ফলে গ্যাসের বণ্টন দ্রুততর হয়।

প্রাকৃতিক পানিতে গ্যাসের যে দ্রবীভবন ঘটে তার আর একটি নিয়ামক তাপমাত্রা। তাপমাত্রার সাথে গ্যাসের দ্রাব্যতার যে সম্পর্ক তা ক্লসিয়াস-ক্লেপেরন (Clausius–Clapeyron) সমীকরণ (২.২) অনুসরণ করে:

$$\log \frac{C_2}{C_1} = \frac{\Delta H}{2.303R} \left\{ \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right\} \qquad (২.২)$$

যখন, C_1 ও C_2 যথাক্রমে পরম তাপমাত্রা T_1 ও T_2 -তে দ্রবীভূত গ্যাসের ঘনমাত্রা;

ΔH, গ্যাসের দ্রবীভবন তাপ cal mol^{-1};

R, গ্যাস ধ্রুবক, 1.987 cal $deg^{-1} mol^{-1}$

প্রাকৃতিক পানিতে যেসব গ্যাস ও আয়ন সচরাচর উপস্থিত থাকে এবং পানির রাসায়নিক পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তাদের সম্পর্কে পরবর্তী পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

২.৩.১ প্রাকৃতিক পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (O_2) : প্রাকৃতিক পানিতে বেশ কিছু পরিমাণ O_2 দ্রবীভূত থাকে এবং বেশ কিছু নিয়ামক দ্বারা তার মাত্রা নির্ধারিত হয়; যেমন - পানির তাপমাত্রা, পানিতে সালোকসংশ্লেষী উদ্ভিদের প্রাচুর্য,পানির স্বচ্ছতা, পানিতে আলোড়ন এবং পানিতে জারণীয় (oxidisable) বস্তুর প্রাচুর্য।

প্রাকৃতিক পানিতে দ্রবীভূত যে O_2 থাকে তার প্রধান পরিবেশক বায়ুমণ্ডল। শুষ্ক বায়ুতে O_2 এর পরিমাণ 20.98%। প্রাকৃতিক পানির তাপমাত্রাভেদে বায়ুমণ্ডলের O_2 তাতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় দ্রবীভূত হয় (সারণি ২.২)। শৈবালের (algae) সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থেকেও কিছু পরিমাণ O_2 প্রাকৃতিক পানিতে প্রবেশ করে:

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{[শৈবাল]}]{\text{সালোকসংশ্লেষণ}} [CH_2O] + O_2\,(aq)$$

তবে, পানিকে O_2 সম্পৃক্ত করতে প্রক্রিয়াটি মোটেই পর্যাপ্ত নয় কেননা দিনে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শৈবাল যে O_2 উৎপাদন করে, রাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনে শৈবাল তার বিরাট এক ভগ্নাংশ আবার পানি থেকে তুলে নেয়। তাছাড়া, শৈবাল মারা যাবার পর আণুবীক্ষণিক জীবের অনুঘটনে তার দেহভরের যখন বিভাজন ঘটে (bio-degradation) তখন তাতেও দ্রবীভূত O_2 এর একটি ভগ্নাংশ ব্যয় হয়।

সারণি ২.২: প্রাকৃতিক পানিতে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ।

পানির তাপমাত্রা, °C	দ্রবীভূত O_2, ppm	পানির তাপমাত্রা, °C	দ্রবীভূত O_2, ppm
0	14.6	20	9.1
10	11.3	25	8.3
15	10.1	30	7.5

বায়ুজীবী জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য যে O_2 প্রয়োজন হয়, প্রাণী ও উদ্ভিদ তা পানি থেকে সংগ্রহ করে। সাধারণত প্রতি লিটার পানিতে 5mg O_2 দ্রবীভূত থাকলেই (5 ppm O_2) পানি জীবনধারণের জন্য উপযোগী হয়; যেখানে, প্রাকৃতিক পানির সাম্যাবস্থায় (সাধারণ তাপমাত্রা) তাতে প্রায় 8 ppm O_2 দ্রবীভূত থাকে। তবে, পানিতে জৈবিক ভর প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকলে তার বিভাজনে এত বেশি পরিমাণ দ্রবীভূত O_2 ব্যয় হয় যে, জলজ জীবের জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত O_2 তখন আর পানিতে অবশিষ্ট থাকে না। শুষ্ক মৌসুমের পর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে পুকুর, হ্রদ প্রভৃতি জলাধারে অনেক সময় মাছ মারা যেতে দেখা যায়। পানিতে O_2 এর অপর্যাপ্ততা এর প্রধান একটি কারণ। প্রবল বৃষ্টিপাতে প্রচুর পরিমাণ জৈব পদার্থ ও গবাদি পশুর বর্জ্য ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ধৌত হয়ে প্রাকৃতিক পানিতে মেশে এবং জীবাণুর অনুঘটনে সেখানে তাদের বিভাজন ঘটে:

$$[CH_2O] + O_2 \rightarrow CO_2\,(aq) + H_2O$$

সরল রাসায়নিক এক হিসাবের সাহায্যে দেখানো যায়, প্রতি লিটার পানির 7.8 mg জৈব বস্তু বিভাজিত হতে O_2 প্রয়োজন হয় 8 mg যা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাকৃতিক পানিতে দ্রবীভূত যে O_2 থাকে (প্রায় 8 ppm) তার সমান। প্রবল বর্ষণের পর জলাশয়ের পানিতে তাই অক্সিজেন ঘাটতি সৃষ্টি হয় এবং মাছ ও অন্যান্য বায়ুজীবী জলজ প্রাণী তাতে মারা যেতে থাকে।

প্রাকৃতিক পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি হলে একদিকে বায়ুজীবী প্রাণী যেমন তাতে লোপ পায় অন্যদিকে সেখানে অবায়ুজীবী প্রাণীর বিস্তার ঘটে। জৈব ও অজৈব পদার্থের বিভাজনে অবায়ুজীবী প্রাণীও অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। তবে এ সময় পদার্থের বিজারণ ঘটে ও H_2S, CH_4, NH_3 প্রভৃতি গ্যাস পানিতে উৎপন্ন হয়। দূষিত ও বদ্ধ পানিতে অনেক সময় যে পচা গন্ধ সৃষ্টি হয় ঐসব গ্যাস তার জন্য দায়ী থাকে।

২.৩.২ প্রাকৃতিক পানিতে CO_2 : প্রাকৃতিক পানিতে যে CO_2 দ্রবীভূত থাকে তার প্রাচুর্য সাধারণত 10 ppm-এর কম। প্রধানত তিনটি উৎস থেকে CO_2 প্রাকৃতিক পানিতে মেশে। যথা, ক.বায়ুমণ্ডল, খ.জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস ও গ.পানিতে উপস্থিত জৈব পদার্থের বিভাজন।

বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর প্রাচুর্য 0.036% (ঘন আয়তনভিত্তিক)। উক্ত CO_2 প্রাকৃতিক পানিতে দুভাবে প্রবেশ করে; যথা, পানি-সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 পানিতে সরাসরি দ্রবীভূত হয়ে এবং বায়ুমণ্ডলের CO_2 বৃষ্টির ফোঁটার মাঝে দ্রবীভূত হয়। বায়ুমণ্ডলের সাথে প্রাকৃতিক পানি যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন বিভিন্ন তাপমাত্রায় যে পরিমাণ CO_2 তাতে দ্রবীভূত হয় তা দেখানো হলো(সারণি ২.৩)।

সারণি ২.৩ : প্রাকৃতিক পানিতে বায়ুমণ্ডলের CO_2 (1-বায়ুচাপ)।

তাপমাত্রা °C	প্রাকৃতিক পানিতে CO_2 এর দ্রাব্যতা, ppm
0	1.0
10	0.70
20	0.51
25	0.43
30	0.38

পানিতে CO_2-এর দ্রবীভবন O_2-এর দ্রবীভবনের মতো সরল নয় কেননা, CO_2 অম্লধর্মী একটি গ্যাস। এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে। বিক্রিয়াটি ধারাবাহিক, প্রথমে দ্রবীভূত CO_2 এর একটি ভগ্নাংশ H_2CO_3 অ্যাসিডে এবং পরে H_2CO_3 এর একটি ভগ্নাংশ HCO_3^- ও CO_3^{2-} আয়নে বিভাজিত হয়:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3; \quad K = 2\times10^{-3} \quad (২.৩)$$

$$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^- ; \quad K_1 = 4.47\times10^{-7} \quad (২.৪)$$

$$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-} ; \quad K_2 = 4.69\times10^{-11} \quad (২.৫)$$

পানির মাঝে CO_2 গ্যাসের দ্রবণকে সাধারণভাবে কার্বোনিক অ্যাসিডের দ্রবণ (H_2CO_3) বলা হয় কিন্তু দ্রবীভূত CO_2 এর এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (~1%) তাতে H_2CO_3 অ্যাসিড আকারে অবস্থান করে [পানির মাঝে NH_3 গ্যাসের দ্রবণকেও অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, NH_4OH বলা হয়ে থাকে যদিও অবিভাজিত NH_4OH এর অস্তিত্ব তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্তুত, এটি $NH_3(aq)$ দ্রবণ যা নিম্নরূপ সাম্যাবস্থায় থাকে:

$$NH_3(aq) + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^- \quad ; K_{25^0} = 1.81 \times 10^{-5}]$$

উপরের ধারাবাহিক বিক্রিয়াগুলো (সমীকরণ ২.৩ - ২.৫) নির্দেশ করে, একটি জলীয় দ্রবণের সাম্যাবস্থায় CO_2, HCO_3^- ও CO_3^{2-} এর আপেক্ষিক পরিমাণ দ্রবণের pH দ্বারা নির্ধারিত হয় (চিত্র ২.১ ও উদাহরণ ২.১)। চিত্রে দেখা যায়, প্রাকৃতিক পানির স্বাভাবিক যে pH (pH 7 - 8) তাতে দ্রবীভূত $CO_2(g)$ প্রধানত HCO_3^- আকারে অবস্থান করে এবং দ্রবণ যত বেশি অম্লীয় হয়, CO_2 এর আপেক্ষিক পরিমাণ তাতে তত বাড়ে। দ্রবণ তীব্রমাত্রায় ক্ষারীয় হলে CO_2 কিংবা HCO_3^-, কোনোটাই তাতে স্থিতিশীল হয় না, সকল উপাদান তখন CO_3^{2-} এ পর্যবসিত হয়।

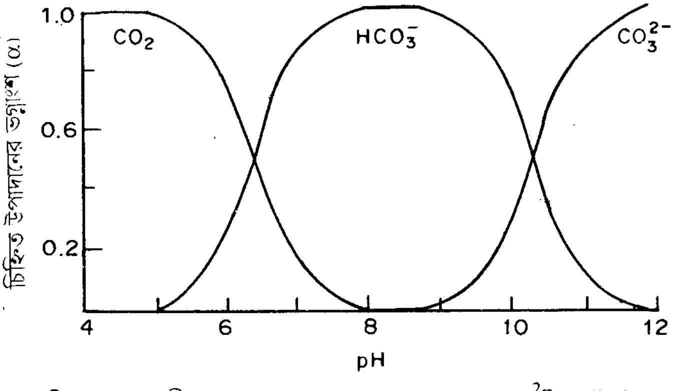

চিত্র ২.১ : জলীয় দ্রবণে pH বনাম CO_2 , HCO_3^- CO_3^{2-} ভগ্নাংশ।

উদাহরণ ২.১ : পানির মাঝে pH =7.0-এ CO_2, HCO_3^- ও CO_3^{2-} উপাদান তিনটির কত ভগ্নাংশ উপস্থিত থাকে? [α = ভগ্নাংশ] ।

$$\alpha_{CO_2} = \frac{[CO_2]}{[CO_2] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]}$$

$$\alpha_{HCO_3^-} = \frac{[HCO_3^-]}{[CO_2] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]}$$

$$\alpha_{CO_3^{2-}} = \frac{[CO_3^{2-}]}{[CO_2] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]}$$

দেখানো যায়, $\alpha(CO_2) = [H^+]^2/D$; $\alpha(HCO_3^-) = K_1[H^+]/D$ এবং $\alpha(C$ $= K_1K_2/D$;

যখন, $D = [H^+]^2 + K_1[H^+] + K_1K_2$ এবং

K_1 ও K_2 যথাক্রমে H_2CO_3 এর প্রথম ও দ্বিতীয় বিয়োজন ধ্রুবক ।

আলোচ্যক্ষেত্রে $[H^+] = 1.0 \times 10^{-7}$ এবং $D = 4.452 \times 10^{-14}$

$\therefore \alpha(CO_2) = 0.183; \alpha(HCO_3^-) = 0.816; \alpha(CO_3^{2-}) = 00$

কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি পানির সাথে বিক্রিয়া না করত তাহলে হেনরির : (২.১) তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো এবং বিশুদ্ধ পানিতে (pH = 7.0) সাধারণ তাপমাত্র (25°C) CO_2-এর দ্রাব্যতা হতো প্রায় 1.18×10^{-5} M। পানির সাথে CO_2 বিক্রি করে বলে দ্রাব্যতা প্রায় 20% বেড়ে যায় ও পানির pH-ও 7.0 থেকে প্রায় 5.5-এ নে আসে (উদাহরণ ২.২)। পানি ক্ষারকীয় হলে (pH > 7.0), CO_2-এর দ্রাব্যতা তা আরও বেড়ে যায় কেননা দ্রবণের অম্লত্ব হ্রাস পাওয়ার সাথে বিক্রিয়া (২.৪) ও (২.৫ তথা বিক্রিয়া (২.৩) এর সাম্যবিন্দু সম্মুখদিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রাকৃতিক পা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় নিরপেক্ষ (pH ≅ 7.0) অথবা মৃদু ক্ষারকীয় (pH : 7.0 – 8.0 অবস্থায় থাকে; CO_2 এর দ্রাব্যতা তাই বিশুদ্ধ পানির তুলনায় অনেক বেশি হয়।

উদাহরণ ২.২ : বিশুদ্ধ বায়ুর সাথে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত বিশুদ্ধ পানিতে 25°C তাপমাত্রায় CO_2 এর দ্রাব্যতা কত?

[বিশুদ্ধ বায়ুতে CO_2 = 0.036%, পানির বাষ্পীয় চাপ = 0.0313 atm, CO_2 এর হেনরির ধ্রুবক = 3.38×10^{-2} mol L^{-1} atm^{-1}]

$$P_{CO_2} = (1.0000 - 0.0313)\ \text{atm} \times 3.6 \times 10^{-4} = 3.49 \times 10^{-4}\ \text{atm}$$

$$[CO_2] = K P_{CO_2} = 3.38 \times 10^{-2}\ \text{molL}^{-1}\ \text{atm}^{-1} \times 3.49 \times 10^{-4}\ \text{atm}$$

$$= 1.179 \times 10^{-5}\ \text{M} \quad : ([CO_2] + [H_2CO_3])$$

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^- ;\ K_1 = [H^+][HCO_3^-]/[CO_2]$$

$$[H^+] \cong [HCO_3^-]; \quad \therefore [H^+]^2/[CO_2] = K_1 = 4.45 \times 10^{-7}$$

$$\therefore [H^+] = [HCO_3^-] = 2.29 \times 10^{-6}; \therefore pH = 5.64$$

অতএব, বিশুদ্ধ পানিতে CO_2 এর মোট ঘনমাত্রা , $C_{CO_2} = [CO_2] + [HCO_3^-]$

$$= 1.179 \times 10^{-5} + 2.29 \times 10^{-6}$$

$$= 1.408 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}$$

উপরের মানটি হেনরির সূত্রানুসারে CO_2 এর মোট যে ঘনমাত্রা তার তুলনায় প্রায় 20% বেশি।

বায়ুমণ্ডলের $CO_2(g)$ বৃষ্টির ফোঁটায় দ্রবীভূত হয়েও প্রাকৃতিক পানিতে যুক্ত হয় এবং বৃষ্টির ফোঁটায় CO_2 ঘনমাত্রা 0.6 ppm পর্যন্ত হতে পারে। বৃষ্টির পানির একটি অংশ মৃত্তিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলাধারে মেশে। মৃত্তিকায় যেসব জৈব পদার্থ থাকে তাদের জৈবিক বিভাজন থেকে উৎপন্ন প্রচুর পরিমাণ CO_2 মৃত্তিকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের মাঝে অবস্থান করে। বৃষ্টির পানি মৃত্তিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় তার সাথে ঐ CO_2 এর মিশ্রণ ঘটে এবং পানি যখন চুনাপাথর জাতীয় শিলার সংস্পর্শে আসে তখন কঠিন কার্বোনেট তাতে বাই-কার্বোনেট আকারে দ্রবীভূত হয়:

$$CaCO_3(s) + (CO_2 + H_2O) \rightarrow Ca(HCO_3)_2\,(aq)$$ ।

পানিতে CO_2 এর ঘনমাত্রা নিম্ন হলে বাইকার্বোনেট অচিরেই আবার কার্বোনেট আকারে সেখানে অধঃক্ষেপ পড়ে। ভূ-পৃষ্ঠের অনেক স্থানে দৃষ্টি-নন্দন চুনাপাথরের পাহাড় ও গুহা দেখা যায়। বৃষ্টির পানিতে যে CO_2 দ্রবীভূত থাকে তার সাথে $CaCO_3$ শিলার বিক্রিয়ায় সেগুলো সৃষ্টি হয়েছে। যাহোক, মৃত্তিকায় CO_2 এর ঘনমাত্রা প্রায়ই উচ্চ থাকে; বৃষ্টির পানিতে দ্রবীভূত $Ca(HCO_3)_2$ ভূ-পৃষ্ঠের উপর $CaCO_3(s)$ আকারে সাধারণত অধঃক্ষেপ পড়ে না, সরাসরি জলাশয়ে গিয়ে তা মেশে। ঐ সময় জলাশয়ে CO_2 এর পরিমাণ যদি কম থাকে তাহলে দ্রবীভূত $Ca(HCO_3)_2$ তাতে কঠিন $CaCO_3$ আকারে জমা হয়:

$$Ca(HCO_3)_2\,(soln) \rightleftharpoons CaCO_3(s) + CO_2 + H_2O$$

প্রাকৃতিক পানিতে যে CO_2 দ্রবীভূত থাকে জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেও তার একটি ভগ্নাংশ আসে:

$$[CH_2O] + O_2 \xrightarrow{\text{শ্বাস-প্রশ্বাস}} CO_2 + H_2O$$

উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, বারিমণ্ডলে বিশেষ করে সামুদ্রিক পানিতে যে CO_2 দ্রবীভূত তাকে তার পরিমাণ বায়ুমণ্ডলীয় CO_2 এর প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশি। বারিমণ্ডলের উক্ত CO_2 দ্বারাই বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনমাত্রা কার্যত নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.৪ প্রাকৃতিক পানির pH

'pH' একটি জলীয় দ্রবণের অম্লীয় / ক্ষারীয় অবস্থা নির্দেশ করে। 25°C তাপমাত্রায় একটি জলীয় দ্রবণের $pH = 7.0$ হলে দ্রবণটি নিরপেক্ষ, $pH < 7$ হলে দ্রবণটি অম্লীয় এবং $pH > 7.0$ হলে তা ক্ষারকীয় হয়। পানি একটি প্রশম পদার্থ, বিশুদ্ধ পানির pH তাই 7.0 । প্রাকৃতিক পানিতে CO_2, SO_2, H_2S, NH_3 প্রভৃতি গ্যাস এবং বিভিন্ন ধাতব ও অধাতব আয়ন দ্রবীভূত থাকে, ঐসব দ্রবীভূত পদার্থের সম্মিলিত প্রভাবে প্রাকৃতিক পানির pH নির্ধারিত হয়।

প্রাকৃতিক পানিতে যেসব প্রাণী বাস করে তাদের মাঝে মাছ আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। মাছের জীবনধারণের জন্য পানির সর্বোত্তম pH 6.7 –8.6, এর বাইরেও কিছু কিছু মাছ বেঁচে থাকে তবে খুব কম সংখ্যক মাছ আছে যারা pH 5.0

এর নিচে এবং pH 9.0 এর উর্ধ্বে বাঁচতে পারে। যেসব মাছ ঐরূপ নিম্ন কিংবা উচ্চ pH এ বাঁচে তারা স্বাভাবিক pH এ বাঁচতে পারে না।

পুকুর, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় যত পুরাতন হয়, পানির pH তাতে তত হ্রাস পায়। পুরাতন জলাধারে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ সঞ্চিত থাকে। বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে তা CO_2 এ জারিত হয়। CO_2 প্রাকৃতিক পানির pH কমিয়ে দেয়:

$$[CH_2O] + O_2 \xrightarrow{\text{ব্যাকটেরিয়া}} CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$$

২.৫ প্রাকৃতিক পানির অম্লত্ব - ক্ষারত্ব (acidity – alkalinity)

পানির অম্লীয়-ক্ষারীয় অবস্থা ও অম্লত্ব -ক্ষারত্ব বিষয় দুটি এক নয়। অম্লীয়-ক্ষারীয় (acidic-basic) অবস্থা পানির pH সাপেক্ষে নির্ধারিত হয় ($pH < 7.0$: অম্লীয়, $pH = 7.0$: নিরপেক্ষ, $pH > 7.0$: ক্ষারীয়)। পক্ষান্তরে, অম্লত্ব -ক্ষারত্ব দ্বারা একটি দ্রবণের যথাক্রমে OH^- ও H^+ আয়ন প্রশমিত করার ক্ষমতা বুঝায়। দুটি দ্রবণের pH একই হলেও তাদের অম্লত্ব-ক্ষারত্ব (OH^- কিংবা H^+ আয়ন প্রশমিত করার ক্ষমতা) ভিন্ন হতে পারে। যেমন, 2.19×10^{-6} M NaOH ও 0.1 M $NaHCO_3$, উভয় দ্রবণের pH একই, 8.34 অথচ ক্ষারত্ব প্রশমিত করতে এক লিটার NaOH দ্রবণের জন্য H^+ আয়ন প্রয়োজন হয় যেখানে মাত্র 2.19×10^{-6} মোল, $NaHCO_3$ দ্রবণটির এক লিটারের জন্য সেখানে তার পরিমাণ লাগে 0.1 মোল, প্রায় 4.6×10^4 গুণ বেশি।

প্রাকৃতিক পানির ক্ষারত্ব যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত হয় HCO_3^-, CO_3^{2-} ও OH^- তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া, ফসফোরিক, সিলিসিক ও বোরিক অ্যাসিড এবং কিছু কিছু জৈব অম্লের সহ-ক্ষারক (conjugate base) ও NH_3 প্রাকৃতিক পানিতে উপস্থিত থাকে। তবে, মোট ক্ষারত্বে এদের অবদান প্রথমোক্ত তিনটি উপাদানের তুলনায় প্রায়ই নগণ্য হয়।

পানির ক্ষারত্ব দুভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে যথা, 'ফেনলথেলিন ক্ষারত্ব' ও 'মিথাইল অরেঞ্জ ক্ষারত্ব'। পানিকে ফেনলথেলিন ও মিথাইল অরেঞ্জ নির্দেশকের উপস্থিতিতে শক্তিশালী অম্ল দ্বারা পৃথক পৃথকভবে টাইট্রেশন করে যে ক্ষারত্ব পাওয়া যায় তাদেরকে যথাক্রমে ফেনলথেলিন ও মিথাইল অরেঞ্জ ক্ষারত্ব বলে। 'ফেনলথেলিন ক্ষারত্ব', (CO_3^{2-} + OH^-) এবং মিথাইল অরেঞ্জ, 'মোট ক্ষারত্ব' প্রদান করে (মুখ্য বিক্রিয়া):

ফেনলথেলিন ক্ষারত্ব: $(OH^- + CO_3^{2-}) + H^+ \rightarrow HCO_3^- + H_2O$ (pH= 8.3)

মিথাইল অরেঞ্জ ক্ষারত্ব: $(CO_3^{2-} + HCO_3^- + OH^-) + H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$ (pH = 4.3)

প্রকৌশল ক্রিয়াকর্মে পানির ক্ষারত্ব সাধারণত mg $CaCO_3$ / L বা ppm $CaCO_3$ এককে প্রকাশ করা হয় যদিও রসায়নবিজ্ঞানীরা স্থিতিমাপটি eq/Lএককে প্রকাশ করতে বেশি পছন্দ করেন। যাহোক, প্রাকৃতিক পানির ক্ষারত্ব যখন 50 - 200 ppm $CaCO_3$ এর মাঝে অবস্থান করে তখন একে স্বাভাবিক ক্ষারত্ব বলা হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক পানির ক্ষারত্ব বিভিন্ন কারণে জানার প্রয়োজন হয়। পানির ক্ষারত্ব উচ্চ হলে তার pHও সাধারণত উচ্চ হয় এবং ঐরূপ পানিতে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণও বেশি থাকে। বয়লার, খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ঐরূপ পানি মোটেই উপযোগী হয় না। পানি পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণও পানির ক্ষারত্বের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়ে থাকে। পানির ক্ষারত্ব উচ্চ হলে তার বাফার ক্ষমতাও বেশি হয় এবং ঐরূপ পানিতে প্রচুর পরিমাণে অজৈব কার্বন (CO_2, HCO_3^-, CO_3^{2-}) উপস্থিত থাকে। জলজ জীবের বংশবৃদ্ধিতে বৈশিষ্ট্যটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বস্তুত, প্রাকৃতিক পানির ক্ষারত্বকে পানির উর্বরাশক্তির একটি পরিমাপ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং পানির pH ও ক্ষারত্ব জানা থাকলে তাতে অজৈব কার্বনের প্রাচুর্যও জানা যায় (উদাহরণ ২.৩)।

শৈবালের দেহভর অজৈব-কার্বন (CO_2, HCO_3^-, CO_3^{2-}) দ্বারা গঠিত হয়-

$$CO_2 + H_2O + h\nu = [CH_2O] : \text{দেহভর} + O_2 \qquad (২.৬)$$

$$HCO_3^- + H_2O + h\nu = [CH_2O] + OH^- + O_2 \qquad (২.৭)$$

প্রাকৃতিক পানির pH সাধারণত 7.0 এর কাছাকাছি (7.0 - 8.0) থাকে এবং ঐরূপ pH এ পানির অজৈব কার্বন কার্যত HCO_3^- আকারে অবস্থান করে। শৈবালের বংশবৃদ্ধির সাথে পানির pH তাই ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে (দ্রঃ সমীকরণ ২.৭)। শৈবালের বংশবৃদ্ধি দ্রুত ঘটতে থাকলে বায়ুমণ্ডলের CO_2 পানির সাথে সাম্যাবস্থায় আসতে পারে না। এতে অনেক সময় পানির pH 10.0 কিংবা তারও বেশি হয়ে যেতে পারে।

উদাহরণ ২.৩ : পানির ক্ষারত্ব 2.00×10^{-3} eq/L এবং pH = 7.00 হলে তাতে CO_2, HCO_3^- ও CO_3^{2-} এর ঘনমাত্রা কত হবে? pH যখন 10.00 তখন উপাদান তিনটির ঘনমাত্রা পানিতে কত হবে?

pH = 7.00 : চিত্র ২.১ থেকে পাওয়া যায়, pH=7.00 এ পানিতে CO_3^{2-} এর উপস্থিতি নগণ্য।

pH যখন 7.00 তখন $[OH^-] = 1.00 \times 10^{-7}$ M (নগণ্য)। অতএব, পানির যে ক্ষারত্ব তা কার্যত HCO_3^- এর অবদান।

$$\therefore [HCO_3^-] \cong [\text{ক্ষারত্ব}] = 2.00 \times 10^{-3} \text{ eq/L}$$

$$[CO_2] = \frac{[H^+]\,[HCO_3^-]}{K_1} = \frac{1.00 \times 10^{-7} \times 2.00 \times 10^{-3}}{4.45 \times 10^{-7}} = 4.50 \times 10^{-4} \text{ eq/L}$$

$$[CO_3^{2-}] = \frac{K_2[HCO_3^-]}{[H^+]} = \frac{4.69\times10^{-11}\times2.00\times10^{-3}}{1.00\times10^{-7}} = 9.38\times10^{-7} \text{ eq/L}$$

pH = 10.00 : এখানে CO_3^{2-} ও OH^- এর ঘনমাত্রা উল্লেখযোগ্য তবে CO_2 নগণ্য।

$$\therefore [\text{ক্ষারত্ব}] = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-] = 2.00\times 10^{-3} \qquad (i)$$

$[OH^-] = 1.00\times10^{-4}$, $[CO_3^{2-}] = K_2[HCO_3^-]/[H^+]$ (ii)

সমীকরণ (i) এ সমীকরণ (ii) এর রাশিগুলো বসিয়ে,

$[HCO_3^-] = 9.80\times10^{-4}$ M এবং $[CO_3^{2-}] = (4.69\times10^{-11}\times9.80\times10^{-4}/1.00\times10^{-10})$

$= 4.60\times10^{-4}$ M

অতএব, [ক্ষারত্ব] = 9.80×10^{-4} eq/L HCO_3^- + 9.20×10^{-4} eq/L CO_3^{2-} + 1.00×10^{-4} eq/L OH^- = 2.00×10^{-3} eq/L] ।

পানির অম্লত্ব বলতে তার OH^- প্রশমিত করার ক্ষমতা বুঝায়। প্রাকৃতিক পানির অম্লত্বে HPO_4^{2-}, $H_2PO_4^-$, CO_2, H_2S, HCO_3^- প্রোটিন, স্নেহজাতীয় অম্ল (fatty acids) এবং Al^{3+} ও Fe^{3+} এর মতো অম্লীয় ধাতু আয়নের অবদান সবচেয়ে বেশি থাকে। পানির ক্ষারত্ব নির্ণয় করা যেমন সহজ, অম্লত্ব নির্ণয় করা তেমন সহজ হয় না কেননা অম্লত্বের জন্য দায়ী প্রধান দুটি উপাদান, CO_2 ও H_2S উদ্বায়ী পদার্থ। অম্লত্ব নির্ণয়করণে তাই ভুলের প্রচুর সম্ভাবনা থাকে-

$$CO_2(g) + OH^- \rightarrow HCO_3^-;\ H_2S(g) + OH^- \rightarrow HS^- + H_2O$$

প্রাকৃতিক পানিতে অনেক সময়, H_2SO_4, HCl প্রভৃতি খনিজ অম্লও যুক্ত হয়; খনি থেকে নির্গত পানিতে ঐসব অম্ল মিশ্রিত থাকে। উচ্চ জারণ অবস্থার ধাতু আয়ন (যেমন, Al^{3+}, Fe^{3+} প্রভৃতি) প্রাকৃতিক পানিতে যে অম্লত্ব প্রদান করে, ধাতু আয়নের জলান্বয়ন তার উৎস, যেমন-

$$Al(H_2O)_6^{3+} \rightleftharpoons [Al(H_2O)_5OH]^{2+} + H^+ \rightleftharpoons [Al(H_2O)_4(OH)_2]^+ + H^+ \rightleftharpoons Al(OH)_3(s)] + H^+$$

অনেক সময় শিল্পকারখানার বর্জ্য থেকে অম্লীয় ধাতু আয়ন ও খনিজ অম্ল প্রাকৃতিক পানিতে মেশে। চুন কিংবা অন্য কোনো ক্ষার পানিতে মিশিয়ে সে অম্ল প্রশমিত করা হয়ে থাকে। কি পরিমাণ ক্ষার যোগ করা হলে পানির অম্লত্ব প্রশমিত হতে পারে তা জানার জন্য পানির অম্লত্ব নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়।

২.৬ প্রাকৃতিক পানিতে নাইট্রোজেন

নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক পানিতে সাধারণত তিনটি রাসায়নিক অবস্থায় উপস্থিত থাকে, যথা-

১. বায়ুমণ্ডলের N_2 পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায়;

২. অজৈব যৌগ ও আয়ন আকারে; যেমন- NO_3^-, NO_2^-, NH_4^+, NH_3 প্রভৃতি ;

৩. জৈব ও প্রাণরাসায়নিক পদার্থ আকারে, কৃষিক্ষেত থেকে ধৌত হয়ে নেমে আসা ইউরিয়া, প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎসের প্রোটিন, জলজ প্রাণীর বিপাকক্রিয়ায় উৎপন্ন ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি এ শ্রেণীর এক একটি পদার্থ।

নাইট্রোজেনের রাসায়নিক অবস্থা যাই হোক এর মূল উৎস বায়ুমণ্ডলের N_2। নাইট্রোজেন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস, সাধারণ বিক্রিয়ায় এটি N-যৌগে পরিণত হতে পারে

না। প্রকৃতিতে মৌলিক নাইট্রোজেন দুটি উপায়ে যৌগিক নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয় - যথা, ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটন ও বিজলির আঘাতে N_2-এর বিভাজন। মৃত্তিকা ও প্রাকৃতিক পানিতে যে N_2 দ্রবীভূত থাকে, ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে তা সরাসরি NO_3^- এ রূপান্তরিত হয়। অন্যদিকে বিজলির আঘাতে বায়ুমণ্ডলীয় N_2-এর পারমাণবিক N এ বিভাজন ঘটে; উক্ত N পরমাণু বায়ুমণ্ডলীয় O_2-এর সাথে বিক্রিয়া করে যাতে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন প্রকার অক্সাইড উৎপন্ন হয়। অক্সাইডগুলো বৃষ্টির ফোঁটায় দ্রবীভূত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে এবং মৃত্তিকা ও প্রাকৃতিক পানির সাথে মেশে। এদের মধ্যে NO_2 ও N_2O_5 যৌগ দুটি আবার পানির সাথে সরাসরি বিক্রিয়া করে এবং HNO_3 অ্যাসিডে পরিণত হয়। নাইট্রিক অ্যাসিড মুক্ত অম্ল অথবা নাইট্রেট লবণ আকারে মৃত্তিকায় ও পানিতে অবস্থান করে।

উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকে NO_3^- শোষণ করে তাকে প্রোটিনে পরিণত করে যার একটি অংশ খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণীতে স্থানান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ বর্জ্যের মাধ্যমে তা আবার মৃত্তিকা ও পানিতে ফিরে আসে। বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া বর্জ্যের অ্যামিনো - N ও NH_4^+ আয়নকে NO_3^- আয়নে এবং অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া NO_3^- আয়নকে আবার মৌলিক নাইট্রোজেনে (N_2) রূপান্তরিত করে (দ্রঃ ২.১৬.২)।

কিছু কিছু অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া আছে যাদের অনুঘটনে NO_3^- আয়ন NH_4^+ আয়নেও পরিণত হয়।

২.৭ প্রাকৃতিক পানিতে ফসফরাস

শিল্পকারখানার বর্জ্য, কৃষিক্ষেতে ব্যবহৃত সার, গৃহের বর্জ্য, পচা জৈবিক বস্তু, খনি থেকে তোলা ফসফেট আকরিক প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস থেকে ফসফরাস প্রাকৃতিক পানিতে মেশে। অজৈব ফসফরাস প্রাকৃতিক পানি ও মৃত্তিকায় সাধারণত ফসফেট আকারে ($H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}) অবস্থান করে। শিল্পকারখানা, গৃহকাজ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ডিটারজেন্ট ব্যবহৃত হয়। ডিটারজেন্টের প্রধান একটি উপাদান (25% – 40%) পলিফসফেট যা ডিটারজেন্টের বিল্ডার (builder) হিসেবে কাজ করে। যেসব স্থানের পানিতে প্রচুর পরিমাণে ফসফেট পাওয়া যায় সেখানে প্রায়ই ডিটারজেন্ট-বর্জ্য তার অন্যতম একটি উৎস হয়ে থাকে।

নাইট্রোজেনের মতো ফসফরাসও জীবের জন্য অপরিহার্য একটি উপাদান এবং নাইট্রোজেনের মতো একইভাবে এটি জীব ও প্রকৃতিতে আবর্তিত হয়। মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ ফসফেট শোষণ করে জৈবিক ক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য কিছু পদার্থ (যেমন, ATP) সংশ্লেষণ করে। খাদ্যের মাধ্যমে উক্ত ফসফরাস উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে স্থানান্তরিত হয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্যের মাধ্যমে তা শেষ পর্যন্ত আবার মৃত্তিকা ও প্রাকৃতিক পানিতে ফিরে আসে। সেখানে একশ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে জৈবিক ফসফরাস দ্রবণীয় জৈব ফসফরাসে এবং আর একশ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে ফসফরাস অজৈব ফসফরাসে (ফসফেট) রূপান্তরিত হয়।

প্রাকৃতিক পানিতে যে শৈবাল জন্মে, ফসফরাস তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবকোষের জন্য যদিও N ও P উভয় মৌলই অপরিহার্য তবে পর্যাপ্ত N-সম্বলিত পানিতে ফসফরাসও যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকে তাহলে শৈবালের বিস্তার থেমে যায়। তাছাড়া, শৈবালের N-স্থাণুকরণ (N-fixation) ফসফরাস দ্বারা উদ্দীপিত হয়। তাই, মনে করা হয় প্রাকৃতিক পানিতে শৈবালের বিস্তার ঘটার ক্ষেত্রে ফসফরাস প্রকৃত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।

সংরক্ষিত জলাধারে যখন শৈবালের বিস্তার ঘটে তখন সেখানে অক্সিজেনের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। অবস্থাটি মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য বিশেষ ক্ষতিকর। কোনো কোনো জীববিজ্ঞানীর ধারণা, প্রাকৃতিক পানিতে ফসফরাসের বার্ষিক গড় প্রাচুর্য 0.015 ppm এর বেশি হলেই শৈবালের অপ্রতিহত বিস্তার ঘটার জন্য পরিবেশ অনুকূল হয়। তবে অন্যান্য অপরিহার্য উপাদানও সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপস্থিত থাকা লাগে।

২.৮ প্রাকৃতিক পানিতে সালফার

প্রাকৃতিক পানিতে সালফার সাধারণত সালফেট ও সালফাইড / H_2S আকারে অবস্থান করে। বিভিন্ন উৎস থেকে সালফার প্রাকৃতিক পানিতে যুক্ত হয়; যেমন-

১. সালফেটঘটিত খনিজ পদার্থ বিশেষ করে জিপসাম, $CaSO_4$, $2H_2O$; ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত হয়ে এরা প্রাকৃতিক পানিতে মেশে।

২. খনিজ সালফাইড, যেমন- পাইরাইট FeS_2; ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে এটি সালফেটে জারিত হয়, বৃষ্টির পানিতে ধৌত হয়ে যা শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক পানিতে প্রবেশ করে।

৩. ডিটারজেন্ট, অ্যালকাইল বেনজাইল সালফোনেট (ABS) ডিটারজেন্টের গুরুত্বপূর্ণ একটি তলসক্রিয় (surfactant) উপাদান। গৃহ, শিল্পকারখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিদিন যে বিশাল পরিমাণ ডিটারজেন্ট ব্যবহৃত হয় তার বর্জ্য থেকে উচ্চমাত্রার সালফার প্রাকৃতিক পানিতে মেশে।

৪. পাথুরে কয়লা ও খনিজ তেল; এ দুটি বর্তমান সময়ের প্রধান জ্বালানি এবং এদের মাঝে সালফার মিশে থাকে। জ্বালানি যখন পোড়ানো হয় তখন সালফার SO_2 গ্যাসে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বায়ুর সংস্পর্শে SO_2 গ্যাস SO_3 গ্যাসে জারিত এবং জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে SO_3 গ্যাস H_2SO_4 অ্যাসিডে পরিণত হয়। অম্লটি এক সময় প্রাকৃতিক পানি ও মৃত্তিকায় স্থান পায়:

$$\text{S (জ্বালানি)} \xrightarrow{[O]} SO_2(g) \xrightarrow[\text{বায়ু}]{[O]} SO_3(g) \xrightarrow[\text{বায়ুমণ্ডল}]{[H_2O]} H_2SO_4 \text{ ।}$$

বায়ুজীবী কিছু ব্যাকটেরিয়া বায়ুসমৃদ্ধ পরিবেশে সালফাইডকে সালফেটে জারিত করে আবার অবায়ুজীবী কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলো বায়ুহীন পরিবেশে সালফেট,

সাইফাইট প্রভৃতি যৌগকে সালফাইডে বিজারিত করে। সালফাইড H_2S গ্যাস, HS^- আয়ন অথবা কঠিন ধাতব সালফাইড আকারে প্রাকৃতিক পানিতে উপস্থিত থাকে। অনেক সময় বদ্ধ অথবা ভূ-গর্ভস্থ পানিতে পচা ডিমের গন্ধ পাওয়া যায়। H_2S গ্যাসের জন্য পানিতে ঐরূপ গন্ধ সৃষ্টি হয়।

২.৯ প্রাকৃতিক পানিতে ক্লোরিন ও ফ্লোরিন

হ্যালোজেনগুলোর মাঝে ক্লোরিন ও ফ্লোরিন প্রাকৃতিক পানিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। প্রধানত হ্যালাইড আকারে এরা সেখানে অবস্থান করে। যেসব উৎস থেকে ক্লোরাইড প্রাকৃতিক পানিতে যুক্ত হয় তার মাঝে নিম্নলিখিতগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ:

১. শিল্প-কারখানা ও গৃহস্থালীর বর্জ্য;

২. পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত ক্লোরিন এবং

৩. শীতপ্রধান দেশে রাস্তার বরফ গলানোর জন্য ব্যবহৃত ক্লোরাইড লবণ ($NaCl$, $CaCl_2$) ।

প্রাকৃতিক পানিতে যে ফ্লোরাইড উপস্থিত থাকে তার প্রধান উৎস ফ্লোরোঅ্যাপাটাইটের [$Ca_5(PO_4)_3F$] মতো কিছু খনিজ পদার্থ, খনিজ পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠ অথবা ভূ-গর্ভ থেকে বিভিন্নভাবে ধৌত হয়ে প্রাকৃতিক পানিতে যুক্ত হয়। প্রাকৃতিক টাটকা পানিতে F^- সাধারণত 1 ppm-এর নিচে থাকে।

ক্লোরাইড প্রাকৃতিক পানিতে প্রত্যক্ষভাবে দূষণ সৃষ্টি করে না এবং পানীয় পানির জন্য প্রায় 250 ppm পর্যন্ত Cl^- সহনীয়। তবে, খুব উচ্চ পরিমাণের, Cl^- পানিতে থাকলে সে পানি পানীয় কিংবা সেচ কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না। জমিতে অত্যধিক লবণ জমা হলে (লবণের বেশিরভাগ $NaCl$) মৃত্তিকার বয়ন (texture) নষ্ট হয়। ফলে জমি কৃষি কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

মানুষের শরীরে ফ্লোরাইডের ভূমিকা বেশ স্পর্শকাতর। পানীয় পানিতে মাত্র এক পিপিএম এর কাছাকাছি F^- থাকলে, তা দাঁতের ক্ষয়রোধ করে কিন্তু F^- এর পরিমাণ বেশি হলেই তাতে হাড়ের ক্ষতি হয়। ফ্লোরাইড ও হাইড্রোক্সাইডের আকৃতি (size) প্রায়ই একই, খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে উচ্চমাত্রায় F^- দেহে প্রবেশ করলে হাড়ের গঠনে যেসব OH^- আয়ন থাকে F^- তাদের সরিয়ে দিয়ে সেসব স্থান দখল করে বসে, এতে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে।

২.১০ প্রাকৃতিক পানিতে Ca ও Mg

প্রাকৃতিক পানিতে যেসব ক্যাটায়ন উপস্থিত থাকে তাদের মাঝে Ca^{2+} এর পরিমাণ সর্বাধিক। বিভিন্ন শিলা ও খনিজ পদার্থ থেকে ধৌত হয়ে Ca^{2+} প্রাকৃতিক পানিতে মেশে। পদার্থগুলোর মাঝে জিপসাম ($CaSO_4,2H_2O$), অ্যানহাইড্রাইট ($CaSO_4$),

ডলোমাইট ($CaMgCO_3$), ক্যালসাইট ও অ্যারোগোনাইট চুনাপাথর ($CaCO_3$) প্রধান। মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণ CO_2 থাকে। বৃষ্টির পানি মৃত্তিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় CO_2 তাতে দ্রবীভূত হয়, উক্ত পানি যখন কার্বোনেট-ঘটিত শিলার সংস্পর্শে আসে তখন কার্বোনেট দ্রবণীয় বাইকার্বোনেটে পরিণত হয় এবং পানি প্রবাহের সাথে জলাধারে নেমে আসে:

$$CaCO_3(s) + (CO_2 + H_2O) \rightleftharpoons Ca\,(HCO_3)_2\,(aq)$$

জলাধারে দ্রবীভূত CO_2-এর পরিমাণ নিম্ন হলে বাইকার্বোনেট কঠিন কার্বোনেট আকারে আবার অধঃক্ষেপ পড়ে, জলাধারের তলদেশে যা ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে। প্রাকৃতিক পানিতে Ca^{2+}-এর টিপিক্যাল মাত্রা 1.0×10^{-3} মোল / লিটার যদিও দ্রবীভূত CO_2-এর মাত্রার উপর তা বহুলাংশে নির্ভর করে। তত্ত্বীয় এক হিসাবের মাধ্যমে দেখানো যায় (উদাহরণ ২.৪) প্রাকৃতিক পানি যখন $CaCO_3$ ও বায়ুমণ্ডলীয় CO_2 (g) এর সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে তখন সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর ঘনমাত্রা তাতে (25°C): $[CO_2] = 1.18 \times 10^{-5}$ M, $[HCO_3^-] = 10.0 \times 10^{-4}$M, $[CO_3^{2-}] = 8.94 \times 10^{-6}$ M, $[Ca^2] = 5.0 \times 10^{-4}$ M (20 ppm) এবং $[H^+] = 5.25 \times 10^{-9}$M বা pH = 8.28 ।

তবে, প্রাকৃতিক পানিতে উপাদানগুলোর ঘনমাত্রা বাস্তবে উক্ত মান থেকে প্রায়ই ভিন্ন হয় এবং নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো তাতে কমবেশি ভূমিকা পালন করে:

১. প্রাকৃতিক পানি ও বায়ুমণ্ডলের মাঝে প্রকৃত সাম্যাবস্থার অভাব,

২. জলাধারের তলদেশে উপরস্তরের তুলনায় CO_2এর অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনীভবন এবং

৩. শৈবাল কর্তৃক CO_2 শোষণ ও তাতে পানির pH বৃদ্ধি।

ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+}) আকৃতি বেশ বড় (r = 0.99 Å), পানিতে আয়নটি তাই কার্যত মুক্ত অবস্থায় থাকে। তবে, পানিতে HCO_3^- ও SO_4^{2-} এর পরিমাণ বেশি হলে Ca^{2+} তাদের সাথে আয়ন-যুগল (ion-pair) গঠন করে অবস্থান করে (যেমন, $Ca^{2+} \ldots HCO_3^- / Ca^{2+} \ldots SO_4^{2-}$) । ম্যাগনেসিয়ামও ($Mg^{2+}$) পানিতে প্রধানত মুক্ত অবস্থায় থাকে তবে Mg^{2+} এর আকৃতি ছোট বলে (r = 0.65 Å) তার চতুর্দিকে পানির যে আবরণ থাকে তা বেশ দৃঢ় হয়। প্রাকৃতিক পানিতে Mg এর পরিমাণ Ca এর তুলনায় কম। Ca এর টিপিক্যাল প্রাচুর্য যেখানে 20 ppm, Mg এর সেখানে প্রায় 10 ppm ।

উদাহরণ ২.৪ : জলাধারে জলজ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসে যে CO_2 উৎপন্ন হয় তা যদি এক বায়ুচাপে $CaCO_3$-এর সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে তাহলে পানির ক্ষারত্ব, খরতা ও pH কত হবে?

সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো জলাধারে নিম্নলিখিত সাম্যাবস্থায় থাকে:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-; \quad K_1 = \frac{[H^+]\,[HCO_3^-]}{[CO_2]} = 4.45 \times 10^{-7} \qquad (i)$$

$$O_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}; \quad K_2 = \frac{[H^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]} = 4.69 \times 10^{-11} \quad \text{(ii)}$$

$$CO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}; K_s = [Ca^{2+}][CO_3^{2-}] = 4.47\times10^{-9} \quad \text{(iii)}$$

$$CaCO_3(s) + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^-$$

$$K' = \frac{[Ca^{2+}][HCO_3-]^2}{[CO_2]} = K_S K_1/K_2 = 4.24\times10^{-5} \quad \text{(iv)}$$

$[CO_2] = 1.18 \times 10^{-5}$ M (উদাহরণ ২.২. দ্র:)

$\therefore [Ca^{2+}][HCO_3^-]^2 = 4.24 \times 1.18 \times 10^{-10} = 5.0 \times 10^{-10}$

$[HCO_3^-] = 2[Ca^{2+}]$

$Ca^{2+}] = 5.0 \times 10^{-4}$ M; $[HCO_3^-] = 10.0 \times 10^{-4}$ M

করণ (iii) থেকে: $[CO_3^{2-}] = 8.94 \times 10^{-6}$ M;

$$K_2 = \frac{[H^+]^2 [CO_3^{2-}]}{[CO_2]} = 2.09 \times 10^{-17} \quad \text{(v)}$$

করণ (v) এ $[CO_3^{2-}]$ ও $[CO_2]$ এর মান বসিয়ে,

$] = 5.25 \times 10^{-9}$ M বা pH = 8.28

ক্ষারত্ব = $[HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] + [OH^-] \cong 10.0 \times 10^{-4}$ M

খরতা $\cong [Ca^{2+}] = 5.0 \times 10^{-4}$ M বা 50.0 ppm $CaCO_3$ এবং pH = 8.28

১ প্রাকৃতিক পানিতে ক্ষারধাতু

তিক পানিতে যেসব ক্ষারধাতু থাকে, Na ও K তাদের প্রধান দুটি উপাদান। রণত খনিজ পদার্থ শিল্পকারখানা ও গৃহের বর্জ্য থেকে Na প্রাকৃতিক পানিতে যুক্ত শীতপ্রধান দেশে প্রাকৃতিক পানিতে ধাতুটির আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হলো র বরফ গলানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত NaCl লবণ; বরফ গলা পানি লবণসহ তিক পানিতে মেশে। সোডিয়াম আয়নের (Na^+) আকৃতি বেশ বড় (r = 0.99 Å) স্থিতিশীল কোনো জটিল যৌগ কিংবা অধঃক্ষেপ আয়নটি সাধারণত গঠন করে না া কঠিন বস্তুর পৃষ্ঠে এটি পরিশোষিতও হয় না। কার্যত, মুক্ত অবস্থায় Na^+ তে অবস্থান করে। পানির লবণাক্ততার জন্য প্রধানত NaCl দায়ী এবং লবণাক্ত তিক পানিতে লবণটি সাধারণত 10 ppm এর কাছাকাছি থাকে।

প্রাকৃতিক পানিতে পটাশিয়াম খনিজ পদার্থ ফেলস্পার (feldspar, $KAlSi_3O_8$) ক সাধারণত যুক্ত হয়। দাবানলে সৃষ্ট ভস্মও প্রাকৃতিক পানিতে মৌলটির গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস, উক্ত ভস্মের মাঝে প্রচুর পরিমাণ K_2O থাকে। বৃষ্টির পানিতে ধৌত

হয়ে যা একসময় জলাধারে মেশে। K-ঘটিত খনিজ পদার্থের দ্রবণীয়তা কম এবং কাদামাটিতে K পরিশোষিত হয় সহজে। প্রাকৃতিক পানিতে মুক্ত- K, তাই Na এর তুলনায় পরিমাণে কম থাকে।

২.১২ প্রাকৃতিক পানিতে অ্যালুমিনিয়াম (Al)

প্রাচুর্যের দিক দিয়ে ভূ-ত্বকে Al এর স্থান তৃতীয়, প্রায় 8.1% । অথচ মুক্ত আয়ন আকারে (Al^{3+}) প্রাকৃতিক পানিতে ধাতুটির যে উপস্থিতি তা অতি সামান্য, 1-ppm এরও কম। ভূ-ত্বক থেকে ধৌত হয়ে ধাতুটি প্রাকৃতিক পানিতে মেশে ঠিকই কিন্তু এর বেশিরভাগ যৌগ পানিতে অদ্রবণীয়। pH 4.0-এর নিচে Al^{3+} আয়ন পানিতে মুক্তাবস্থায় থাকে কিন্তু pH যত বাড়ে, তত তার জলান্বয়ন ঘটে এবং শেষপর্যন্ত তা কঠিন জিবসাইটে ($Al_2O_3 . 3H_2O$) পরিণত হয়:

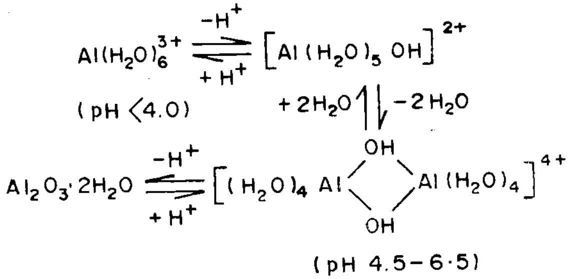

অ্যালুমিনিয়াম (III) একটি উভধর্মী (amphoteric) আয়ন; pH 10.0 এর উর্ধ্বে এটি দ্রবণীয় অ্যালুমিনেট, $Al\ (OH)_4^-$ গঠন করে। অ্যালুমিনিয়াম (III) সিলিকেট ও অর্থোফসফেট আকারে অধঃক্ষেপ পড়ে তবে পানিতে উচ্চমাত্রার F^- উপস্থিত থাকলে, আয়নটি ফ্লোরো জটিল আয়ন, AlF_6^{3-} আকারে সেখানে দ্রবীভূত থাকে।

২.১৩ প্রাকৃতিক পানিতে লৌহ (Fe)

লৌহ ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অন্যতম একটি উপাদান। মৃত্তিকা, আকরিক, শিল্প-কারখানার বর্জ্য প্রভৃতি উৎস থেকে লৌহ প্রাকৃতিক পানিতে মেশে। পানিতে লৌহ 0.3 ppm এর বেশি থাকলে পানীয় হিসেবে তা বিস্বাদ এবং ধোয়া, পরিষ্কার করার কাজের জন্য সে পানি অনুপযোগী হয়। উচ্চমাত্রার লৌহ আছে এমন পানি দ্বারা বস্ত্র ও বাসনপত্র ধোয়া হলে ধৌত সামগ্রীতে লালচে দাগ পড়ে।

প্রাকৃতিক পানিতে লৌহের যে রসায়ন তা বেশ জটিল। ধাতুটির সাধারণ জারণ অবস্থা দুটি, ফেরাস (Fe^{2+}) ও ফেরিক (Fe^{3+})। ফেরাস বিজারণধর্মী (reducing) এবং ফেরিক জারণধর্মী (oxidising) পরিবেশে স্থিতিশীল হয়। জলাধার বিশাল হলে তার উপর ও নিম্নস্তরে পানি ভিন্ন দুই পরিবেশে থাকে, উপরস্তরে জারণধর্মী ও তলদেশে বিজারণধর্মী পরিবেশে পানি অবস্থান করে কেননা উপরস্তরের পানিতে দ্রবীভূত O_2-এর

পরিমাণ বেশি থাকে (প্রায় 8 ppm) কিন্তু নিম্নস্তরে তা অপেক্ষাকৃত কম, এমনকি অনেক সময় থাকে না বললে চলে। ঐরূপ একটি জলাধারে লৌহ তাই উপরস্তরে ফেরিক অবস্থায় এবং তলদেশে ফেরাস অবস্থায় স্থিতিশীল হয়। ফেরিক আয়ন মোটামুটি শক্তিশালী একটি লুইস অম্ল ($K_1 = 8.9 \times 10^{-4}$); প্রাকৃতিক পানির স্বাভাবিক যে pH($\approx$7.0) তাতে মুক্ত ফেরিক আয়ন, $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ সেখানে স্থিতিশীল হতে পারে না, ধারাবাহিকভাবে জলান্বিত হয়ে একসময় এটি কলয়েডীয় $Fe(OH)_3$ / $Fe_2O_3 . 3H_2O$ - এ পরিণত হয়:

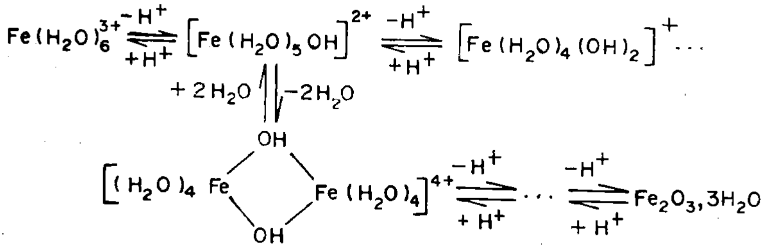

কলয়েডীয় $Fe(OH)_3/Fe_2O_3 . 3H_2O$ ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে এবং জলাধারে তা তলানি পড়ে।

উপরে ফেরিক আয়নের যে রূপান্তর ধারাটি প্রদান করা হয়েছে তার ভিত্তিতে দেখানো যায়, জলাধারের উপরস্তরে লৌহ প্রায় থাকে না বললে চলে (1.0×10^{-18} M) তবে Fe^{3+} এর সাথে জটিল আয়ন গঠন করে এমন কোনো পদার্থ পানিতে উপস্থিত থাকলে ফেরিকের পরিমাণ তখন পানিতে বৃদ্ধি পায়।

উচ্চমাত্রায় অম্লীয় পানিতে লৌহ ফেরাস ও ফেরিক উভয় অবস্থায় স্থিতিশীল হয়, শিল্পকারখানার বর্জ্য-মিশ্রিত পানিতে প্রায়ই ঐরূপ ঘটনা ঘটে। এ জাতীয় পানির অম্লত্ব যখন হ্রাস পায় লৌহ তখন সেখানে অক্সাইড আকারে অধঃক্ষেপ পড়ে এবং কুৎসিৎ বাদামি রঙের এক প্রলেপ সৃষ্টি করে।

জলাধারের তলদেশে দ্রবীভূত O_2 এর পরিমাণ কম বলে লৌহ সেখানে সাধারণত ফেরাস অবস্থায় থাকে এবং পানি ক্ষারকীয় হলে ফেরাস লৌহ $Fe(OH)^+$ আকারে স্থিতিশীল হয়। তবে, পানিতে দ্রবীভূত CO_2 বেশি থাকলে ফেরাস তখন $FeCO_3$ আকারে অধঃক্ষেপ পড়ে। অন্যদিকে আবার তলদেশের পানিতে SO_4^{2-} যদি বেশি থাকে, ফেরাস তাহলে ফেরাস সালফেট আয়ন-যুগল আকারে ($Fe^{2+} \cdots SO_4^{2-}$) সেখানে অবস্থান করে। ফেরাস আয়ন হিউমিক পদার্থের সাথে জটিল আয়ন গঠন করেও অনেক সময় প্রাকৃতিক পানিতে স্থিতিশীল হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানিতে লৌহ কার্যত ফেরাস আকারে থাকে কেননা ভূগর্ভে পানি বিজারণধর্মী পরিবেশে অবস্থান করে। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে লৌহের স্বাভাবিক মাত্রা 1-10 ppm যদিও কখনো কখনো তা 50 ppm পর্যন্ত হতে পারে। যাহোক ভূগর্ভস্থ পানিতে

লৌহের পরিমাণ 0.1 ppm এর বেশি হলেই সে পানি বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখায়; যেমন, পানি যখন ভূ-গর্ভ থেকে তোলা হয় তখন তা স্বচ্ছ থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ পরই পানি ঘোলা হতে থাকে এবং একসময় তা কুৎসিৎ বাদামি রঙ ধারণ করে। ভূগর্ভস্থ পানিতে যে ফেরাস আয়ন থাকে,বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসার পর তাতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটে বলে পানি ঐরূপ বৈশিষ্ট্য দেখায়:

$$Fe(H_2O)_6^{2+} \text{ (ভূগর্ভস্থ পানি)} \xrightarrow[\text{বায়ু}]{[O]} Fe(H_2O)_6^{3+} \xrightarrow{\text{ধারাবাহিক জলান্বয়ন}}$$

স্বচ্ছ বর্ণহীন — হালকা বাদামি

$Fe(OH)_3 / Fe_2O_3 . 3H_2O$ (কলয়েডীয়)

(পানি ঘোলা এবং রঙ কুৎসিত বাদামি)

২.১৪ প্রাকৃতিক পানিতে জটিলযৌগ গঠনকারী পদার্থ (Complexing Agent): যেসব অণু/ আয়ন ইলেকট্রন যুগল দান করতে সক্ষম তাদের লুইস ক্ষারক (Lewis base), লুইস ক্ষারক ধাতু আয়নে ইলেকট্রন যুগল দান করে যে যৌগ গঠন করে তাকে জটিল (complex) যৌগ এবং জটিল যৌগে ধাতু আয়নের সাথে যুক্ত লুইস ক্ষারককে লিগ্যান্ড (ligand) বলে। যেসব লিগ্যান্ড ধাতু আয়নে একজোড়া করে ইলেকট্রন দান করে তাদের মনোডিনটেট (monodentate-একদন্তী) লিগ্যান্ড বলে। NH_3 একটি মনোডিনটেট লিগ্যান্ড। বহু লুইস ক্ষারক আছে যাদের একটি অণু / আয়ন ধাতুতে একের অধিক ইলেকট্রন যুগল দান করে, ঐরূপ লিগ্যান্ডকে পলিডিনটেট (polydentate) লিগ্যান্ড এবং উৎপন্ন জটিলযৌগকে কিলেট (chelate) বলে। ইথিলিনডাইঅ্যামিন ($H_2NCH_2CH_2NH_2$), EDTA, পলিফসফেট প্রভৃতি যৌগ / আয়ন এক একটি পলিডিনটেট লিগ্যান্ড হিসেবে কাজ করে। কিলেট অনুরূপ ফর্মুলার সরল একটি জটিল যৌগের তুলনায় সাধারণত বেশি স্থিতিশীল হয়। কিলেট গঠন প্রক্রিয়ায় সিস্টেমে এনট্রপির (entropy) ধনাত্মক পরিবর্তন ঘটে বলে কিলেটের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রাকৃতিক পানিতে বিভিন্ন প্রকার ধাতু যেমন থাকে তেমনি তাতে এমন কিছু লুইস ক্ষারকও থাকে যারা ঐসব ধাতু আয়নের সাথে জটিলযৌগ গঠন করতে পারে। জটিলযৌগ গঠনের ফলে পানির স্বাভাবিক যে বৈশিষ্ট্য তাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে; যেমন,

১. স্বাভাবিক অবস্থায় পানিতে যেসব ধাতু দ্রবীভূত থাকে জটিল যৌগ আকারে তারা অদ্রবীভূত এবং যেসব ধাতু অদ্রবীভূত থাকে তারা দ্রবীভূত হতে পারে।

২. স্বাভাবিক পানিতে একটি পদার্থের যে স্থিতিশীলতা, জারণ-বিজারণ ক্ষমতা কিংবা জলান্বয়ন প্রবণতা থাকে, জটিলযৌগ গঠনের ফলে তার সেসব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। যাহোক, প্রাকৃতিক পানিতে যেসব লুইস ক্ষারক সচরাচর উপস্থিত

থাকে তারা সাধারণত কার্বোক্সাইলেট (-COO), অ্যামিনো ($-NH_2$), ফেনক্সাইড ($C_6H_5O^-$) ও ফসফেট (PO_4^{3-}) গ্রুপ বহন করে; হিউমিক (humic) ও পলিফসফেট এই শ্রেণীর প্রধান দুটি পদার্থ। নিম্নে হিউমিক পদার্থ ও পলিফসফেট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

২.১৪.১ হিউমিক পদার্থ: গাছের ঝরা পাতা ও জীবজন্তুর বর্জ্য থেকে হিউমিক পদার্থ সাধারণত উৎপন্ন হয়। পাতা ও জীবজন্তুর মল যখন পচতে থাকে তখন তার রাসায়নিক উপাদানগুলোর একে একে বিভাজন ঘটে। কিন্তু কিছু কিছু উপাদান থাকে, যেগুলো সহজে বিভাজিত হয় না। দুর্বিভাজনীয় ঐসব উপাদানগুলোকে সম্মিলিতভাবে হিউমাস (humus) বা হিউমিক পদার্থ বলে। হিউমিক পদার্থ মৃত্তিকা, লিগনাইট (পিঙ্গল অঙ্গার) ও জলাভূমির তলানিতে এবং যেখানে প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিদ পচে, সেখানে তৈরি হয়। পদার্থটির স্বতন্ত্র উপাদানগুলো উচ্চ আণবিক ভরের (আপেক্ষিক ভর) এক একটি পলিইলেকট্রোলাইট; সাধারণত দ্রাব্যতার ভিত্তিতে তাদের পৃথক করা হয়ে থাকে:

[শক্তিশালী ক্ষার]
হিউমিক পদার্থ ——
- ক. দ্রবীভূত ভগ্নাংশ
- খ. অদ্রবীভূত ভগ্নাংশ: হিউমিন; আ.ভর:দশ সহস্রাধিক

[শক্তিশালী অম্ল]
ক.দ্রবীভূত ভগ্নাংশ ——
মিশ্রণ অম্লীয়
- গ. দ্রবীভূত ভগ্নাংশ:ফালভিক এসিড; আ.ভর: কয়েকশত
- ঘ. অধঃক্ষেপ: হিউমিক এসিড; আ. ভর: দশ সহস্রাধিক

ফালভিক এসডি (fulvic acid) সাধারণভাবে পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু হিউমিন (humin) ও হিউমিক অ্যাসিড (humic acid) পানিতে অদ্রবণীয়।

হিউমিক পদার্থে স্বতন্ত্র যেসব উপাদান থাকে তাদের মূল কাঠামো কার্বনঘটিত এবং প্রধানত অ্যারোমেটিক। কোনো কোনো উপাদানের কার্বন কাঠামোর মাঝে প্রোটিন-সদৃশ ভগ্নাংশ এবং কার্বোহাইড্রেট ভগ্নাংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। কাঠামোর অ্যারোমেটিক অংশ রাসায়নিক কিংবা জৈবিক প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় না তবে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন অংশের দ্রুত জলাস্বয়ন ঘটে। মূল কাঠামো যেমনই হোক তার সাথে অসংখ্য কার্যকরমূলক (functional group) যুক্ত থাকে এবং উপাদানের মোট যে আণবিক ভর তার বিরাট এক ভগ্নাংশ ঐসব মূলক দ্বারা গঠিত হয়। কার্যকর মূলকগুলো মূলত অক্সিজেন-ঘটিত এক একটি একক।

হিউমিক পদার্থে স্বতন্ত্র উপাদানগুলোর (হিউমিন, হিউমিক অ্যাসিড ও ফালভিক অ্যাসিড) কোনোটিরও আণবিক গঠন সুনির্দিষ্ট নয় তবে বিশ্লেষণে বিভিন্ন মৌলের যে প্রাচুর্য এতে পাওয়া যায় তা মোটামুটি এরূপ: C: 45-55%, O: 30-45%, H: 3-6%,

N: 1-5% এবং S: 0-1%। উপাদানের আণবিক গঠন সুনির্দিষ্ট না হলেও যেসব রাসায়নিক এককের সমন্বয়ে অণু গঠিত থাকে তাদের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই এবং তারা সম শ্রেণীভুক্ত হয়। যেমন, হিউমিক অ্যাসিডে নিম্নলিখিত এককগুলো সাধারণত উপস্থিত থাকে-

কেটিকোল ... ... 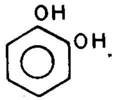

সিরিঞ্জালডিহাইড .... 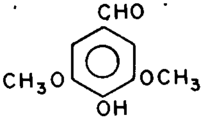

3,5 ডাই-হাইড্রোক্সিবেনজোইক অ্যাসিড ... ... 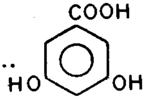

অতএব, ধারণা করা হয়, হিউমিক অ্যাসিড উল্লিখিত যৌগগুলোর ঘন-সন্নিবিষ্ট (condensed) একটি পদার্থ। হিউমিক অ্যাসিডে নাইট্রোজেনও(N) পাওয়া যায় তাই নিম্নরূপ একটি এককও অ্যাসিডটিতে থাকতে পারে বলে মনে করা হয়:

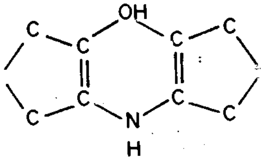

ফালভিক অ্যাসিডে কার্যকরমূলক নমুনার উৎসভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে তবে নিম্নলিখিত মূলকগুলো সাধারণভাবে এতে পাওয়া যায়: (মিলিতুল্য/গ্রাম নমুনা) অম্লত্ব: ১২-১৪, কার্বোক্সিল:৮-৯,ফেনলিয় হাইড্রোক্সিল:৩-৬, অ্যালকোহলীয় হাইড্রোক্সিল: ৩-৫, কার্বোনিল: ১-৩ এবং মেথক্সিল: অতিসামান্য। যাহোক, হিউমিক ও ফালভিক অ্যাসিডের গঠন সম্পর্কে উপরে যে তথ্য প্রদান করা হলো তার ভিত্তিতে ধারণা করা হয় অ্যাসিড দুটি তাদের কার্যকরমূলকের মাধ্যমে হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।

হিউমিক পদার্থ প্রাকৃতিক পানিতে প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে এবং তার অম্লত্ব, ক্ষারত্ব, লিগ্যান্ড ক্ষমতা ও আয়ন-বিনিময়করণ ক্ষমতা দ্বারা পানির বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে

প্রভাবিত হয়। হিউমিক পদার্থ-COOH ও ϕOH গ্রুপের মাধ্যমে ধাতু আয়নের সাথে কিলেট গঠন করে; যেমন,

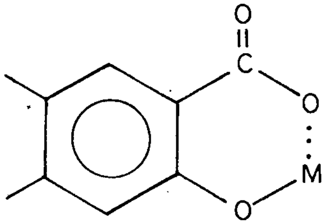

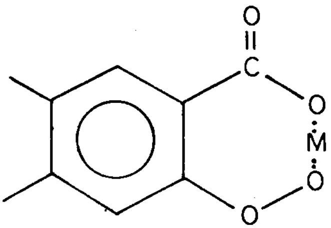

ধাতু আয়ন (M), Fe^{3+} ও Al^{3+} হলে কিলেট খুবই স্থিতিশীল এবং N_i^{2+}, Pb^{2+}, Ca^{2+} ও Zn^{2+} হলে কিলেট মোটামুটি স্থিতিশীল হয় তবে Mg^{2+} এর কিলেট মোটেই স্থিতিশীল হয় না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হিউমিক পদার্থের ফালভিক অ্যাসিড উপাদানটি সাধারণভাবে পানিতে দ্রবণীয়। এটি ধাতু আয়নের সাথে যে কিলেট গঠন করে তাও সাধারণত পানিতে দ্রবণীয় হয়। প্রাকৃতিক পানিতে জৈবিক প্রক্রিয়ায় যেসব ধাতু আয়ন জড়িত থাকে, সম্ভবত ফালভিক অ্যাসিডের জটিল যৌগ আকারে তারা পানিতে অবস্থান করে। ফেরিক আয়নের মতো উচ্চ জারণ অবস্থার যেসব ধাতু আয়ন মুক্তাবস্থায় পানিতে থাকতে পারে না, কঠিন অক্সাইড আকারে তলানিতে জমে, তারাও ফালভিক অ্যাসিডের কিলেট আকারে পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং পানিতে তাদের সঞ্চলন বৃদ্ধি পায়।

হিউমিক পদার্থ উচ্চ শক্তিসম্পন্ন একটি আয়ন বিনিময়কারী। মূলত, অদ্রবণীয় হিউমিন ও হিউমিক অ্যাসিডের মাধ্যমে পদার্থটি আয়ন বিনিময় করে। হিউমিন ও হিউমিক অ্যাসিডের কার্বন কাঠামোয় যে -COOH গ্রুপ যুক্ত থাকে তার H^+ আয়নের সাথে পানিতে অবস্থিত মুক্ত-ধাতু আয়নের বিনিময় ঘটে। ধাতু আয়ন তখন কঠিন হিউমিক পদার্থে আবদ্ধ এবং H^+ আয়ন পানিতে মুক্ত হয়:

হিউমিক পদার্থ-$COO^-H^+(s) + M^+$ (soln) $\rightleftharpoons$ হিউমিক পদার্থ -$COO^-M^+(s) + H^+$ (soln)

হিউমিক পদার্থ এভাবে প্রাকৃতিক পানিকে বহু ধাতু আয়নের দূষণ থেকে মুক্ত করে। লিগনাইটের মাঝে প্রচুর পরিমাণে হিউমিক অ্যাসিড থাকে; পানি থেকে ধাতু আয়ন অপসারণ করতে লিগনাইট তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.১৪.২ পলিফসফেট (polyphosphate): পলিফসফেট পলিফসফোরিক অ্যাসিডের সহ-ক্ষারক(conjugate base) এবং পলিফসফোরিক অ্যাসিড অর্থোফসফোরিক অ্যাসিডের ঘন-সন্নিবিষ্ট (condensed) একটি রূপ। পলিফসফেট বহু পূর্ব থেকে পানি পরিশোধন ও পানি মৃদুকরণে (water softening) এবং ডিটারজেন্টের

বিল্ডার হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে; পদার্থটি বিভিন্ন প্রকার ধাতু আয়নের সাথে কিলেট গঠন করে।

পলিফসফেট দুই শ্রেণীর - রৈখিক শিকল (linear chain) ও চাক্রিক (cyclic)। রৈখিক শিকল পলিফসফেটের সাধারণ ফর্মুলা $[P_nO_{3n+1}]^{(n+2)+}$(অ্যাসিড রূপ: $H_{n+2}P_nO_{3n+1}$)এবং পাইরোফসফেট $(P_2O_7^{4-})$ এর সরলতম একক। পাইরোফসফেটের গাঠনিক ফর্মুলা (অ্যাসিডরূপে):

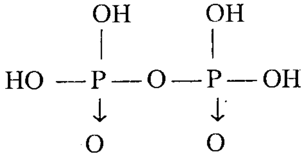

দীর্ঘ শিকল পলিফসফেটে বহুসংখ্যক P উল্লিখিত গাঠনিক ফর্মুলায় রৈখিকভাবে যুক্ত থাকে, কাচীয় (vitreous) সোডিয়াম ফসফেট' নামে যে পদার্থটি প্রচলিত তা 4 - 18 টি ফসফরাস পরমাণু সম্বলিত বিভিন্ন রৈখিক শিকল পলিফসফেটের একটি মিশ্রণ।

চাক্রিক পলিফসফেট 'মেটাফসফেট' নামে পরিচিত; এর সাধারণ ফর্মুলা (অ্যাসিডরূপে), $(HPO_3)_n$। চাক্রিক পলিফসফেটের ক্ষুদ্র দুটি একক ট্রাই ও টেট্রামেটাফসফেট; এদের গাঠনিক ফর্মুলা (অ্যাসিডরূপে):

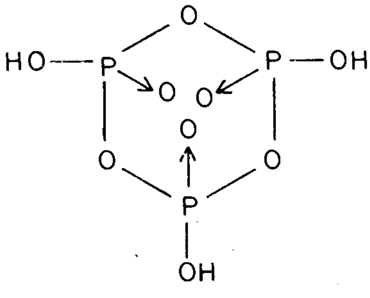

ট্রাইমেটাফসফোরিক অ্যাসিড

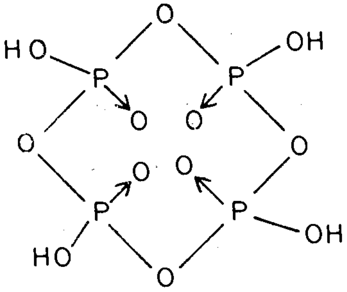

টেট্রামেটাফসফোরিক অ্যাসিড

রৈখিক শিকল পলিফসফেট লিগ্যান্ড হিসেবে সাধারণত খুব শক্তিশালী; ক্ষারধাতুর সাথেও এটি জটিলযৌগ গঠন করে। চাক্রিক পলিফসফেট লিগ্যান্ড হিসেবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পলিফসফেটের যে গঠন কাঠামো সম্ভবত তার দ্বারা এর লিগ্যান্ড শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। ধাতু আয়ন রৈখিক পলিফসফেটের একটি এককে তিনটি অক্সিজেনের (O) সাথে যুক্ত হতে পারে অথচ চাক্রিক পলিফসফেটের একটি এককে দুটির বেশি অক্সিজেনের সাথে তা যুক্ত হতে পারে না। ধাতুর সাথে চাক্রিক পলিফসফেটের বন্ধন তাই রৈখিক পলিফসফেটের বন্ধনের মতো তত শক্তিশালী হয় না।

পলিফসফেট অর্থোফসফেটে (PO_4^{3-}) জলান্বিত হয়। প্রাকৃতিক পানিতে যে অর্থোফসফেট উপস্থিত থাকে, উক্ত বিক্রিয়া তার প্রধান একটি উৎস।

$$H_4P_2O_7 + H_2O \rightleftharpoons 2H_3PO_4$$

অর্থোফসফেট, ক্ষার ধাতু বাদে, দ্রবীভূত আর প্রায় সকল ধাতুকে পানি থেকে অধঃক্ষেপ ফেলে তবে Fe^{3+} এর সাথে বিক্রিয়ায় অর্থোফসফেট জটিল আয়ন $Fe(HPO_4)^+$ গঠন করে।

লুইস ক্ষারক যে শ্রেণীরই হোক প্রাকৃতিক পানির বহু ধাতুকে তা জটিল যৌগ আকারে দ্রবীভূত অবস্থায় রাখে। ঘটনাটির ভালো-মন্দ দুটি দিকই আছে। একটি পদার্থ যখন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তখন তা জলজ জীব কর্তৃক গৃহীত হতে পারে। বহু ধাতু আছে যেগুলো জীবের জন্য অপরিহার্য আবার এমন ধাতুও আছে যেগুলো জীবের জন্য তীব্র বিষ স্বরূপ। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ধাতু যখন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তখন জলজ জীবের জন্য তা কল্যাণকর হয়। তবে শেষোক্ত শ্রেণীর ধাতু দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলে পানিতে দূষণ সৃষ্টি হয় ও জলজ অ-জলজ যে কোনো জীব তাতে আক্রান্ত হতে পারে। তাছাড়া, দ্রবীভূত পদার্থ সঞ্চারণশীল বলে পানির দূষণ দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

২.১৫. জীবাণু (Micro-organism)

জল,স্থল, বায়ুমণ্ডল সর্বত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য জীবাণু বাস করে। জীবাণুগুলো তিন শ্রেণীর; যথা- ব্যাকটেরিয়া (bacteria), অ্যালজি (algae) ও ফাংগাস (fungus) । প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যেসব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাদের অধিকাংশগুলোতে কোনো না কোনো জীবাণু অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। কাজের প্রকৃতিভেদে জীবাণুগুলোকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা, প্রস্তুতকারক (producer) ও বিনাশক (decomposer) । অ্যালজী প্রস্তুতকারক শ্রেণীর জীবাণু; CO_2, H_2O, NH_3 প্রভৃতি সরল অজৈব পদার্থের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অ্যালজী খাদ্য প্রস্তুত করে; ঐ সময় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে খাদ্যে সঞ্চিত হয়। বস্তুত, অ্যালজী খাদ্য শিকলের (food-chain) প্রথম প্রস্তুতকারক। ফাংগাস ও বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়া বিনাশক জীবাণু; এরা খাদ্যের জটিল বৃহদাকার যৌগকে ভেঙ্গে সরল ক্ষুদ্রাকার যৌগে পরিণত করে এবং তা থেকে জৈবিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে। নিম্নে জীবাণুগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হলো।

ক. ব্যাকটেরিয়া [Bacteria(pl), Bacterium(s)]:

খাদ্যাভাসের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়াকে নিম্নলিখিত শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

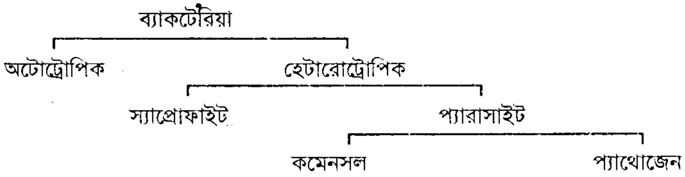

১. অটোট্রোপিক (autotropic) ব্যাকটেরিয়া : অটোট্রোপিক ব্যাকটেরিয়া সরল অজৈব পদার্থের সাহায্যে নিজেদের খাবার নিজেরা প্রস্তুত করে। গ্যালিওনেলা (Gallionella) এ শ্রেণীর একটি ব্যাকটেরিয়া। NH_4Cl, ফসফেট, খনিজ লবণ, CO_2 ও কঠিন FeS দ্বারা প্রস্তুত মিশ্রণে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এদের বিস্তার ঘটে। অটোট্রোপিক ব্যাকটেরিয়ার কিছু কিছু প্রজাতি আছে যারা সালোকসংশ্লেষী অর্থাৎ, ক্লোরোফিল-সদৃশ কোনো পদার্থ তারা বহন করে।

২. হেটারোট্রোপিক (heterotropic) ব্যাকটেরিয়া : হেটারোট্রোপিক ব্যাকটেরিয়া নিজেদের খাবার নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে না, অপরের প্রস্তুত করা খাবার খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে। হেটারোট্রোপিক ব্যাকটেরিয়া দুই শ্রেণীরঃ যথা,স্যাপ্রোফাইট ও প্যারাসাইট।

স্যাপ্রোফাইট (saprophite) : স্যাপ্রোফাইট মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে খাবার সংগ্রহ করে; এরা না থাকলে মৃত জীবদেহের স্তূপে ভূ-পৃষ্ঠ ঢাকা পড়ে যেত।

প্যারাসাইট (parasite) : প্যারাসাইট জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদে বাস করে এবং সেখান থেকে খাবার তুলে নেয়।

কমেনসল (commensal) : কমেনসল একটি প্যারাসাইট; এরা পোষক (host) থেকে যে খাবার সংগ্রহ করে তাতে পোষকের কোনো ক্ষতি হয় না বরং উপকার হয়। ই.কোলাই (E.Coli) এ শ্রেণীর একটি প্যারাসাইট (ব্যাকটেরিয়া); এরা মানুষ ও জীবজন্তুর অন্ত্রে (intestine) বাস করে এবং ভুক্ত খাদ্যের জটিল যৌগকে ভেঙ্গে সরল যৌগে পরিণত করতে জীবকে সহায়তা করে। বস্তুত ই.কোলাই ও কোলাই শ্রেণীর আরো কিছু ব্যাকটেরিয়া বৃহদন্ত্রে যদি না থাকতো তাহলে মানুষ কিংবা জীবজন্তুর পক্ষে তাদের ভুক্ত খাবার পরিপাক করা তথা বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমেনসল ব্যাকটেরিয়া প্রাণীদেহের বাইরে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না।

প্যাথোজেন (pathogen) : প্যাথোজেনও একটি প্যারাসাইট তবে কমেনসলের সাথে এর পার্থক্য আছে। প্যাথোজেন তার পোষক (host) থেকে যখন খাবার তুলে নেয় তখন পোষকের তাতে ক্ষতি হয়, এরা জীবদেহের কলা ভক্ষণ করে। দুরারোগ্য বহু ব্যাধি আছে যেগুলো প্যাথোজেনের আক্রমণে সৃষ্টি হয়; যেমন-যক্ষা, ম্যানেনজাইটিস প্রভৃতি। যক্ষা সৃষ্টিকারী প্যাথোজেন ফুসফুসের কলা ভক্ষণ করে তাতে ক্ষত সৃষ্টি করে। কিছু কিছু প্যাথোজেন থেকে বিষাক্ত পদার্থও (toxin) নিঃসৃত হয়। হুপিং কাশি, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি ঐরূপ টকসিন ঘটিত এক একটি ব্যাধি।

বাসস্থানের পরিবেশ বিচারে ব্যাকটেরিয়া দুই প্রকার — বায়ুজীবী (aerobic) ও অবায়ুজীবী (anaerobic)। বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনসমৃদ্ধ পরিবেশে এবং

অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে জীবনধারণ করে। বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে যখন একটি পদার্থ বিভাজিত হয় তখন O_2 সেখানে ইলেকট্রন গ্রাহক (বিজারক) এবং অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে CO_2, NO_3^-, SO_4^{2-} প্রভৃতি অণু / আয়ন ইলেকট্রন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে:

বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া : $O_2 + 4H^+ + e \rightleftharpoons 2H_2O$

অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া: $NO_3^- + 2H^+ + 2e \rightleftharpoons NO_2^- + H_2O$

$SO_4^{2-} + 1OH^+ + 8e \rightleftharpoons H_2S + 4H_2O$ ।

বায়ুজীবী ও অবায়ুজীবী ছাড়া আরও এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া আছে যারা অক্সিজেন-সমৃদ্ধ ও অক্সিজেনবিহীন উভয় পরিবেশে বাঁচতে পারে।

হাজার হাজার প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া প্রকৃতিতে বিদ্যমান। প্রজাতি যাই হোক, অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি (size) 0.5 - 3.0 μm ($\mu = 10^{-6}$) তবে সর্বনিম্ন 0.3 μm থেকে সর্বোচ্চ 100 μm পর্যন্তও কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি হতে পারে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, 0.45μm ফিল্টারের সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া পৃথক করা যায়।

খ.অ্যালজী [(Algae (pl), Alga (s)] : অ্যালজী ক্লোরোফিলবাহী এক প্রকার জীবাণু, যার প্রত্যেকটি কোষ এক একটি যৌন কোষ তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। অ্যালজীকে আদিম উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে কেননা এর প্রত্যেকটি কোষ যাবতীয় জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে সক্ষম। সাধারণ একজন মানুষের কাছে যা পানির গাঁজলা, প্রস্তরখণ্ডের শেওলা কিংবা সমুদ্রের শৈবাল, জীববিজ্ঞানীর কাছে তা এক একটি অ্যালজী কলোনি। অ্যালজী আণুবীক্ষণিক স্বতন্ত্র একটি কোষ থেকে কয়েকশত ফুট লম্বা পর্যন্ত হয়। অ্যালজী মুক্ত অথবা কঠিন বস্তুর পৃষ্ঠে আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে; স্বতন্ত্র এক একটি কোষ, কোষগুচ্ছ অথবা কোষ শিকল আকারে এরা অবস্থান করে। অ্যালজী দেখতে অবিকল সাধারণ একটি উদ্ভিদের মতো। নদীনালা, খালবিল, পুকুর, হ্রদ সর্বত্রই অ্যালজী জন্ম নেয়।

অ্যালজী প্রস্তুতকারক (producer) শ্রেণীর জীবাণু। সরল অজৈব পদার্থের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এরা খাদ্য প্রস্তুত করে। বস্তুত, অ্যালজী খাদ্য শিকলের প্রথম প্রস্তুতকারক :

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{h\nu} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \qquad (২.৮)$$

[hν , আলোক-কণা; সমীকরণটি অতি সরলীকৃত, বাস্তব প্রক্রিয়া অনেকবেশি জটিল ও অস্পষ্ট] ।

আলোর অনুপস্থিতিতে অ্যালজী খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস (respiration) সে সময়ও চলতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটি উপরে যে বিক্রিয়াটি দেখানো হলো (সমীকরণ ২.৮) তার ঠিক বিপরীত। সালোকসংশ্লেষণে সৌরশক্তি

রাসায়নিক শক্তি আকারে শর্করায় সঞ্চিত হয়; শ্বাস-প্রশ্বাসে সঞ্চিত সে শক্তি মুক্ত হয় এবং জৈবিক কাজের প্রয়োজনে অ্যালজী তা ব্যবহার করে।

প্রাকৃতিক পানিতে খাদ্যের মুখ্য প্রস্তুতকারক অ্যালজী। অ্যালজী খাদ্য প্রস্তুত করার সময় (সমীকরণ ২.৮) যে O_2 উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞানীদের ধারণা তা জল, স্থল ও বায়ুতে বিদ্যমান মুক্ত যে O_2 তার প্রায় ৪0% যোগান দেয়। উক্ত অক্সিজেন একদিকে দূষকের বিভাজন ঘটায় অন্যদিকে আবার পানির O_2 -ঘাটতি পূরণ করে।

অ্যালজী প্রাকৃতিক পানির স্বাভাবিক ও অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান তবে এর অতি-বংশবৃদ্ধি পানিতে দূষণ সৃষ্টি করে। অ্যালজী মারা যাবার পর ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে তা যখন পচতে থাকে তখন পানির দ্রবীভূত O_2 তাতে ব্যয় হয়; এ সময় পানির বর্ণ ও স্বাদ নষ্ট এবং পানিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। মাছ ও বায়ুজীবী অন্যান্য জলজ প্রাণী ঐরূপ পানিতে বাঁচতে পারে না।

গ. ফাংগাস [fungus (s), fungi (pl)] : অ্যালজীর মতো ফাংগাসও অতি প্রাথমিক পর্যায়ের একশ্রেণীর উদ্ভিদ। তবে, অ্যালজী ও ফাংগাসের মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে; যেমন, অ্যালজী ক্লোরোফিলবাহী, ফাংগাসে ক্লোরোফিল থাকে না। অ্যালজী সরল অজৈব পদার্থের সাহায্যে নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে, ফাংগাস নিজে খাবার প্রস্তুত করে না, অপরের প্রস্তুতকরা খাবার খায়। অ্যালজী অন্ধকারে বাঁচতে পারে না, খাদ্য প্রস্তুত করার সময় আলো এর জন্য অপরিহার্য। ফাংগাস আলো কিংবা অন্ধকার যে কোনো পরিবেশে বাস করতে পারে।

ফাংগাস বিভিন্ন আকারের হতে পারে তবে অধিকাংশ ফাংগাস সুতার মতো। আকৃতিতে ফাংগাস আণুবীক্ষণিক স্বতন্ত্র একটি কোষ যেমন হতে পারে তেমনি আমাদের অতি পরিচিত ব্যাঙের ছাতাও এক প্রকার ফাংগাস। ফাংগাস বায়ুজীবী উদ্ভিদ, জলীয় পরিবেশ এর জন্য অনুকূল নয়, ভূ-পৃষ্ঠই ফাংগাসের সর্বোৎকৃষ্ঠ আবাসস্থল। ভূ-পৃষ্ঠে মৃত জীবজন্তু ও উদ্ভিদকে ফাংগাস ধ্বংস করে।

জীবাণু ব্যাকটেরিয়া, অ্যালজী কিংবা ফাংগাস যে শ্রেণীরই হোক পরিবেশ প্রতিকূল হলে বীজগুটি (spore) গঠন করে তারা তখন সেখানে বেঁচে থাকে। বীজগুটি জীবাণুর এক প্রকার ঘুমন্ত অবস্থা, জীবাণুর বিপাক এসময় স্তব্ধ থাকে। পরিবেশ যখন অনুকূল হয় তখন জীবাণু বীজগুটি থেকে আবার জেগে ওঠে এবং বংশবৃদ্ধি ঘটায়। এভাবে জীবাণু প্রতিকূল পরিবেশে ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

২.১৬ জীবাণুর অনুঘটনে প্রকৃতিতে রাসায়নিক পরিবর্তন

প্রকৃতিতে এমন বহু রাসায়নিক পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে যাতে কোনো না কোনো শ্রেণীর জীবাণু অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। নিচে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু পরিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. জীবাণুর অনুঘটনে কার্বনের রূপান্তর: জীবাণুর দেহভর (biomass) -এর প্রধান একটি উপাদান কার্বন। জীবাণুর বিপাকক্রিয়ায় যে শক্তি প্রয়োজন হয় এবং

বিপাকক্রিয়া থেকে যে শক্তি মুক্ত হয় তার বড় এক ভগ্নাংশ কার্বনের জারণ অবস্থা পরিবর্তন ঘটার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। অ্যালজী তথা উদ্ভিদ যখন সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে CO_2 ও H_2O এর সাহায্যে শর্করা প্রস্তুত করে তখন C এর জারণ অবস্থা +4 থেকে 0 (শূন্য) তে নেমে আসে এবং সৌরশক্তি (hν) রাসায়নিক শক্তি আকারে শর্করাতে জমা হয়। শর্করা সংশ্লেষণের বিপরীত প্রক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস; শ্বাস-প্রশ্বাসে শর্করার বিভাজন ঘটে এবং যে রাসায়নিক শক্তি তাতে সঞ্চিত থাকে তা মুক্ত হয়:

$$CO_2(g) + H_2O \underset{-E}{\overset{h\nu}{\rightleftharpoons}} [CH_2O] + O_2$$

জীবদেহের শর্করা, জীব মারা যাবার পর, অক্সিজেন-সমৃদ্ধ কিংবা অক্সিজেনবিহীন যেকোনো পরিবেশে বিভাজিত হতে পারে। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে শর্করা CO_2 এ জারিত হয়। এ সময় O_2 ইলেকট্রন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিমোল ইলেকট্রনের জন্য 29.9.kcal পরিমাণ শক্তির নির্গমন ঘটে। পরিবেশ অক্সিজেনবিহীন হলে অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া সেখানে শর্করার বিভাজন ঘটায় এবং CO_2, NO_3^-, SO_4^{2-} প্রভৃতি যৌগ/আয়ন তখন ইলেকট্রন গ্রহণ করে:

$$CO_2 + 8H^+ + 8e = CH_4 + 2H_2O$$
$$2[CH_2O] + 2H_2O = CO_2 + 8H^+ + 8e$$

$$2[C^{\circ}H_2O] = C^{4-}H_4 + C^{4+}O_2$$

বিক্রিয়াটিতে প্রতিমোল ইলেকট্রনের জন্য যে শক্তি নির্গত হয় তার পরিমাণ মাত্র 5.55 kcal, বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে সংঘটিত বিক্রিয়ার এক পঞ্চমাংশ। শর্করা বিভাজনে উল্লিখিত CH_4- উৎপাদী বিক্রিয়া , শক্তি নির্গমনের ক্ষেত্রে যত অদক্ষই হোক, বিশাল জলাধারের তলদেশে, পুরানো জলাভূমি প্রভৃতি যেসব স্থানে তীব্র অক্সিজেন ঘাটতি সৃষ্টি হয় সেখানে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মোটামুটি চার প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া(যেমন,মিথেনোব্যাকটেরিয়া, মিথেনোবেসিলাস, মিথেনোকককাস ও মিথেনোসারসিনা) বিভাজন প্রক্রিয়ায় অনুঘটনের কাজ করে। ভূ-গর্ভে যে বিপুল পরিমাণ পাথুরে কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাস বিদ্যমান, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সেখানে জমে থাকা মৃত উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর অবায়বীয় জৈবিক বিভাজন (anerobic bio-degradation) তার উৎস। অবায়বীয় বিভাজনে জৈব পদার্থের এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে, তাতে অক্সিজেনের অনুপাত হ্রাস ও কার্বনের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কয়লা, তেল ও গ্যাসে তা পরিণত হয়েছে।

২.নাইট্রোজেন স্থাণুভবন (N-fixation) : বায়ুমণ্ডলের মুক্ত N_2 প্রাণরাসায়নিক ও সরল অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হওয়াকে N এর স্থাণুভবন বলে। নাইট্রোজেন দুভাবে স্থাণু হতে পারে - রাসায়নিক ও জৈবিক। জৈবিক স্থাণুভবন জীবাণুর অনুঘটনে ঘটে

এবং যেসব জীবাণু এতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, রাইজোবিয়াম (rhizobium) তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি দক্ষ। শিম্বোৎপাদী (leguminous) উদ্ভিদের শিকড়ে একপ্রকার স্ফীত গ্রন্থি (nodule) থাকে। রাইজোবিয়াম সেখানে অবস্থান করে বায়ুমণ্ডল থেকে N_2 শুষে নেয় এবং উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী যৌগে তাকে রূপান্তরিত করে। উদ্ভিদ মারা যাবার পর উক্ত N যৌগের কোনো কোনোটি জীবাণুর অনুঘটনে NO_3^- এ পরিণত হয়, অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে যা সরাসরি ব্যবহার করে। রাসায়নিক সার আবিষ্কৃত হবার পূর্বে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য তাই শিম্বোৎপাদী উদ্ভিদের প্রচুর চাষ হতো। রাইজোবিয়াম পানিতে বাস করে না তবে কিছু কিছু সালোকসংশ্লেষী অ্যালজী ও ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলো পানিতে বাস করে দ্রবীভূত N-এর স্থাণুভবন ঘটায়। প্রাকৃতিক পানিতে N-ঘটিত যেসব পদার্থ উপস্থিত থাকে তাদের প্রধান উৎস কৃষিক্ষেত্র থেকে বিধৌত রাসায়নিক N- সার এবং জীবাণুর অনুঘটনে বিভাজিত জৈবিক বস্তু। বর্তমানে N- স্থাণুভবন জীবাণুর অনুঘটনে যতটা ঘটে তার বহুগুণ বেশি ঘটে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় তিন কোটি মেট্রিক টন বায়ুমণ্ডলীয় N_2 রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় N যৌগে রূপান্তরিত করা হয়।

নাইট্রিফিকেশন (nitrification) : নাইট্রোজেন (III) যৌগের (যেমন, NH_3) নাইট্রোজেন(V) যৌগে(যেমন, NO_3^-) রূপান্তর ঘটাকে নাইট্রিফিকেশন বলে। প্রাকৃতিক পানি ও মৃত্তিকায় রূপান্তরটি সচরাচর ঘটে এবং নাইট্রোসোমোনাস ও নাইট্রোব্যাকটার নামে দুই প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া তাতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। নাইট্রোসোমোনাস NH_3 কে NO_2^- -এ এবং নাইট্রোসোব্যাকটার NO_2^- কে NO_3^- -এ রূপান্তরিত করে। ব্যাকটেরিয়ার এই শ্রেণী দুটি কেবল O_2 এর উপস্থিতিতে কাজ করতে সক্ষম:

$$N(III)H_3 + (3/2)\,O_2 \xrightarrow{\text{[নাইট্রোসোমোনাস]}} N(III)O_2^- + H^+ + H_2O$$

$$N(III)O_2^- + \tfrac{1}{2}\,O_2 \xrightarrow{\text{[নাইট্রোসোব্যাকটার]}} N(V)O_3^-$$

ডিনাইট্রিফিকেশন (denitrification) : নাইট্রোজেন যৌগ নাইট্রোজেন মৌলে (N_2) রূপান্তরিত হওয়াকে ডিনাইট্রিফিকেশন বলে। প্রকৃতিতে জীবাণুর অনুঘটনে রূপান্তরটি ঘটে:

$$4NO_3^- + 5\,[CH_2O] + 4H^+ \longrightarrow N_2\,(g) + CO_2(g) + 7H_2O$$

নাইট্রোজেন চক্র (N-cycle): বায়ুমণ্ডলের মুক্ত - N_2 জৈবিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠ ও বারিমণ্ডলে N-যৌগ আকারে প্রতিনিয়ত স্থাণু হয় এবং স্থাণু N-যৌগ আবার জৈবিক প্রক্রিয়ায় মুক্ত N_2 আকারে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে; প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের এই যে পরিক্রমণ একে N-চক্র বলে। নাইট্রোজেন চক্রের স্বতন্ত্র

ংশগুলো উপরে আলোচনা করা হয়েছে, নিচে চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো চিত্র ২.২) ।

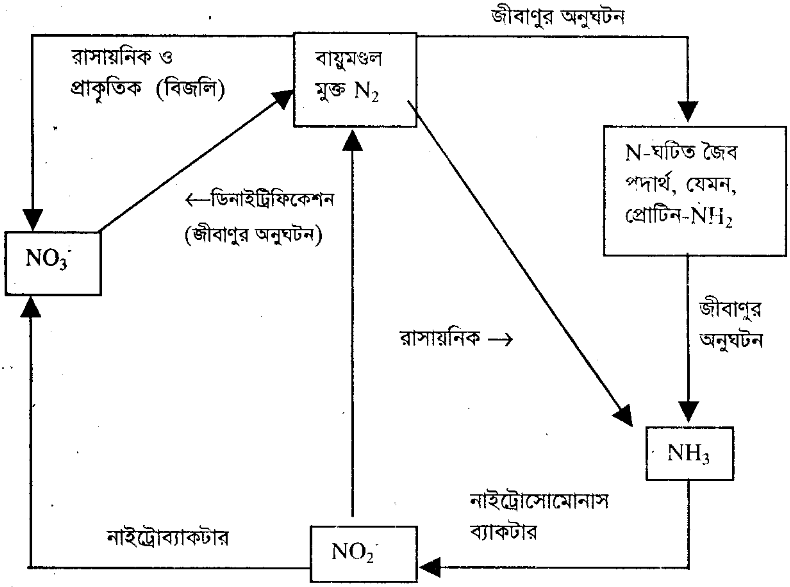

চিত্র ২.২: নাইট্রোজেন চক্র ।

৩. প্রকৃতিতে জীবাণুর অনুঘটনে সালফারের রূপান্তর : সালফারযৌগ প্রাকৃতিক ানির সাধারণ একটি উপাদান, বিভিন্ন মাত্রার সালফেট প্রায় সকল পানিতে উপস্থিত াকে। প্রাকৃতিক উৎস ও বর্জ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে জৈব সালফার পানিতে প্রবেশ রে। জীবাণুর অনুঘটনে ঐসব সালফার যৌগ (জৈব ও অজৈব) রাসায়নিক এক বস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

সালফেটের H_2S এ রূপান্তর : প্রধানত জৈব সালফার থেকে H_2S প্রাকৃতিক ানিতে উৎপন্ন হয় তবে কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া আছে (যেমন, ডিসালফোভিব্রিও) াগুলো SO_4^{2-} কে H_2S এ বিজারিত করে। বস্তুত, এক্ষেত্রে জৈব পদার্থের জারণ ঘটে বং SO_4^{2-} এতে ইলেকট্রন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে:

$$S(VI)\,O_4^{2-} + 2\,[CH_2O] + 2H^+ \longrightarrow H_2S\,(-II) + 2CO_2 + 2H_2O$$

বিশাল জলাশয়ের তলদেশে অক্সিজেন (O_2) কম কিন্তু SO_4^{2-} বেশি থাকে। H_2S ৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া তাই সেখানে খুবই সক্রিয় হয়। যে পানিতে সালফাইড H_2S) থাকে, তলানি সেখানে কালো রঙ ধারণ করে কেননা তলানিতে যে Fe(II) াকে, সালফাইডের সাথে তার বিক্রিয়ায় কালো রঙ এর FeS(s) উৎপন্ন হয়।

হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত (পচা ডিমের গন্ধ) একটি গ্যাস। এটি পানিতে মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করে।

হাইড্রোজেন সালফাইডের (H_2S) সালফেটে রূপান্তর : যেসব ব্যাকটেরিয়া H_2S কে SO_4^{2-} এ রূপান্তরিত করে তারা বায়ুজীবী ও অবায়ুজীবী উভয় শ্রেণীর হতে পারে। বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া অনুঘটক হলে O_2 সেখানে ইলেকট্রন গ্রাহক হয় কিন্তু অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে CO_2 ইলেকট্রন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে:

$$2H_2S + 4O_2 \xrightarrow{\text{বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া}} 2SO_4^{2-} + 4H^+$$

$$H_2S + CO_2 + 2H_2O \xrightarrow{\text{অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া}} SO_4^{2-} + CH_4 + 2H^+$$

বিক্রিয়ায় যে H_2SO_4 উৎপন্ন হয় তাতে পানির/মৃত্তিকার অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়। কৃষিজমির মৃত্তিকা অতিমাত্রায় ক্ষারীয় হলে, ক্ষার প্রশমনের জন্য অনেক সময় তাতে সালফার যোগ করা হয়ে থাকে। বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া সালফারকে H_2SO_4 অ্যাসিডে জারিত করে, উক্ত অ্যাসিডের দ্বারা ক্ষার প্রশমিত হয়:

$$2S + 2H_2O + 3O_2 \xrightarrow{\text{ব্যাকটেরিয়া}} 4H^+ + 2SO_4^{2-}$$

প্রকৃতিতে জৈব সালফারের বিভাজন : সালফার জৈবিক বস্তুর সাধারণ একটি উপাদান। প্রাকৃতিক পানিতে জৈব সালফার উপস্থিত থাকা তাই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। জৈব সালফার জীবাণুর অনুঘটনে বিভাজিত হয় এবং বায়ু ও পানির পরিবেশের উপর তা অবাঞ্ছিত কিছু প্রভাব ফেলে।

জৈব সালফার যৌগে যেসব কার্যকরমূলক সচরাচর উপস্থিত থাকে তাদের মাঝে হাইড্রোসালফাইড (-SH), ডাইসালফাইড (-S-S-), সালফাইড (S^{2-}), সালফোক্সাইড ($>S = O$), সালফোনেট ($-SO_2OH$), থাইয়োকিটোন ($> C=S$) ও থাইয়োজল (C_3H_2NS-) প্রধান। প্রোটিনের কিছু অ্যামিনো অ্যাসিডও সালফার বহন করে যেমন, সিসটেইন, ($HO_2C-CHNH_2CH_2SH$), মিথিওনাইন ($HO_2C-CHNH_2CH_2CH_2SCH_3$) প্রভৃতি। জৈব সালফার যৌগের যখন জৈবিক বিভাজন ঘটে তখন তা থেকে মিথাইল থাইওল (CH_3SH), ডাইমিথাইল ডাইসালফাইড (CH_3SSCH_3), H_2S প্রভৃতি যৌগ উৎপন্ন হয়। পদার্থগুলো তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত। জৈবিক বস্তু পচতে থাকলে তার চারদিকে যে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ঐসব পদার্থের বাষ্প তা সৃষ্টি করে। প্রকৃতিতে জৈব সালফার যৌগ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, তাদের বিভাজন কৌশল ও উৎপাদ তাই বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

২.১৭. অম্ল খনির পানি (acid mine water)

খনিতে কয়লার সাথে বেশকিছু পরিমাণ পাইরাইটও (FeS_2) মিশ্রিত থাকে। পাইরাইট ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে H_2SO_4 অ্যাসিডে বিভাজিত হয়। উক্ত অ্যাসিড খনিতে পানির সাথে মিশে অম্লপানি সৃষ্টি করে:

$$2FeS_2 + 2H_2O + 7O_2 = 4H^+ + 4SO_4^{2-} + 2Fe^{2+} \quad (২.৯)$$

$$4Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ = 4Fe^{3+} + 2H_2O \quad (২.১০)$$

$$FeS_2 + 14Fe^{3+} + 8H_2O = 15Fe^{2+} + 16H^+ + 2SO_4^{2-} \quad (২.১১)$$

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিতে বেশ কিছু প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া (যেমন আয়রন ব্যাকটেরিয়া) অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং বিক্রিয়া (২.১০)ও (২.১১) চক্রাকারে চলতে থাকে। ফেরিক আয়ন নিজেই একটি অম্ল; pH 3.0 এর উর্ধ্বে এর জলান্বয়ন ঘটে এবং পানিতে H^+ আয়ন যুক্ত হয়:

$$Fe^{3+} + 3H_2O = Fe(OH)_3\,(s) + 3H^+$$

অতএব, প্রাকৃতিক পানিতে (স্বাভাবিক pH $\approx$7) যখন Fe^{3+} আয়ন মেশে তখন তার pH কমে যায় (অম্লত্ব বাড়ে)। যাহোক, প্রাকৃতিক জলাধারে যখন খনিজ অম্ল-পানির মিশ্রণ ঘটে তখন তার তলদেশ হলুদ বর্ণের জেলির মতো একটি তলানি দ্বারা প্রায়ই আচ্ছাদিত হতে দেখা যায়; $Fe(OH)_3(s)$ (অথবা $Fe_2\,O_3,\,xH_2O$) উক্ত আচ্ছাদন সৃষ্টি করে। খনিজ অম্ল-পানির অম্লত্ব এতই বেশি থাকে যে, কোনো জীব তাতে বাঁচতে পারে না। উক্ত পানি যখন প্রাকৃতিক পানিতে মেশে তখন সেখানেও তীব্র দূষণ সৃষ্টি হয়।

২.১৮ প্রাকৃতিক পানিতে বস্তুকণা (particulates)

প্রাকৃতিক পানিতে বস্তুকণার উপস্থিতি সাধারণ একটি ঘটনা। কণার আকৃতি (size) ভেদে তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা,

ক. বড় আকৃতির ভারি কণা : জলাশয়ে এগুলো তলানি আকারে জমা হয় এবং

খ. অতি ক্ষুদ্র কণা (ব্যাস 1.0 – 1.0 $\times 10^{-3}$ μm; $\mu = 10^{-6}$): কণাগুলো এতই হালকা হয় যে, জলাশয়ের তলদেশে এরা থিতাতে পারে না। সমগ্র পানির মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভেসে থাকে। এ শ্রেণীর কণাকে কলয়েডীয় কণা বলে। কিছু কিছু খনিজ পদার্থ, কাদামাটি (clay), জৈব-বর্জ্য, প্রোটিন, অ্যালজী ও ব্যাকটেরিয়ার কোষ, খনিজ তেল প্রভৃতি বস্তু পানিতে কলয়েড আকারে অবস্থান করে।

বড় আকৃতির কঠিন কণা (যা জলাশয়ে তলানি পড়ে) সাধারণত পলি, কাদামাটি, বালু, জৈব ও খনিজ বস্তুর একটি মিশ্রণ, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ধৌত হয়ে এরা প্রাকৃতিক পানিতে মেশে। কিছু কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেও এ জাতীয় কঠিন কণা প্রাকৃতিক পানিতে তৈরি হয়; যেমন,

১.ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ধৌত হয়ে ফসফেট যখন খরপানিতে মেশে তখন Ca হাইড্রোক্সিঅ্যাপাটাইট সেখানে অধঃক্ষেপ পড়ে;

$$5Ca^{2+} + OH^- + 3PO_4^{3-} \rightarrow Ca_5OH(PO_4)_3\,(s)$$

২. CO_2-সমৃদ্ধ অস্থায়ী খরপানি থেকে CO_2 (g) অপসারিত হলে, $CaCO_3$ সে পানিতে অধঃক্ষিপ্ত হয়:

$$Ca^{2+} + 2HCO_3^- \rightarrow CaCO_3 (s) + CO_2 \uparrow + H_2O$$

৩. CO_2-সমৃদ্ধ অস্থায়ী খরপানিতে যদি প্রচুর পরিমাণে শৈবাল জন্মে, পানির pH তাতে বেড়ে যায় এবং $CaCO_3$ সেখানে অধঃক্ষেপ পড়ে:

$$Ca^{2+} + 2HCO_3^- + h\nu \rightarrow [CH_2O] + CaCO_3(s) + O_2 \uparrow$$

৪. প্রাকৃতিক পানিতে Fe^{2+} উপস্থিত থাকলে তা জারিত হয়ে $Fe(OH)_3$ আকারে অধঃক্ষেপ পড়ে:

$$Fe^{2+} + 10H_2O + O_2 \rightarrow 4Fe(OH)_3(s) + 8H^+;$$

বিক্রিয়াটিতে পানির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়, যার দরুন দ্রবীভূত হিউমেট হিউমিক অ্যাসিড আকারে সেখানে অধঃক্ষেপ পড়তে পারে।

৫. জীবাণুর অনুঘটনে প্রাকৃতিক পানিতে যেসব বিক্রিয়া ঘটে, তাদের একটির সাথে অন্যটির সংযোগে অনেক সময় অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়; যেমন, ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে একই পানিতে SO_4^{2-} থেকে H_2S এবং Fe^{3+} থেকে Fe^{2+} উৎপন্ন হলে Fe^{2+} এর সাথে H_2S এর বিক্রিয়ায় সেখানে FeS এর কালো তলানি পড়ে:

$$Fe^{2+} + H_2S \rightarrow FeS (s) + 2H^+$$

প্রাকৃতিক পানিতে বস্তুকণা বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে; যেমন,

১. প্রাকৃতিক পানিতে রাসায়নিক ও প্রাণরাসায়নিক যেসব বিক্রিয়া ঘটে, সাধারণত বস্তুকণা ও পানির সংযোগস্থলে সেগুলোর সূত্রপাত হয়।

২. প্রাকৃতিক পানির বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় কলয়েড কণা দ্বারা। কলয়েড কণা ক্ষুদ্র বলে তার আপেক্ষিক তল আয়তন বিশাল হয়; যেমন, এক গ্রাম টিপিক্যাল অধঃক্ষেপের তল আয়তন যেখানে 30 -300 cm^2, এক গ্রাম কলয়েড কণার তল আয়তন সেখানে প্রায় 3×10^6 cm^2। কণার আপেক্ষিক তল-আয়তনের সাথে তার পরিশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক পানিতে যেসব অপদ্রব দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে কলয়েড কণার পৃষ্ঠে বিশালমাত্রায় তাদের পরিশোষণ ঘটে, অপদ্রবের পরিবহণ ও বিক্রিয়া এতে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

পানিতে লবণের ঘনমাত্রা উচ্চ হলে বিপুল সংখ্যক পরিশোষিত আয়নসহ কলয়েড কণাগুলো একত্রে জমাট বাঁধে। এ সময় পানির দ্রবীভূত বহু অপদ্রব জমাট-বাঁধা কলয়েড পিণ্ডের মাঝে আটকাও পড়ে। কলয়েড পিণ্ড ভারি হয় বলে পরিশোষিত ও অন্তর্ভুক্ত সকল অপদ্রবসহ জলাশয়ের তলদেশে সেগুলো একসময় জমা হয় এবং পানিকে অপদ্রব মুক্ত করে।

৩. কলয়েড কণা প্রাকৃতিক পানি থেকে অপদ্রবকে অপসারণ যেমন করে (উপরে দ্র:) তেমনি জমাট বাঁধা কলয়েড পিণ্ডের তলানি অপদ্রবের ভাণ্ডার হিসেবেও কাজ করতে পারে। তলানিতে যেসব অপদ্রব আটকা থাকে, পরিবেশ কখনো অনুকূল হলে

সেগুলো আবার সেখান থেকে মুক্ত হয় এবং পানি প্রবাহের সাথে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলয়েড পিণ্ডের তলানি তখন পানি দূষণের দীর্ঘস্থায়ী একটি উৎস হিসেবে কাজ করতে থাকে।

২.১৯ ইউট্রোফিকেশন (Eutrophication)

হ্রদ কিংবা সংরক্ষিত জলাশয়ে উদ্ভিদের পুষ্টি ও সার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে ইউট্রোফিকেশন বলে। ইউট্রোফিকেশনের ফলে জলাশয়ে নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে যার চরম অবস্থায় জলাশয়টি একদিন অগভীর জলাভূমি কিংবা বনভূমিতে পরিণত হয়।

শুরুতে একটি জলাশয় একেবারেই অনুর্বর থাকে। জীবের জন্য যেসব পুষ্টি উপাদান অপরিহার্য সেগুলোর কোনোটি সেখানে থাকে না। ঐরূপ অবস্থায় জলাশয়ের পানি স্বচ্ছ, শীতল ও নিষ্প্রাণ হয়। জলাশয়ের বয়স যত বাড়ে, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নাইট্রেট, ফসফেট ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান ধৌত হয়ে একটু একটু করে তাতে মেশে। ফলে, জলাশয়ের উর্বরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর তাতে বিস্তার ঘটতে থাকে। জলজ জীবের বিস্তার যেমন ঘটে, তাদের মৃত্যুও তেমন ঘটে এবং মৃতদেহ জলাশয়ে জমা হয়। ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে উক্ত জৈবিক বস্তুর বিভাজন ঘটে; এতে জলাশয়ের উর্বরতা আরও বাড়ে এবং উদ্ভিদের বিস্তারও ত্বরান্বিত হয়। ঐসব ঘটনার পাশাপাশি, তলানি জমে জমে জলাশয়ের গভীরতা কমতে থাকে। তলানির জৈবিক বিভাজনে জলাশয়ে অক্সিজেন ঘাটতি সৃষ্টি হতে থাকে, মাছ ও অন্যান্য উপকারী জলজ প্রাণী অক্সিজেনের অভাবে ক্রমশ নিঃশেষ হতে থাকে এবং পোকামাকড় ও সরিসৃপ জলাশয়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। অন্যদিকে আবার, তীরবর্তী ভূখণ্ড ক্ষয় হয়ে হয়ে জলাশয়ে মেশে এবং গভীরতা আরো কমিয়ে দেয়। অগভীর জলাশয়ে পানি উষ্ণ থাকে এবং সার্বিক যে পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হয় তাতে উদ্ভিদ জলাশয়ের তলদেশে শিকড় প্রোথিত করে প্রবল বেগে বেড়ে উঠতে থাকে। ইউট্রোফিকেশন বলতে ঐ জাতীয় সব ঘটনার মাধ্যমে জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া বুঝায় এবং সংশ্লিষ্ট জলাশয়কে 'ইউট্রোফিক' জলাশয় বলা হয়। ইউট্রোফিকেশনের পরিণতিতে জলাশয় ক্রমশ সংকুচিত ও অগভীর হতে থাকে এবং এক সময় তা জলাভূমি, ঘন তৃণভূমি অথবা সবুজ বনভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ভূগর্ভে জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা, তেল ও গ্যাস) যে বিপুল ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে তাতে লক্ষ লক্ষ বছর আগে জলাধারে ঘটে যাওয়া ইউট্রোফিকেশনের বিশাল অবদান রয়েছে। ইউট্রোফিকেশনের ফলে জলাধার এক সময় বন ও তৃণভূমিতে পরিণত হয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিক আলোড়নে সেসব বন ও তৃণভূমি ধ্বংস হয়ে ভূ-গর্ভে স্থান পেয়েছে এবং সেখানে বায়ুহীন পরিবেশে ঐসব জৈবিক বস্তু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিভাজিত হয়ে কয়লা, তেল ও গ্যাসে পরিণত হয়েছে। ইউট্রোফিকেশন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এটি এতই মন্থর যে, বিশাল

একটি জলাশয়ের ইউট্রোফিকেশন দৃশ্যমান হতে হাজার হাজার বছর সময় লেগে যায়। উত্তর আমেরিকার বৃহৎ হ্রদপুঞ্জ (great lakes) সবশেষ বরফ যুগের পর সৃষ্টি হয়েছে (প্রায় দশ হাজার বছর আগে বরফ যুগের হিমবাহ গলে এটি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়)। শুরুতে হ্রদগুলো অনুর্বর ও গভীর ছিল; পরে একটু একটু করে প্রতিনিয়ত তাতে ইউট্রোফিকেশন ঘটেছে এবং কয়েক হাজার বছর পরে এসে আজ তা দৃশ্যমান হয়েছে। বর্তমানে হ্রদগুলোর গভীরতা এত হ্রাস এবং উর্বরতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে হ্রদগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

ইউট্রোফিকেশন মূলত প্রাকৃতিক একটি প্রক্রিয়া হলেও মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারা এটি প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। মানুষের সৃষ্টি শিল্পকারখানা থেকে বর্জ্য, নর্দমার আবর্জনা, কৃষিক্ষেত থেকে নেমে আসা রাসায়নিক সার, ডিটারজেন্টের বর্জ্য প্রভৃতি যখন জলাশয়ে মেশে তখন তার উর্বরতা বিপুল মাত্রায় বেড়ে যায় এবং ইউট্রোফিকেশন ত্বরান্বিত হয়। শিল্পকারখানার বর্জ্য ও নগরের আবর্জনা উত্তর আমেরিকার হ্রদ এরি-তে (erie) গত পঞ্চাশ বছরে যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, ধারণা করা হয়, প্রাকৃতিক নিয়মে তা ঘটতে আরও পনেরো হাজার বছর বেশি সময় লাগত। কিছু কিছু তথ্য নির্দেশ করে, ফসফেট ইউট্রোফিকেশনের প্রধান একটি নিয়ামক; এটি ডিটারজেন্টের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান (বিল্ডার)। বর্তমানে সারাবিশ্বে শিল্পকারখানা ও গৃহে যে বিপুল পরিমাণ ডিটারজেন্ট ব্যবহৃত হয় তার বর্জ্য জলাশয়ে মিশে সেখানে ইউট্রোফিকেশন ত্বরান্বিত করছে বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

২.২০. প্রাকৃতিক পানিতে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া ও ইলেকট্রন সক্রিয়তা, pE

প্রাকৃতিক ও বর্জ্য পানিতে যেসব জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে তার দ্বারা পানির বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন,

১.প্রচুর পরিমাণ জৈব পদার্থ যখন পানিতে উপস্থিত থাকে তখন সে পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি সৃষ্টি হয় কেননা পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন জৈব পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে তাকে CO_2 -এ জারিত করে। অক্সিজেন ঘাটতি থাকলে (5 ppm এর কম) সে পানিতে মাছ ও বায়ুজীবী অন্যান্য জলজ প্রাণী বাঁচতে পারে না।

২.বর্জ্য পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি সৃষ্টি হলে, তা থেকে লৌহ পৃথক করা কঠিন হয় কেননা ঐরূপ পানিতে লৌহ ফেরাস (Fe^{2+}) অবস্থায় দ্রবীভূত থাকে, পানি থেকে তা সহজে পৃথক হয় না। পক্ষান্তরে, অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানিতে লৌহ ফেরিক অবস্থায় (Fe^{3+}) অবস্থান করে এবং $Fe(OH)_3$/ Fe_2O_3 অধঃক্ষেপ আকারে পানি থেকে কার্যত সম্পূর্ণরূপে তা পৃথক হয়ে যায়।

৩.বিশাল জলাশয়ের তলদেশে অক্সিজেন কম থাকে কিংবা থাকে না বলে সেখানে পরিবেশ বিজারণধর্মী (reducing) হয়; ঐরূপ পরিবেশে তলানির মাঝে C, N, S ও Fe-ঘটিত যেসব পদার্থ থাকে, সাধারণত বিজারিত অবস্থায় তারা সেখানে অবস্থান

করে; যেমন C এর CH_4, N এর NH_3, S এর H_2S, লৌহের Fe(II) প্রভৃতি। বিজারিত ঐসব যৌগগুলোর প্রত্যেকটি পানিকে দূষিত করে। অন্যদিকে, জলাশয়ের উপরস্তরে পানি অক্সিজেনসমৃদ্ধ ও জারণধর্মী (oxidising) হয় এবং সেখানে যেসব পদার্থ দ্রবীভূত থাকে তারা সাধারণত জারিত অবস্থায় থাকে; যেমন C এর CO_2, N এর NO_3^-, S এর SO_4^{2-}, Fe এর Fe^{3+} প্রভৃতি। পদার্থগুলো জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ কর্তৃক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় অন্যথায় এগুলো অধঃক্ষেপ আকারে তলানি পড়ে। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া কেবল যে প্রাকৃতিক পানির পরিবেশকে প্রভাবিত করে তা না; মৃত্তিকার পরিবেশও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, বিজারণধর্মী পরিবেশে স্থিতিশীল N এর যৌগ NH_3 /NH_4^+ উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয় না। কিন্তু, জারণধর্মী পরিবেশে এটি যখন NO_3^- এ জারিত হয় তখন উদ্ভিদ তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

একজন পরিবেশবিজ্ঞানী জলীয় মাধ্যমে একটি পদার্থের যে জারণ-বিজারণ ক্ষমতা তা 'ইলেকট্রন সক্রিয়তা' হিসেবে প্রকাশ করে থাকেন। ইলেকট্রন-সক্রিয়তা' (a_{e^-}) H^+ সক্রিয়তার (a_{H^+}) অনুরূপ একটি স্থিতিমাপ। অম্ল-ক্ষারকের ক্ষেত্রে যেমন a_{H^+} উচ্চ হলে দ্রবণ অম্লীয় এবং নিম্ন হলে দ্রবণ ক্ষারকীয় হয়, জারণ-বিজারণের ক্ষেত্রে তেমন a_{e^-} উচ্চ হলে দ্রবণ বিজারণধর্মী (reducing) এবং নিম্ন হলে দ্রবণ জারণধর্মী (oxidising) বৈশিষ্ট্য দেখায়।

জলীয় দ্রবণে ইলেকট্রন সক্রিয়তা, pE: জলীয় দ্রবণে H^+ সক্রিয়তা যেমন pH (= $-\log a_{H^+}$) আকারে প্রকাশ করা হয়, ইলেকট্রন সক্রিয়তা প্রকাশ করতে তেমনি ব্যবহৃত হয়, pE যখন,

$$pE = -\log a_{e^-} \qquad (২.১২)$$

[মনে রাখতে হবে, pE, ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল 'E' এর -log নয়]

$$2H^+(aq) + 2e \rightleftharpoons H_2(g)$$

বিক্রিয়াটিতে H^+ ও $H_2(g)$, উভয়ের সক্রিয়তা যখন এক (a =1) তখন $a_{e^-} = 1.00$ ধরা হয়। অতএব, উক্ত শর্তে,

$$pE = -\log a_{e^-} = 0 \qquad (২.১৩)$$

ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল, E, ইলেকট্রন সক্রিয়তা, pE ও নার্নস্ট সমীকরণ:

$$Pt, H_2\ (1\text{-atm})\ |\ H^+\ (a = 1)\ ||\ M^{n+}\ (a = x)\ |\ M$$

কোষটিতে - সংশ্লিষ্ট অর্ধবিক্রিয়া:

$$2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2\ (g)\ ; \qquad E^\circ_{SHE}\ (= 0.00V)$$

$$M^{n+} + ne \rightleftharpoons M(s); \qquad E_{M^{n+}/M}, V$$

এবং $E_{cell} = E_{M^{n+}/M} - E^\circ_{SHE} = E_{M^{n+}/M}, V$

অর্থাৎ অর্ধ-বিক্রিয়া M^{n+}/M এর ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল ($E_{M^{n+}/M}$), অর্ধবিক্রিয়া H^+/H_2 এর সাপেক্ষে M^{n+}/M এর যে চালিকা-শক্তি তার একটি পরিমাপ। যখন অর্ধ-বিক্রিয়া, M^{n+}/M এর সাথে সংশ্লিষ্ট উভয় উপাদানের $a=1$ তখন অর্ধ-বিক্রিয়াটির ইলেকট্রোড পটেনশিয়ালকে (E) প্রমাণ ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল $E^\circ_{M^{n+}/M}$ বলা হয়। উপাদানের সক্রিয়তা এক থেকে ভিন্ন হলে, ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল নার্নস্ট সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। যেমন, অর্ধ বিক্রিয়া M^{n+}/M এর নার্নস্ট সমীকরণ:

$$E_{M^{n+}/M} = E^\circ_{M^{n+}/M} - \frac{0.0591}{n} \log \frac{a_M}{a_{M^{n+}}} \; ; (25^\circ C)$$

$a_M = 1$; অতএব,

$$E_{M^{n+}/M} = E^\circ_{M^{n+}/M} - \frac{0.0591}{n} \log \frac{1}{a_{M^{n+}}}$$

লঘু দ্রবণের ক্ষেত্রে, সক্রিয়তাকে মোলার ঘনমাত্রা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায় ($a_{M^{n+}} \cong [M^{n+}]$); অতএব,

$$E_{M^{n+}/M} = E^\circ_{M^{n+}/M} - \frac{0.0591}{n} \log \frac{1}{[M^{n+}]}$$

উপরের সমীকরণটিকে সাধারণভাবে লেখা যায়:

$$E = E^\circ - \frac{0.0591}{n} \log ([R] / [O]); \text{ (যখন, } O + ne \rightleftharpoons R) \qquad (২.১৪)$$

ইলেকট্রন-সক্রিয়তা, pE, ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল E এর মতো একটি আপেক্ষিক স্থিতিমাপ। উভয়ের ক্ষেত্রে রেফারেন্স অর্ধ-বিক্রিয়া $2H^+ (a=1) + 2e \rightleftharpoons H_2 (g)$ (1-atm), যার $E^\circ = 0.00$ V এবং $pE^\circ = 0$

তাপগতীয় যুক্তির সাহায্যে দেখানো যায়:

$pE = E / 0.0591$

$\therefore pE^\circ = E^\circ / 0.0591$

অতএব, নার্নস্ট সমীকরণ (২.১৪) কে লেখা যায়:

$$pE = pE^\circ - (1/n) \log [R] / [O] \qquad (২.১৫)$$

প্রাকৃতিক পানিতে সচরাচর ঘটে, এখন কিছু অর্ধ-বিক্রিয়ার pE সারণিতে (সারণি ২.৪) লিপিবদ্ধ করা হলো।

উদাহরণ ২.৫: নিচের অর্ধ-বিক্রিয়াগুলোর E° কে pE° তে প্রকাশ কর।

(i) $Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu(s)$; $E^\circ = +0.337$ V

(ii) $2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2(g)$; $E^\circ = 0.00$ V

(iii) $Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn(s)$; $E° = -0.763$ V

সমাধান :

(i) $pE° = E° / 0.0591 = +0.337 / 0.0591 = 13.35$
(ii) $pE° = 0.0 / 0.0591 = 0$
(iii) $pE° = -0.763 / 0.0591 = -12.91$

E° ও pE° মানের চিহ্ন (+/-) অর্ধ-বিক্রিয়া যে আকারে লেখা হয় তার উপর নির্ভর করে। বিজারণ আকারে লেখা অর্ধ-বিক্রিয়ায় E° ও pE° মানের যে চিহ্ন থাকে, অর্ধ-বিক্রিয়া জারণ আকারে লেখা হলে চিহ্ন তার বিপরীত হবে। [IUPAC এর বর্তমান রীতি অনুসারে জারণ আকারে লেখা অর্ধ-বিক্রিয়ার পটেনশিয়ালকে'ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল' E বলা হয় না, একে জারণ পটেনশিয়াল E_{ox} বলা হয়। যেমন,

$Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu(s)$; $E° = + 0.337$ V

$Cu(s) \rightleftharpoons Cu^{2+}$ 2e; $E_{ox} = -0.337$ V]

পূর্ণ জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় pE: যে জারণ-অর্ধবিক্রিয়া ও বিজারণ-অর্ধবিক্রিয়ার সংযোগে একটি পূর্ণ জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে তাদের pE একত্রিত করে পূর্ণ বিক্রিয়ার pE পাওয়া যায়। পূর্ণ বিক্রিয়ার pE কে pE_t প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন,

$Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$; $pE° = 5.71$ ($E° = 0.337$ V)

$Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn$; $pE° = -12.91$ ($E° = -0.763$ V)

পূর্ণ-বিক্রিয়া: $Cu^{2+} + Zn \rightleftharpoons Cu + Zn^{2+}$

$\therefore pE_t = 5.71 - (-12.91) = 18.62$

pE_t ও পূর্ণ-বিক্রিয়ার সাম্যধ্রুবক, K: একটি বিক্রিয়া যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন তার $pE_t = 0$ ($E_{cell} = 0$)। সাধারণ একটি বিক্রিয়া বিবেচনা করা যাক:

$A + ne \rightleftharpoons A'$; $pE°_A$
$B \rightleftharpoons B' + ne$; $pE°_B$

$\therefore$ পূর্ণ-বিক্রিয়া: $A + B \rightleftharpoons A' + B'$; $pE°_t = pE°_A + pE°_B = pE°_{AB}$
(সাম্যাবস্থায় $E°_{AB} = 0.00$ V)

সমীকরণ (২.১৫) অনুসারে:

$$pE_{AB} = pE^{o}_{AB} - \frac{1}{n} \log \frac{[A'][B']}{[A][B]}$$

সাম্যধ্রুবক , $K = \dfrac{[A'][B']}{[A][B]}$ এবং সাম্যাবস্থায় $pE_{AB} = 0.00$

অতএব, $0.00 = pE°_{AB} - (1/n)\log K.$

$\log K = npE°_{AB} = nE°_{AB} / 0.0591$ (২.১৬)

যখন, n=1 তখন $\log K = pE°_{AB} = E°_{AB} / 0.0591$ (২.১৭)

উদাহরণ ২.৬ : Cu^{2+} - Zn(s) বিক্রিয়ার সাম্যধ্রুবক, K কত হবে?

অর্ধবিক্রিয়া: $Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$; $pE° = 5.71$

$Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2e$; $pE° = 12.91$

পূর্ণবিক্রিয়া: $Cu^{2+} + Zn(s) \rightleftharpoons Cu(s) + Zn^{2+}$; $\therefore pE°_t = 18.62$

$K = [Zn^{2+}]/[Cu^{2+}]$; $\log K = npE°_t = 2 \times 18.62 = 37.24$

$\therefore K = 1.74 \times 10^{37}$

সারণি ২.8 : পানিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার pE° (25°C)[1]

বিক্রিয়া	pE°	pE°(W)*
$\frac{1}{4} O_2(g) + H^+ + e = \frac{1}{2} H_2O$	20.75	13.75
$1/5\ NO_3^- + 6/5H^+ + e = 1/10\ N_2(g) + 3/5\ H_2O$	21.05	12.65
$\frac{1}{2} NO_3^- + H^+ + e = \frac{1}{2} NO_2^- + \frac{1}{2} H_2O$	14.15	7.15
$1/8\ NO_3^- + 5/4H^+ + e = 1/8\ NH_4^+ + 3/8\ H_2O$	14.90	6.15
$1/6\ NO_2^- + 4/3H^+ + e = 1/6\ NH_4^+ + 1/3\ H_2O$	15.14	5.82
$\frac{1}{4} CH_2O + H^+ + e = \frac{1}{4} CH_4(g) + \frac{1}{4} H_2O$	6.94	-0.06
$\frac{1}{2} CH_2O + H^+ + e = \frac{1}{2} CH_3OH$	3.99	- 3.01
$1/6\ SO_4^{2-} + 4/3\ H^+ + e = 1/6\ S + 2/3\ H_2O$	6.03	- 3.30
$1/8\ SO_4^{2-} + 5/4H^+ + e = 1/8\ H_2S + 1/2\ H_2O$	5.75	- 3.50
$1/8\ SO_4^{2-} + 9/8H^+ + e = 1/8\ HS^- + \frac{1}{2} H_2O$	4.13	- 3.75
$\frac{1}{2} S + H^+ + e = \frac{1}{2} H_2S(g)$	2.89	- 4.11
$1/8\ CO_2 + H^+ + e = 1/8\ CH_4(g) + \frac{1}{4} H_2O$	2.87	- 4.13
$1/6\ N_2(g) + 4/3H^+ + e = 1/3\ NH_4^+$	4.68	- 4.65
$H^+ + e = \frac{1}{2} H_2(g)$	0.00	- 7.00
$\frac{1}{4} CO_2(g) + H^+ + e = \frac{1}{4} CH_2O + \frac{1}{4} H_2O$	-1.20	-8.20

*যখন $a_{H^+} = 1.00 \times 10^{-7}$

1.W.Stum and J. J. Morgan; *Aquastic Chemistry*; Wiley Intersc.; Ny.1970, p-318

pE এর তাৎপর্য : ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল, E ও ইলেকট্রন সক্রিয়তা, pE উভয়ের তাৎপর্য একই। নিচে pE এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করা হলো (অর্ধ-বিক্রিয়া বিজারণ আকারে প্রকাশিত : $M^{n+} + ne \rightleftharpoons M$):

১.pE ধনাত্মক (+) : জারক হিসেবে M^{n+} আয়ন H^+ আয়নের তুলনায় বেশি শক্তিশালী, pE এর ধনাত্মক মান যত বড় হয় M^{n+} এর জারণশক্তি তত বেশি হয়।

২.pE ঋণাত্মক (-) : বিজারক হিসেবে H_2 এর তুলনায় M বেশি শক্তিশালী। pE এর ঋণাত্মক মান যত বড় হয় M এর বিজারণ শক্তি তত বেশি হয় এবং

৩.পূর্ণ-বিক্রিয়ার pE (বা pE_t) : pE_t ধনাত্মক হলে বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত, ঋণাত্মক হলে স্বতঃস্ফূর্ত নয়। ধনাত্মক মান যত বড় হয়, বিক্রিয়া তত বেশি সম্পূর্ণ হয় (সাম্যধ্রুবক, K তত বড়)।

জলীয় দ্রবণে pE এর প্রান্তীয় মান (limiting value) : জলীয় দ্রবণে pE এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান পানির জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়:

পানির জারণ : $2H_2O \rightarrow O_2(g) + 4H^+ + 4e;$

পানির বিজারণ: $2H_2O + 2e \rightarrow H_2\,(g) + 2OH^-$

বিক্রিয়া দুটি pH নির্ভর কেননা এতে H^+/OH^- আয়ন সংশ্লিষ্ট। অতএব, প্রতিমোল ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে বিক্রিয়া দুটির pE সমীকরণ:

$[\ \tfrac{1}{4} O_2 + H^+ + e \rightleftharpoons \tfrac{1}{2} H_2O; \quad pE^\circ = 20.75\ ]$

জারণ: $pE = pE^\circ + \log\,(p_{O_2}^{1/4}\ [H^+])$

$$= 20.75 + \tfrac{1}{4}\log\ p_{O_2} - pH \qquad (২.১৮)$$

এবং, $[H^+ + e = \tfrac{1}{2} H_2(g); \ \ pE^\circ = 0.00\ ]$

বিজারণ: $pE = pE^\circ - \log\,(p_{H_2}^{1/2}/[H^+])$

$$= -\log\ p_{H_2}^{1/2} - pH \qquad (২.১৯)$$

সমীকরণ (২.১৮) ও (২.১৯) অনুসারে পানির স্থিতিশীলতার pE সীমা নির্ধারিত হয়। উক্ত সীমার বাইরে কোনো জারক বা বিজারক পানিতে স্থিতিশীল হতে পারে না। প্রাকৃতিক পানি যখন বায়ুমণ্ডলের সাথে সাম্যবস্থায় থাকে তখন তার স্বাভাবিক pH = 7.00 এবং $p_{O_2} = 0.21$ atm; ঐরূপ অবস্থায় পানির চরম জারণধর্মী পরিবেশে pE $\cong$ 13.5 পর্যন্ত হতে পারে (উদাহরণ ২.৭)। তবে জলাশয়ের তলদেশে অক্সিজেন অপ্রতুল বিজারণধর্মী পরিবেশে pE এর প্রান্তীয় মান CO_2, CH_4 প্রভৃতি গ্যাস দ্বারা নির্ধারিত হয় (উদাহরণ ২.৭)।

উদাহরণ ২.৭ : জলাশয়ের পানি যখন বায়ুমণ্ডলের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে তখন তার উপরস্তরে $p_{O_2} = 0.21$ atm এবং জলাশয়ের তলদেশে অক্সিজেন অপ্রতুল পরিবেশে অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে CO_2 থেকে CH_4 গ্যাস উৎপন্ন হয়। যদি ধরে নেয়া হয় $p_{co_2} = p_{CH_4}$ এবং pH = 7.0, তাহলে জলাশয়ের উপরস্তর ও তলদেশে pE এর প্রান্তীয় মান কত হবে? তলদেশে অক্সিজেনের আংশিক চাপ p_{o_2} কত হবে?

জলাশয়ের উপরস্তর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে থাকে বলে তার পরিবেশ জারণীয় এবং তাতে pE এর সর্বোচ্চ সীমা পানির জারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অতএব, সংশ্লিষ্ট অর্ধবিক্রিয়া,

$$\frac{1}{4} O_2 + H^+ + e = \frac{1}{2} H_2O \ ; \quad pE° = 20.75$$

সমীকরণ (২.১৮) অনুসারে,

$$pE = pE° + \frac{1}{4} \log p_{O_2} - pH = 20.75 + \frac{1}{4}(-0.68) - 7.00 = 13.58$$

জলাশয়ের তলদেশে বিক্রিয়া:

$$(1/8)\, CO_2 + H^+ + e = (1/8)\, CH_4 + (1/4)\, H_2O; \ pE° = 2.87$$

$$pE = pE° - \log p_{CH_4}^{1/8} / p_{co_2}^{1/8} + \log [H^+]$$

$$= 2.87 - 7.00 = -4.13; \quad [p_{co_2} = p_{CH_4}]$$

জলাশয়ের তলদেশে p_{o_2} :

$$pE = -4.13 = 20.75 + \frac{1}{4} \log p_{o_2} - pH \ ; [pH = 7.0]$$

$\therefore p_{o_2} = 3.0 \times 10^{-72}$ atm (অতি নগণ্য)।

২.২১ সামুদ্রিক পানিতে রাসায়নিক দ্রব্য

সমুদ্র বিশাল একটি রাসায়নিক সিস্টেম যা ভূ-পৃষ্ঠের 71% স্থান জুড়ে মোট পানির প্রায় 97% ধারণ করে আছে। সমুদ্রের গড় গভীরতা 3.7 কিলোমিটার যদিও গভীর সমুদ্রের গভীরতা 10 কিলোমিটারেরও বেশি হতে পারে। সমুদ্রের পানি গ্যাস ও কঠিন পদার্থের একটি দ্রবণ যার মাঝে জৈব ও অজৈব পদার্থের ভাসমান কণাও (suspended particutate) প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে। দ্রবণটি অক্সিজেন সমৃদ্ধ এবং এর pH 8.0 এর কাছাকাছি অবস্থান করে। ভূ-পৃষ্ঠে যত মৌলিক পদার্থ আছে, তার সবগুলো সামুদ্রিক পানিতেও পাওয়া যায় তবে পরিমাণে কম। মৌলগুলোর মাঝে যেগুলোর প্রাচুর্য 1 mg / kg এর উর্ধ্বে অবস্থান করে, তাদের মুখ্য মৌল (major element) হিসেবে গণ্য করা হয় (সারণি ২.৫)। মুখ্য উপাদানগুলোর আপেক্ষিক প্রাচুর্য সামুদ্রিক

পানির সর্বত্র সর্বদা মোটামুটি একই থাকে; উপাদানের এরূপ বিতরণকে তার রক্ষণশীল (conservative) আচরণ বলা হয় কেননা উপাদানের পরম ঘনমাত্রা (absolute concentration) রাসায়নিক কিংবা জৈবিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় ভৌত প্রক্রিয়ায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচরণটির ব্যত্যয় ঘটে; যেমন, Ca^{2+} ও HCO_3^- এর বিতরণ। চাপ ও শৈত্যের সাথে $CaCO_3$ এর দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায়; সমুদ্র যতো গভীর হয়, Ca^{2+} ও HCO_3^- এর ঘনমাত্রা তাই সেখানে তত বাড়তে থাকে। যাহোক, সামুদ্রিক পানিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত একটি সমসত্ত্ব দ্রবণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। মন্তব্যটি যদিও অতি সরলীকৃত তবে মুখ্য উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে এটি দৃশ্যত প্রযোজ্য হয়।

সামুদ্রিক পানির রাসায়নিক গঠন নির্ধারণে সাম্যবিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তার মাধ্যমেই পানিতে দ্রবীভূত গ্যাসের ঘনমাত্রা (তথা জারণ-বিজারণ পটেনশিয়াল ও pH), বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থায় মুখ্য ও গৌণ উপাদানের প্রাচুর্য, উপাদানের দ্রবীভবন নির্ধারিত হয়। নিচে কিছু কিছু উপাদানের সাম্য প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো।সমুদ্রের পানিতে গ্যাসের দ্রবীভবন হেনরির সূত্র অনুসরণ করে। বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রপৃষ্ঠের সংযোগ তলে (interface) গ্যাসের বিনিময় ঘটে; ফলে, সমুদ্র পানির উপরের স্তর বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসে প্রায় বা সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত থাকে। পানির আলোড়নে উপর ও নিম্নস্তরের পানি মিশ্রিত হয়; এতে দ্রবীভূত গ্যাসগুলোর পানির মাঝে সর্বত্র বণ্টন ঘটে। উক্ত বণ্টনে প্রধানত Ar, Xe ও N_2 গ্যাস রক্ষণশীল এবং O_2 ও CO_2 অরক্ষণশীল (non-conservative) আচরণ করে। শেষোক্ত গ্যাস দুটির (O_2 ও CO_2) ঘনমাত্রা জৈবিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এরা যথাক্রমে পানির জারণ-বিজারণ

সারণি ২.৫ : সামুদ্রিক পানিতে মুখ্য মৌল (major elements) [লবণাক্ততা (salinity): প্রতি কেজি পানিতে দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের ভর = 35-g /kg]

মৌল	রাসায়নিক অবস্থা	মোল/লিটার	গ্রাম/কিলোগ্রাম
Na	Na^+	4.79×10^{-1}	10.77
Mg	Mg^{2+}	5.44×10^{-2}	1.29
Ca	Ca^{2+}	1.05×10^{-2}	0.4123
K	K^+	1.05×10^{-2}	0.3991
Sr	Sr^{2+}	9.51×10^{-5}	0.00814
Cl	Cl^-	5.59×10^{-1}	19.353
S	SO_4^{2-}, $NaSO_4^-$	2.89×10^{-2}	0.905
C(অজৈব)	HCO_3^-, CO_3^{2-}	2.35×10^{-3}	0.276
Br	Br^-	8.62×10^{-4}	0.673
B	$B(OH)_3$, $B(OH)_4^-$	4.21×10^{-4}	0.0445
F	F^-, MgF^+	7.51×10^{-5}	0.00139

*Dyrssen and Wedborg (1974)

পটেনশিয়াল ও pH নির্ধারণ করে থাকে।অক্সিজেন সম্পৃক্ত পানির জারণ বিজারণ পটেনশিয়াল নিম্নলিখিত সাম্যবিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয় বলে ধারণা করা হয়:

$$O_2 + 4H^+ + 4e \rightleftharpoons 2H_2O$$

তাপমাত্রা 20°C ও pH 8.1-এ পানি যখন অক্সিজেনের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে (p_{o_2} = 0.21 atm) তখন পানির pE = 12.5 (pE , ইলেকট্রন সক্রিয়তা):

$$[pE = pE^\circ - pH + \log\ p_{o_2}^{1/4} = 20.75 - 8.1 + \log (0.21)^{1/4} = 12.5]$$

সামুদ্রিক পানির pH 7.8 – 8.2 এর মাঝে মোটামুটি স্থির থাকে। প্রধানত, লঘু HCO_3^- দ্রবণের সাথে বায়ুমণ্ডলীয় CO_2 এর সাম্যাবস্থা দ্বারা সামুদ্রিক পানির বাফার বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয় (উদাহরণ ২.৮) তবে $B(OH)_3 - B(OH)_4^-$ (বোরিক অ্যাসিড - বোরেট) সাম্যও এতে কিছুটা অবদান রাখে। যাহোক, CO_2 যখন জৈবিক প্রক্রিয়ায় পানি থেকে অপসারিত কিংবা পানিতে যুক্ত হয় তখন pH এর উপর তার ক্ষণস্থায়ী একটি প্রভাব পড়ে, যেমন- পানির উপর স্তর থেকে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় CO_2 যখন অপসারিত হয় তখন সেখানে pH বাড়ে। পক্ষান্তরে, গভীর পানিতে জৈব বস্তুর জারণে পানিতে যখন CO_2 যুক্ত হয়, তখন সেখানে pH কমে (ল্য -শাটেলিয়ে নীতি, উদাহরণ ২.৮ দ্র:)। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া পানির ক্ষারত্বের (alkalinity) উপরও প্রভাব ফেলে কেননা প্রক্রিয়াটিতে H^+ আয়ন সংশ্লিষ্ট থাকে। কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাসের সাধারণ অপসারণ ও সংযোজনও পানির pH ,কে প্রভাবিত করে তবে এতে ক্ষারত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটে না কেননা H_2CO_3 থেকে একই সংখ্যক মোল H^+ ও HCO_3^- উৎপন্ন হয়। যাহোক বায়ুমণ্ডলে CO_2এর ঘনমাত্রা যে হারে বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে একদিন সামুদ্রিক পানির pH হ্রাস এবং ক্ষারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে:

$$CO_2 + H_2 \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$; (pH হ্রাস)

$$CaCO_3 (s) + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^-$$ (ক্ষারত্ব বৃদ্ধি)।

সামুদ্রিক পানি লবণের একটি 3.5% দ্রবণ, NaCl এর মুখ্য উপাদান (প্রায় 0.48M)। পানিতে বহু অজৈব আয়ন ও জৈব পদার্থ উপস্থিত থাকে যেগুলো বিভিন্ন ধাতু আয়নের সাথে আয়নযুগল (ion-pair) ও জটিল যৌগ গঠন করে। তবে, পানির মুখ্য যেসব ধাতব মৌল, সেগুলো প্রধানত মুক্ত আয়ন আকারে সেখানে অবস্থান করে (যেমন, Na^+: 97.6%, Mg^{2+}: 89-92%, Ca^{2+}: 89-92%, K^+: 98.8%)। অবস্থান্তর ধাতুর জটিল যৌগ গঠন করার প্রবণতা খুব শক্তিশালী। এসব ধাতু তাই কার্যত জটিল যৌগ আকারে পানিতে উপস্থিত থাকে। পানিতে যেসব জৈবিক ক্রিয়া ঘটে তাতে ট্রেস ধাতুর ভূমিকা থাকে। ধাতুর জটিল আয়ন গঠনের প্রবণতা উক্ত ভূমিকাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, Cu^{2+} ও Zn^{2+} এর কথা ধরা যাক; মনে করা হয়, মুক্ত-আয়ন অবস্থায় এরা জীব কর্তৃক গৃহীত হয় এবং উচ্চ ঘনমাত্রায় এরা জীবদেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। ধাতু দুটির জটিল যৌগ গঠনের প্রবণতা উচ্চ তাই এদের মুক্ত

আয়নের ঘনমাত্রা পানিতে কখনো বেশি হতে পারে না এবং জীব এদের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা পায়। বহু সামুদ্রিক প্রাণী আছে যারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মুখ দিয়ে এক প্রকার রস নিঃসরণ করে; উক্ত রসের মাঝে কিলেটিং লিগ্যান্ড শ্রেণীর এমন কিছু যৌগ থাকে যা পারিপার্শ্বিক ট্রেস ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হয় তার বিষক্রিয়া নষ্ট করে দেয় অন্যথায় প্রাণীর গ্রহণোপযোগী একটি রাসায়নিক অবস্থায় ধাতুটিকে রূপান্তরিত করে। যাহোক, সামুদ্রিক পানিতে ট্রেস ধাতুর যে রসায়ন তা বেশ জটিল। একই ধাতু ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক অবস্থায় পানিতে অবস্থান করে এবং প্রধানত ধাতুর প্রাচুর্য, পানির pH ও জারণ-বিজারণ পরিবেশ দ্বারা ধাতুর রাসায়নিক অবস্থা ও তার প্রাচুর্য নির্ধারিত হয়। সীসার (Pb) কথা ধরা যাক, কমপক্ষে ছয়টি রাসায়নিক অবস্থায় (যেমন, $PbCl_3^-$, $PbCl_2$, $PbCl^+$, $Pb(OH)_2$, $PbOH^+$, $PbCO_3$) ধাতুটি সামুদ্রিক পানিতে অবস্থান করে যার মাঝে $PbCO_3$ নিম্নতর pH এ (pH 7.5-8.0) এবং $Pb(OH)^+$ উচ্চতর pH -এ (pH 8.1-8.5) মুখ্য উপাদান হিসেবে পানিতে উপস্থিত থাকে।

উদাহরণ ২.৮ : দেখাও যে, সামুদ্রিক পানি একটি বাফার যার $pH = 8.0 \pm 0.2$। সামুদ্রিক পানির pH ও বাফার বৈশিষ্ট্য মুখ্যত $CO_2 - HCO_3^- - CO_3^{2-}$ সাম্য এবং গৌণত $B(OH)_3 - B(OH)_4^-$ সাম্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। পানির মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব অম্ল-ক্ষারক সাম্যবিক্রিয়া ঘটে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. বায়ুমণ্ডল - সমুদ্রপৃষ্ঠের সংযোগতল (interface):

$$CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq) \qquad (i)$$

২. পানি-সংযোজন (hydration):

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \qquad (ii)$$

বিক্রিয়া (i) এর তুলনায় (ii) অনেক বেশি দ্রুততর; অতএব,

$$CO_2(g) + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3;\ K'_{co_2} = \frac{[H_2CO_3]}{p_{co_2}[H_2O]} = 10^{-1.41} \qquad (iii)$$

৩. বিয়োজন (dissociation):

$$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-;\ \rightleftharpoons\ pK_1' = 6.05 \quad (25°C)$$

$$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-};\ pK'_2 = 9.23$$

মোট অজৈব কার্বন: $\Sigma CO_2 = [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$

মোট ক্ষারত্ব, TA (Titration Alkalinity):

$$TA = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [B(OH)_4^-] + [OH^-] - [H^+];$$

$[B(OH)^-_4]$ মোট ক্ষারত্বের মাত্র 3% এবং $[OH^-]$ ও $[H^+]$ উভয়ই নগণ্য;

অতএব, TA ≅ কার্বোনেট ক্ষারত্ব (CA)

$$CA = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] \cong 2.40 \times 10^{-3}\ eq/L$$

সমীকরণ (iii) থেকে: $[H_2CO_3] = K'_{CO_2}\ P_{CO_2}$

$P_{CO_2} = 3.6 \times 10^{-4}$ atm (15°C)

$\therefore [H_2CO_3] = 10^{-1.41} \times 3.6 \times 10^{-4} = 1.40 \times 10^{-5}$

$$CA = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] = \frac{K'_1 [H_2CO_3]}{[H^+]} + \frac{2K'_1K'_2 [H_2CO_3]}{[H^+]^2}$$

$$\therefore CA \{[H^+]^2 - K_1' [H_2CO_3][H^+] - 2K'_1K'_2 [H_2CO_3]\} = 0$$

CA, K'_1, K_2' ও $[H_2CO_3]$ এর মান বসিয়ে দ্বিঘাত সমীকরণটি সমাধান করে:
$[H^+] = 6.19 \times 10^{-9}$ mol / L; pH = 8.21

অজৈব কার্বনের সর্বশেষ রাসায়নিক অবস্থা, খনিজ কার্বোনেট; সামুদ্রিক পানিতে যে কার্বোনেট থাকে, তার সাথে CO_2 এর বিক্রিয়া পানিকে বাফার ক্ষমতা প্রদান করে:

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^-$$

২.২২ টাটকা পানিতে রাসায়নিক দ্রব্য

উৎসভেদে টাটকা পানির রাসায়নিক গঠন ভিন্ন হয়। টাটকা পানির উৎস প্রধানত তিনটি - বৃষ্টি/তুষার, নদী ও হ্রদ। উৎস তিনটি সম্মিলিতভাবে যে পানি ধারণ করে তা মোট পানিরাশির এক অতি নগণ্য ভগ্নাংশ, মাত্র 0.003%; তা সত্ত্বেও বারিমণ্ডলীয় চক্রের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য টাটকা পানির পরিক্রমণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন, এক. সামুদ্রিক পানি থেকে লবণ ও গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বৃষ্টি ও তুষারপাত ঐসব পদার্থকে বায়ুমণ্ডল থেকে ধৌত করে ভূপৃষ্ঠ ও জলাধারে ফিরিয়ে আনে। দুই. পানি একটি উত্তম দ্রাবক। বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি কিংবা মৃত্তিকার দ্রবণ আকারে উক্ত দুই শ্রেণীর পানি মহাদেশীয় শিলা ক্ষয় করে সমুদ্রের পানিতে তা বহন করে নিয়ে যায়। নিচে বৃষ্টি, নদী ও হ্রদের পানির রাসায়নিক গঠন বর্ণনা করা হলো।

২.২২.১ বৃষ্টির পানিতে রাসায়নিক দ্রব্য: বৃষ্টি ও তুষারপাত আকারে যে পানি পাওয়া যায়, সামুদ্রিক পানি তার প্রধান উৎস। সমুদ্রের পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং সেখানে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা (particulates) ভেসে বেড়ায়, তাদের কেন্দ্র করে জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধে; পরে অনুকূল তাপ ও চাপে জমাট-বাঁধা বাষ্পকণা বৃষ্টি/ তুষারপাত আকারে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। বায়ুমণ্ডলের ভাসমান বস্তুকণাকে অ্যারোসল বলে (কণার ব্যাস 1-20 μm)। অ্যারোসলের উৎস দুটি-- সামুদ্রিক পানি ও মহাদেশীয় মৃত্তিকা। মহাদেশীয় অ্যারোসলের প্রধান উপাদান অ্যালুমিনোসিলিকেট ও দুর্বিভাজনীয় (refractory) ধাতব অক্সাইড এবং সামুদ্রিক অ্যারোসলের দ্রবণীয় ক্লোরাইড ও সালফেট লবণ। সমুদ্রের পানিতে বুদবুদের যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন দ্রবীভূত লবণসহ পানি-বিন্দু বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়। উক্ত পানি

বাষ্পীভূত হবার পর দ্রবীভূত লবণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কণা আকারে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। সামুদ্রিক পানিতে যেসব লবণ থাকে তাদের মাঝে NaCl এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, প্রায় 78%; সামুদ্রিক অ্যারোসলে তাই লবণটি প্রাধান্য পায়। তবে সামুদ্রিক পানিতে Na^+ ও Cl^- যে অনুপাতে থাকে, সামুদ্রিক অ্যারোসলে তা ভিন্ন হয়। অ্যারোসলে Cl^- অপেক্ষাকৃত কম থাকে; সম্ভবত Cl^- এর একটি ভগ্নাংশ উদ্বায়ী HCl গঠন করে এবং অ্যারোসল থেকে তা উবে যায়।

বৃষ্টির পানির গড় রাসায়নিক গঠন সারণি ২.৬ এ প্রদান করা হলো; মহাদেশীয় অ্যারোসল কিংবা মানুষের তৈরি পদার্থ পানিতে যুক্ত হয়ে উক্ত গঠনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, NO_x ও SO_x (মানুষের তৈরি পদার্থ) যদি বায়ুমণ্ডলে উচ্চমাত্রায় প্রবেশ করে তাহলে বৃষ্টির পানিতে অম্ল বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে উপকূল থেকে মহাদেশের গভীরে বৃষ্টির পানিতে লবণের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

সারণি ২.৬ : বৃষ্টি ও নদীর পানিতে মুখ্য উপাদানগুলোর গড় ঘনমাত্রা*।

উপাদান	ঘনমাত্রা, mg/L		
	বৃষ্টির পানি	সমুদ্রের পানি	নদীর পানি
Na^+	1.98	10,500	6.3
K^+	0.30	380	2.3
Mg^{2+}	0.27	1300	4.1
Ca^{2+}	0.09	400	15
Fe	-	-	0.67
Al	-	-	0.01
Cl^-	3.79	19,000	7.8
SO_4^{2-}	0.58	2650	11.2
HCO_3^-	0.12	140	58.4
SiO_2	-	6	13.1
pH	5.7	8.2	-
DS	-	32000-37000	10

* Garrels and MacKenzie (1971)

২.২২.২ নদীর পানিতে রাসায়নিক দ্রব্য : সারণিতে (সারণি ২.৬) নদীর পানির গড় গঠন লিপিবদ্ধ করা হলো। অঞ্চলভেদে উক্ত গঠনের বিরাট তারতম্য ঘটে। নদীর পানির রাসায়নিক গঠন নির্ধারণে তিনটি নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; যথা (ক) পানিতে লবণের প্রাচুর্য (খ) যে ভূখণ্ডের ভিতর দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় সেখানে ভূমির প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং (গ) নদীর পানিতে বর্জ্য পদার্থের মিশ্রণ। বৃষ্টিপ্রধান

অঞ্চলের নদীর পানিতে লবণের মাত্রা সাধারণত কম থাকে, যদি না উপরিউক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়ামক দুটি সেখানে প্রবল হয়। যে অঞ্চলে ভূমির ক্ষয় খুব প্রবল সেখানে নদীর পানিতে প্রচুর পরিমাণ লবণ ও ক্যালসিয়াম (Ca) উপস্থিত থাকে। নদীর পানি সবচেয়ে বেশি লবণাক্ত হয় সে অঞ্চলে যেখানে পানির বাষ্পীভবন খুব বেশি ঘটে। শুষ্ক উষ্ণ অঞ্চলে নদীর পানি তাই অতিমাত্রায় লবণাক্ত হয়ে থাকে। ঐরূপ পানিতে Ca^{2+} আয়ন কার্বোনেট আকারে অধঃক্ষেপ পড়ে এবং Na^{+} আয়ন পানির মুখ্য উপাদানে পরিণত হয়। সামুদ্রিক পানিতে মহাদেশীয় শিলার যে মিশ্রণ ঘটে, নদীর পানি তার প্রধান বাহক হিসেবে কাজ করে। প্রতি বছর প্রায় 4.2×10^{12} kg দ্রবীভূত পদার্থ ও 18.3×10^{12} kg বস্তুকণা (particulates: 0.4-0.5μm ফিল্টারে যা আটকা পড়ে) নদীবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানিতে মেশে। ঐসব বস্তুকণায় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আপেক্ষিক প্রাচুর্য নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডের শিলা দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিলার যেসব উপাদান রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ায় দুর্বিভাজনীয় (refractory: যেমন:Al, Fe, Ti, P) নদীবাহিত বস্তুকণায় তাদের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি এবং যেসব উপাদান ক্ষয়প্রবণ(যেমন Na ও Ca) তাদের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে (সারণি ২.৭ দ্র:)।

সারণি ২.৭ : নদীবাহিত বস্তুকণায় ও নদীর তীরবর্তী ভূখন্ডের শিলায় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের গড় প্রাচুর্য* ।

মৌলিক পদার্থ	প্রাচুর্য, g/kg	
	নদীবাহিত বস্তুকণা	তীরবর্তী ভূখণ্ডের শিলা
Si	285.0	275.0
Al	94.0	69.3
Fe	48.0	35.9
Ti	5.6	3.8
Mn	1.1	0.7
P	1.2	0.6
Ca	21.5	45.0
K	20.0	24.4
Mg	11.8	16.4
Na	7.1	14.2

* Martin & Meybeck (1979)

২.২২.৩ হ্রদের পানিতে রাসায়নিক দ্রব্য : হ্রদ যে নদীর সাথে যুক্ত থাকে তার পানির রাসায়নিক গঠন হ্রদের পানিতে প্রতিফলিত হয় যদিও নদী ও হ্রদের পানির মাঝে পার্থক্যও অনেক থাকে। বহু ভৌত ও জৈবিক প্রক্রিয়া আছে, যেগুলো হ্রদের পানিতে ঘটতে পারে কিন্তু নদীর পানিতে ঘটে না। নদীর পানি হ্রদে প্রবেশ করার পর ঐসব প্রক্রিয়ার প্রভাবে তার রাসায়নিক গঠনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন ঘটে। ভৌত

প্রক্রিয়ার বিষয়টি ধরা যাক, নদীর পানির তুলনায় হ্রদের পানিতে গতীয় শক্তি (hydrodynamic energy) অনেক কম। নদীর পানি হ্রদে প্রবেশ করার পর তার ভাসমান বস্তুকণা (particulates) তাই হ্রদে তলানি পড়ে এবং হ্রদের পানি নদীর পানির তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ হয়। হ্রদ খাড়াভাবে গভীরে নেমে যায় ফলে তলানি কূলের তুলনায় গভীর তলদেশে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে জমা পড়ে। এতে হ্রদের গভীরতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। হ্রদের পানির গঠন সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় পানিতে যেসব জৈবিক প্রক্রিয়া ঘটে তার মাধ্যমে এবং জৈবিক প্রক্রিয়াগুলো ঘটতে পারে পানি সেখানে আলোড়িত হয় না বলে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে পানির উপরস্তর উষ্ণ হয় কিন্তু নিচের স্তর শীতল থাকে। পানি রাশির ঐরূপ তাপীয় স্তরায়ণ (thermal stratification) এমন মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছায় যে, একস্তরের দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত পদার্থ অন্যস্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ঐ সময় দুইস্তরের মাঝে দুই শ্রেণীর জৈবিক প্রক্রিয়া ঘটে এবং দুই স্তরে পানির রাসায়নিক গঠনেও বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়। উপরস্তরের পানি বায়ুমণ্ডলের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে এবং সেখানে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে বলে উক্ত পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন উচ্চমাত্রায় উপস্থিত থাকে (প্রায় 8 ppm)। উপরস্তরে পানির পরিবেশ তাই জারণধর্মী (oxidising) (pE≅ 12.0) হয়। পক্ষান্তরে, নিম্নস্তরে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন স্বাভাবিকভাবেই কম প্রবেশ করে এবং যে অক্সিজেন সেখানে প্রবেশ করে তাও জলজ প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যয় হয়। হ্রদের নিম্নস্তরে তাই তীব্র বিজারণধর্মী (reducing) একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঐরূপ পরিবেশে ধাতু আয়ন নিম্নতর জারণ অবস্থায় থাকে (যেমন, নিম্নস্তরে Fe^{2+}, Mn^{2+} বনাম উপরস্তরে Fe^{3+}, Mn^{4+}) এবং NO_3^-, NO_2^-, SO_4^{2-} প্রভৃতি আয়ন জৈব বস্তুর বিভাজনে ইলেকট্রন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে (উপরস্তরে ইলেকট্রন গ্রাহক, O_2)। শেষোক্ত আয়নগুলো বিজারিত হয়ে NH_3 ও H_2S উৎপন্ন হয়; পদার্থ দুটি পানিতে দূষণ সৃষ্টি করে।

জলাধারের উর্বরতা বৃদ্ধি পাওয়াকে তার 'ইউট্রোফিকেশন' বলে (২.২০ দ্রঃ)। হ্রদ যত পুরাতন হয় তত তার ইউট্রোফিকেশন ঘটে। প্রক্রিয়াটি প্রাকৃতিক তবে মানুষের ক্রিয়াকর্মে এটি ত্বরান্বিত হতে পারে। যেসব পুষ্টি উপাদান পানিতে কম পরিমাণে থাকে তারা ইউট্রোফিকেশনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। অঞ্চলভেদে 'নিয়ন্ত্রক' ভিন্ন হয় তবে সাধারণভাবে নাইট্রেট অথবা ফসফেট উক্ত ভূমিকা পালন করে থাকে। রাসায়নিক সার, নাইট্রেট, ডিটারজেন্ট(ফসফেট) অথবা দুর্বল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত পশু ফার্মের বর্জ্য থেকে নাইট্রেট ও ফসফেট হ্রদের পানিতে যুক্ত হয়। হ্রদের ইউট্রোফিকেশনে ভূমির ক্ষয়, নগরের বর্জ্য, এমন কি হ্রদের বিনোদন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বর্জ্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হ্রদে তথা যে কোনো জলাধারে ইউট্রোফিকেশনের প্রভাব প্রথম দৃশ্যমান হয় তখন যখন তাতে জৈবিক কর্মকাণ্ডের প্রসার বিপুলমাত্রায় ঘটে চলে। ডায়াটম (diatom), সবুজ শৈবাল(algae), সায়ানোব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি আণুবীক্ষণিক জীব এসময় সেখানে

অপ্রতিহত গতিতে বাড়তে থাকে। ঐরূপ পানি সহজে পরিশোধন করা যায় না। তাছাড়া, শৈবাল যখন হ্রদের পানিতে পচতে থাকে তখন তাতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। শৈবাল পচার ফলে হ্রদের উর্বরতা আরও বাড়ে এবং এভাবে চলতে থাকলে হ্রদ একসময় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রশ্নমালা

১. পরিবেশ রসায়নে পানির বিশেষত্ব কি কি এবং বিশেষত্বগুলো দ্বারা পরিবেশ কিভাবে প্রভাবিত হয়?

২. পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব কি? অম্লীয় ক্ষারীয় অবস্থা এবং অম্লত্ব - ক্ষারত্বের মধ্যে পার্থক্য কি?

৩. প্রাকৃতিক পানিতে N_2 ও O_2 এর দ্রবীভবন যেমন সরল, CO_2 এর দ্রবীভবন তেমন সরল নয় - ব্যাখ্যা কর। বায়ুমণ্ডলের সাথে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত পানিতে (25°C) O_2 এর ঘনমাত্রা কত?

৪. পানিতে CO_2 গ্যাস প্রধানত CO_2, HCO_3^- ও CO_3^{2-} আকারে অবস্থান করে। পানির pH যখন 4.0, 7.0 ও 10.0 তখন তাতে উপাদান তিনটির আপেক্ষিক প্রাচুর্য কত হবে?

৫. প্রাকৃতিক পানিতে যেসব ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন সচরাচর উপস্থিত থাকে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত রসায়ন আলোচনা কর। প্রাকৃতিক পানির বৈশিষ্ট্যের উপর ঐসব আয়ন কিরূপ প্রভাব ফেলে?

৬. প্রাকৃতিক পানিতে লৌহ ও অ্যালুমিনিয়ামের রসায়ন আলোচনা কর।

৭. হিউমাস কি? প্রাকৃতিক পানিতে হিউমাসের প্রভাব আলোচনা কর।

৮. প্রাকৃতিক পানিতে যে ফসফেট পাওয়া যায় তার প্রধান উৎসগুলি কি কি ? প্রাকৃতিক পানির বৈশিষ্ট্যকে ফসফেট কিভাবে প্রভাবিত করে?

৯. পরিবেশে যেসব আণুবীক্ষণিক জীব বাস করে সেগুলোর বিবরণ দাও। প্রাকৃতিক পানি ও মৃত্তিকায় ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে C, N ও S এর যেসব রূপান্তর ঘটে সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। নাইট্রোজেন চক্র কি?

১০. নাইট্রোজেন স্থাণুভবন, নাইট্রিফিকেশন ও ডিনাইট্রিফিকেশন ব্যাখ্যা কর।

১১. অম্ল খনির পানি বলতে কি বুঝায়? প্রাকৃতিক পানিতে এর প্রভাব কি?

১২. প্রাকৃতিক পানিতে যেসব বস্তুকণা উপস্থিত থাকে সেগুলোর উৎস আলোচনা কর। বস্তুকণা দ্বারা প্রাকৃতিক পানির বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রভাবিত হয়?

১৩. ইউট্রোফিকেশন কি? ব্যাখ্যা কর।

১৪. ইলেকট্রন সক্রিয়তা ও ইলেকট্রোড পটেনশিয়ালের মাঝে সম্পর্ক কি?

১৫. প্রাকৃতিক পানি যখন বায়ুমণ্ডলের সাথে সাম্যাবস্থায় থাকে তখন তাতে O_2 -এর আংশিক চাপ যদি বায়ুমণ্ডলে O_2 এর যে আংশিক চাপ (0.21 atm) তার সমান হয় তাহলে দেখাও যে পানির pH যখন 7.0 তখন তার pE এর প্রান্তীয় মান 13.5. pH 4.0 ও 10.0 -এ একই শর্তে pE এর জারণীয় প্রান্তীয় মান কত হবে?

১৬. কারণ ব্যাখ্যা কর:

ক. পুরাতন জলাশয়ে পানির pH সাধারণত নিম্ন হয়;

খ. জলাশয়ে শৈবালের বংশবৃদ্ধি যখন খুব দ্রুত ঘটে, পানির pH তখন বেড়ে যায়;

গ. বদ্ধ ও ভূ-গর্ভস্থ পানিতে অনেক সময় পচা ডিমের গন্ধ পাওয়া যায়;

ঘ. ভূ-পৃষ্ঠে Al এর প্রাচুর্য তৃতীয় স্থানে কিন্তু প্রাকৃতিক পানিতে ধাতুটির উপস্থিতি নগণ্য;

ঙ. Al^{3+} ও Fe^{3+} পানির অম্লত্ব বৃদ্ধি করে;

চ. মৃত জীবজন্তু যখন পচতে থাকে তখন দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়;

ছ. প্রাকৃতিক পানিতে বস্তুকণা পানিকে যেমন পরিশোধন করে তেমনি তাতে দূষণও সৃষ্টি করে;

জ. বদ্ধ জলাশয়ের তলদেশে অনেক সময় মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি হয় এবং

ঝ. ভূ-গর্ভে যে জীবশ্ম জ্বালানি সৃষ্টি হয়েছে তার প্রাথমিক ধাপ জলাশয়ের ইউট্রোফিকেশন।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Carole L. Hamilton (Introduction); Chemistry in the Environment (Collection from Scientific American), Freeman, USA, 1952-73

2. S.E. Manahan, 'Environmental Chemistry', 6th Ed., Lewis Publishers, USA, 1994.

3. W.A. Andrews (Editor), A Guide to the Study of Environmental Pollution' Prentice Hall, USA, 1972.

4. R.M. Harrison & S.J. de Mora, 'Introductory Chemistry for the Environmental Sciences', 2nd Ed., Cambridge Univ. Press, U.K., 1996

BANGLA ACADEMY Dhaka

তৃতীয় অধ্যায়

পানি দূষণ ও পানি পরিশোধন

(Water Pollution and Water Purification)

৩.১ ভূমিকা

পানির অপর নাম জীবন। শারীরিক সুস্থতাই হোক কিংবা জাগতিক সমৃদ্ধিই হোক - মানুষের ইতিহাসের সকল পর্যায়ে পানি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মল-মূত্র দ্বারা দূষিত পানি পান করার ফলে জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে নগরের পর নগর জনশূন্য হয়েছে এমন ঘটনার উদাহরণ যেমন প্রচুর রয়েছে তেমনি আবার যথোপযুক্ত পানির সহজপ্রাপ্যতা সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে মানব সভ্যতার উন্মেষ ও বিস্তার ঘটাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, সেই ইতিহাসও আজ অজানা নয়। অনুন্নত দেশে এখনো কোথাও কোথাও পানিবাহিত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। তবে বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তার যত ঘটছে, জনসাধারণ ততই ঐসব রোগব্যাধির কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সজাগ হচ্ছে এবং পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব তত হ্রাস পাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে বর্তমানে পানিবাহিত রোগ নেই বললেই চলে। রোগজীবাণুর বাহক হিসেবে পানি সম্পর্কে যে উদ্বেগ কয়েক দশক পূর্বেও অত্যন্ত প্রকট ছিল তা আজ আর তেমন নেই ঠিকই কিন্তু ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিতে পানি বর্তমানে বিশ্ববাসীর জন্য আবার গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প-কারখানার বিস্তার নতুন এই উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। আজ লক্ষ লক্ষ টন শিল্প-বর্জ্য, কীটনাশক, রাসায়নিক দ্রব্য প্রতিদিন প্রাকৃতিক পানিতে যুক্ত হচ্ছে যা প্রাকৃতিক পানিতে দূষণ সৃষ্টি করে মানুষ, জীবজন্তু ও বৃক্ষরাজির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে চলেছে। সুস্থ পরিবেশের জন্য দূষণমুক্ত বারিমণ্ডল অত্যাবশ্যক। আধুনিক শিল্পসভ্যতার যুগে পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য তাই পানি দূষণ বিষয়টিকে নতুন এক পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৩.২ পানির দূষক

পানির দূষককে মোটামুটিভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা- জৈব দূষক, অজৈব দূষক, তলানি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও তাপীয় দূষক। নিচে বিভিন্ন শ্রেণী দূষকের বিবরণ প্রদান করা হলো (পানীয় পানিতে বিভিন্ন দূষকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)।

৩.২.১ প্রাকৃতিক পানিতে জৈব দূষক : জৈব দূষককে সাধারণ কয়েকটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা, অক্সিজেনগ্রাসী দূষক,রোগ সৃষ্টিকারী দূষক, নর্দমার ময়লা ও কৃষিক্ষেত বিধৌত দূষক, সংশ্লেষিত (synthetic) জৈব পদার্থ এবং খনিজ তেল (mineral oil)।

অক্সিজেনগ্রাসী (oxygen demanding) **দূষক:** যখন বায়ুচাপ 1-atm ও তাপমাত্রা 25°C তখন বায়ুমণ্ডলের সাথে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত পানিতে দ্রবীভূত O_2-এর ঘনমাত্রা (D.O.) 8.32 ppm. বায়ুচাপ, তাপমাত্রা ও পানিতে লবণের প্রাচুর্যভেদে D.O.-এর কিছুটা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য প্রাকৃতিক পানির সর্বোত্তম (optimum) D.O. 4 - 6 ppm. D.O. তার নিচে নেমে গেলে পানিতে জৈব দূষক আছে বলে ধরে নেয়া হয়। পানিতে O_2 গ্রাসী যেসব জৈব দূষক উপস্থিত থাকতে পারে তাদের মাঝে বাসস্থানের বর্জ্য, গৃহপালিত জীবজন্তুর মলমূত্র, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও কাগজ মিলের বর্জ্য, কসাইখানা ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার বর্জ্য এবং কৃষিক্ষেত্র বিধৌত সার, কীটনাশক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে ঐসব জৈবিক বস্তুর জারণ ঘটে এবং পানির D.O. হ্রাস পায়:

$$C + O_2 \rightarrow CO_2\,(g)$$

রোগসৃষ্টিকারী জৈব দূষক : পানি রোগজীবাণুর অন্যতম একটি বাহক এবং জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক। পানিবাহিত জীবাণু যেসব রোগসৃষ্টি করে তার মাঝে কলেরা, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, আমাশয়, পোলিও, সংক্রামক হেপাটাইটিস প্রভৃতি প্রধান। ঐসব রোগে যারা আক্রান্ত হয় তাদের মল-মূত্র পানি ও বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে প্রাকৃতিক পানিতে মেশে এবং তাতে দূষণ সৃষ্টি করে। পানি পরিশোধন ব্যবস্থার প্রাথমিক ধাপে তাই সংক্রমণবীজ বিনাশের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

নর্দমার ময়লা ও কৃষিক্ষেত বিধৌত জৈব দূষক : নর্দমার ময়লা ও কৃষিক্ষেত বিধৌত পানি যখন প্রাকৃতিক জলাধারে (যেমন, হ্রদ, সরোবর, পুকুর প্রভৃতি) মেশে তখন সেখানে শৈবালের বিস্তার ঘটে এবং কালক্রমে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, জলাধারের পানি পার্থিব যে কোনো প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। প্রক্রিয়াটি বহু বছর ধরে চলতে থাকলে বিশাল জলাধার একদিন লতাগুল্মে ভরা কর্দমাক্ত অগভীর জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়। জলাধারের ঐরূপ রূপান্তর ঘটাকে ইউট্রোফিকেশন (eutrophication) বলে (বিষয়টি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

পানিতে তেল দূষণ : তেল দূষণ বলতে পেট্রোলিয়াম (অপরিশোধিত) দূষণ বুঝায়। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম প্রধানত প্যারাফিন, চাক্রিক প্যারাফিন ও অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর শত শত যৌগের জটিল একটি মিশ্রণ। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রতিদিন পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার প্রায় ৬৫০ লক্ষ ব্যারেল (1 US barrel =

42 gallons; 1 US gallon = 3.8 L)। উক্ত তেল কূপ থেকে উত্তোলন (সমুদ্র অভ্যন্তরে খননকৃত কূপ) ও পরিবহণের সময় তার একটি অংশ সামুদ্রিক ও টাটকা পানিতে মেশে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বৈরিতার কারণেও অনেক সময় শত্রুপক্ষ একে অপরের পানি সীমায় ট্যাংকার থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তেল ফেলে পানিতে দূষণ সৃষ্টি করে। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, তেল উত্তোলন, পরিবহণ ও অশনাক্তকৃত বহু কারণে বর্তমানে প্রতি বছর দশ হাজারের বেশি ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটে এবং তা থেকে প্রায় ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন (1 মেট্রিক টন = 1000 kg = 7.8 US ব্যারেল) তেল সামুদ্রিক পানিতে মেশে। সাম্প্রতিককালে সামুদ্রিক পানিতে বড় আকারের তেল দূষণের যেসব ঘটনা ঘটেছে তার কয়েকটি নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১৯৬৭ সালে টোরি কেনিয়ন (Torrey Canyon) নামে একটি ট্যাংকার ইংল্যান্ডের 'ল্যান্ড এন্ড' (Land End)-এর ওলার্ড রক (Ollard Rock)-এ বিধ্বস্ত হয় যা থেকে প্রায় এক লক্ষ টন তেল সমুদ্রের পানিতে মেশে এবং ইংল্যান্ডের করনিক (Cornich) উপকূলের প্রায় 225-km এলাকা জুড়ে প্রচণ্ড পানি দূষণের সৃষ্টি করে। সে দূষণ ফ্রান্সের ব্রিটানি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ১৯৭৭ সালে আরও বড় এক দুর্ঘটনায় অ্যামকো কডিজ (Amco Codiz) ট্যাংকার থেকে সম্পূর্ণ তেল (দুই লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি) ব্রিটানি উপকূলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালে ট্যাংকার একসন ভালদেজ (Exxon Vaaldez) প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ড এর সাথে ধাক্কা লেগে আলাস্কা উপকূলে বিধ্বস্ত হয় এবং প্রায় এগারো মিলিয়ন (11×10^6) গ্যালন তেল আলাস্কা উপকূলের পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনাটিতে আলাস্কায় সামুদ্রিক পরিবেশের এমন বিশাল পরিমাণ ক্ষতি হয় যে, নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য এক বিচারক একে পারমাণবিক বোমার আঘাতে হিরোশিমায় যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছিল তার সাথে তুলনা করেন। ১৯৯২ - ৯৩ সালে দুই মাসের মধ্যে তেলবাহী তিনটি সুপার ট্যাংকার দুর্ঘটনার শিকার হয়। প্রথমটি স্পেনের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, দ্বিতীয়টি উত্তর স্কটল্যান্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশসমৃদ্ধ শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে এবং তৃতীয়টি বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ অংশে।

আন্তর্জাতিক বৈরিতার কারণে সমুদ্রের পানিতে তেল দূষণের যেসব ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় উপসাগরের পানিতে তেল দূষণের ঘটনা অন্যতম। ৪২ দিনব্যাপী ঐ যুদ্ধে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনীর সাথে ইরাকের যুদ্ধ) ৬ - ৮ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উপসাগরের পানিতে নিক্ষিপ্ত হয় (স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ অঞ্চলের পানিতে বছরে তেলের মিশ্রণ ২ মিলিয়ন ব্যারেল) এবং যুদ্ধের পরও প্রায় ১০ মাস ব্যাপী কুয়েতের প্রায় ৭০০টি তেলের কূপ জ্বলতে থাকে। এতে প্রতিদিন প্রায় এক মিলিয়ন টন তেল শ্বাসরুদ্ধকর কালো ধোঁয়া আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিদিন প্রায় আশি মিলিয়ন টন CO_2 ও ছত্রিশ মিলিয়ন

টন SO_2 প্রতিদিন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। উপসাগরীয় যুদ্ধে ঐ অঞ্চলে সামগ্রিক পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপরিমেয়।

পেট্রোলিয়াম সমুদ্রের পানিতে পড়ার পর বাতাস, জোয়ার-ভাটা ও জলস্রোতে তা যেমন বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তেমনি তার হালকা, নিম্ন স্ফুটনাঙ্ক যেসব উপাদান (প্যারাফিন, অ্যারোমেটিক্স, $C<12$) সেগুলো বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং / অথবা পানিতে দ্রবীভূত হয়। পাশাপাশি জারণ, জৈবিক বিভাজন, ইমালসন (emulsion) গঠন, কঠিন বস্তুপৃষ্ঠে পরিশোষণ প্রভৃতি ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তেলের গঠনে (composition) পরিবর্তন ঘটে। প্যারাফিনের জৈবিক বিভাজন সহজে ঘটে তবে চাক্রিক প্যারাফিন ও অ্যারোমেটিক্স সহজে বিভাজিত হয় না। পেট্রোলিয়ামের ভারি উপাদান যেগুলো বিভাজিত হয় না কিংবা তলানিও পড়ে না সেগুলো কালো আলকাতরার পিণ্ড বা বল আকারে তীরে এসে জমে। ফলে সমুদ্রতীরে কুৎসিত, শ্বাসরুদ্ধকর ও চরম অস্বাস্থ্যকর এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

পানিতে তেল দূষণ ঘটলে পানির স্বচ্ছতা হ্রাস পায় এবং সূর্যালোক পানির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে, সামুদ্রিক উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ ব্যহত হয় এবং পানির D.O. হ্রাস পায়। তেল দূষণ সামুদ্রিক জীবের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, এতে জীবের শারীরবৃত্তীয় (physiological), মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটে যার চরম অবস্থায় জীবের প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে। পেট্রোলিয়ামের দ্রবণীয় অ্যারোমেটিক উপাদানগুলোই ($C<10$) জীবের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। বয়োপ্রাপ্ত সামুদ্রিক জীবের জন্য দ্রবণীয় অ্যারোমেটিক-এর সহনীয় মাত্রা1-100 ppm, অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাত্রা আরও কম, মাত্রা 0.1 ppm এমনকি পিপিবি মাত্রায়ও পদার্থগুলো জীবের ক্ষতি করতে পারে, জীবের অনুভূতি ও আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। সামুদ্রিক তেল দূষণে জলচর পাখির বিশেষ ক্ষতি হয়। পাখির পালকে পানিরোধী এক প্রকার আবরণ থাকে, তেলে তা দ্রবীভূত হয় বলে পাখি পানিতে ভাসতে পারে না এবং শৈত্য আঘাতে মারাও যায়।

তেল দূষণে আক্রান্ত সামুদ্রিক উদ্ভিদ মানুষের জন্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে। বহু সামুদ্রিক জীব আছে যেগুলো মানুষের ভোজ্য। পিপিবি মাত্রার অ্যারোমেটিকও উদ্ভিদের কলায় প্রবেশ করে এবং জৈবিক প্রক্রিয়ায় সেখানে তাদের নানাবিধ রূপান্তর ঘটে। এতে একদিকে ভোজ্য উদ্ভিদের স্বাদ-গন্ধ যেমন নষ্ট হয় অন্যদিকে আবার রূপান্তরিত যৌগের প্রভাবে মানুষের দেহে ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিও সৃষ্টি হতে পারে। সরলভাবে বলা যায়, তেল দূষণ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পরিবেশকে যেমন নষ্ট করে তেমনি সামুদ্রিক প্রাণী, উদ্ভিদ ও খাবারের জন্যও তা বিরাট ক্ষতির কারণ হয়। অথচ, বর্তমান বাস্তব অবস্থা হলো তেলভিত্তিক প্রযুক্তির যত প্রসার ঘটছে, সামুদ্রিক পানিতে তেল দূষণের ঘটনাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামুদ্রিক পানির তেল দূষণ অপসারণ করা প্রায় অসাধ্য একটি কাজ তবে, ইতিমধ্যে রাসায়নিক ও ভৌত কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে যার সাহায্যে দূষণের মাত্রা হ্রাস করা যায়। রাসায়নিক প্রযুক্তিতে তেল আস্তরণের উপর কিছু রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তেলের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন ঘটে এবং উপাদানগুলো জমাট বেঁধে তলানি পড়ে অথবা দ্রবীভূত হয়। প্রযুক্তিটির প্রধান দুর্বলতা এটি পানিতে তেল দূষণের স্থলে ভিন্ন এক দূষণ সৃষ্টি করে। ভৌত পদ্ধতি রাসায়নিক পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। এতে পানির উপর ভাসমান তেলের আস্তরণটিকে ভাসমান একটি দেয়ালের সাহায্যে গণ্ডিবদ্ধ করে একটি শোষক বস্তুর সাহায্যে তুলে নেয়া হয়। পদ্ধতিটি বেশ সরল ও মোটামুটি কার্যকর।

পানিতে সংশ্লেষিত (synthetic) **জৈব পদার্থের দূষণ:** বর্তমান প্রযুক্তির এমন একটি ক্ষেত্রও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে সংশ্লেষিত কোনো জৈব পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। শিল্প-কারখানা, ওষুধ, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ এদের অগণিত ব্যবহার। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নতুন নতুন জৈব পদার্থ সংশ্লেষণ করার পদ্ধতি যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রচলিত পদার্থের সংশ্লেষণ পদ্ধতিও তেমনি উন্নততর করা হচ্ছে। এভাবে তালিকায় প্রতি বছর নতুন নতুন পদার্থ যোগ হতে হতে আজ এদের সংখ্যা ষাট লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। পদার্থগুলোর মাঝে প্রায় হাজার দশেক আছে যেগুলোর বাণিজ্যিক ব্যবহার ব্যাপক। প্রতি বছরে এসব পদার্থের উৎপাদন প্রায় দুশ বিলিয়ন (2.00×10^{11}) পাউন্ড এবং এক বছর থেকে পরবর্তী বছরে এদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় প্রায় 15%। অনুমান করা যায়, সংশ্লেষিত জৈব পদার্থ, সংখ্যা ও পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রে আজ কি বিশাল আকার ধারণ করেছে।

বৈজ্ঞানিক বিরাট এই সাফল্যের গভীর উদ্বেগজনক একটি দিকও আছে। ঐ বিপুল সংখ্যক পদার্থের প্রত্যেকটি থেকে কিছু না কিছু পরিমাণ পদার্থ কোনো না কোনোভাবে পরিবেশে যুক্ত হয় এবং সেখানে জানা অজানা নানাবিধ প্রভাব ফেলে। নতুন একটি পদার্থ যখন প্রথম সংশ্লেষিত হয়, জীবের উপর তার প্রভাব কি হতে পারে তা হয়ত বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তথ্য সংগৃহীত হয় স্বল্প সময়ে পরিচালিত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। দীর্ঘকালব্যাপী জীবের উপর পদার্থটি ক্রিয়া করতে থাকলে তাতে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে সে সত্য প্রায়ই অজানা থেকে যায়। কীটনাশক DDT-এর বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিগত চল্লিশের দশকে কীটনাশকটির ব্যবহার প্রথম যখন শুরু হয় তখন প্রত্যাশিত সুফলই কেবল তাতে পাওয়া যেত। কিন্তু এক দশক যেতে না যেতেই বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়ে কীটনাশকটি বহু উপকারী কীট-পতঙ্গ ও জলজ প্রাণীও ধ্বংস করে চলেছে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে। ১৯৬৮ সাল থেকে তাই EPA (Environmental Protection Agency, USA) বেসরকারি পর্যায়ে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া পদার্থটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। প্রাথমিক এক পর্যবেক্ষণেই

প্রমাণিত হয়েছে সংশ্লেষিত জৈব পদার্থের মাঝে এক বিরাট সংখ্যক রয়েছে যেগুলো বংশানুগতির (heredity) অন্যতম উপাদান, 'জীন' (gene)-এর বিকার ঘটায় এবং ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী ব্যাধিরও (carcinogenic)জন্ম দেয় । অতএব, নতুন নতুন জৈব পদার্থ সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে রসায়ন বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর সাফল্য, তা একদিকে যেমন প্রযুক্তির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে অন্যদিকে আবার পরিবেশের জন্য বিরাট এক হুমকির কারণও সৃষ্টি করছে।

অধিকাংশ জৈব পদার্থ প্রকৃতিতে সহজে বিভাজিত হয়। প্রধানত, জারণ-বিজারণ ও জলান্বয়ন (hydrolysis) প্রক্রিয়ায় বিভাজন ঘটে এবং আলোকরশ্মি, কীট-পতঙ্গ ও আণুবীক্ষণিক জীব তাতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। জৈব পদার্থের বর্জ্য প্রকৃতি থেকে এভাবে অপসারিত হয়। তবে কিছু কিছু জৈব পদার্থ আছে যেগুলো সহজে বিভাজিত হয় না। ঐ শ্রেণীর পদার্থকে দুর্বিনাশী (refractory) পদার্থ বলে। সাধারণত অ্যারোমেটিক ও ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর পদার্থ দুর্বিনাশী হয়। নিচে দুর্বিনাশী জৈব পদার্থের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা প্রদান করা হলো (সারণি ৩.১)। দুর্বিনাশী পদার্থ প্রকৃতিতে বহুদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে বলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী এদের প্রসার ঘটে। প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর এ জাতীয় পদার্থের মাত্র একটির প্রভাবও যদি অহিতকর হয় তখন পরিবেশের জন্য তা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে যেসব জৈব পদার্থ মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সাথে সাথে পরিবেশেরও প্রভূত ক্ষতিসাধন করে চলেছে তাদের মাঝে কীটনাশক, ডিটারজেন্ট ও পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (PCB) শ্রেণীর পদার্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রেণী তিনটি সম্পর্কে পরে (৩.৩ - ৩.৫) পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রকৃতিতে একটি পদার্থ বিভাজিত হলে অন্য যে পদার্থ সৃষ্টি হয় তা পরিবেশবান্ধব নাও হতে পারে; যেমন, অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে সালফেট (SO_4^{2-}) এর যে বিভাজন ঘটে তাতে H_2S উৎপন্ন হয়। H_2S বিষাক্ত একটি গ্যাস এবং পরিবেশের একটি দূষক। জৈব বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা তাই অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। আপদ-নিরাপদ ব্যবস্থাপনা থেকেও অনেক সময় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে লাভ ক্যানাল ডাম্পসাইট (Love Canal Dumpsite) দুর্ঘটনার বিষয়টি উল্লেখ করা যাক। নিউইয়র্ক রাজ্যে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে অবস্থিত লাভ ক্যানাল নামক নিম্নভূমিতে ১৯৩০-১৯৫৩ সালে রাসায়নিক পদার্থের বর্জ্য ও শহরের আবর্জনা ফেলা হতো। ১৯৫৩ সালে স্থানটি মাটি দ্বারা ভরাট করে শহর শিক্ষাবোর্ড সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং বিদ্যালয়টির চারপাশে বেশকিছু বসতি গড়ে ওঠে। কিন্তু একসময় বাড়ির বাসিন্দারা ঘরের ভিতর দুর্গন্ধ পেতে থাকেন এবং ১৯৭৮ সালে রাজ্যের কর্মকর্তারা বাড়িগুলোর নিচতলার বায়ু পরীক্ষা করে সেখানে ছাব্বিশটি বিষাক্ত জৈব গ্যাসের সন্ধান পান। এদের মাঝে কোনো কোনোটির

প্রাচুর্য তাদের TLV মানের সমান ছিল। ঐরূপ ভয়াবহ বায়ু দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে নিউইয়র্ক রাজ্য অঞ্চলটিতে স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং সে অঞ্চলের সকল পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

লাভ ক্যানাল ডাম্পসাইট দুর্ঘটনার উৎপত্তি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, তা পরিবেশ কর্মীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষণীয় বিষয়। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বর্জ্য-স্তূপের উপরের স্তরে মাটি ছিল ফাঁপা ও সছিদ্র এবং নিচের স্তর নিম্ন-প্রবেশ্য পলি (silt) ও কাদামাটি (clay) সমৃদ্ধ। এতে মাটির গভীরে বর্জ্যের অনুস্রাবন (percolation) বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে, উপর স্তরের মাটি যখন ভিজে ওঠে তখন সঞ্চিত গ্যাসের উপর চাপ পড়ে এবং গ্যাস নিচের দিকে যেতে না পেরে সছিদ্র স্তর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। যাহোক, লাভ ক্যানালের দুর্ঘটনা জানিয়ে দেয়, বর্জ্য মাটির গভীরে চাপা দিলেও পরিবেশকে তার প্রভাব থেকে রক্ষা করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

ঘটমান পরিস্থিতিতে একথা আস্থার সাথে বলা যায়, সংশ্লেষিত জৈব পদার্থের সংখ্যা ও পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং কল্যাণকর অবদানের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা ক্রমশ বিস্তারলাভ করবে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। তবে সংশ্লেষণ-রসায়নবিদ ও পরিবেশবিজ্ঞানী যৌথভাবে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করলে দুর্যোগের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। সেজন্য, সংশ্লেষিত একটি পদার্থ পরিবেশের উপর তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী কি প্রভাব ফেলতে পারে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে পদার্থটির প্রয়োগবিধি প্রদান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকে তার নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে কাজটিকে গ্রহণ করতে হবে।

সারণি ৩.১: জৈবিক দুর্বিনাশী (biorefractory) কিছু জৈব পদার্থ।

শ্রেণী	যৌগ
অ্যারোমেটিক	বেনজিনটলুইন, ইথাইল বেনজিন, আইসোপ্রোপাইল বেনজিন, বিউটাইল বেনজিন, 1,2 ডাইমেক্সিবেনজিন, নাইট্রোবেনজিন, মিথাইল বাইফিনাইল, স্টাইরিন, ডাইনাইট্রোটলুইন, ক্যাম্ফর।
হ্যালোজেনযুক্ত অ্যারোমেটিক	ব্রোমোবেনজিন, ব্রোমোক্লোরোবেনজিন, ক্লোরোনাইট্রো-বেনজিন, ডাইব্রোমোবেনজিন, ডাইক্লোরোবেনজিন।
অ্যালিফেটিক/ ক্লোরিনযুক্ত অ্যালিফেটিক	অ্যাসিটোন, ক্লোরোফরম, আইসোসায়ানিক অ্যাসিড, মিথাইল ক্লোরাইড, ট্রাইক্লোরোইথেন, টেট্রাক্লোরোইথিলিন, ক্লোরোইথাইল ইথার, ক্লোরোমিথাইল ইথাইল ইথার, ইথিলিন ডাইক্লোরাইড, ডাইক্লোরোইথাইল ইথার, 2- ইথাইলহেক্সালন।

৩.২.২ পানিতে অজৈব দূষক (inorganic pollutant) : অজৈব দূষকের তালিকা জৈব দূষকের মতো বিশাল না হলেও একেবারে নগণ্য নয়। খনিজ অম্ল, অজৈব লবণ, ধাতুর গুড়া ও ধাতব যৌগ, ধাতব জটিল আয়ন, জৈব ধাতব (organometallic)

পদার্থ, সায়ানাইড, সালফেট, সালফাইট, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি পদার্থ অজৈব দূষক শ্রেণীর অন্তর্গত। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, উল্লিখিত প্রায় সকল শ্রেণীর পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থাতেই প্রাকৃতিক পানিতে উপস্থিত থাকে এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য অপরিহার্য যেসব উপাদান সেগুলো পরিবেশন করে। পদার্থগুলো সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে ধৌত হয়ে জলাধারে মেশে অথবা আণুবীক্ষণিক জীবের অনুঘটনে বিভিন্ন শ্রেণীর জৈব ও অজৈব পদার্থ থেকে পানিতে উৎপন্ন হয়। তবে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে (যেমন, শিল্পকারখানা ও বাসস্থানের বর্জ্য) যখন ঐসব পদার্থ প্রাকৃতিক পানিতে প্রবেশ করে, মূলত তখনই পানির প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট এবং তাতে দূষণ সৃষ্টি হয়। অজৈব দূষকের মাঝে একটি শ্রেণী আছে যা ভারি ধাতু (heavy metal) ও ধাতুকল্পের (metalloid) যৌগ। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণেও (trace) যদি এরা পানিতে উপস্থিত থাকে তাহলে তাতে তীব্র দূষণ সৃষ্টি হয়। ঐ জাতীয় দূষণকে সাধারণভাবে 'ট্রেস মৌলের দূষণ' (trace element pollution) বলা হয়ে থাকে (সপ্তম অধ্যায়ে এটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। ভারি ধাতু ও ধাতুকল্প বাদে যেসব অজৈব পদার্থ প্রাকৃতিক পানিতে সচরাচর উচ্চমাত্রায় দূষণ সৃষ্টি করে, নিচে তেমনি কয়েকটি পদার্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

পানিতে সায়ানাইড (CN^-) [পানীয় পানির জন্য CN^- এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা 0.01 ppm]: সায়ানাইড একটি মারাত্মক বিষ। পানিতে এটি HCN ($K_a = 6.0 \times 10^{-10}$) আকারে অবস্থান করে। HCN একটি গ্যাস, এর বিষক্রিয়াও অতি তীব্র। সায়ানাইড যখন বহু ধাতু আয়নের সাথে স্থিতিশীল জটিল আয়ন গঠন করে তখন এর বিষক্রিয়া হ্রাস পায়।

সায়ানাইড প্রধানত মানুষের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পানিতে প্রবেশ করে। ধাতু পরিষ্কারকরণ ও ইলেকট্রোপ্লেটিং এবং কিছু কিছু খনিজ পদার্থ প্রক্রিয়াজাতকরণে CN^- ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেখান থেকে বর্জ্য হিসেবে এটি প্রাকৃতিক পানিতে মেশে। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, বিগত আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্রে এক স্বর্ণখনির আকরিক থেকে ধাতুটি নিষ্কাশন করার সময় প্রতিদিন প্রায় 1.25 মেট্রিক টন সায়ানাইড ব্যবহার করা হতো এবং তা থেকে প্রতিদিন প্রায় 75 পাউন্ড সায়ানাইড বর্জ্য হিসেবে প্রাকৃতিক পানিতে প্রবেশ করতো। সায়ানাইড কয়লার গ্যাস (coal gas) তৈরি করার কারখানা ও কোক চুল্লিরও (coke oven) গুরুত্বপূর্ণ একটি বর্জ্য।

প্রাণিদেহে CN^- যে তীব্র বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে তার প্রধান কারণ Fe(III) -এর প্রতি CN^- এর প্রবল আসক্তি। অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) জীবকোষে শক্তির বাহক হিসেবে কাজ করে। অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট (ADP) এর সাথে অজৈব ফসফেট (Pi) এর বিক্রিয়ায় ATP সংশ্লেষিত হয় এবং বিক্রিয়াটি শক্তি (E) শোষণ করে:

$$ADP + P_i + E \rightarrow ATP$$

কোষের মাঝে O_2-এর সংস্পর্শে গ্লুকোজের জারণ ঘটে। বিক্রিয়াটি শক্তি উৎপাদন করে এবং ATP-এর সংশ্লেষণে তা যোগান দেয়। তবে গ্লুকোজের জারণ নিয়ন্ত্রিত না হলে একসাথে এত অধিক শক্তি নির্গত হয় যে তাতে দেহকলা (tissue) ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ফেরিসাইটোক্রোম অক্সিডেজ Fe(III)-Cyt নামে একটি এনজাইম (ধাতু-প্রোটিন) গ্লুকোজের জারণ বিক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রকের (mediator) ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রথম ধাপে গ্লুকোজ (বিজারক) Fe(III)-Cyt কে Fe(II)-Cyt (ফেরোসাইটোক্রোম)এ বিজারিত করে এবং পরবর্তী ধাপে Fe(II)–Cyt অক্সিজেনে ইলেকট্রন দান করে আবার Fe(III)–Cyt এ ফিরে আসে:

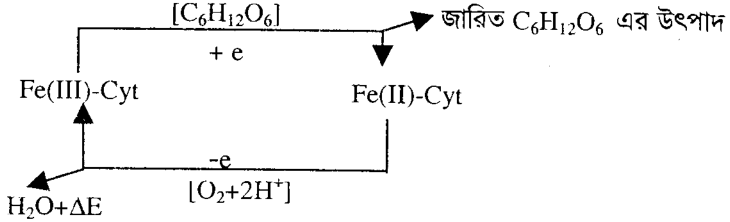

কোষে CN^- প্রবেশ করলে Fe(III)–Cyt / Fe(II)–Cyt -এ আয়রনের সাথে তা দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে, এনজাইমটির কার্যকারিতা লোপ পায় এবং ATP এর সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায়; ঘটনাটি জীবননাশক। তাছাড়া, CN^- অন্যান্য হেমাটিন যৌগের সাথেও জটিল যৌগ গঠন করে; এতে রক্তের অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা কমে যায়।

সায়ানাইডের বিষক্রিয়া শিরাপথে $NaNO_2$-এর দ্রবণ রক্তের সাথে মিশিয়ে কিংবা নিঃশ্বাসের সাথে অ্যামাইল নাইট্রেট-এর বাষ্প প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। নাইট্রাইট (NO_2^-) হেমোগ্লোবিনকে [HbFe(II)] মিথেমোগ্লোবিনে [HbFe(III)] জারিত করে। মিথেমোগ্লোবিন অক্সিজেন বহন করতে পারে না কিন্তু তা CN^--এর সাথে যুক্ত হয় এবং সায়ানাইডযুক্ত Fe(III)–Cyt অক্সিডেজ থেকে CN^- কেড়ে নিয়ে এনজাইমের কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনে।

$$\mathrm{HbFe\,(II)} \xrightarrow[-e]{[NO_2^-]} \mathrm{HbFe\,(III)}$$

$$\mathrm{HbFe(III) + Fe\,(III)\text{ - }Cyt\text{ - }CN \rightarrow HbFe(III)\text{-}CN + Fe\,(III)\text{–}Cyt}$$

সবশেষে, $Na_2S_2O_3$ দ্রবণ দিয়ে রক্ত ধৌত করা হলে CN^- তা থেকে অপসারিত হয়:

$$\mathrm{HbFe(III)\,CN} + S_2O_3^{2-} \rightarrow SCN^- + \mathrm{HbFe(II)} + SO_3^{2-};$$

বিক্রিয়াটিতে এনজাইম, রোডানেজ (rhodanase) অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

প্রাকৃতিক পানিতে সালফেট (SO_4^{2-}) দূষণ [পানীয় পানির জন্য সালফেটের গ্রহণযোগ্য মাত্রা 400 ppm] : সালফেট প্রাকৃতিক পানির সাধারণ একটি উপাদান;

কয়েক পিপিএম থেকে কয়েকহাজার পিপিএম পর্যন্ত সালফেট প্রাকৃতিক পানিতে উপস্থিত থাকতে পারে। খনি ধৌত পানি যখন প্রাকৃতিক পানিতে মেশে তখন সেখানে সালফেটের মাত্রা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। শিল্প-কারখানার বর্জ্য থেকেও অনেক সময় এটি পানিতে প্রচুর পরিমাণে যুক্ত হয়। ন্যাপথা (naptha) থেকে খনিজ তেল সংগ্রহ করার পর যে 'অবশেষ' (residue) পাওয়া যায় তাতে প্রচুর পরিমাণ Na_2SO_4 থাকে। 'অবশেষ' এর স্তুপ থেকে লবণটি ধৌত হয়ে প্রাকৃতিক পানিতে মিশতে পারে। পানীয় পানিতে সালফেটের মাত্রা খুব বেশি হলে পেটের পীড়া (পাতলা পায়খানা) দেখা দেয়।

প্রাকৃতিক পানিতে H_2S-এর দূষণ : H_2S একটি বিষাক্ত গ্যাস। এর গন্ধ পচা ডিমের গন্ধের মতো। খুব সামান্য পরিমাণেও যদি গ্যাসটি পানিতে দ্রবীভূত থাকে তাহলে পানিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে বিশেষ করে উষ্ণ প্রস্রবণে (hot spring) এবং জৈবিক বর্জ্য-মিশ্রিত পানিতে H_2S প্রায়ই উপস্থিত থাকে। বায়ুহীন পরিবেশে জৈব সালফার ও সালফেটের জৈবিক বিভাজন (bio-degradation) যখন ঘটে তখন তাতে H_2S উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক শিল্প, কাগজ শিল্প, বয়ন শিল্প এবং চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বর্জ্য থেকে উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ H_2S পানিতে ও বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

পানিতে H_2S দ্বিপ্রোটনীয় একটি দুর্বল অম্ল ($pK_1 = 6.99$, $pK_2 = 12.92$) এবং প্রাকৃতিক পানিতে S^{2-} মুক্তাবস্থায় থাকে না কেননা ভারি ধাতুর প্রতি S^{2-} এর আসক্তি প্রবল। তাই প্রাকৃতিক পানিতে যেখানে ধাতব সালফাইড থাকে সেখানে H_2Sও থাকে, ধরে নেয়া যেতে পারে।

প্রাকৃতিক পানিতে অ্যামোনিয়া দূষণ [পানীয় পানিতে NH_3এর গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা 0.5 ppm] : ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ পানিতে এবং বাসগৃহের বর্জ্যে অ্যামোনিয়া প্রাকৃতিকভাবেই উপস্থিত থাকে; নাইট্রোজেনযুক্ত জৈব বস্তুর যখন বিভাজন ঘটে তখন তার প্রাথমিক ধাপে NH_3 উৎপন্ন হয়। তাই, যে স্থানের পানিতে NH_3 থাকে সেখানে N-যুক্ত জৈব বস্তু প্রায়ই উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ইউরিয়ার জলান্বয়ন এবং নাইট্রেটের নির্বায়ু বিজারণ থেকেও NH_3 প্রাকৃতিক পানিতে উৎপন্ন হয়। যেহেতু, NH_4^+ এর $pKa = 9.26$ সেহেতু অ্যামোনিয়া 'মুক্ত NH_3' আকারে না থেকে কার্যত NH_4^+ আকারে প্রাকৃতিক পানিতে অবস্থান করে।

প্রাকৃতিক পানিতে (NO_3^- + NO_2^-) দূষণ [পানীয় পানিতে NO_3^-+NO_2^-এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা 50-100 ppm] : ভূ-পৃষ্ঠের পানিতে নাইট্রেট (NO_3^-) সাধারণত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (trace) পরিমাণে উপস্থিত থাকে। তবে, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে এর মাত্রা বেশি হতে পারে। নাইট্রাইট (NO_2^-) প্রকৃতিতে NH_3 জারিত হওয়ার কিংবা NO_3^- বিজারিত হওয়ার অন্তর্বর্তী একটি উৎপাদ। পানীয় পানিতে NO_3^- ও NO_2^- এর প্রাচুর্য যথাক্রমে

50 ও 0.1 ppm এর বেশি হলে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে। নাইট্রেট (NO_3^-) ছয় মাসের কমবয়স্ক শিশুদের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর; এটি মেথহেমোগ্লোবিনেমিয়া (methemoglobinemea) নামক একটি শিশুরোগ সৃষ্টি করে। শিশুদের পানীয় পানিতে আয়নটি তাই 10 ppm এর বেশি থাকা উচিত নয়। নাইট্রাইট (NO_2^-) পানীয় পানিতে কদাচিৎ 0.1 ppm এর বেশি উপস্থিত থাকে।

প্রাকৃতিক পানিতে অম্ল, ক্ষার ও লবণের দূষণ: জলজ প্রাণী pH এর চরম অবস্থা সহ্য করতে পারে না। এমনকি যে লবণাক্ততায় জলজ প্রাণী অভ্যস্ত নয় সেখানেও তারা বাঁচতে পারে না। তাই, দেখা যায় টাটকা পানির মাছ সমুদ্রে পড়লে মারা যায় এবং সামুদ্রিক মাছের পক্ষে টাটকা পানি সহ্য করা কষ্টকর হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। পদার্থের আয়ন/ অণু কোষ ঝিল্লি অতিক্রম করে কোষের ভিতরে ঢোকে অথবা কোষ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। আস্রাবণ প্রক্রিয়ায় (osmosis) ঘটনাটি ঘটে। জলজ জীব পারিপার্শ্বিক যে pH কিংবা লবণাক্ততার মাঝে থাকে জীবের কোষ যদি তাতে অনভ্যস্ত হয়, তাহলে আস্রাবন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং জীব তখন উপরিউক্ত পরিণতির শিকার হয়। উল্লেখ্য, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ের জন্য pH ও লবণাক্ততার একটি ব্যাপ্তি থাকে যার মাঝে এরা বেঁচে থাকতে পারে। তবে, ব্যাপ্তির প্রান্তীয় অঞ্চলে এরা বেঁচে থাকলেও বিস্তার লাভ করতে পারে না।

পানিতে অম্ল দূষণ যেসব কারণে সৃষ্টি হয় তাদের মাঝে খনির অম্ল নিষ্কাশন (acid mine drainage) সাধারণ একটি ঘটনা। পাইরাইট (FeS_2) কিংবা অন্য যে কোনো সালফাইড-খনিজের সালফার জীবাণুর অনুঘটনে সালফেটে (SO_4^{2-}) এবং ফেরাস ফেরিক আয়নে জারিত হয়। সালফেট ও ফেরিক আয়ন উভয়ে পানির সংস্পর্শে অম্ল সৃষ্টি করে, খনি থেকে ধৌত হয়ে একসময় যা প্রাকৃতিক জলাধারে মেশে এবং অম্ল দূষণ ঘটায়:

$$2FeS_2 + 2H_2O + 7O_2 \xrightarrow{[\text{জীবাণু}]} 2Fe^{2+} + 4SO_4^{2-} + 4H^+$$

$$2Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ \longrightarrow 4Fe^{3+} + 2H_2O$$

$$Fe^{3+} + 3H_2O \longrightarrow Fe(OH)_3\,(s) + 3H^+$$

উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় জলাধারের পানি এতই অম্লীয় হয় যে, pH 3.0 পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। একমাত্র অনুঘটক-জীবাণু ছাড়া অন্যসব জলজ প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের জন্য পানির ঐরূপ অম্লীয় অবস্থা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। শিল্প-কারখানার বর্জ্যও অনেকসময় প্রাকৃতিক পানিতে অম্ল দূষণ সৃষ্টি করে।

কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলে SO_2 এর প্রাচুর্য যদি দূষণ মাত্রায় অবস্থান করে তাহলে সেখানে প্রাকৃতিক পানিতেও অম্ল দূষণ সৃষ্টি হতে পারে। বায়ুমণ্ডলে SO_2 এর যে দূষণ ঘটে, ভূ-পৃষ্ঠে জীবাশ্ম জ্বালানির দহন এবং সালফাইড আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন

তার প্রধান দুটি উৎস। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন SO_2 কে SO_3 এ জারিত করে এবং SO_3 গ্যাস জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে H_2SO_4 অ্যাসিডে পরিণত হয় যা অম্ল-বৃষ্টি আকারে একসময় ভূ-পৃষ্ঠ ও জলাধারে নেমে আসে। ঐসময় জলাধারে যদি চুনাপাথরের মতো কোনো ক্ষারীয় পদার্থ না থাকে তাহলে পানির pH বিপজ্জনক স্তরে নেমে যেতে পারে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বহুস্থানে হ্রদের পানিতে অম্ল-বৃষ্টির মিশ্রণ ইতিপূর্বে বহুবার ঘটেছে এবং এখনো ঘটে চলেছে। ফলে, হ্রদগুলোতে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে - কোথাও হ্রদ মাছ শূন্য হয়ে পড়ছে আবার কোথাও হ্রদের পানিতে বিশেষ বিশেষ কিছু প্রজাতির মাছ বিস্তার লাভ করতে পারছে না।

পানির ক্ষার-দূষণে মানুষের তেমন কিছু ভূমিকা থাকে না। মৃত্তিকা ও খনিজ স্তর যদি ক্ষারীয় হয় তাহলে সেখানে প্রাকৃতিক পানির ক্ষারত্ব বা pH সাধারণত উঁচুতে অবস্থান করে। জলাশয়ের পানি খুব বেশি ক্ষারীয় হলে জলাশয়ের কূলে লবণের সাদা একটি দাগ পড়ে।

প্রাকৃতিক জলাধারের পানি যখন উচ্চমাত্রায় লবণাক্ত হয় তখন তার জন্য মানুষের ক্রিয়াকর্মই প্রধানত দায়ী থাকে; ঐ সময় শিল্পকারখানার কিংবা মানুষের সৃষ্টি এমন কোনো বর্জ্য পানিতে মেশে যাতে পানির লবণাক্ততা বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, নাপথা থেকে তেল সংগ্রহ করার পর Na_2SO_4- সমৃদ্ধ যে 'অবশেষ' সৃষ্টি হয় তা যদি প্রাকৃতিক পানিতে মেশে তাহলে পানি লবণাক্ত হয়ে যেতে পারে।

৩.২.৩ প্রাকৃতিক পানিতে তলানি (sediments) : প্রাকৃতিক পানিতে তলানি প্রধানত ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা থেকে আসে; মৃত্তিকা ক্ষয় হয়ে প্রাকৃতিক পানিতে যুক্ত হয়। মৃত্তিকার ক্ষয় বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে; যেমন, বায়ু ও পানি-প্রবাহ, জমির চাষাবাদ, খনি খনন, নির্মাণকাজ প্রভৃতি। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, প্রতি হাজার বছরে মহাদেশসমূহ তার 5.8 cm পুরু একটি স্তর হারায় এবং প্রতি বছর প্রায় 2.26×10^{10} মেট্রিক টন মৃত্তিকা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সমুদ্র ও জলাধারে নেমে যায়। এতে প্রায় অর্ধ কোটি টন NPK সার (নাইট্রোজেন, ফসফসরাস ও পটাশিয়াম) ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকা প্রতি বছর হারায়। অর্থাৎ, ভুমিক্ষয়ের ফলে একদিকে যেমন কৃষিজমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে অপরদিকে আবার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাধারে (বাঁধ দ্বারা সৃষ্ট জলাধার) পলি জমা পড়ছে। শেষোক্ত ঘটনাটি জলাধারের পানি-ধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং সেচ ব্যবস্থায় হুমকি সৃষ্টি করে।

মৃত্তিকার সূক্ষ্ম কণা পানির মাঝে ভেসে থাকে বলে পানির স্বচ্ছতা হ্রাস পায় এবং সূর্যালোক জলাধারের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। ঐরূপ অবস্থায় জলাধারের তলদেশে যেসব উদ্ভিদ থাকে তাদের সালোকসংশ্লেষণ তথা অক্সিজেন উৎপাদন ব্যহত হয়। জলাধারের তলানিতে বিপুল পরিমাণ জৈব বস্তু মিশ্রিত থাকে। জীবাণুর অনুঘটনে

সেগুলোরও জারণ ঘটে (O_2 গৃহীত হয়) । এসব ঘটনায় জলাধারের তলদেশে অক্সিজেনের এমন ঘাটতি সৃষ্টি হয় যে, তাতে একদিকে তলদেশে বসবাসকারী চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি খোলাওয়ালা মাছ, প্রবালকীট ও অন্যান্য বায়ুজীবী জলজ প্রাণী অক্সিজেনের অভাবে মারা যায় অন্যদিকে আবার অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে কিছু কিছু জৈব ও অজৈব পদার্থ থেকে সেখানে (জলাশয়ের তলদেশে) H_2S, NH_3, CH_4 প্রভৃতি বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়।

সাধারণ মৃত্তিকার তুলনায় জলাশয়ের তলানিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। ঐসব জৈব পদার্থের মাঝে বিরাট একটি ভগ্নাংশ থাকে যা আয়ন বিনিময় করতে পারে; যেমন হিউমিক পদার্থ। এরা আয়ন-বিনিময় প্রক্রিয়ায় পানি থেকে Cu, Co, Ni, Mn, Cr, Mo প্রভৃতি ট্রেস ধাতু তুলে নেয়। ফলে, জলাশয়ের তলানি ঐসব ট্রেস ধাতুর এক বিশাল ভাণ্ডারে পরিণত হয় এবং পানি দূষণের দীর্ঘস্থায়ী একটি উৎস হিসেবে কাজ করে। তলানি যে পানি থেকে ট্রেস ধাতু তুলে নেয় তার হিতকর একটি দিকও আছে। পানি ঐসব ধাতুর দূষণ থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত হয়। যাহোক, পানিতে যেসব বস্তুকণা (পলি, কয়লার গুড়া প্রভৃতি) ভেসে থাকে তা মাছের স্বাভাবিক জীবনধারণে ব্যাঘাত ঘটায়। মাছের কানকুয়ার (gill) মাঝে তারা ঢুকে পড়ে যাতে মাছের শ্বাস কষ্ট সৃষ্টি হয়।

৩.২.৪ প্রাকৃতিক পানিতে তাপীয় দূষণ (thermal pollution): প্রাকৃতিক পানিতে তাপীয় দূষণ ঘটে প্রধানত কয়লা অথবা নিউক্লিয় জ্বালানিভিত্তিক 'পাওয়ার প্লান্ট' থেকে। তাপীয় শক্তিকে কাজে রূপান্তরিত করার যে কোনো প্রযুক্তিতে তাপীয় শক্তির অপচয় ঘটে। কয়লাভিত্তিক সর্বাধুনিক পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রেও তাপকে কাজে রূপান্তর করার দক্ষতা 40% এর বেশি হয় না। পাওয়ার প্লান্টের যন্ত্রাংশ (কনডেন্সার কয়েল) ঠাণ্ডা করার জন্য জলাধার থেকে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রাংশ থেকে তাপ গ্রহণ করার পর উত্তপ্ত পানি আবার জলাধারে ফিরে যায়। ফলে, জলাধারে পানির তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে; এতে পানির D.O. হ্রাস পায় এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পাওয়ার প্লান্ট নিউক্লিয় জ্বালানি-নির্ভর হলে বহির্গামী উত্তপ্ত পানিতে তেজস্ক্রিয়তাও কিছু প্রবেশ করে এবং বছরের পর বছর এভাবে চলার ফলে জলাধারে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বেড়ে গিয়ে একদিন তা বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে যেতে পারে। যাহোক, প্রাকৃতিক পানিকে তাপীয় দূষণ থেকে রক্ষা করতে হলে এমন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে যাতে পানিবাহিত তাপশক্তি জলাধারে প্রবেশ না করে।

৩.৩ পেস্টিসাইড (pesticide)

পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ প্রজাতির কীট-পতঙ্গ বাস করে। জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মোট যে প্রজাতি সংখ্যা তার তুলনায় কীট-পতঙ্গের প্রজাতি সংখ্যা অনেক বেশি। বিশাল সংখ্যক ঐ কীট-পতঙ্গের মাঝে অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ আছে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর

- হয় তারা শস্যের ক্ষতি করে অন্যথায় রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে বা রোগের বিস্তার ঘটায়। কীট-পতঙ্গ ছাড়া কিছু লতাগুল্মও (weed) আছে, যেগুলো শস্যের জন্য ক্ষতিকর। পেস্টিসাইড এক শ্রেণীর জৈব পদার্থ যা উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর জন্য ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ ও লতাগুল্মকে ধ্বংস করে অথবা তাদের বিস্তার রোধ করে। এ পর্যন্ত দশ হাজারেরও বেশি পেস্টিসাইড সংশ্লেষিত হয়েছে; বিশাল সংখ্যক ঐ পেস্টিসাইডকে সাধারণ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন.

১. **কীটপতঙ্গনাশক** (insecticide) : শস্যের জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে ধ্বংস করে;

২. **লতাগুল্মনাশক** (herbicide) : অবাঞ্ছিত লতাগুল্ম ধ্বংস করে;

৩. **ছত্রাকনাশক** (fungicide) : ছত্রাক ও গাছপালার রোগ নিয়ন্ত্রণ করে।

এছাড়াও বিশেষ বিশেষ কিছু পেস্টিসাইড আছে যেগুলো ইঁদুর জাতীয় তীক্ষ্ণদন্তী (rodent) প্রাণীকে ধ্বংস করে।

পেস্টিসাইডের ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। ঐ সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যেসব পদার্থ পেস্টিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত হতো সেগুলো ছিল প্রধানত আর্সেনিকঘটিত অজৈব পদার্থ; যেমন, লেড আর্সেনেট, ক্যালসিয়াম আর্সেনেট, কপার অ্যাসিটো আর্সেনেট (প্যারিস গ্রীন) প্রভৃতি। তাছাড়া, সোডিয়াম ফ্লোরাইড ও ক্রাইওলাইটও (সোডিয়াম ফ্লোঅ্যালুমিনেট) এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। আর্সেনিক মানুষ ও জীবজন্তুর জন্যও তীব্র একটি বিষ বলে পেস্টিসাইড হিসেবে এখন আর্সেনিক যৌগের ব্যবহার খুবই সীমিত। বর্তমানে যেসব পদার্থ পেস্টিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো প্রায় সব জৈব শ্রেণীর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় DDT এর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে (১৯৪৫) জৈব পেস্টিসাইডের যাত্রা শুরু। রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে জৈব পেস্টিসাইডকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা: ক্লোরিনযুক্ত (chlorinated) হাইড্রোকার্বন, জৈব ফসফটে, কার্বামেট ও ক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিড। এদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী দুটি প্রধানত কীটপতঙ্গনাশক, তৃতীয় শ্রেণীটি কীটপতঙ্গনাশক এবং চতুর্থ শ্রেণীটি লতাগুল্মনাশক। সচরাচর ব্যবহৃত হয়, বিভিন্ন শ্রেণীর এমন কিছু পেস্টিসাইডের রাসায়নিক গঠন, ব্যবহার এবং পরিবেশের জন্য সহনীয় মাত্রা সারণিতে (সারণি ৩.২) প্রদান করা হলো।

পেস্টিসাইড-ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন: ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন শ্রেণী থেকে সংশ্লেষিত জৈব পেস্টিসাইডের যাত্রা শুরু। এই শ্রেণীর আটশোরও বেশি পেস্টিসাইড সংশ্লেষিত হয়েছে। DDT(ডাইক্লোরোডাইফিনাইলট্রাইক্লোরোইথেন) ও বাণিজ্যিক নামে প্রচলিত এলড্রিন, ডাই-এলড্রিন, ক্লোরডেন, লিনডেন, এনড্রিন, হেপ্টাক্লোর প্রভৃতি এই শ্রেণীর এক একটি পেস্টিসাইড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মশা, মাছি প্রভৃতি জীবাণুবাহক কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে DDT প্রথম (১৯৪৫) ব্যবহৃত হয়। এক

সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, পেস্টিসাইডটি ঐ সময় এক দশকের মাঝে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে এবং প্রায় দশ কোটি লোককে ম্যালেরিয়া, টাইফাস, আমাশয় প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করেছে।

একটি পেস্টিসাইড টার্গেট এর প্রতি যেভাবে ক্রিয়া করে তা DDT এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান করা হয়েছে। টার্গেট এর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র DDT এর আক্রমণ স্থান। পেস্টিসাইডটি চর্বিকলায় (lipid tissue) দ্রবীভূত হয় এবং স্নায়ুকোষের চারদিকে চর্বি ঝিল্লির মাঝে সঞ্চিত থাকে; এতে স্নায়ুতন্ত্রের প্রেরণা সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হয় এবং পুরো স্নায়ুতন্ত্র অচিরে অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে টার্গেট এর মৃত্যুঘটে। ক্লোরিনযুক্ত আর যেসব পেস্টিসাইড আছে সেগুলোও DDT-এর মতো একইভাবে কাজ করে।

পেস্টিসাইড - জৈব ফসফেট : ১৯৪৭ এর পর থেকে আজ পর্যন্ত দশ হাজারেরও বেশি জৈব ফসফেট সংশ্লেষিত হয়েছে যার প্রত্যেকটি পেস্টিসাইড হিসেবে কমবেশি কার্যকর। প্যারাথিয়ন ও মিথাইল প্যারাথিয়ন জৈব ফসফেট শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য দুটি পেস্টিসাইড। জৈব ফসফেট পেস্টিসাইড রাসায়নিকভাবে সক্রিয়। এরা সহজে বিভাজিত হয় এবং মাটিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। কোনো কোনো যৌগ আবার মানুষ ও উষ্ণ রক্তবাহী স্তন্যপায়ী জীবে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

টার্গেট এর প্রতি জৈব ফসফেট এর ক্রিয়া করার যে কৌশল তা অনেকটা DDT এর অনুরূপ। কোলিনস্টিয়ারেজ ও কিছু কিছু ফিনাইলস্টিয়ারেজ এনজাইম স্নায়ুতন্ত্রের প্রেরণা সঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফসফেট ঐসব এনজাইমের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে তাদের ক্রিয়া বন্ধ করে দেয় ফলে টার্গেট-এর মৃত্যু ঘটে।

পেস্টিসাইড - কার্বামেট : কার্বামেট বিশেষ বিশেষ টার্গেট-এর ক্ষেত্রে কার্যকর এক শ্রেণীর পেস্টিসাইড, কার্বারিল (সেবিন) এই শ্রেণীর প্রথম পেস্টিসাইড। ১৯৫০ সালে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় এবং সারা পৃথিবীতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কার্বামেট শ্রেণীর অন্তর্গত আর যেসব পেস্টিসাইডের ব্যবহার ব্যাপক তাদের মাঝে অ্যামিনোকার্ব (aminocarb), বেনডিওকার্ব (bendiocarb), বাইগন (baigon), ডাইমেটিলন (di-metilon), ডাইঅক্সাকার্ব (dioxacarb), মেথিওকার্ব, (methiocarb), প্রোমকার্ব (promecarb), এলডিকার্ব (LDcarb), কার্বোফিউরান (carbofuran), মেথোমাইল (methomile), অক্সামাইল (oxamile), প্রিমিকার্ব (primicarb), থাইওফেনক্স (thiophenox) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জৈব ফসফেট এর মতো কার্বামেটও কোলিন (cholinesterage) বিদ্বেষী। কার্বারিল কোলিনস্টিয়ারেজ এনজাইমের ক্রিয়াই কেবল বন্ধ করে না, এলিস্টিয়ারেজ

এনজাইমের ক্রিয়াও বন্ধ করে দিতে পারে তবে এনজাইমের সাথে ফসফেটের যে বন্ধন ঘটে তার তুলনায় কার্বামেটের বন্ধন অনেক বেশি উভমুখী বলে মনে হয়।

সারণি ৩.২: প্রচলিত কিছু পেস্টিসাইড।

বাণিজ্যিক নাম	ফর্মুলা	প্রয়োগ	টাটকা পানিতে সহনীয় মাত্রা, μg/L
শ্রেণী: ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন			
অ্যালড্রিন	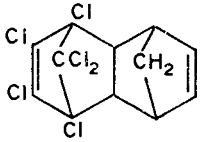	পিঁপড়ে, গুবরে পোকা ও তুলার জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে। EPA কর্তৃক (1975) অধিকাংশক্ষেত্রে নিষিদ্ধ।	0.003
ডাই অ্যালড্রিন / এনড্রিন (সমানু)	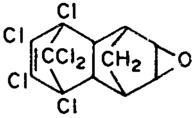	একই	0.003
ক্লোরডেন	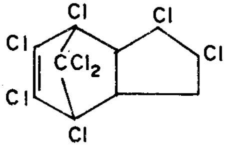	ঘুনপোকা, উইপোকা ধ্বংস করে, সন্দেহজনক ক্যান্সার সৃষ্টিকারক, EPA কর্তৃক নিষিদ্ধ।	0.01
লিনডেন	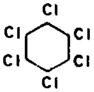	তুলার ক্ষতিকর কীট ও ধানগাছ ছিদ্রকারী কীট ধ্বংস করে।	0.01
ডিডিটি	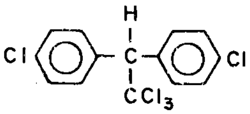	তুলা, সয়াবিন, চিনাবাদাম এর জন্য ক্ষতিকর বহু প্রকার কীটপতঙ্গ মশামাছি ধ্বংস করে। দুর্বিনাশী; খাদ্যদ্রব্যও জীবদেহে সঞ্চিত হয়, প্রয়োগ EPA কর্তৃক সীমিত।	0.001

মেথক্সিক্লোর	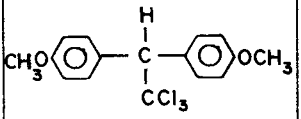	DDT এর বিকল্প, জৈবিক বিনাশী, স্তন্যপায়ীদের জন্য কম বিষাক্ত।	0.03
টক্সাফেন	ক্যামফিনের ক্লোরোডেরিভেটিভ এর মিশ্রণ।	শস্য ও গবাদি পশুর জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে; সন্দেহজনক ক্যান্সার সৃষ্টিকারক।	5
হেপ্টাক্লোর	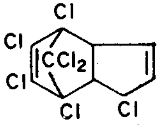	মৃত্তিকার ক্ষতিকর কীটধ্বংস করে; সন্দেহজনক ক্যান্সার সৃষ্টিকারক; প্রয়োগ EPA কর্তৃক নিষিদ্ধ।	0.001
শ্রেণী : জৈব ফসফেট			
ম্যালাথিয়ন	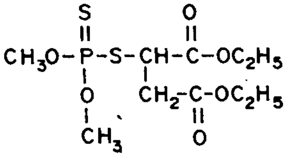	কিছু ফল ও শাকসবজির জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে; স্তন্যপায়ীদের জন্য কম ক্ষতিকর।	0.1
ইথাইল প্যারাথিয়ন	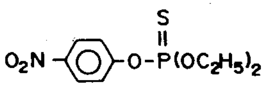	মশার শুয়াপোকা নিয়ন্ত্রক, ফল ও শাকসবজির জন্য ক্ষতিকর বহু কীটধ্বংস করে।	0.015
মিথাইল প্যারাথিয়ন	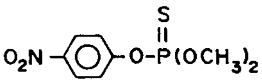	উদ্ভিদের ক্ষতিকর কীট ধ্বংস করে।	—
ডায়াজিনোন	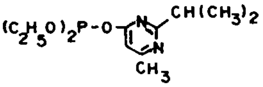	ফল ও শাকসবজির ক্ষতিকর কীট ধ্বংস করে।	—

শ্রেণী : কার্বামেট			
কার্বারিল (সেভিন)	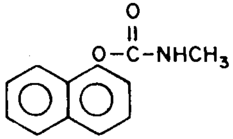	তুলা, গবদিপশুর খাদ্য, ফল, শাকসবজি, বাগান ও উঠানের ছত্রাক, লতাগুল্ম, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে; স্তন্যপায়ীর জন্য কম ক্ষতিকর।	
বেগন	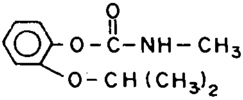	মশা, মাছি, পিঁপড়ে ও তেলাপোকা নিয়ন্ত্রণ করে।	
ডাইমেটিল্যান	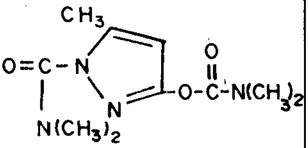	বাড়ির ও ফলের মাছি নিয়ন্ত্রণ করে।	
শ্রেণী : ক্লোরোফেনক্সি এসিড			
2,4-D	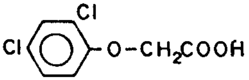 2,4-ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক এসিড	গুল্ম ও খনিজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করে।	100
2,4,5-T	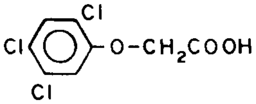 2,4,5-ট্রাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক এসিড	গুল্ম নিয়ন্ত্রণ করে।	

পেস্টিসাইড ও পরিবেশ : পেস্টিসাইড একদিকে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও লতাগুল্ম ধ্বংস করে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। অন্যদিকে আবার, বহু উপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে মানুষের প্রভূত ক্ষতিও করে। পরিবেশের ক্ষতি করার ব্যাপারে হ্যালোজেনযুক্ত হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর

পেস্টিসাইড (যেমন, DDT, এনড্রিন প্রভৃতি) সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। কেননা, এই শ্রেণীর পেস্টিসাইড সাধারণভাবে দুর্বিনাশী (persistent); টার্গেটে ব্যবহার করার পর বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় এরা প্রকৃতিতে অবস্থান করে। ঐ সময় পানি ও বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে বহু দূর দূরান্তে এরা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বায়ু, মাটি ও পানির দূষণ ঘটায়। এক বিশ্লেষণে DDT এর ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে, পেস্টিসাইডটির মোট যে পরিমাণ টার্গেটে ব্যবহার করা হয় তার প্রায় 25% কালক্রমে সমুদ্রের পানিতে স্থান পায়। এর আবার একটি ভগ্নাংশ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ হয়ে খাদ্যশিকলের শেষপ্রান্তে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। উক্ত স্থানান্তর প্রক্রিয়ার ধাপে ধাপে পদার্থটির ঘনীভবন চলতে থাকে; যেমন, পানির 10^{-6} ppm DDT শিকারি পাখির দেহ পর্যন্ত যখন পৌঁছে তখন সেখানে এর ঘনীভবন ঘটে প্রায় এক কোটি গুণ (ঘনমাত্রা 5 - 10 ppm)।

বিষক্রিয়ার মাত্রা এক এক পেস্টিসাইডের এক এক প্রকার; যেমন, 0.6 μg/L এনড্রিন একটি জলাশয়ের মাছ 50% পর্যন্ত ধ্বংস করতে পারে, যেখানে সমমাত্রার ক্রিয়া ঘটাতে বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড প্রয়োজন হয় প্রায় 800 μg/L অর্থাৎ শেষোক্তটির তুলনায় প্রথমোক্তটির বিষক্রিয়া প্রায় হাজার গুণ বেশি তীব্র। এনড্রিন আমাদের দেশে কৃষকেরা তাদের কৃষিজমিতে ব্যবহার করে থাকেন এবং না জানার কারণে এনড্রিনের পাত্র পুকুরের পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করেন; এতে অনেক সময় পুকুরের মাছ মারা যেতে দেখা যায়।

পেস্টিসাইডের স্বাভাবিক প্রয়োগে পরিবেশের যে দূষণ ঘটে তার মাত্রা সাধারণত কম থাকে। তবে, পেস্টিসাইড উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখন পরিবেশে যে দূষণ সৃষ্টি হয় তার তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব মারাত্মক আকার ধারণ করে। পেস্টিসাইডের ইতিহাসে এমন ছোট বড় দুর্ঘটনা বহু ঘটেছে, যার মাঝে আমেরিকার 'হোপওয়েল দুর্ঘটনা' (১৯৭০), ইটালির 'সেভোসো দুর্ঘটনা' (১৯৭৬) এবং ভারতের ভূপালরাজ্যে 'ইউনিয়ন কার্বাইড দুর্ঘটনা' (১৯৮৪) (পরিচ্ছেদ ১.৩ দ্রষ্টব্য) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. হোপওয়েল কোপেন দুর্ঘটনা: কোপেন (Kopen) এক প্রকার কীটনাশক, যা তামাকের সুতাপোকা, পিঁপড়ে, তেলাপোকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গ দমনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাখি, তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণী (rodent; যেমন, ইঁদুর) ও মানুষের উপরও এটি তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যান্সার সৃষ্টিকারক বলেও একে সন্দেহ করা হয়। আমেরিকার ভার্জিনিয়া রাজ্যের হোপওয়েল (Hopewell) নগরীতে কোপেন উৎপাদনের কারখানা থেকে ১৯৭০ এর মাঝামাঝি এক ভয়াবহ দুর্যোগের সূচনা হয়। কারখানাটির বর্জ্য-নিষ্কাশন ব্যবস্থা শহরের নর্দমা

সিস্টেমের সাথে যুক্ত ছিল। কারখানাটিতে উৎপাদন শুরু হওয়ার পর এক বছরের মাঝে তা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মেট্রিক টন বর্জ্য নর্দমায় যুক্ত হয় যা একসময় কেসাপেক (Chesapeake) উপসাগরে গিয়ে পড়ে এবং পানিতে মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করে। এর ফলে, উপসাগরের পানিতে মৎস সম্পদ ধ্বংস হয়, অন্যান্য বহু জলজ জীবের প্রাণহানি ঘটে এবং শ্রমিকরাও নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত কারখানাটি উৎপাদন শুরু হওয়ার মাত্র ষোল মাস পরই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

২. সেভোসো TCDD দুর্ঘটনা: 2,3,7,8-টেট্রাক্লোরোডাইবেনজো-10-ডাইঅক্সিন (সংক্ষেপে TCDD) তীব্র বিষাক্ত একটি পদার্থ (m.p. 305°C); 2,4,5-ট্রাইক্লোরোফেনল থেকে উচ্চতাপে এটি সৃষ্টি হতে পারে। 2,4,5-ট্রাইক্লোরোফেনল লতাগুল্মনাশক, 2,4,5-ট্রাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটেট (সংক্ষেপে, 2,4,5-T) উৎপাদনের একটি উপাদান। ইটালির সেভেসো নগরীতে একটি কারখানায় 2,4,5-ট্রাইক্লোরোফেনল উৎপাদিত হতো (১৯৭৬)। দুর্ঘটনার দিন কারখানার তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ত্রুটি. ঘটে। ফলে বিক্রিয়া-পাত্রের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায় এবং পাত্রে ডাইঅক্সিন গ্যাস উৎপন্ন হতে থাকে। গ্যাসের চাপে একসময় বিক্রিয়া-পাত্রে বিস্ফোরণ ঘটে এবং ডাই-অক্সিন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্থূল এক হিসাবের সাহায্যে দেখানো হয়েছে, উক্ত দুর্ঘটনায় প্রায় 13-kg TCDD উৎপন্ন হয় যা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মাটি, দালানকোঠা, গাছপালা, প্রভৃতি সবকিছুকে বিষের আস্তরণে ঢেকে দেয়। ইটালি সরকার ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে চরম আক্রান্ত অঞ্চল থেকে সকল লোকজন অন্যত্র সরিয়ে নেয়; তা সত্ত্বেও প্রায় দুশ নগরবাসী চর্মরোগে এবং কেউ কেউ যকৃতের ব্যাধিতে ভোগে। দুর্ঘটনার পর সে অঞ্চলে যেসব শিশু জন্ম গ্রহণ করে তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ (প্রায় 1%) বিকলাঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা, সেভেসো নগরীতে ডাই-অক্সিনের যে দূষণ ঘটেছিল তার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং জৈবিক-চক্রের স্বাভাবিক যে ধারা তা ব্যহত হতে থাকেবে।

প্রকৃতিতে পেস্টিসাইডের বিভাজন: পেস্টিসাইড সাধারণত বাতাসে স্প্রে করে এবং গাছের পাতার উপর অথবা সরাসরি মাটিতে কিংবা পানিতে গুঁড়া ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োগ করার পর থেকেই প্রকৃতিতে পেস্টিসাইডের বিভাজন ঘটতে থাকে। এক এক পেস্টিসাইডের বিভাজন হার (rate) ও কৌশল (mechanism) এক এক প্রকার। তবে, সাধারণত জারণ, বিজারণ ও জলান্বয়ন প্রক্রিয়ায় বিভাজন ঘটে এবং সূর্যালোক ও আণুবীক্ষণিক জীব(যেমন, ব্যাকটেরিয়া ও ফাংগাস) তাতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বস্তুত, পেস্টিসাইড বিভাজনে আণুবীক্ষণিক জীবের ভূমিকা এত ব্যাপক যে, প্রক্রিয়াটিকে সাধারণভাবে 'জৈবিক বিভাজন' (bio-degradation) বলা হয়ে থাকে। যাহোক, সকল শ্রেণীর সংশ্লেষিত জৈব পেস্টিসাইডের মাঝে ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন-পেস্টিসাইডের বিভাজন হার সবচেয়ে কম। নিচে বিভিন্ন শ্রেণীর কিছু পেস্টিসাইডের বিভাজন কৌশল প্রদান করা হলো।

১. জৈব ক্লোরিন পেস্টিসাইড (organochlorine pesticide):
(আণুবীক্ষণিক জীব সকল ধাপে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে)

ক 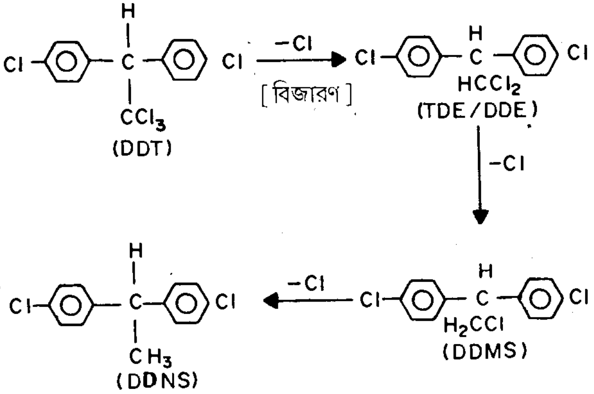

খ 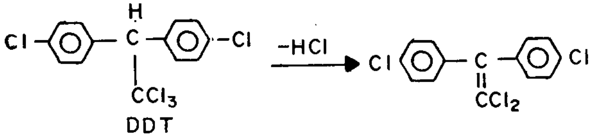

গ 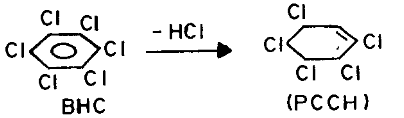

২। সাইক্লোডাইন পেস্টিসাইড

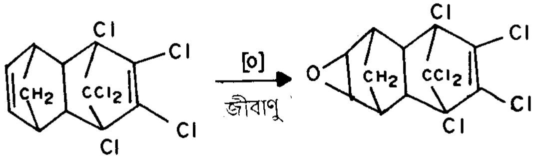

এলড্রিন এনড্রিন

৩. জৈব ফসফেট পেস্টিসাইড

ক. $$RO-\overset{\overset{O}{\|}}{P}-X + H_2O \xrightarrow{[O]} PO_4^{3-} + ROH$$

খ. 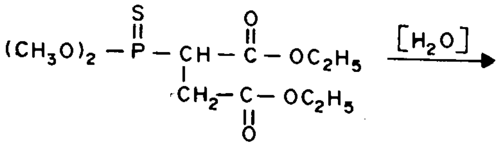

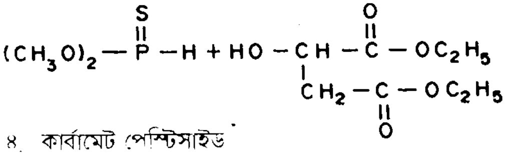

৪. কার্বামেট পেস্টিসাইড

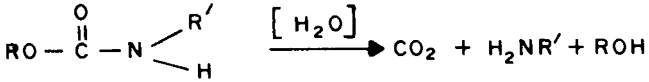

পেস্টিসাইড বিভাজনে আণুবীক্ষণিক জীবের প্রভাবন ক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পেস্টিসাইড যৌগের ফর্মুলা এবং প্রভাবক জীবের প্রকারভেদে বিভাজনের হার ও কৌশল ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, 2,4-D শ্রেণীর (2,4-ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যালকাইলকার্বোক্সাইলক অ্যাসিড) পেস্টিসাইডের কথা ধরা যাক। 2,4-D-এক শ্রেণীর লতাগুল্মনাশক। অ্যাসিটেট, বিউটারেট ও α- প্রোপিওনেট এই শ্রেণীর তিনটি যৌগঃ

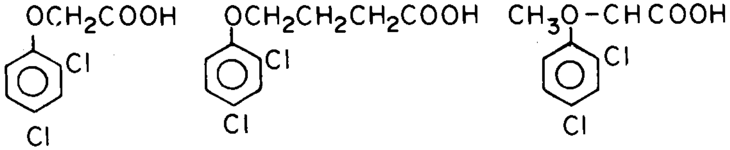

পদার্থ তিনটির মাঝে অ্যাসিটেট ও বিউটারেট মৃত্তিকার অনভ্যস্ত (nonacclimated) ব্যাকটেরিয়া ও ফাংগাস দ্বারা পনেরো দিনের মাঝে বিভাজিত হয়। তবে, প্রোপিওনেটের কোনো বিভাজন ঐ সময়ের মাঝে ঘটে না। উক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে পদার্থগুলোর রাসায়নিক গঠনের সাথে তাদের জৈবিক বিভাজনীয়তার নিম্নরূপ একটি সম্পর্ক প্রদান করা হয়েছেঃ

ক. ফ্যাটি-অ্যাসিড গ্রুপ বেনজিন চক্রের যে বিন্দুতে যুক্ত থাকে, তার সাপেক্ষে মেটাস্থানে (m-) Cl যুক্ত থাকলে পদার্থটির বিভাজন খুব মন্থর হয়।

খ. ফ্যাটি-অ্যাসিড শিকলের যে প্রান্তে -COOH গ্রুপ যুক্ত তার বিপরীত প্রান্ত ফেনক্সি গ্রুপের সাথে যুক্ত থাকলে পদার্থের জৈবিক বিভাজন দ্রুত হয়। পক্ষান্তরে -COOH এর α স্থানের C- (কার্বন) ফেনক্সি গ্রুপের সাথে যুক্ত থাকলে (α প্রোপিওনেট) তার জৈবিক বিভাজন ঘটে না বললে চলে।

যাহোক, 2, 4-D শ্রেণীর পেস্টিসাইড, $Cl_2\phi\text{-}O\text{-}(CH_2)_xCOOH$, $x = 2\text{-}7$, নোকারডিয়া নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিভাজিত হলে $Cl_2\text{-}\phi\text{-}O\text{-}(CH_2)_{x-2}COOH$ অবশেষ হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু যৌগটির যখন 'ফ্লেভোব্যাকটেয়িার' অনুঘটনে বিভাজন ঘটে তখন সেখানে কোনো প্রকার অ্যারোমেটিক ভগ্নাংশ অবশিষ্ট থাকে না। ধারণা করা হয়, 'নোকারডিয়া' ফ্যাটি অ্যাসিডে -COOH এর β কার্বনে বিভাজন ঘটায় এবং দুটি কার্বন অপসারিত হয়। অন্যদিকে 'ফ্লেভোব্যাকটেরিয়া' প্রথম ধাপে ফেনক্সি

বিন্দুতে বিভাজন ঘটায় এবং সম্পূর্ণ ফ্যাটি অ্যাসিডকে অক্ষত রাখে। পরবর্তী ধাপে বেনজিন চক্র ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিভাজিত হয়:

নোকারডিয়া : $Cl_2\phi\text{-}O\text{-}(CH_2)_xCOOH + 3O_2 \rightarrow Cl_2\phi\text{-}O\text{-}(CH_2)_{x-2}COOH + 2CO_2 + 2H_2O$

ফ্ল্যাভোব্যাকটেরিয়াম : $Cl_2\phi\text{-}O\text{-}(CH_2)_xCOOH \rightarrow CH_3(CH_2)_{x-1}COOH + Cl_2\phi\text{-}OH$

$\downarrow$

বিভাজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ $\leftarrow HOOC\text{-}C{=}C(Cl)C{=}C\text{-}COOH \leftarrow Cl\phi(OH)_2 + Cl$

বহু পেস্টিসাইড আছে যেগুলোর বিভাজন ঘটতে একাধিক শ্রেণীভুক্ত জীবাণুর সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়। প্যারাথিয়ন এই শ্রেণীর একটি পেস্টিসাইড। এর জৈবিক বিভাজন শেষে হাইড্রোকুইনোন অবশিষ্ট থাকে। বেশ কয়েকটি শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া সম্মিলিতভাবে পেস্টিসাইডটির বিভাজন ঘটায়। ধারণা করা হয়, এরূপ বিভাজন প্রক্রিয়ায় এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া কাজ করে; অন্য শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া তাতে শক্তি যোগান দেয় (symbiotic)।

বর্তমান বিশ্বে যেসব ঘটনা পরিবেশ-দূষণে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে, পেস্টিসাইডের ব্যবহার তার অন্যতম। পেস্টিসাইডের উদ্ভাবক ও প্রস্তুতকারক একজন রসায়নবিজ্ঞানী। পরিবেশ দূষণের এই উপসর্গটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অনেকখানি দায়িত্ব তাই রসায়নিবিজ্ঞানীর উপর বর্তায়। নতুন নতুন পেস্টিসাইড উদ্ভাবনের সময় বিজ্ঞানীর তাই সতর্ক থাকা উচিত, পদার্থটি যেন প্রকৃতিতে দুর্বিনাশী না হয়। পেস্টিসাইড যিনি প্রয়োগ করেন তারও সতর্ক থাকা উচিত, পদার্থটির যথেচ্ছ ব্যবহার যেন না হয়। এতে তাৎক্ষণিক ফল যাই হোক, সুদূরপ্রসারী ফল এমন মারাত্মক হতে পারে যে, তার জন্য ব্যবহারকারীকে বহু মূল্য দিতে হতে পারে।

কীটপতঙ্গের পেস্টিসাইড প্রতিরোধঃ পেস্টিসাইডের প্রতি কীটপতঙ্গের প্রতিরোধ ক্ষমতা নতুন কোনো ঘটনা না । ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম জীব, সকলের শরীরে বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কিছু কিছু প্রাণরাসায়নিক উপাদান থাকে। জীব যখন আক্রান্ত হয় তখন প্রতিরোধী উপাদান সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা দেহের মাঝে গড়ে তোলে। DDT এর প্রতি মাছির যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তার উপর গবেষণা করে দেখা গেছে, পেস্টিসাইডটি মাছির দেহে প্রবেশ করার পর পরই এক প্রকার এনজাইম সেখানে সক্রিয় হয়ে ওঠে যা DDT কে নির্বিষ DDE-তে রূপান্তর করে DDT এর বিষক্রিয়া থেকে মাছিদের রক্ষা করে। বর্তমানে আরও একটি বিষয় গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কীটপতঙ্গের শরীরে এক প্রকার পেস্টিসাইডের প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে, ভিন্ন পেস্টিসাইডের প্রতিও সাধারণভাবে সে ক্ষমতা কমবেশি কার্যকর থাকছে। ফলে, পেস্টিসাইডের শ্রেণী পরিবর্তন করা হলেও তার কার্যকারিতা পুরোমাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে না। যাহোক, পেস্টিসাইড-প্রতিরোধী কীটপতঙ্গের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার একটি পরিসংখ্যান নিচে প্রদান করা হলো।

পেস্টিসাইড	প্রতিরোধী কীটপতঙ্গের প্রজাতি সংখ্যা	তথ্য প্রাপ্তির বছর
DDT (প্রথম প্রচলন ১৯৪৫)	১ (মাছি) ৯ ২০৩	১৯৪৭ ১৯৬৭ ১৯৭৫
চাক্রিক ডাইন	১৩৫ ২২৫	১৯৬৭ ১৯৭৫
জৈব ফসফেট	৫৪ ১৪৭	১৯৬৭ ১৯৭৫
কার্বামেট ও অন্যান্য	২০ ৭১	১৯৬৭ ১৯৭৫

সূত্র: Encyclopedia of Science and Technology, McGraw, 6^{th} Ed., V-9,12,13; 1987

একদিকে প্রচলিত পেস্টিসাইডের প্রতি কীটপতঙ্গের প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে রসায়নবিজ্ঞানীও নতুন নতুন পেস্টিসাইড উদ্ভাবন করে চলেছেন এবং ঐ দুই প্রতিযোগীর মাঝে পড়ে পরিবেশ আজ বিপন্ন। পরিবেশকে এরূপ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য পরিবেশ সচেতন বিজ্ঞানী কীটপতঙ্গ দমনের সমন্বিত একটি ব্যবস্থা (integrated pest management) গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সমন্বিত ব্যবস্থাপনা এমন একটি প্রকল্প যাতে কীটপতঙ্গ দমনের জন্য জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহারের পাশাপাশি আরও কিছু পদক্ষেপ থাকবে যেগুলো পরিবেশকে রক্ষাও করবে। কীটপতঙ্গ দমনের উদ্দেশ্যে জৈব পেস্টিসাইডের বিকল্প অথবা সহযোগী হিসেবে এ পর্যন্ত যেসব ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আশাব্যঞ্জক কিছু ফলাফলও পাওয়া গেছে তাদের মাঝে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো উল্লেখযোগ্য:

১. কীটপতঙ্গ নির্বীজকরণ (sterilisation) : বিপুল সংখ্যক কীটপতঙ্গকে তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা নির্বীজ করার পর পরিবেশে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে, নির্বীজ ও বন্য কীটপতঙ্গের যৌন মিলন ঘটে কিন্তু বংশবৃদ্ধি ঘটে না।

২. কীটপতঙ্গের হরমোন (Pheromone) **ল্যাবরেটরিতে সংশ্লেষণ ও তার প্রয়োগ** : ফেরোমোন জীবজন্তু কর্তৃক নিঃসৃত একশ্রেণীর হরমোন যার সাহায্যে একটি প্রাণী একই প্রজাতির অন্য একটি প্রাণীর কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়। ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত কীটপতঙ্গের ফেরোমোন (প্রধানত স্ত্রী প্রজাতির যৌন হরমোন) কীটপতঙ্গ আক্রান্ত অঞ্চলের একপ্রান্তে রেখে দিয়ে দেখা গেছে, একই প্রজাতির সকল কীটপতঙ্গ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ফেরোমোন সংরক্ষিত স্থানে জমা হয়। এতে কীটপতঙ্গের আক্রমণ বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে না।

৩.ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের প্রাকৃতিক কোনো শিকারি ব্যবহার : ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে শিকার করে, এমন ভিন্ন প্রজাতির কীটপতঙ্গ বা পাখি বহুসংখ্যায় আক্রান্ত অঞ্চলে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে, শিকারি ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে খেয়ে তাদের সংখ্যা সীমিত রাখে।

উপরের পদ্ধতিগুলো পরিবেশের জন্য নিরাপদ। জৈব পেস্টিসাইডের বিকল্প কিংবা সহযোগী হিসেবে এ জাতীয় পদ্ধতির যত বেশি প্রসার ঘটানো যাবে, পরিবেশ তত বেশি দূষণমুক্ত থাকবে।

৩.৪ ডিটারজেন্ট (detergent)

ডিটারজেন্ট সাবানের মতো এক শ্রেণীর ময়লা পরিষ্কারক পদার্থ। 'ময়লা' বলে যে জিনিসটাকে বুঝানো হয় তা আসলে তেল-চর্বি মিশ্রিত ধূলিবালির একটি আস্তরণ। আস্তরণটি তৈলাক্ত বলে এটি পানিবিকর্ষী হয় এবং সাধারণ পানির সাহায্যে একে ময়লা বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে অপসারণ করা যায় না। সাবান ও ডিটারজেন্টের পরিষ্কারক উপাদান দীর্ঘ কার্বন শিকল-যুক্ত অম্লের সোডিয়াম লবণ। এ জাতীয় পদার্থের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য, এরা তল-সক্রিয় (surface–active)। এদের অপোলার হাইড্রোকার্বন শিকল ময়লার তেল-চর্বি মিশ্রণের মাঝে প্রবেশ করে বস্তুপৃষ্ঠ থেকে ময়লার আস্তরণকে পানিতে টেনে নামিয়ে আনে এবং কঠিনপৃষ্ঠকে ময়লা মুক্ত করে। তবে, ময়লা পরিষ্কারক হিসেবে সাবানের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। খর পানিতে (hardwater) এটি ভালো কাজ করে না। যে পানিতে সাবানের ফেনা সহজে সৃষ্টি হয় না তাকে ' খর ' পানি বলে। প্রধানত, Ca^{2+} ও Mg^{2+} এর জন্য পানিতে খরতা সৃষ্টি হয় এবং প্রাকৃতিক পানিতে আয়ন দুটি প্রায়ই উচ্চ পরিমাণে উপস্থিত থাকে (পানিতে আয়ন দুটির প্রাচুর্য 75 ppm এর বেশি হলে পানি খর হয়)। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন সাবানের উপাদান, ফ্যাটি অ্যাসিডের ($-COO^-$) সাথে বিক্রিয়া করে তাকে অদ্রবণীয় লবণে $[(RCOO)_2M$ $(M = Ca^{2+}, Mg^{2+})]$ রূপান্তর করে। ফলে, সাবানের স্বাভাবিক যে কার্যকারিতা তা লোপ পায় এবং ময়লা পরিষ্কার করতে তখন প্রচুর সাবান খরচ করা লাগে।

ডিটারজেন্টের পরিষ্কারক উপাদান রৈখিক অ্যালকাইল সালফেট (LAS = Linear Alkyl Sulfate) নামের একশ্রেণীর তল-সক্রিয় পদার্থ (যেমন, সোডিয়াম লরাইল সালফেট - $C_{12}H_{25}OSO_3^-Na^+$) । পানির খরতাজনিত যে সমস্যা সাবানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় তা এড়াবার জন্য ডিটারজেন্টে সোডিয়াম ট্রাইপলিফসফেট ($Na_5P_3O_{10}$) 'বিল্ডার' (builder) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পলিফসফেট পানির Ca^{2+} এর সাথে জটিল আয়ন গঠন করে একে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যাহোক, বাণিজ্যিক একটি ডিটারজেন্টের সাধারণ যে গঠন তা এরূপ: তল-সক্রিয় পদার্থ, 10-30%. পোলিফসফেট 25 - 40%, সোডিয়াম সিলিকেট (ক্ষয় প্রতিরোধক, corrosion resistant), 5-7%., অ্যামাইড (ফেনা স্থিতিকারক), 3 - 6%; কার্বোক্সিমিথাইল সেলুলোজ (ধূলিবালি বিচ্যুতকারক), 0.5 - 1.0%; সোডিয়াম সালফেট (লঘুকারক) 15 - 25% এবং পানি, 6 - 15% । প্রতিদিন গৃহকাজ ও মিল কলকারখানায় যে বিশাল পরিমাণ ডিটারজেন্ট ব্যবহৃত হয় তার বর্জ্য শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক পানিতে মেশে। ডিটারজেন্টের তল সক্রিয় উপাদান, LAS জৈবিকবিনাশী একটি পদার্থ। অন্যান্য উপাদানও পরিবেশে প্রত্যক্ষভাবে কোনো

দূষণ সৃষ্টি করে না। তবে, পলিফসফেট পরোক্ষভাবে পরিবেশের দূষণ ঘটায়। পানিতে পলিফসফেটের দ্রুত জলান্বয়ন ঘটে এবং তা থেকে ফসফেট উৎপন্ন হয়:

$$P_3O_{10}^{5-} \rightarrow 2HPO_4^{2-} + H_2PO_4^{-}$$ ।

ফসফেটও পরিবেশের প্রত্যক্ষ দূষক নয়। এটি জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর নয় বরং উদ্ভিদের একটি পুষ্টি উপাদান। ফসফেটের শেষোক্ত এই বৈশিষ্ট্যই (উদ্ভিদের পুষ্টি) কখনো কখনো পরোক্ষভাবে পরিবেশের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে। পানিতে মিশ্রিত ডিটারজেন্টের বর্জ্য জলাধারে যে পুষ্টি পরিবেশন করে তাতে শৈবাল, লতাগুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদের সেখানে বিপুল বিস্তার ঘটে। ঐসব উদ্ভিদ মারা যাবার পর পানিতে যখন সেগুলো পচতে থাকে তখন সেখানে মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি হয়। ঐরূপ পানি যেমন ব্যবহারোপযোগী থাকে না তেমনি জলজ প্রাণীও সেখানে বাঁচতে পারে না। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। পচা উদ্ভিদ জলাধারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, তাতে আবার উদ্ভিদ প্রবলতর মাত্রায় সেখানে জন্ম নেয়। উদ্ভিদের জন্ম, মৃত্যু ও পুষ্টি-পরিবেশন, এই চক্রাকার প্রক্রিয়ার পরিণতিতে সমগ্র জলাধার একদিন বড় বড় গাছপালা ও লতাগুল্মে ভরা জলাভূমিতে পর্যবসিত হতে পারে। যাহোক, ফসফেটের দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডিটারজেন্টের বিল্ডার হিসেবে পলিফসফেটের বিকল্প অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত নাইট্রাইলোট্রাইঅ্যাসেটিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ ব্যবহার করে মোটামুটি উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে। নাইট্রাইলোট্রাইঅ্যাসেটিক অ্যাসিড জৈবিক বিনাশী একটি পদার্থ।

৩.৫ পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল, PCB (polychlorinated biphenyl)

PCB বাইফিনাইলের ক্লোরো-ডেরিভেটিভ যাতে বাইফিনাইলের যে দশটি H তার এক বা একাধিক হাইড্রোজেন Cl- দ্বারা প্রতিস্থাপিত থাকে:

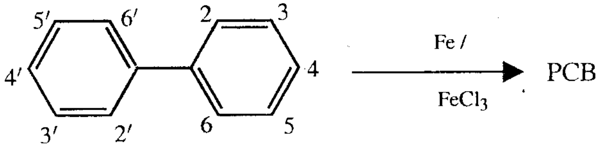

এভাবে সর্বমোট 209 টি ভিন্ন ভিন্ন যৌগ তৈরি হতে পারে যার প্রত্যেকটিকে PCB বলা হয়। তবে, বাণিজ্যিক PCB একাধিক যৌগের একটি মিশ্রণ এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে (trade name) সেগুলো বাজারজাত করা হয়; যেমন, অ্যারোক্লোর (Arochlor)-1242 এবং অ্যারোক্লোর -1254 দুটি বাণিজ্যিক PCB যাতে Cl এর প্রাচুর্য যথাক্রমে 42 ও 54%।

পানিতে PCB এর দ্রবণীয়তা কম কিন্তু সকল সাধারণ জৈব দ্রাবকে এটি দ্রবণীয়। পদার্থগুলোর বাষ্পীয় চাপ বেশ উচ্চ এবং অতি উচ্চমাত্রায় এরা দুর্বিভাজনীয়। PCB-

এর তাপীয় স্থিতিশীলতা বিস্ময়কর, অক্সিজেনের 17-atm চাপে ও 140°C তাপমাত্রায়ও এদের উল্লেখযোগ্য কোনো জারণ ঘটে না, পদার্থগুলো বিদ্যুৎ-কুপরিবাহী।

১৯২৯ সালে PCB-এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় এবং তারপর থেকে অতি অল্প সময়ের মাঝে শিল্পকারখানার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। রং, ছাপার কালি, ক্যাপাসিটর এবং বিশেষ করে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকরণ শিল্প পদার্থগুলোর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র। PCB-এর উচ্চ তাপীয় স্থিতিশীলতা ও নিম্ন বিদ্যুৎপরিবাহিতার জন্য ট্রান্সফরমারের তাপ-স্থানান্তরিতকরণ মাধ্যম হিসেবে পদার্থটি বিশেষ উপযোগী হয়েছে। বর্তমানে PCB-এর উৎপাদন নিষিদ্ধ। তবে, যতদিন এর উৎপাদন চালু ছিল ততদিন সারা পৃথিবীতে পদার্থগুলোর প্রায় 2×10^6 মেট্রিক টন পরিমাণ উৎপাদিত হয়েছে যার বিরাট এক ভগ্নাংশ বাজারে এখনও প্রচলিত আছে।

PCB-এর প্রত্যক্ষ বিষক্রিয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য খুব বেশি কিছু পাওয়া যায় না। একটি ঘটনার কথা জানা যায় যাতে একটি মুরগীর খামারে মড়ক লাগার জন্য সরাসরি PCB কে দায়ী করা হয়েছে। ঐ খামারের খোয়াড়ে যে পেইন্ট লাগানো হয়েছিল তাতে PCB মেশানো ছিল। PCB এর প্রত্যক্ষ বিষক্রিয়া থাক বা না-থাক, পরোক্ষভাবে এটি যে পরিবেশে মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করতে পারে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য রয়েছে এবং সেজন্যই পদার্থগুলোর উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

PCB- এর পরোক্ষ যে দূষণ-সৃষ্টি তাতে পদার্থটির দুটি বৈশিষ্ট্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে; যথা, উচ্চমাত্রায় দুর্বিনাশিতা ও উল্লেখযোগ্য উদ্বায়িতা (volatility)। উক্ত বৈশিষ্ট্যের দরুন PCB যেখানে ব্যবহৃত হয় সেখান থেকে বহু দূর দূরান্তে জল, বায়ু, মাটি সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। ভূ-মণ্ডলের সর্বত্র PCB-এর অস্তিত্ব শনাক্ত করা হয়েছে। আমেরিকার বৃহৎ হ্রদপুঞ্জে (great lakes) PCB উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিদ্যমান। দূরের কোনো উৎস থেকে বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে হ্রদের পানিতে এসে এটি যুক্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

PCB অতি উচ্চ তাপমাত্রায় দগ্ধ করা হলে কার্যত সম্পূর্ণরূপে এটি ধ্বংস হয়। তবে, পদ্ধতি যথাযথ না হলে তা থেকে PCDD (polychlorinated dibenzo-p-dioxins) ও PCDF (polychlorinated dibenzofurans) নামে দুই শ্রেণীর যৌগ উৎপন্ন হতে পারে, PCDD ও PCDF উভয়ই গ্যাস এবং PCB এর তুলনায় অনেক বেশি বিষাক্ত। বস্তুত, PCB এর পরোক্ষ যে দূষণ তার জন্য এই দুটি গ্যাসই মুখ্যত দায়ী থাকে। মিউনিসিপ্যালিটির বর্জ্য যখন পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় কিংবা কোথাও যখন দাবানলে বনভূমি উজাড় হয় তখন সেখানে PCB থেকে PCDD ও PCDF উৎপন্ন হয়ে পরিবেশে মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করে। বর্জ্যে যে PCB মিশে থাকে এবং বায়ুমণ্ডল থেকে গাছের পাতায় যে PCB জমে তাদের অসম্পূর্ণ দহন উক্ত PCDD ও PCDF এর অন্যতম একটি উৎস বলে ধারণা করা হয়। তবে, যে কোনো দহন, যাতে C, O ও

Cl উৎপন্ন হয়, যথাযথ শর্ত পূরণ হলেও তাতে ডাইঅক্সিন সৃষ্টি হতে পারে। যাহোক, দাবানলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বনভূমির স্থানে আবার যখন বনভূমি সৃষ্টি হয় তখন দেখা যায় বনে পাখি যে ডিম পাড়ে তার বহু ডিমে উপরের খোঁসা পুরাপুরি কঠিন হয় না এবং পরিণতিতে বাচ্চা জন্ম নিতে পারে না। পাখির দেহে ডাইঅক্সিনের দূষণ ঘটনাটির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

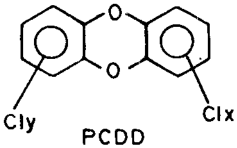

PCDD

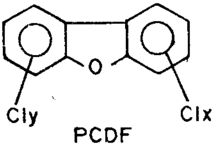

PCDF

৩.৬ পলিঅ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, PAH

PAH এর সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য, এদের গঠনে অ্যারোমেটিক চক্র একটির গায়ে অন্যটি লেগে থাকে। নিচে এই শ্রেণীর অন্তর্গত কিছু যৌগের গাঠনিক ফর্মুলা প্রদান করা হলোঃ

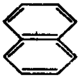

ন্যাপথ্যালিন

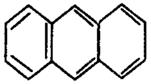

অ্যানথ্রাসিন

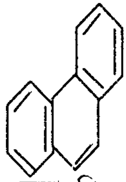

ফেনানথ্রিন

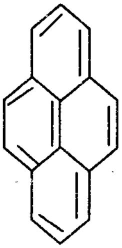

পাইরিন

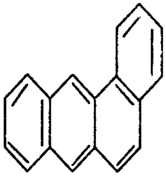

বেনজ [a] অ্যানথ্রাসিন
(benz[a] anthracene)

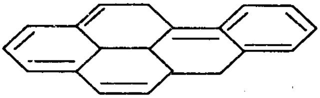

বেনজো [a] পাইরিন
benzo[a] pyrene

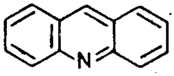

অ্যাক্রিডিন

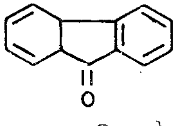

9–ফ্লুরিনোন

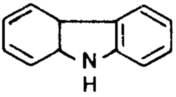

কার্বাজোল

যে কোনো C-যৌগ উচ্চতাপে পোড়ানো হলে (combustion) C-ঘটিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্রিত হয়ে PAH সৃষ্টি হতে পারে। একসময় পাথুরে কয়লা ও কাঠ পোড়ানো PAH এর প্রধান দুটি উৎস ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে উন্নত দেশে শহরাঞ্চলের

বায়ুতে পদার্থগুলোর যে উপস্থিতি তার জন্য পেট্রোলচালিত যানবাহনের ধোঁয়া প্রধানত দায়ী। যাহোক, PAH শ্রেণীভুক্ত যৌগগুলো পরিবেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পদার্থগুলো ক্যান্সার (carcinogenic) সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং বেনজো [a] পাইরিন পদার্থগুলোর মাঝে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর।

দহনক্রিয়া থেকে যে PAH সৃষ্টি হয় তা প্রথমে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে পরে সেখান থেকে ভূ-পৃষ্ঠ ও জলাধারে নেমে আসে। তবে, আগুন নেভানোর জন্য (মিউনিসিপ্যালিটির বর্জ্য পোড়ানোর পর কিংবা দাবানলে) যে পানি ব্যবহৃত হয় তাতে ধৌত হয়ে PAH সরাসরি মৃত্তিকায় ও জলাধারে প্রবেশ করে। মিউনিসিপ্যালিটির বর্জ্য ধ্বংস করার জন্য যেখানে তা পোড়ানো হয় তার চারপাশের পরিবেশে তাই PAH এর দূষণ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বায়ুমণ্ডল থেকে ফলমূল ও শস্যের মাঝেও PAH এর অনুপ্রবেশ ঘটে।

PCB এর সাথে তুলনায় PAH এর একটি ভালো দিক, এটি PCB এর মতো অত দুর্বিনাশী নয়। কিছু কিছু জারণ বিক্রিয়া আছে যাতে PAH প্রকৃতিতে একটু একটু করে ধ্বংস হয়। তবে, অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় মৃত্তিকায় এদের স্থিতিশীলতা বেশি বলে মনে হয়। যদিও তথ্যটি কিছুটা বিতর্কিত কেননা মৃত্তিকায় জৈব বস্তুর যে বিভাজন ঘটে তা থেকেও PAH সৃষ্টি হতে পারে।

৩.৭ বর্জ্য পানির বৈশিষ্ট্য

বর্জ্য পানির বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত ভৌত, রাসায়নিক ও প্রাণরাসায়নিক স্থিতিমাপগুলো (parameter) দ্বারা নির্ধারিত হয়:

ক. ভৌত স্থিতিমাপ (physical parameters) : রং, গন্ধ, দ্রবীভূত অক্সিজেন এর পরিমাণ(D.O.–dissolved oxygen), অদ্রবণীয় পদার্থ, ক্ষয়কারিতা (corrosiveness), তেজস্ক্রিয়তা (radioactivity), তাপমাত্রার ওঠানামা, ফেনা উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি।

খ. রাসায়নিক স্থিতিমাপঃ pH, অম্লত্ব/ ক্ষারত্ব , খরতা (hardness), মোট কার্বন, দ্রবীভূত মোট কঠিন বস্তু (TDS = Total Dissolved Solids), অক্সিজেনের রাসায়নিক চাহিদা (COD = Chemical Oxygen Demand), ক্লোরিন চাহিদা এবং জৈব ও অজৈব পদার্থের প্রাচুর্য [যেমন, Cl^-, S^{2-}, SO_4^{2-}, N, P, Pb, Cd, Hg, Cr, As, ফেনল, হাইড্রোকার্বন, তেল, গ্রিজ, তলসক্রিয় পদার্থ (surfactant) প্রভৃতি]।

গ. প্রাণরাসায়নিক (biochemical) **স্থিতিমাপঃ** অক্সিজেনের প্রাণরাসায়নিক চাহিদা (BOD = Biochemical Oxygen Demand), রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর (pathogen) প্রাচুর্য, মানুষ, জীবজন্তু, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি বিষক্রিয়া (toxicity)।

স্থিতিমাপগুলো নির্ণয় করার কিছু কিছু পদ্ধতি অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৭.১ প্রাণরাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা, BOD (Biochemical Oxygen Demand): BOD প্রাকৃতিক পানির মান নির্দেশক গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থিতিমাপ। স্থিতিমাপটি পানিতে যে জৈব বস্তু থাকে তার একটি পরিমাপ প্রদান করে। প্রতি লিটার পানির জৈব বস্তু ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে বিভাজিত হতে যত মিলিগ্রাম অক্সিজেন খরচ হয় তাকে সে পানির BOD বলে।

CH_2O [জৈববস্তু] + $O_2 = CO_2 + H_2O$

$1 \text{ mg C} \equiv 2.67 \text{ mg } O_2$

BOD = mg-O_2, যা প্রতি লিটার পানিতে বিদ্যমান জীবাণুর অনুঘটনে জারণীয় জৈব বস্তুর সমতুল।

ভূপৃষ্ঠের পানি বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে অবস্থান করে বলে তাতে প্রায় 9 ppm O_2 দ্রবীভূত থাকে। পানির দ্রবীভূত O_2 (D.O.) অধিকাংশ জলজ জীবের জন্য অপরিহার্য একটি উপাদান। কিন্তু, পানিতে যখন বর্জ্য যুক্ত হয় তখন তার D.O হ্রাস পায়। বর্জ্যের মাঝে যে জৈব বস্তু থাকে তা মুখ্যত ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে দ্রবীভূত O_2 দ্বারা CO_2 -এ জারিত হয়। ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে যে বিক্রিয়া ঘটে, তা প্রাণরাসায়নিক শ্রেণীর অন্তর্গত একটি বিক্রিয়া। প্রাকৃতিক পানি থেকে, ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে, দ্রবীভূত O_2 অপসারিত হওয়াকে তাই পানির প্রাণরাসায়নিক O_2 চাহিদা বা BOD বলা হয়ে থাকে। পানীয় পানির জন্য অনুমোদিত BOD 6 ppm (WHO)। কিন্তু পানিতে যখন বর্জ্য মেশে তখন তার BOD বৃদ্ধি পায়। বর্জ্যের উৎসভেদে পানির BOD কমবেশি হয়। যেমন, (টিপিক্যাল BOD) গার্হস্থ্য নর্দমার পানি - 160 ppm, শিল্পকারখানার বর্জ্য-মিশ্রিত পানি - 200 ppm, কাগজ শিল্পের বর্জ্য মিশ্রিত পানি - 375 ppm, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বর্জ্য পানি - 750 ppm, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বর্জ্য পানি - 1000-2000 ppm। পানির BOD যত উচ্চ থাকে, জলজ বায়ুজীবী জীবের জীবনধারণের জন্য সে পানি তত বেশি অনুপযোগী হয়। যাহোক, বর্জ্য পানি যখন পরিশোধন করা হয় তখন পরিশোধন পদ্ধতিতে এমন কিছু ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকে যা পানির জৈববস্তুকে ধ্বংস করে BOD নিচে নামিয়ে আনে।

৩.৭.২ রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা, COD (Chemical Oxygen Demand): COD ও BOD এর অনুরূপ একটি স্থিতিমাপ যা পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনকে (D.O) অপসারণ করে, এমন বস্তুর একটি পরিমাপ প্রদান করে। তবে, BOD যেখানে জীবাণুর অনুঘটনে জারণীয় জৈববস্তু তথা অপসারণীয় O_2 এর পরিমাণ দেয়, COD এর সাহায্যে সেখানে অম্লীয় $K_2Cr_2O_7$ দ্বারা জারণীয় সকল বস্তুর পরিমাণ পাওয়া যায়:

COD = mg O_2, যা প্রতিলিটার পানিতে বিদ্যমান, অম্লীয় $K_2Cr_2O_7$ দ্বারা জারণীয় বস্তুর সমতুল।

জীবাণু-সক্রিয় ও জীবাণু-নিষ্ক্রিয় উভয় শ্রেণীর বস্তু (জৈব ও অজৈব) অম্লীয় $K_2Cr_2O_7$ - এ জারিত হতে পারে। পানির COD তাই BOD-এর তুলনায় সর্বদা বেশি হয়।

BOD-এর তুলনায় COD নির্ণয় করা সহজ এবং COD-এর মানে সূক্ষ্মতাও (precision) অনেক বেশি থাকে। BOD নির্ণয় করতে পাঁচদিন সময় লাগে। COD সেখানে সাধারণ একটি টাইট্রেশনে যে সময় লাগে তেমনি অল্প সময়ের মাঝে নির্ণয় করা যায়। BOD যত জটিলই হোক, প্রাকৃতিক পানিতে কেবল জৈবিক বিভাজনীয় জৈববস্তুর পরিমাণ যখন জানার প্রয়োজন হয় তখন BOD নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

৩.৮ পানি পরিশোধন (purification of water)

পানি পরিশোধনের ব্যবস্থাকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা:

ক. গৃহে ও শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য পানির পরিশোধন ব্যবস্থা এবং

খ. প্রাকৃতিক জলাধারে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে বর্জ্য পানির পরিশোধন ব্যবস্থা।

পরিশোধনীয় পানির উৎস ও পরিশোধনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে পরিশোধনের ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়। যেমন, গৃহে ব্যবহারের পানি রোগজীবাণুমুক্ত হতে হয় তবে এতে খরতা (Ca ও Mg আয়ন) কিছু পরিমাণে থাকতে পারে। অপরদিকে, বয়লারে ব্যবহার করার পানি সম্পূর্ণরূপে খরতামুক্ত হতে হয়। তবে, এতে রোগজীবাণু, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি আণুবীক্ষণিক জীব উপস্থিত থাকতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে পানির পরিশোধন ব্যবস্থায় তাই এমন কিছু পদার্থ ব্যবহার করতে হয় (যেমন, Cl_2) যা রোগজীবাণু ও ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে পানিকে সম্পূর্ণরূপে খরতামুক্ত করতে পারে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা লাগে। একইভাবে, যে বর্জ্য পানি বড় জলাধারে যুক্ত হবে তাকে যতখানি পরিশোধন করা লাগে, শুষ্ক অঞ্চলে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বর্জ্য পানিকে তার থেকে বেশি পরিমাণে পরিশোধণ করতে হয়। নিচে বর্জ্য পানি পরিশোধনের একটি পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

বর্জ্য-পানি পরিশোধন (waste water purification): বর্জ্য পানি বলতে সাধারণত গার্হস্থ্য নর্দমার পানি ও শিল্পকারখানার বর্জ্য মিশ্রিত পানিকে বুঝানো হয়। গার্হস্থ্য বর্জ্য ও শিল্পকারখানা বর্জ্য, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য অনেক। তারপর আবার, শিল্পকারখানার প্রকারভেদে তার বর্জ্যও ভিন্ন হয় (সারণি ৩.৩)। 'বর্জ্যপানি পরিশোধন' বিষয়টির পরিধি তাই অতি বিস্তীর্ণ। তবে, কিছু কিছু প্রক্রিয়া আছে যা সব শ্রেণীর বর্জ্য পানি পরিশোধনের জন্য প্রয়োজন হয়। নিচে সাধারণ ঐ প্রক্রিয়াগুলোর সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ প্রদান করা হলো (চিত্র ৩.১):

বর্জ্য পানি পরিশোধনের প্রক্রিয়াগুলোকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা, প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়াকরণ, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ, দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ ও তৃতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ।

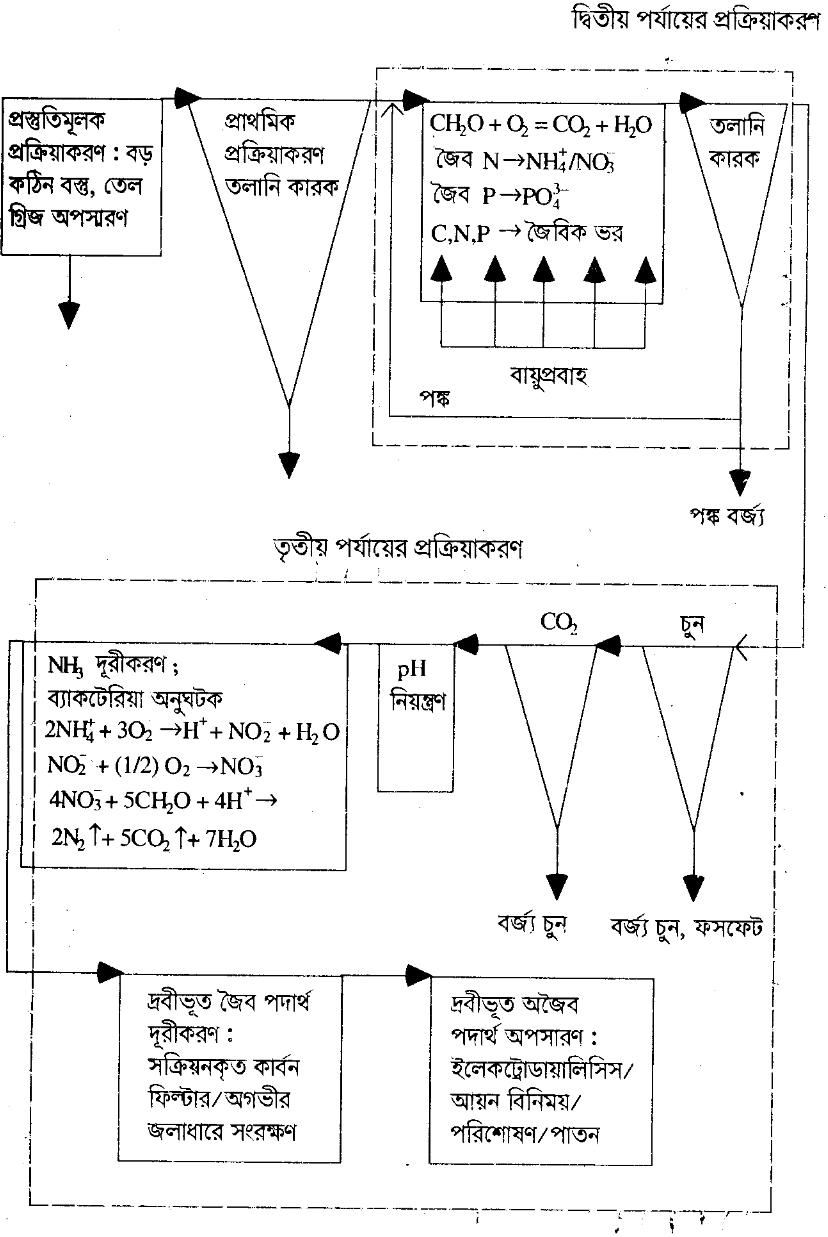

চিত্র ৩.১ : বর্জ্য পানি পরিশোধন (সক্রিয়নকৃত পঙ্ক পদ্ধতি) ।

১. প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়াকরণ (preliminary treatment): প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক। বর্জ্য পানির উপর ও অভ্যন্তরে ভাসমান অবস্থায় বড় আকারের কঠিন বস্তু, কাঁকর, তেল, গ্রিজ প্রভৃতি উপস্থিত থাকে। প্রস্তুতিমূলক ধাপে পানি থেকে এগুলো পৃথক করা হয়। কঠিন বস্তু স্থির কিংবা চলমান তার-ছাকনির সাহায্যে এবং ভাসমান তেল/ গ্রিজ স্কিমার-(skimmer) এর সাহায্যে পানি থেকে তুলে ফেলা হয়। তবে, তেল/ গ্রিজ পানির সাথে মিশে ইমালশন (emulsion) অবস্থায় থাকলে প্রস্তুতিমূলক ধাপে তা পৃথক হয় না। পরবর্তী ধাপে (প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ) তা পৃথক হয়।

২. প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ (primary treatment): এই প্রক্রিয়াটিও যান্ত্রিক। প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়াকরণের পর পানির অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কণা ভাসমান অবস্থায় থাকে, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ধাপে সেগুলো পৃথক হয়। কাজটি সম্পাদনের জন্য এমন একটি তলানিকারক ট্যাংক (sedimentation tank) ব্যবহার করা হয় যাতে ছোট ও হালকা কণা অভিকর্ষ বলে ট্যাংকের তলায় জমা পড়ে। একটি দক্ষ তলানিকারক ট্যাংকে দুই ঘণ্টার মাঝে ভাসমান কণার প্রায় 90% তলানি পড়ে যার মাঝে প্রায় 40% থাকে জৈব পদার্থ। তবে, শিল্পকারখানার বর্জ্যপানি থেকে তলানি ফেলতে সাধারণত কিছুটা বেশি সময় লাগে। তলানিকারক ট্যাংকে ক্ষুদ্রকণা তলানি হিসেবে জমা হওয়ার পর ট্যাংকের উপর স্তর থেকে পানি দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রেরিত হয়।

৩. দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ (secondary treatment): প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ শেষে যে পানি দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রেরিত হয়, প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ তখনও তাতে উপস্থিত থাকে। পানিতে জৈব পদার্থ উপস্থিত থাকার প্রধান একটি ক্ষতিকর দিক, জৈব পদার্থ জীবাণুর অনুঘটনে পানির দ্রবীভূত O_2এর সাথে বিক্রিয়া করে । ফলে, পানিতে দ্রবীভূত O_2 এর পরিমাণ কমে যায় এবং জলজ প্রাণীর জীবনধারণ তাতে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ ধাপে পানির জৈব পদার্থকে ধ্বংস করে একটি সহনীয় মাত্রায় তাকে নামিয়ে আনা হয়। কাজটি বিভিন্নভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে তবে সকল পদ্ধতির মৌলিক নীতি একই- অক্সিজেন (প্রয়োজনে, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট প্রভৃতি পুষ্টিকর পদার্থসহ অক্সিজেন) পরিবেশন করে জীবাণুর অনুঘটনে জৈব পদার্থকে সে পর্যন্ত বিভাজিত করা হয় যে পর্যন্ত পানির BOD গ্রহণযোগ্য একটি মানে নেমে না আসে। প্রক্রিয়াকরণটির সবচেয়ে দক্ষ ও বহুমুখী একটি পদ্ধতি -'সক্রিয়নকৃত পঙ্ক পদ্ধতি' (activated sludge process) । নিচে পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হলো :

সক্রিয়নকৃত পঙ্ক পদ্ধতি : একটি বায়ু-সঞ্চালন কক্ষে প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়। পানির মাঝে যেসব জীবাণু থাকে, অতিরিক্ত O_2 ও পুষ্টিকর খাদ্যের উপস্থিতিতে জৈব কার্বনকে তারা $CO_2(g)$ এ জারিত করে এবং নিজেদের বংশবৃদ্ধি ঘটায়। এ সময় জৈব নাইট্রোজেন NH_4^+ অথবা NO_3^-এ এবং জৈব ফসফরাস PO_4^{3-} এ পরিণত হয়। অর্থাৎ, বর্জ্যপানিতে জীবাণুর অনুঘটনে একদিকে যেমন জৈব পদার্থের বিভাজন ঘটে অন্যদিকে

আবার জীবাণুর পুষ্টি উপাদান ও নতুন নতুন জীবাণু কোষ গঠিত হতে থাকে। জৈব পদার্থের জারণক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয়, জীবাণু নতুন কোষ গঠনে সেই শক্তি ব্যবহার করে। যাহোক, জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটা যতক্ষণ পর্যন্ত একটি স্থিতাবস্থায় না পৌঁছে ততক্ষণ পরিশোধনীয় বর্জ্যপানি বায়ুসঞ্চালন কক্ষে রেখে দেয়া হয়। তারপর পানি একটি তলানিকারক ট্যাংকে প্রেরিত হয়, যেখানে জীবাণুকোষগুলো গুচ্ছাকারে জমাট বাঁধে এবং এক সময় ট্যাংকের তলদেশে 'পঙ্ক' (sludge) আকারে তলানি পড়ে। পঙ্কের একটি ভগ্নাংশ আবার বায়ু সঞ্চালন কক্ষে প্রেরিত হয় এবং অপর ভগ্নাংশ ট্যাংকের তলা থেকে বের করে বর্জ্য হিসেবে নিম্নভূমিতে সংরক্ষর্ণ করা হয়। বায়ুসঞ্চালন কক্ষে পঙ্ক নতুন বর্জ্যের (প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ধাপের পানি) সংস্পর্শে আসে। বায়ুসঞ্চালন কক্ষে যে বর্জ্যপানি প্রবেশ করে তাতে জীবাণু-কোষের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপস্থিত থাকে। অন্যদিকে, পঙ্কের সাথে বিপুল সংখ্যক ক্ষুধার্ত জীবাণুও সেখানে প্রবেশ করে। পঙ্ক যুক্ত হওয়ার ফলে বায়ু-সঞ্চালন কক্ষে তাই এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই (কয়েক ঘণ্টা মাত্র) এতে জৈব পদার্থের সম্পূর্ণ বিভাজন ঘটে।

পঙ্কের আণুবীক্ষণিক জীব বর্জ্যপানিতে বিদ্যমান জৈববস্তুর সংস্পর্শে যখন আসে, তার প্রথম পর্যায়ে পদ্ধতিটিতে প্রচুর অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রচলিত (conventional) পদ্ধতিতে বায়ুসঞ্চালন ট্যাংকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাতান্বয়ন (aeration) ও বর্জ্যপানির সাথে আণুবীক্ষণিক জীবের মিশ্রণ সমানভাবে চলে। এতে ট্যাংকের প্রবেশ দ্বারের প্রান্তে অক্সিজেনের ঘনমাত্রা অতিমাত্রায় নিচুতে নেমে যায়। আণুবীক্ষণিক জীবের বংশবৃদ্ধির জন্য ঐরূপ অবস্থা বিশেষ ক্ষতিকর। এ কারণে চলিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার রূপান্তর ঘটানো হয় যাতে ন্যূনতম খরচে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পরিবেশন করা যায়। রূপান্তরগুলোর দুটি এরূপ:

১. প্রবেশ দ্বারের প্রান্তে বাতান্বয়ন তীব্র রেখে বায়ুসঞ্চালন ট্যাংকের দৈঘ্য বরাবর তা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয়। পদ্ধতিটি ক্রমশ-ক্ষীয়মান বাতান্বয়ন (tapered aeration) নামে পরিচিত। এতে বায়ুসঞ্চালনের খরচ অনেক কম পড়ে এবং বায়ুও অধিকতর কার্যকরভাবে গৃহীত হয়।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি 'ধাপ বাতান্বয়ন' (step aeration) নামে পরিচিত। এতে অক্সিজেন পরিবেশন ক্রমশ কমিয়ে না এনে পরিশোধনীয় বর্জ্যপানি ও পঙ্কের নতুন নতুন মিশ্রণ বায়ুসঞ্চালন ট্যাংকের দৈর্ঘ্য বরাবর ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবেশ করানো হয়। ফলে বাতান্বয়নের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অক্সিজেন চাহিদা সমভাবে পূরণ হতে পারে।

পঙ্ক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা : তলানিকারক ট্যাংকের তলদেশ থেকে পঙ্কের যে ভগ্নাংশ বর্জ্য হিসেবে অপসারিত হয় তাতে কিছু পরিমাণ কঠিন বস্তু (প্রায় 1%) ও অসংখ্য ক্ষতিকারক উপাদান থাকে। সাধারণত বালু স্তরে ফিল্টার করে অথবা সেন্ট্রিফিউজ করে

পঙ্ক বর্জ্যের পানি আংশিকভাবে অপসারণ করা হয় এবং শুষ্ক বর্জ্যকে পরে পুড়িয়ে ফেলা হয় অথবা নিম্নভূমি ভরাট করতে তা ব্যবহার করা হয়। উক্ত বর্জ্য জ্বালানি (CH_4 গ্যাস) উৎপাদনেও ব্যবহৃত হতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে অবায়ুজীবী কিছু ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটন প্রয়োজন হয়:

$$2CH_2O \xrightarrow[\text{ব্যাকটেরিয়া}]{CH_4\text{-উৎপাদনকারী}} CH_4 + CO_2$$

গার্হস্থ্য নর্দমার পানি পরিশোধনের পর (দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ শেষে) যে পঙ্ক সৃষ্টি হয় তা কৃষিজমির সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এতে প্রায় 5% N, 3% P, 0.5% K (শুষ্ক পঙ্কের ভিত্তিতে) ও প্রচুর পরিমাণের হিউমিক পদার্থ (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রঃ) উপস্থিত থাকে। হিউমিক পদার্থ মৃত্তিকার CEC (cation exchange capacity) ও আরো কিছু ভৌত বৈশিষ্ট্যকে সমৃদ্ধ করে। তবে, পঙ্ক-বর্জ্য সার হিসেবে ব্যবহার করার কিছু ক্ষতিকর দিকও আছে, যেমন-

ক. কৃষিক্ষেত-বিধৌত পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করে কিংবা প্রাকৃতিক জলাধারে মিশে সেখানে N-দূষণ সৃষ্টি করতে পারে।

খ. বর্জ্যের সাথে রোগজীবাণু ও বিভিন্ন প্রকার ভারি ধাতু (যেমন, Pb, Cd, Hg, Cr, Cu, Ni, Zn প্রভৃতি) প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে। এরা মৃত্তিকার জৈব পদার্থের সাথে কিলেট গঠন করে অথবা মৃত্তিকায় পরিশোষিত হয়ে অথবা অক্সাইড / কার্বোনেট আকারে অবস্থান করে। উক্ত ধাতু একসময় শস্য ও শাকসবজির মাঝে প্রবেশ করে এবং খাদ্য-দূষণ ঘটায় । তাই, পঙ্ক-বর্জ্য সার হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী কিনা তা প্রথমে যাচাই করে দেখা উচিত। বর্জ্যের উৎস গৃহ অথবা শিল্পকারখানা যাই হোক এটি যখন সৃষ্টি হয় তখন সতর্ক থাকতে হয়, ভারি ধাতু যেন তার সাথে মিশতে না পারে। কেননা, পঙ্ক বর্জ্য উদ্ভিদ পুষ্টির এক বিশাল ভাণ্ডার, ভারি ধাতু এতে উপস্থিত না থাকলে সার হিসেবে একে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

৪. **তৃতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ** (tertiary treatment) : তৃতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থায় একই উদ্দেশ্যে বেশকিছু প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিশোধন শেষে যে পানি পাওয়া যায় তার মাঝেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলয়ডীয় কণা, দ্রবীভূত জৈব ও অজৈব পদার্থ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত থাকে। পানির বৈশিষ্ট্যকে এদের এক একটি উপাদান এক একভাবে প্রভাবিত করে। যেমন, কলয়ডীয় কণা ও দ্রবীভূত জৈব পদার্থের দরুন পানির BOD বেড়ে যায়। কোনো কোনো পদার্থ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর হয়। দ্রবীভূত অজৈব পদার্থের মাঝে নাইট্রেট (NO_3^-) ও ফসফেট (PO_4^{3-}) উপস্থিত থাকলে পানি জলাধারে মিশ্রিত হাওয়ার পর সেখানে শৈবালের বিস্তার ঘটতে পারে। আবার, অজৈব পদার্থে ভারি ধাতু মিশ্রিত থাকলে জলাধারে তা মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করে । যাহোক, বর্জ্য-পানি পরিশোধনের তৃতীয় পর্যায়ে এই তিন শ্রেণীর অপদ্রব পানি থেকে অপসারণ করা হয়ে থাকে।

কলয়েডীয় কণা অপসারণ : উপযুক্ত একটি ঘনীকারক অথবা গুচ্ছকারক (coagulant or floculant) পদার্থ (যেমন ফটকিরি, K_2SO_4, $Al_2\ (SO_4)_3 \cdot 24H_2O$, ফেরিক ক্লোরাইড, $FeCl_3$,পলিইলেকট্রোলাইট প্রভৃতি) পানিতে মিশ্রিত করা হলে কলয়েডীয় কণা জমাট বেঁধে তলানিকারক ট্যাংকের তলদেশে জমা হয় এবং পানি স্বচ্ছ হয়ে যায়। বালুস্তরের সাহায্যে ফিল্টার করেও পানির কলয়েডীয় কণা অপসারণ করা যেতে পারে।

দ্রবীভূত জৈব পদার্থ অপসারণ: দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিশোধন শেষে পানি অগভীর জলাধারে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা হলে জীবাণুর অনুঘটনে দ্রবীভূত জৈব পদার্থ ধ্বংস হয় এবং জীবাণু-কোষ গুচ্ছাকারে জলাধারের তলদেশে থিতিয়ে পড়ে। দ্রবীভূত জৈব পদার্থ অপসারণের জন্য এটি উত্তম একটি ব্যবস্থা। এতে পানির BOD যেমন নিচুতে নেমে আসে তেমনি ভাসমান কলয়েডীয় কণার পরিমাণও হ্রাস পায়।

দ্রবীভূত জৈব অপদ্রব অপসারণের জনপ্রিয় আর একটি পদ্ধতি, সক্রিয়নকৃত কার্বনস্তরের (কাঠকয়লা) ভিতর দিয়ে পানি ফিল্টার করা, জৈব যৌগ কার্বন-পৃষ্ঠে পরিশোষিত হয়ে পানি থেকে পৃথক হয়। DDT ও কার্বামেট এর মতো পেস্টিসাইড এবং অবাঞ্ছিত বর্ণ ও গন্ধ দূর করার জন্য সক্রিয়নকৃত কার্বন ফিল্টার অতি কার্যকর একটি পদ্ধতি। তবে, জৈব যৌগ পরিশোষিত হওয়ার ফলে কার্বনস্তরের পরিশোষণ দক্ষতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। জলীয় বাষ্প ও বায়ুর মিশ্রণে 950°C তাপমাত্রায় কার্বনকে জারিত করা হলে তার লুপ্ত দক্ষতা ফিরে আসে যদিও প্রায় 10% কার্বন এতে নষ্ট হয়।

বেশ কিছু সংশ্লেষিত পরিশোষকও (যেমন, অ্যামবারলাইট XAD-4) জৈবিক-দুর্বিনাশী (biorefractory) জৈব পদার্থ অপসারণের জন্য বিশেষ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এদের লুপ্ত দক্ষতা পুনরুদ্ধার করাও বেশ সহজ - আইসোপ্রোপানল কিংবা এসিটোনের সাহায্যে ধৌত করা হলেই এদের দক্ষতা ফিরে আসে।

দ্রবীভূত অজৈব পদার্থ অপসারণ : বর্জ্য-পানি পরিশোধনের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হওয়ার পরও পানির মাঝে প্রচুর পরিমাণ অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থেকে যায়। দ্রবীভূত ঐ অজৈব পদার্থ অপসারণ করা বর্জ্য-পানি পরিশোধনের সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা। পরিশোধিত পানির প্রত্যাশিত মান এবং পরিশোধন প্রক্রিয়ার আর্থিক খরচ বিবেচনা করে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর এক একটি এক এক সময় বেছে নেয়া হয়।

ক. **বাষ্পীভবন** (evaporation): পানির বাষ্পীভবন (এবং বাষ্পের ঘনীভবন) একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি। সাধারণত বর্জ্যপানির পরিমাণ যখন কম হয় এবং বাষ্পীভবন শেষে ঘন দ্রবণ/ কঠিন পদার্থ যখন আবার ব্যবহার করা যায় (যেমন, ইলেকট্রোপ্লেটিং শিল্পের বর্জ্য) তখন পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বর্জ্য ঘনীকরণে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খ. **আয়ন-বিনিময়** (ion-exchange): আয়ন-বিনিময়কারক পদার্থ একশ্রেণীর উচ্চ পলিমার যার সাথে বহু সংখ্যক আয়নায়নযোগ্য অম্ল বা ক্ষারক গ্রুপ যুক্ত থাকে (যেমন, $RSO_3^-H^+$, $R\text{-}NR_3^+OH^-$ প্রভৃতি)। পরিশোধনীয় পানিতে যে আয়ন থাকে তার সাথে পলিমারের আয়নায়নযোগ্য আয়নের বিনিময় ঘটে। ফলে, পানির আয়ন কঠিন পলিমার পৃষ্ঠে আবদ্ধ হয় এবং পলিমারের আয়ন পানিতে মুক্ত হয়:

$$R\text{-}SO_3^-H^+(s) + M^+(aq) \rightleftharpoons R\text{-}SO_3^-M^+(s) + H^+(aq)$$

$$R\text{-}NR_3^+OH^-(s) + X^-(aq) \rightleftharpoons R\text{-}NR_3^+ X^-(s) + OH^- (aq)$$ ।

উক্ত নীতির ভিত্তিতে H^+ ও OH^- বিনিময়কারী রেজিনের মিশ্র বেড ব্যবহার করে বর্জ্য পানির (পরিশোধন প্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়ে) আয়ন পৃথক করা হয় এবং অতি উচ্চমানের বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায়। পদ্ধতিটির কিছু দুর্বল দিক আছে, যেমন- বর্জ্য পানিতে এমন অনেক জৈব পদার্থ থাকে যা পলিমারে আবদ্ধ হয় এবং জীবাণু তার উপর বিস্তার লাভ করে, এতে আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। ঐরূপ ক্ষেত্রে আয়ন-বিনিময়কারক পলিমারের কার্যদক্ষতা পুনরুদ্ধার করা বেশ ব্যয়বহুল হয়। যাহোক, পৃথককৃত আয়ন উপকারী এবং অর্থকরী হলে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ. **পরিশোষণ** (adsorption): সম্প্রতি জাপানে সালফার ও নাইট্রোজেন কার্যকর মূলকযুক্ত একশ্রেণীর (ALM সিরিজ) পলিমার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যাদের ভারি ধাতু পরিশোষণ করার আসক্তি প্রবল। উক্ত পলিমার স্তরের ভিতর দিয়ে শিল্পকারখানার বর্জ্য-পানি ফিল্টার করে ভারি ধাতুর পরিমাণ তাতে এক পিপিবি মাত্রারও নিচে নামিয়ে আনা যায়।

ঘ. **ইলেকট্রোডায়ালিসিস** (electrodialysis): তড়িৎ-চালক বলের প্রভাবে পদ্ধতিটি কাজ করে। ইলেকট্রোডায়ালিসিস প্রকোষ্ঠের দুই প্রান্তে দুটি ইলেকট্রোড এবং ইলেকট্রোড দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে একগুচ্ছ আয়ন-প্রবেশ্য ঝিল্লি (permeable membrane) এমনভাবে সাজানো থাকে যাতে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ঝিল্লির (adjacent membrane) ভিতর দিয়ে বিপরীত চার্জের আয়ন প্রবেশ করতে পারে (চিত্র ৩.২)।

ঝিল্লি সজ্জিত প্রকোষ্ঠ পরিশোধনীয় পানি দ্বারা পূর্ণ করে ইলেকট্রোড দুটির মাঝে dc বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রয়োগ করা হলে পানির ক্যাটায়ন ক্যাথোডের দিকে এবং অ্যানায়ন অ্যানোডের দিকে অভিপ্রয়াণ (migration) করে। সন্নিহিত দুটি ঝিল্লি যেহেতু, পরস্পর বিপরীত চার্জের আয়ন প্রবেশ্য থাকে, একই প্রকোষ্ঠ থেকে ক্যাটায়ন তাই পার্শ্ববর্তী এক প্রকোষ্ঠে এবং অ্যানায়ন পার্শ্ববর্তী অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করে। ফলে, এক প্রকোষ্ঠের পানিতে লবণের ঘনমাত্রা হ্রাস এবং তার দুই পার্শ্বের দুই প্রকোষ্ঠে লবণের ঘনামাত্রা বৃদ্ধি পায়। এভাবে এক সময় সম্পূর্ণ পানির একটি ভগ্নাংশ আয়নমুক্ত এবং অপর

ভগ্নাংশ আয়ন-সমৃদ্ধ হয়ে পড়ে। দুই শ্রেণীর পানিকে তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ থেকে পৃথকভাবে অপসারণ করা হয়।

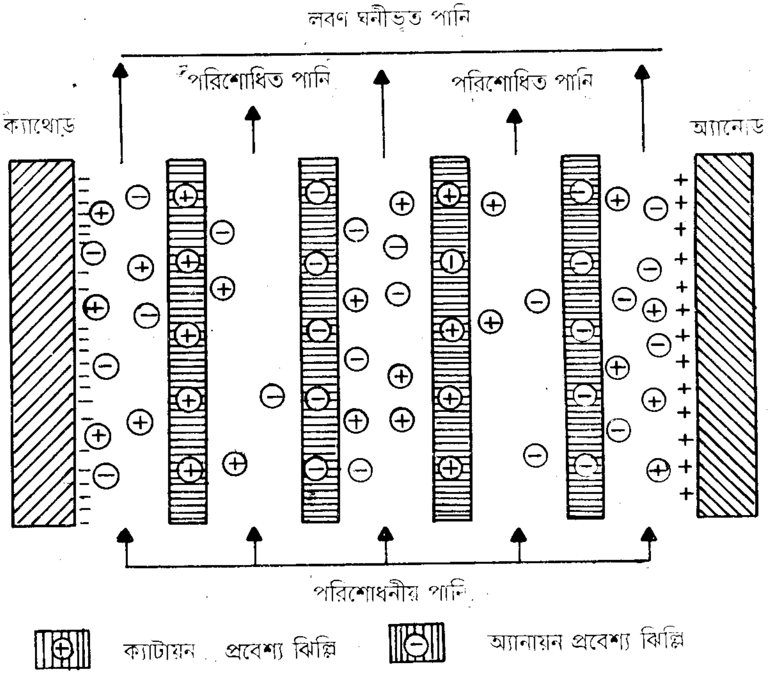

চিত্র ৩.২: ইলেকট্রোডায়ালিসিস যন্ত্র।

পদ্ধতিটির কিছু দুর্বল দিক আছে, ঝিল্লির প্রবেশ্য ক্ষমতা আয়নের আকৃতির (size) উপর নির্ভর করে। ছোট আয়ন ঝিল্লি অতিক্রম করতে পারে কিন্তু বড় আকৃতির আয়ন (যেমন প্রোটিন) ঝিল্লি অতিক্রম করতে পারে না, ঝিল্লির গায়ে লেগে থাকে, এতে ঝিল্লির প্রবেশ্য ক্ষমতা লোপ পায়। তাছাড়া কলয়ডীয় ও দ্রবীভূত জৈব বস্তু এবং সম্ভবত জীবাণুকোষও ঝিল্লির প্রবেশ্য ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিতে পারে বলে মনে করা হয়।

ঙ. **তড়িৎ-বিশ্লেষণ** (electrolysis) : তড়িৎ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্জ্য পানির ধাতু আয়নকে ক্যাথোড পৃষ্ঠে ধাতু আকারে জমা করা পদ্ধতিটির মৌলিক নীতি; ইলেকট্রোপ্লেটিং, ধাতু খোদাইকরণ (etching) ও ধাতু পরিষ্কারকরণ পাত্রের (bath) বর্জ্যপানি থেকে Cu. Sn. Ag ও অন্যান্য কিছু ধাতু পৃথক করতে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়। ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রোড (rotating electrode) এর সাহায্যে পদ্ধতিটির দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণি ৩.৩: গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিল্পের বর্জ্য এবং পানির মানের উপর তার প্রভাব।

প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্য	বর্জ্য ও বর্জ্য-মিশ্রিত পানির বৈশিষ্ট্য
১. মণ্ড ও কাগজ উৎপাদন শিল্প ক. কাঁচামাল : কাঠ, বাঁশ, আখের ছোবড়া, (bagasse), নেকড়া, খড়কুটা, তুলার বর্জ্য, পাট প্রভৃতি সেলুলোজ শ্রেণীর বস্তু। খ. মণ্ড তৈরিকরণ : কাঁচামালের রেজিন, লাইনিং প্রভৃতি সেলুলোজ থেকে পৃথক করা হয়: ক্রাফট পদ্ধতি : রাসায়নিক দ্রব্য-Na_2S, NaOH, Na_2CO_3 অম্ল সালফাইড পদ্ধতি : রাসায়নিক দ্রব্য-$Ca(HSO_3)_2$, $Mg(HSO_3)_2$ আধারাসায়নিক পদ্ধতি : রাসায়নিক দ্রব্য NaOH, Na_2S গ. মণ্ড ধৌতকরণ : রাসায়নিক দ্রব্য- Cl_2, NaOH, $Ca(OCl)_2$ । ঘ. কাগজ প্রস্তুতকরণ : রাসায়নিক দ্রব্য - কাদামাটি, $CaCO_3$, $BaSO_4$, TiO_2, মোমের ইমালসন, $Al_2(SO_4)_3$ রঞ্জক প্রভৃতি।	বর্জ্য- কাঁচামালের লাইনিং (আস্তরণ), সালফাইট, ফেনল, Cl_2, মিথাইল . মারকেপট্যান, পেন্টাক্লোরোফেনল প্রভৃতি। বর্জ্য মিশ্রিত পানির রঙ কালো হয়, পানিতে জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটে, এতে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতি হয়, পানির DO হ্রাস পায়, জলাধারের তলদেশে ভারি কণা জমা হয় এবং সেখানেও পানির দূষণ ঘটে।
২. বয়ন শিল্প - তুলা ও কৃত্রিম ক. তুলাবয়ন : প্রাথমিক কাজ - তুলা আঁচড়ানো, সুতাকাটা, সিরিশ করা (sizing -এক প্রকার আঠা লাগানো), বয়ন। সিরিশ অপসারণ (desizing) : রাসায়নিক দ্রব্য H_2SO_4/ এনজাইজ । স্কাউরিং (scouring) : গ্রিজ, মোম, চর্বি অপসারণ; রাসায়নিক দ্রব্য - NaOH, সোডা অ্যাশ, সোডিয়াম সিলিকেট, Na_2O_2, ডিটারজেন্ট। মারসেরাইজিং : সুতা ধৌতকরণ; রাসায়নিক দ্রব্য - 20% NaOH. সুতা সাদাকরণ (bleaching) : প্রাকৃতিক বস্তু অপসারণ; রাসায়নিক দ্রব্য- ক্ষারীয় হাইপোক্লোরাইট / Cl_2/Na_2O_2 । সুতা রঙ করা ও বস্ত্র ছাপানো: রঙ ও ছাপ প্রদান; রাসায়নিক দ্রব্য- রঞ্জক, ক্ষার, Cr-লবণ, তেল, মোম প্রভৃতি।	বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ ও তার উপজাত বর্জ্যে স্থান পায়। এতে পানির রঙ নষ্ট হয়, BOD বেড়ে যায়, পানিতে ভাসমান বস্তু ও তলানি জমে, পানির pH বেড়ে যায়, DO হ্রাস ও BOD বৃদ্ধি পায়, পানিতে ট্রেস ধাতুর দূষণ ঘটে। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ ও পানির স্বতঃপরিশোধন ব্যহত হয়; জলজ জীবের ক্ষতি হয়, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থায় কঠিন আস্তরণ পড়ে তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

খ. কৃত্রিম তন্তু বয়ন, যেমন, রেয়ন, নাইলন, অ্যাক্রাইলিক, সেলুলোজ অ্যাসিটেট, পলিস্টার প্রভৃতি এখানেও সিরিশ, PVA, রেজিন, জিলেটিন প্রভৃতি অপসারণ করতে হয়।	তুলা বয়নের চেয়ে এখানে বর্জ্যের পরিমাণ কম তবে ক্ষার, জৈব দ্রাবক, রেজিন, PVA প্রভৃতি বস্তু বর্জ্যে থাকে, এতে পানি রঙিন হয়, COD ও BOD বেড়ে যায়।
৩. চামড়া ট্যানিং শিল্প চামড়া সিক্তকরণ (soaking): এতে চামড়া থেকে রক্ত, ধুলো-ময়লা অপসারিত হয়, চামড়ার আর্দ্রতা বজায় থাকে, রাসায়নিক দ্রব্য - প্রচুর লবণ ও সিক্তকারক পদার্থ। চুন মিশানো (liming) : চামড়া থেকে লোম ও প্রোটিন অপদ্রব অপসারিত হয় এবং চামড়া মসৃণ হয়, রাসায়নিক দ্রব্য - চুন ও Na_2S। চুন অপসারণ (deliming) : রাসায়নিক দ্রব্য- NH_4Cl / $(NH_4)_2SO_4$ । ক. সবজি ট্যানিং (vegetable tanning) : ভারি চামড়া পাকাকরণ; রাসায়নিক দ্রব্য- ট্যান লিকার (গাছের বাকল, কাঠ, বাদাম প্রভৃতির নিষ্কর্ষ), পাইরাগ্যালোল / কেটিকল, মাইরোবলান লিকার, পানগাম তেল প্রভৃতি। খ. ক্রামট্যানিং : হালকা, শক্ত চামড়া পাকাকরণ: রাসায়নিক দ্রব্য - $Cr_2(SO_4)_3$, Na_2SO_3 । বেটিং (bating): চুনমুক্ত চামড়ার pH কমে, চামড়া স্ফীত, সছিদ্র, পেলব ও ঝকঝকে হয়, প্রোটিনের ভগ্নাংশ দূর হয়; রাসায়নিক দ্রব্য - টিপসিন, কাইমোটিপসিনের মতো এনজাইজ। চামড়া রঙ করা ও ফ্লাট লিকারিং: চামড়ায় রঙ করা হয় এবং একে নরম ও নমনীয় করা হয়। রাসায়নিক দ্রব্য - রঞ্জক, সালোফোনেটেড তেল, ইমালসন।	বর্জ্যে প্রচুর লবণ, ধুলোময়লা, গোবর, দ্রবণীয় প্রোটিন (অ্যাল-বুমিন), জৈব বস্তু থাকে। এগুলো পচে পানিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। বর্জ্যে ক্ষার, চুন, লোম, প্রোটিন কণা, সালফাইড ও অন্যান্য কঠিন কণা থাকে, পানির BOD বৃদ্ধি পায়, (4000-9000 mg/L) বর্জ্য অম্লীয়, পানির BOD 1000-2000 mg /L । বর্জ্যে প্রচুর জৈববস্তু ও কঠিন বস্তু থাকে, এতে পানি রঙিন ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, BOD বেড়ে যায় (প্রায় 12,000 mg /L)। বর্জ্য অম্লীয়, বিষাক্ত Cr এতে থাকে (100-200 mg/L), BOD প্রায় 1000 mg/L । বর্জ্যে অ্যামোনিয়াম ও জৈব N এবং দ্রবণীয় প্রোটিন থাকে । বর্জ্য বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক, তেল ও গ্রিজ।
৪. ইলেকট্রোপ্লেটিং শিল্প : তল পরিষ্কারকরণ: ধাতু-তল থেকে গ্রিজ অপসারণ করা হয়; রাসায়নিক দ্রব্য-NaOH, Na_2CO_3, Na_3PO_4, Na_2SiO_3, বেনজিন / ট্রাইক্লোরো-ইথিলিন। পিকলিং (pickling) : মূল ধাতুর অপ-আস্তরণ ও মরিচা অপসারণ; রাসায়নিক দ্রব্য - H_2SO_4 /HCl	বর্জ্য ক্ষারকীয়; এতে জৈব দ্রাবক, তেল ও গ্রিজ থাকে, যা বর্জ্যের জৈবিক প্রক্রিয়াকরণে বাধা সৃষ্টি করে। বর্জ্য -মূল ধাতুর (সাধারণত Fe) লবণ ও অব্যবহৃত অম্ল ।

প্লেটিং (plating): মূল ধাতুর উপর ভিন্ন ধাতুর আস্তরণ সৃষ্টিকরণ; রাসায়নিক দ্রব্য - যে ধাতুর আস্তরণ হবে, তার লবণ, অ্যামোনিয়া, সায়ানাইড (প্রায়ই) ও অন্যান্য দ্রব্য।	বর্জ্য তীব্র বিষ, এতে Cu, Ni, Ag, Au, Zn, Cd, Cr, Sn, Pb, Fe, Mo, Se, As, Co, বোরেট, CN, F^-, PO_4^{3-}, S^{2-}, টারট্রেট, SO_4^{2-} সালফামেট, স্যাকারিন, অ্যালডিহাইড প্রভৃতি থাকে (বাথনির্ভর)।

নিচে আরো কিছু শিল্পের বর্জ্য এবং পরিবেশের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ একটি বিবরণ প্রদান করা হলো।

৫. আখের চিনি শিল্প : সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া - আখ মাড়াই, নিষ্কাশিত রস পরিষ্কারকরণ, জ্বাল দিয়ে রস ঘনকরণ ও পরিষ্কারকরণ এবং চিনি আহরণ।

বর্জ্য : ছোবড়া, রসের ছিটা, রঙিন জৈব বস্তু, ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট প্রভৃতি। বর্জ্য পানির বৈশিষ্ট্য: pH এর পরিবর্তন ঘটে, BOD বেড়ে যায়, পানিতে দ্রবীভূত কার্বনঘটিত পদার্থ ও ভাসমান পদার্থ প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে, পানির রঙ নষ্ট হয় এবং তাতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়।

৬. রাসায়নিক সার শিল্প : সার: ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সুপার ফসফেট [$Ca(H_2PO_4)_2 + CaSO_4 . 2H_2O$] ট্রিপল সুপার ফসফেট, [$Ca(H_2PO_4)_2$], মনো-অ্যামোনিয়াম ও ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট, অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য তরল সার।

কাঁচামাল : H_2SO_4, H_3PO_4, HCl, HNO_3, $Ca_3(PO_4)_2$, NH_3 প্রভৃতি।

বর্জ্যের উৎস : কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত অম্লের ও উৎপাদিত সারের ছিটা, বয়লায়ের ভস্ম ও ময়লা।

বর্জ্যমিশ্রিত পানির বৈশিষ্ট্য : অ্যামোনিয়া উৎপাদনের বর্জ্যপানি তীব্র ক্ষারীয়, গ্যাস পরিষ্কারকরণ ব্যবস্থা থেকে NH_3 পানিতে মেশে। ফসফোরিক অ্যাসিড উৎপাদনের বর্জ্যপানি তীব্র অম্লীয়। এতে প্রচুর ফসফেট ও ভাসমান কঠিন কণা থাকে। উক্ত বর্জ্যপানি যখন জলাধারে মেশে তখন তাতে প্রচুর শৈবাল জন্মে এবং জলাশয়ের ইউট্রোফিকেশন ঘটে। ফসফেট সার উৎপাদনের বর্জ্যে প্রচুর পরিমাণ ফ্লোরাইড থাকে (1000 mg /L এর বেশি) ঐরূপ বর্জ্য-মিশ্রিত পানি পান করা হলে মানুষের দাঁত ও হাড়ে ফ্লুরোসিস (fluorosis) হতে পারে এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতি হতে পারে।

৭. সাবান শিল্প : কাঁচামাল - প্রধানত চর্বি ও ক্ষার ।

বর্জ্যের উৎস : বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ ধাপের বর্জ্য, ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের ছিটা ও কর্মস্থলে মেঝের ময়লা।

বর্জ্যমিশ্রিত পানির বৈশিষ্ট্য : পানি ক্ষার, চর্বি ও ভাসমান কঠিন কণাযুক্ত হয়, পানির COD ও BOD বেড়ে যায়।

৮. ডিটারজেন্ট শিল্প : কাঁচামাল - প্রধানত দীর্ঘ শিকল ফ্যাটি অম্ল যেমন, অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনেট (ABS) এবং পলিফসফেট (বিল্ডার)।

বর্জ্যের উৎস: ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের ছিটা ও মেঝের ময়লা।

বর্জ্য মিশ্রিত পানির বৈশিষ্ট্য : সাধারণত তীব্র ক্ষারীয়, ABS ও অন্যান্য তল-সক্রিয় উপাদান, ফসফেট, সোহাগা (borax) প্রভৃতি পানিতে মেশে, এগুলো জৈবিক অবিভাজনীয়। পানিতে ফেনা সৃষ্টি হয় যা জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর। ফসফেটযুক্ত হওয়ার ফলে জলাধারে শৈবালের বিস্তার এবং জলাধারের ইউট্রোফিকেশন ঘটতে পারে।

প্রশ্নমালা

১. পানির দূষককে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং কি কি? প্রত্যেক শ্রেণীর উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২. পানিতে যে অজৈব দূষণ সৃষ্টি হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩. প্রাকৃতিক পানিতে তলানি সৃষ্টি হওয়ার কৌশল এবং পানির মানের উপর তলানির প্রভাব আলোচনা কর।

৪. প্রাকৃতিক পানিতে তাপীয় দূষণ কিভাবে ঘটে?

৫. পেস্টিসাইড কি? বিভিন্ন শ্রেণীর পেস্টিসাইড পরিবেশের উপর যে প্রভাব ফেলে তা আলোচনা কর। পেস্টিসাইড প্রকৃতিতে কিভাবে ধ্বংস হয় এবং জীবের উপর কিভাবে এরা বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে? পেস্টিসাইডের বিকল্প কিছু ব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান কর।

৬. ডিটারজেন্ট কি? কিভাবে এটি পানিতে দূষণ সৃষ্টি করে?

৭. PCB ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব আলোচনা কর।

৮. PAH এর উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

৯. BOD ও COD কি? এরা পানির মানের গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্থিতিমাপ কেন?

১০. বর্জ্যপানি পরিশোধনের জন্য যেসব প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে সেগুলো বর্ণনা কর।

১১. বর্জ্য পানি পরিশোধনের ব্যবস্থায় সক্রিয়নকৃত পঙ্ক পদ্ধতি কি? চিত্রের সাহায্যে পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।

১২. ইলেকট্রোডায়লিসিস কি? পদ্ধতিটির সাহায্যে পানির লবণাক্ততা কিভাবে দূর করা যায়- চিত্রের সাহায্যে তা বর্ণনা কর।

১৩. নিম্নলিখিত পানি দূষকের উৎস ও প্রভাব আলোচনা কর:

ক. সায়ানাইড, খ. H_2S, গ. $NO_3^- + NO_2^-$, ঘ. অম্ল ক্ষার, ঙ. তলানি, চ. তেজস্ক্রিয়তা ছ. ডিটারজেন্ট জ.পেস্টিসাইড, ঝ. PCB ঞ. PAH .

গ্রন্থপঞ্জি

1. S.E. Manahan, 'Environmental Chemistry', 6th ed., Lewis Publishers, USA, 1994.

2. Carole L. Hamilton (Introduction), 'Chemistry in the Environment (Collection from Scientific American)' Freeman, USA, 1952-73.

3. M. Harrison & S.J. de Mora, "Introductory Chemistry for the Environmental Sciences', 2nd ed., Cambridge Univ. Press, U.K. 1996.

4. A.K. De., 'Environmental Chemistry`, 3rd ed., Wiley Eastern, India, 1995.

5. S.H. Stoker and S.L. Seager, 'Environmental Chemistry: Air and Water Pollution', Scott Foresman, NY, USA, 1976.

চতুর্থ অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল

(Atmosphere)

৪.১ ভূমিকা

পৃথিবী গ্যাসের একটি আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, উক্ত আবরণকে বায়ুমণ্ডল বলে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার (1 km = 0.62 mile) পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। তবে, যতই ঊর্ধ্বে যাওয়া যায় বায়ুমণ্ডলের চাপ ও ভর ততই হ্রাস পায়। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের চাপ যেখানে 760 mm Hg (1 atm), 50 km ঊর্ধ্বে তা মাত্র 1 mm Hg । পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব প্রায় 1.3×10^{-3} g/cm^3। ঊর্ধ্বদিকে এই ঘনত্ব এমন বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায় যে একটি গ্যাস অণুর গড় মুক্ত পথ (mean free path) সমুদ্রপৃষ্ঠে যেখানে মাত্র 1×10^{-6} cm, 500 km ঊর্ধ্বে তা প্রায় 2×10^{6} cm (প্রায় 12.42 মাইল) অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে একটি কণাকে অপর একটি কণার সংস্পর্শে আসতে যেখানে অতিক্রম করতে হয় গড়ে মাত্র $1{\times}10^{-6}$ cm পথ, 500 km ঊর্ধ্বে সেখানে তার অতিক্রম করা লাগে প্রায় সাড়ে বারো মাইল। বায়ুমণ্ডলের মোট যে ভর (প্রায় 5.0×10^{15} মে.টন; মে.টন = 1000 kg) তার প্রায় 90% ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে মাত্র 16 km এর মাঝে অবস্থান করে।

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6370 km অর্থাৎ পৃথিবীর কাছে বায়ুমণ্ডল, কমলালেবুর কাছে তার পাতলা খোসা যেমন, তেমনি একটি আবরণ। খোসা যেমন লেবুটিকে ঢেকে রেখে বাইরের আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করে, বায়ুমণ্ডলও তেমনি পৃথিবীকে ঢেকে রেখে তার প্রাণী ও উদ্ভিদকে রক্ষা করে চলেছে। বায়ুমণ্ডল যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবী মারাত্মক মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic-ray) ও অতিবেগুনি (uv) রশ্মির বর্ষণে-প্লাবিত জীবনহীন এক গ্রহে পরিণত হতো। দুপুরে সূর্যের প্রখর তাপে এটি দগ্ধ হতো আবার রাতের বেলা বরফে ঢেকে যেতো । পৃথিবীর তাপমাত্রাকে সহনীয় ক্ষুদ্র এক ব্যাপ্তির মাঝে স্থির রেখেছে যেসব নিয়ামক বায়ুমণ্ডল তাদের অন্যতম। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর জীবকে বাইরের আঘাত থেকে কেবল রক্ষাই করে না, জীবের বেঁচে থাকার অক্সিজেন এবং খাবার তৈরির উপাদান যোগান দেয়। মানুষ তথা সমগ্র জীবের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী এই যে বায়ুমণ্ডল, মানুষের দ্বারাই আবার তা প্রতিনিয়ত দূষণের শিকার হচ্ছে। বায়ুমণ্ডল পরিবেশের একটি অঙ্গ। পরিবেশকে বাসোপযোগী রাখতে হলে তাই, বায়ুমণ্ডলকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন বায়ুমণ্ডলের গঠন, বায়ুমণ্ডলের

অন্তর্গত রসায়ন এবং বায়ুমণ্ডল ও পরিবেশের অন্যান্য অঙ্গের পারস্পরিক যে সম্পর্ক তা সম্যকভাবে অনুধাবন করা।

৪.২ বায়ুর উপাদান

বায়ুর মুখ্য উপাদান চারটি - N_2, O_2, CO_2 ও Ar; তাছাড়া, অনির্দিষ্ট পরিমাণের জলীয় বাষ্প (H_2O:0.1-5%) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো কিছু উপাদান বায়ুতে উপস্থিত থাকে (সারণি ৪.১)। উপাদানগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে প্রায় আশি কিলোমিটার পর্যন্ত, প্রাকৃতিক আলোড়নের ফলে, মিশ্রণ আকারে অবস্থান করে এবং অঞ্চলটির সর্বত্র এদের আপেক্ষিক পরিমাণ প্রায় একই থাকে। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুর আণবিক ভর ধরা হয় 28.96 g /mol (উদাহরণ ৪.১)। বায়ুমণ্ডলের মোট ভর প্রায় 5.0×10^{15} মেট্রিক টন, পৃথিবীর যে ভর তার দশ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র।

সারণি ৪.১: সমুদ্র সমতলে দূষণমুক্ত শুষ্ক বায়ুর উপাদান।

উপাদান	% ঘন আয়তন	ঘনমাত্রা, পিপিএম
মুখ্য উপাদান		
N_2	78.08	
O_2	20.95	
*H_2O	0.1-5 (স্থান কালভেদে কমবেশি হয়)।	
Ar	0.934	
CO_2	0.036	360
গৌণ উপাদান		
Ne	1.82×10^{-3}	18.2
He	5.24×10^{-4}	5.24
CH_4	1.8×10^{-4}	1.8
Kr	1.1×10^{-4}	1.1
H_2	5×10^{-5}	0.5
Xe	$0\text{-}8.7 \times 10^{-6}$	0.087
N_2O	5×10^{-5}	0.5
SO_2	$0\text{-}1 \times 10^{-4}$	0-1
O_3	$0\text{-}2 \times 10^{-6}$	0-0.02
NO_2	$0\text{-}2 \times 10^{-6}$	0-0.02
NH_3	$0\text{-}1 \times 10^{-6}$	0-0.01
CO	$0\text{-}1.2 \times 10^{-5}$	0-0.012

* সাধারণ বায়ুতে

উদাহরণ ৪.১: শুষ্ক বায়ুর গড় আণবিক ওজন কত?

বায়ুর আণবিক ওজন বলতে এর মুখ্য উপাদানসমূহের প্রাচুর্যভিত্তিক গড় (weighted average) আণবিক ওজন বুঝায়। শুষ্ক বায়ুর মুখ্য উপাদান চারটি , N_2, O_2, CO_2 ও Ar।

উপাদান	মোল ভগ্নাংশ* × আণবিক ওজন	=বায়ুর ভরে অবদান
N_2	0.7808 × 28.02	= 21.88
O_2	0.2095 × 32.00	= 6.70
Ar	0.00934 × 39.95	= 0.37
CO_2	0.00036 × 44.01	= 0.01
∴ গড় ওজন		= 28.96

* % ঘনআয়তন = % মোল।

৪.৩ বায়ুমণ্ডলের গঠন (composition)

ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে প্রায় 500 km পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। উচ্চতার সাথে তাপমাত্রার ওঠানামার যে ধারা তার উপর ভিত্তি করে সমগ্র বায়ুমণ্ডলকে প্রধান চারটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। যথা, ট্রোপোস্ফেয়ার (troposphere), স্ট্রাটোস্ফেয়ার (stratosphere), মেসোস্ফেয়ার (mesosphere) ও থার্মোস্ফেয়ার (thermosphere)। এছাড়া ট্রোপোস্ফেয়ার ও স্ট্রাটোস্ফেয়ার এর মধ্যবর্তীস্থানে ট্রোপোপজ (tropopause), স্ট্রাটোস্ফেয়ার ও মেসোস্ফেয়ার এর মধ্যবর্তীস্থানে স্ট্রাটোপজ (stratopause) এবং মেসোস্ফেয়ার ও থার্মোস্ফেয়ার এর মধ্যবর্তীস্থানে মেসোপজ (mesopause) নামে ক্ষুদ্র তিনটি স্তরকে পৃথক করা হয়। ট্রোপোপজ, স্ট্রাটোপজ ও মেসোপজ এর তাপমাত্রা স্থির থাকে। নিচে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চল এবং তাদের প্রধান প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো (সারণি ৪.২ ও চিত্র ৪.১)।

সারণি ৪.২: বায়ুমণ্ডলের মুখ্য অঞ্চল এবং তাদের বৈশিষ্ট্য।

অঞ্চল	ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা,km	তাপমাত্রার ব্যাপ্তি*,°C	মুখ্য উপাদান
ট্রোপোস্ফেয়ার	0 - 11	15 থেকে -56	N_2, O_2, CO_2, H_2O
স্ট্রাটোস্ফেয়ার	11 – 50	-56 থেকে -2	O_3
মেসোস্ফেয়ার	50 – 85	-2 থেকে -92	O_2^+, NO^+
থার্মোস্ফেয়ার	85 – 500	-92 থেকে 1200	O_2^+, O^+, NO^+
* অক্ষাংশ (latitude) ও ঋতুভেদে প্রকৃতমান কিছুটা কম বেশি হয়।			

বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার ওঠানামার ধারা: বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে যতই নিচের দিকে আসা যায়, তাপমাত্রা থার্মোস্ফেয়ার ও স্ট্রাটোস্ফেয়ারে ততই হ্রাস এবং মেসোস্ফেয়ার ও ট্রোপোস্ফেয়ারে ততই বৃদ্ধি পায়। উচ্চতার সাথে তাপমাত্রার যে পরিবর্তন ঘটে তার হারকে বায়ুমণ্ডলের বিলোপন হার (lapse rate), উপর থেকে নিচের দিকে তাপমাত্রা হ্রাস পেলে বিলোপন হারকে ধনাত্মক (+) এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিলোপন হারকে ঋণাত্মক (-) বিলোপন হার বলা হয়ে থাকে। উক্ত সংজ্ঞানুসারে, থার্মোস্ফেয়ার ও স্ট্রাটোস্ফেয়ারে বিলোপন হার ধনাত্মক (+) এবং মেসোস্ফেয়ার ও ট্রোপোস্ফেয়ারে বিলোপন হার ঋণাত্মক (-)। বায়ুমণ্ডলের অঞ্চলভেদে বিলোপন হারের [illegible] বৈশিষ্ট্য

প্রধানত তিনটি নিয়ামক দ্বারা নির্ধারিত হয়; যথা- আপতিত সূর্যরশ্মির তীব্রতা, বিকিরণ-শোষক উপাদানের প্রাচুর্য এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রত্যাগত বিকিরণের তীব্রতা।

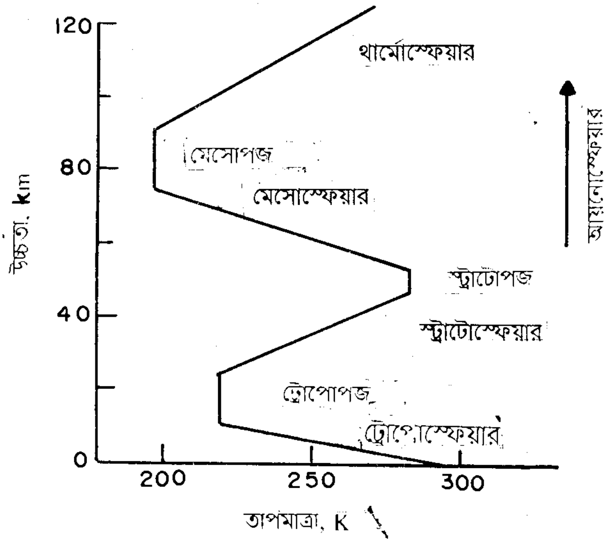

চিত্র ৪.১ : বায়ুমণ্ডলের অঞ্চলসমূহ।

থার্মোস্ফেয়ার ও স্ট্রাটোস্ফেয়ারে তাপমাত্রা পরিবর্তনের ধারা : থার্মোস্ফেয়ার ও স্ট্রাটোস্ফেয়ার উভয় অঞ্চলে বিলোপন হার ধনাত্মক। সূর্যের যে বিকিরণ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তা অতিবেগুনি থেকে অবলোহিত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে (বর্ণালি চিত্র ৪.২)। বায়ুমণ্ডলের মুখ্য দুটি উপাদান N_2 ও O_2 উচ্চশক্তিসম্পন্ন অতিবেগুনি বিকিরণ ব্যতীত সূর্যরশ্মির অন্য কোনো বিকিরণ এরা শোষণ করতে পারে না (উদাহরণ ৪.২)। সূর্যরশ্মি যখন থার্মোস্ফেয়ারে প্রবেশ করে তখন 242 nm এর নিম্নতর যে অতিবেগুনি বিকিরণ তা প্রধানত O_2 দ্বারা শোষিত হয়:

$$O_2(g) \xrightarrow{h\nu} O + O\ (\lambda < 242\ \text{nm})\ ।$$

এতে দুটি ঘটনা ঘটে; এক. মেসোস্ফেয়ারে অক্সিজেন পরমাণুর ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত, ভূপৃষ্ঠ থেকে 100 km এর উর্ধ্বে O_2 এর তুলনায় O এর ঘনমাত্রা বেশি থাকে। দুই. বিকিরণের শক্তি O পরমাণুতে স্থানান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাপশক্তি আকারে তা প্রকাশ পায় ফলে থার্মোস্ফেয়ারে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে। তবে, সূর্যরশ্মি থার্মোস্ফেয়ারের যত গভীরে প্রবেশ করে, অতিবেগুনি বিকিরণের তীব্রতা তত হ্রাস পেতে থাকে। এতে O সৃষ্টি তথা তাপের উৎপাদনও ক্রমশ হ্রাস পায় এবং মেসোপজে এসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন মানে পৌঁছায় (সর্বোচ্চ 1200 থেকে -92°C)।

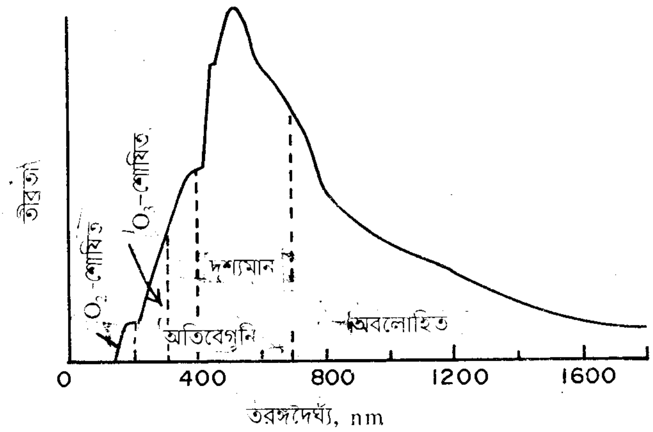

চিত্র ৪.২: সৌর বর্ণালি।

স্ট্রাটোস্ফেয়ারে বিলোপন হার ধনাত্মক হওয়ার জন্য দায়ী থাকে দুটি ঘটনা — ওজোনের (O_3) উৎপত্তি এবং ওজোন কর্তৃক অতিবেগুনি বিকিরণ (200-300 nm) শোষণ। স্ট্রাটোস্ফেয়ার ও উচ্চতর অঞ্চলে (থার্মোস্ফেয়ার ও মেসোস্ফেয়ার) যে O উৎপন্ন হয়, O_2 এর সাথে যুক্ত হয়ে তা O_3 গঠন করে। এ সময় যে শক্তি নির্গত হয়, O_3 তা শোষণ করে নেয় এবং উত্তেজিত হয়ে পড়ে। উত্তেজিত O_3 এর স্থিতিশীলতা খুব কম। গঠিত হওয়ার সাথে সাথে উত্তেজিত O_3 যদি তৃতীয় একটি বস্তুতে (M) তার অতিরিক্ত শক্তি ছেড়ে দিতে না পারে তাহলে O_3 এর আবার O_2 ও O পরমাণুতে বিভাজন ঘটে। পরিবেশে M এর প্রাচুর্য যত কম থাকে, O_3 এর পক্ষে M এর সংস্পর্শে আসার সম্ভবনা তত হ্রাস পায় এবং O_3 তত বেশি অস্থিতিশীল হয়:

$O_2(g) + O \rightleftharpoons O_3^*$ (অস্থিতিশীল, উত্তেজিত);

$O_3^* + M \rightleftharpoons O_3$ (স্থিতিশীল, অনুত্তেজিত) $+ M$

M এখানে O_2, N_2 কিংবা অন্য কোনো অণু। স্ট্রাটোস্ফেয়ারে পর্যাপ্ত সংখ্যক M উপস্থিত থাকে ; O_3 তাই এখানে স্থিতিশীল হয় এবং এর গড় ঘনমাত্রা 1.5 ppm এ পৌঁছায়। স্ট্রাটোস্ফেয়ার থেকে যত ঊর্ধ্বে যাওয়া যায়, M এর প্রাচুর্য তত হ্রাস পায় এবং থার্মোস্ফেয়ারে এসে তা একেবারেই নগণ্য হয়ে যায় (গড় মুক্তপথ $\cong 2 \times 10^6$cm)। থার্মোস্ফেয়ারে তাই O_3 স্থিতিশীল হতে পারে না। যাহোক, O_3 অতিবেগুনি বিকিরণের দক্ষ একটি শোষক, এটি 220 - 330 nm এর বিকিরণ শোষণ করে। শোষিত বিকিরণের শক্তি তাপশক্তি আকারে প্রকাশ পায় যার দ্বারা স্ট্রাটোস্ফেয়ারে তাপমাত্রা পরিবর্তনের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সূর্যরশ্মি স্ট্রাটোস্ফেয়ারের ভিতর দিয়ে যত নিচে নামতে থাকে, তাতে অতিবেগুনি বিকিরণের পরিমাণ তত হ্রাস পায় কেননা O_3কর্তৃক UV বিকিরণ প্রবলভাবে ক্রমাগত শোষিত হয়। উক্ত ঘটনার পরিণতিতে তাপমাত্রাও স্ট্রাটোস্ফেয়ারের উপর (তাপমাত্রা -2°C) থেকে নিচের দিকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে (বিলোপন হার ধনাত্মক) সর্বনিম্ন -56°C এ পৌঁছায়। এভাবে, থার্মোস্ফেয়ার ও স্ট্রাটোস্ফেয়ার মিলে সূর্যরশ্মির প্রায় সমগ্র অতিবেগুনি বিকিরণ শোষণ করে নেয় এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠে সূর্যরশ্মির যে ভগ্নাংশ এসে পৌঁছায় তাতে অতিবেগুনি বিকিরণ থাকে না বললে চলে।

মেসোস্ফেয়ার ও ট্রোপোস্ফেয়ারে তাপমাত্রা পরিবর্তনের ধারা : মেসোস্ফেয়ারে ও ট্রোপোস্ফেয়ারে বিলোপন হার ঋণাত্মক (-) অর্থাৎ এই দুই অঞ্চলে উপর থেকে নিচের দিকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। মেসোস্ফেয়ারে, স্ট্রাটোস্ফেয়ারের মতো, ওজোন সৃষ্টি ও ওজোন কর্তৃক অতিবেগুনি বিকিরণ শোষণ এই দুই ঘটনা দ্বারা তাপমাত্রা-পরিবর্তনের ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। থার্মোস্ফেয়ারে তৃতীয় কণার (M) উপস্থিতি নগণ্য বলে O_3 সেখানে স্থিতিশীল হতে পারে না। কিন্তু মেসোপজ (তাপমাত্রা -92°C) থেকে নিচের দিকে মেসোস্ফেয়ারের যত গভীরে প্রবেশ করা যায় M এর প্রাচুর্য তত বৃদ্ধি পায়। ফলে, O_3 এর ঘনমাত্রা ও অতিবেগুনি বিকিরণের শোষণ তথা তাপমাত্রার বৃদ্ধি তত প্রবল হতে থাকে এবং মেসোস্ফেয়ারের নিম্নতম প্রান্তে এসে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ −2°C এ উপনীত হয়।

ট্রোপোস্ফেয়ারে তাপমাত্রা পরির্তনের যে ধারা তার জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিক্ষিপ্ত (emitted) তাপশক্তি কার্যত দায়ী থাকে। সূর্যরশ্মি বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে স্ট্রাটোস্ফেয়ারের নিম্নতম প্রান্তে যখন পৌঁছে তখন তা থেকে অতিবেগুনি বিকিরণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। অবশিষ্ট যে বিকিরণ (300-20,000 nm) ট্রোপোস্ফেয়ারে প্রবেশ করে তার একটি ভগ্নাংশ (অবলোহিত 7-20μm) জলীয় বাষ্প (H_2O), CO_2, CH_4 প্রভৃতি গ্যাসে এবং অপর একটি ভগ্নাংশ (প্রধানত, দৃশ্যমান 400-700 nm) ভূ-পৃষ্ঠ ও সমুদ্রপৃষ্ঠে শোষিত হয়। ভূপৃষ্ঠে শোষিত বিকিরণ মূলত তাপশক্তি আকারে (অবলোহিত বিকিরণ: 2-40 μm) আবার ট্রোপোস্ফেয়ারে ফিরে আসে। এতে বায়ুমণ্ডলের ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন স্তর উষ্ণ থাকে এবং এর গড় তাপমাত্রা প্রায় 15°C এ অবস্থান করে। বায়ুপ্রবাহের আলোড়নে সমগ্র ট্রোপোস্ফেয়ার জুড়ে উপাদানগুলোর প্রায় সমসত্ত্ব একটি মিশ্রণ সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিক্ষিপ্ত বিকিরণ উক্ত মিশ্রণ ভেদ করে যত উপরে ওঠে মিশ্রণের উপাদানগুলো দ্বারা তা তত শোষিত হয় এবং ক্রমাগত তীব্রতা হারায়। ফলে, ভু-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় তাপমাত্রা তত হ্রাস পায় এবং ট্রোপোস্ফেয়ারের উচ্চতম প্রান্তে এসে তা সর্বনিম্ন মানে (-56°C) পৌঁছায়।

ট্রোপোস্ফেয়ার ও স্ট্রাটোস্ফেয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ট্রোপোপজ বলে। ট্রোপোপজ বেশ পুরু ও ঠাণ্ডা (-56°C) একটি স্তর, জলীয় বাষ্প এখানে কঠিন বরফে পরিণত হয়ে ট্রোপোস্ফেয়ারের উপরে পুরু শীতল একটি ঢাকনার মতো অবস্থান করে।

বরফের ঐ ঢাকনা ভেদ করে জলীয় বাষ্প ট্রোপোস্ফেয়ারের উর্ধ্বে যেতে পারে না। ঘটনাটি পৃথিবীর জন্য বিরাট একটি আশির্বাদ, ট্রোপোপজে বরফের ঢাকনা না থাকলে, জলীয়বাষ্প ট্রোপোস্ফেয়ার অতিক্রম করে স্ট্রাটোস্ফেয়ারে উঠে যেত এবং সেখানে উচ্চতর তাপমাত্রা ও শক্তিশালী অতিবেগুনি বিকিরণের আঘাতে তা H_2 ও O_2 এ বিভাজিত হতো। এভাবে পৃথিবী হয়ত একদিন পানিশূন্য ধূলিবালুতে ঢাকা একটি গ্রহে পর্যবসিত হতো।

উদাহরণ ৪.২: O_2 এর বন্ধনশক্তি 494 kJ/mol; কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণে এটি পরমাণুতে বিভাজিত হবে? ধরে নিতে হবে, একটি ফোটন বিভাজন ঘটায়।

$$494 \times 10^3 \text{ j/mol} \times \frac{1-\text{mol}}{6.02 \times 10^{23} O_2} = 8.21 \times 10^{-19} \text{ J}/O_2$$

$$\nu = \varepsilon/h = 8.21 \times 10^{-19} \text{J} / (6.63 \times 10^{-34}) \text{ J. s.} = 1.24 \times 10^{15} /\text{s}$$

$$\therefore \lambda = c/\nu = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{1.24 \times 10^{15} /\text{s}} = 2.42 \times 10^{-7} \text{ m} = 242 \text{ nm}$$

[N_2-এর বন্ধনশক্তি 942 kJ/mol; একইভাবে হিসাব করে দেখানো যায়, N_2 পরমাণুতে বিভাজিত হতে 13 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ প্রয়োজন] ।

৪.৪ বায়ুমণ্ডলের অভিব্যক্তি (Evolution)

সূর্য ও গ্রহপুঞ্জের বয়স প্রায় পাঁচশ কোটি বছর। সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবীর কোনো বায়ুমণ্ডল ছিল কিনা কিংবা থাকলে তা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। আদিতে পৃথিবীর কোনো বায়ুমণ্ডল থাক বা না থাক, পরবর্তী সময়ে এতে একপ্রকার বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত, পৃথিবীর কঠিন আবরণের নিচে আটকে-থাকা গ্যাস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে মুক্ত হয়ে ঐ বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ঐ আদিম বায়ুমণ্ডলের উপাদান কি কি ছিল তা CH_4, NH_3 এর মতো বিজারিত গ্যাসে সমৃদ্ধ ছিল, না CO_2, H_2O, SO_2 এর মতো জারিত গ্যাসে সমৃদ্ধ ছিল সে ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। তবে, বিজ্ঞানীরা একটি বিষয়ে একমত, আদিম বায়ুমণ্ডলে মুক্ত O_2 হয় একেবারেই ছিল না, না হয় অতি নগণ্য মাত্রায় ছিল। মতটির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি, O_2 অত্যন্ত সক্রিয় একটি গ্যাস, পৃথিবীতে আদিম যে পরিবেশ ছিল তাতে মুক্ত অবস্থায় থাকা O_2 এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভূ-পৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে অন্যান্য মৌলের সাথে যৌগ গঠন করে (যেমন, CO_2, H_2O, ধাতব অক্সাইড প্রভৃতি) আবদ্ধ অবস্থায় থাকাই মৌলটির পক্ষে স্বাভাবিক। ধারণাটির স্বপক্ষে ভূতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণও পাওয়া যায় এবং সাক্ষ্যগুলো এরূপ ইঙ্গিতও দেয়, পৃথিবীর জন্ম থেকে প্রায় তিনশ কোটি বছর পর (আজ থেকে দুশ কোটি বছর আগে) মুক্ত O_2এর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ শুরু হয়। উক্ত O_2 এর কিছুটা হয়ত এসেছে জলীয় বাষ্পের আলোক বিভাজন

(photolysis) থেকে [$2H_2O(g) \xrightarrow{h\nu} H_2(g) + O_2(g)$; $H_2(g)$ মহাশূন্যে মিশে গেছে] তবে বায়ুমণ্ডলে মুক্ত O_2 এর প্রধান যোগানদাতা সম্ভবত জৈবিক প্রক্রিয়া। পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব ঘটার পর (আজ থেকে প্রায় দুশ কোটি বছর আগে) কোনো এক পর্যায়ে এমন কিছু উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় যেগুলো CO_2 ও H_2O এর সাহায্যে, সালোকসংশ্লেষণ (photosynthesis) প্রক্রিয়ায় শক্তির পরিবেশক উপাদান হিসেবে গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়:

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{h\nu} C_6H_{12}O_6 + 6O_2(g) \quad (৪.১)$$

এবং বিক্রিয়াটির উপজাত O_2 (g) বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হতে থাকে। ঐ সকল আদিম জীব গ্লুকোজকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে ভেঙ্গে সঞ্চিত শক্তিকে মুক্ত করত এবং জৈবিক প্রক্রিয়া সম্পাদনে তা ব্যবহার করত:

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[\text{বিভাজন}]{\text{জৈবিক}} 2CH_3CHOHCOOH + \text{শক্তি} \quad (৪.২)$$

এভাবে এক পর্যায়ে বায়ুমণ্ডলে O_2 এর আংশিক চাপ (partial pressure) যখন বেড়ে যায় তখন এমন এক জীবের উদ্ভব ঘটে যা বায়ুমণ্ডল থেকে O_2 সরাসরি গ্রহণ করে এনজাইমের অনুঘটনে গ্লুকোজকে CO_2 ও পানিতে বিভাজিত করতে সক্ষম হয়।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \xrightarrow{\text{এনজাইম}} 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি} \quad (৪.৩)$$

জৈবিক এই প্রক্রিয়াটি শ্বাস-প্রশ্বাস (respiration) নামে পরিচিত। সাধারণত, বিক্রিয়া (৪.১) ও (৪.৩) এর মাধ্যমে প্রকৃতির অজৈব কার্বন (CO_2) জৈব কার্বনে ($C_6H_{12}O_6$) এবং জৈব কার্বন অজৈব কার্বনে চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে যার পরিণতিতে অতিরিক্ত O_2 বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হতে পারে না। তবে, কখনো কখনো জৈব কার্বন হ্রদ কিংবা সমুদ্রতলে পলি হিসেবে আটকা পড়ে। তখন, তার তুল্য পরিমাণ অক্সিজেন কার্বন-অক্সিজেন চক্র থেকে বেরিয়ে আসে এবং বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অবস্থায় অথবা ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভে যৌগিক অবস্থায় তা অবস্থান করে। বর্তমানে পাললিক শিলায় (sedimentary rock) মোট যে কার্বন আবদ্ধ হয়ে আছে তার ভিত্তিতে হিসাব করে দেখানো যায় কার্বন-অক্সিজেন চক্র থেকে 2×10^{22} g অক্সিজেন (O_2) বেরিয়ে এসেছে। উক্ত অক্সিজেন-এর প্রায় 1.9×10^{22} g অজৈব খনিজ বস্তুর মাঝে যৌগিক অবস্থায় এবং অবশিষ্ট 1×10^{21}g বায়ুমণ্ডলে মুক্ত O_2 আকারে অবস্থান করছে বলে ধারণা করা হয় (উদাহরণ ৪.৩)।

নাইট্রোজেনও বায়ুমণ্ডলের আদিম অবস্থা থেকে এতে উপস্থিত আছে। গ্যাসটি নিষ্ক্রিয় ও অপেক্ষাকৃত ভারি বলে বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অবস্থায় ও বিশাল পরিমাণে (78%) এর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে, ব্যাখ্যাটির একটি দুর্বলতা, নিওন (Ne)-এর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য না। নিওনও নাইট্রোজেনের মতো

নিষ্ক্রিয় ও অপেক্ষাকৃত ভারি একটি গ্যাস অথচ বায়ুমণ্ডলে এর উপস্থিতি নগণ্য (0.0018%)। বিষয়টির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

উদাহরণ ৪.৩ : পাললিক শিলার পরিমাণ 2×10^{24}g; এতে জৈব কার্বনের গড় প্রাচুর্য 0.4%। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখাও, প্রকৃতির কার্বনচক্র থেকে কি পরিমাণ অক্সিজেন বেরিয়ে এসেছে?

$$\text{শিলায় আবদ্ধ মোট জৈব কার্বন} = 2 \times 10^{24}\text{ g শিলা} \times \frac{0.004\text{-g C}}{1\text{-g শিলা}} = 8 \times 10^{21}\text{-g C}$$

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{h\nu} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

$$\therefore 6C \equiv C_6H_{12}O_6 \text{ (জৈব -C)} \equiv 6O_2$$

অর্থাৎ, C - এর এক পরমাণু শিলায় আবদ্ধ হলে এক অণু অক্সিজেন (O_2) উদ্বৃত্ত হয়।

$$\therefore \text{C- চক্র থেকে বেরিয়ে আসা } O_2 = 8 \times 10^{21}\text{g C} \times \frac{1\text{-mol}}{12\text{-g C}} \times \frac{1\text{-mol } O_2}{1\text{-mol C}} \times \frac{32\text{-g } O_2}{1\text{-mol } O_2} = 2 \times 10^{22}\text{ g}$$ ।

৪.৫. গ্রীন হাউজ প্রভাব (Green-house effect)

প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ ও তুষারপাতের আঘাত থেকে গাছের চারাকে রক্ষা করার জন্য শীতপ্রধান দেশে এক প্রকার কাচের ঘর ব্যবহার করা হয়, উক্ত ঘরকে 'গ্রীন-হাউজ' বলে। দিনের বেলা সূর্যের তাপে কাচের ঘর উত্তপ্ত হয় এবং রাতের বেলায়ও সে তাপের একটি ভগ্নাংশ ঘরের মাঝে আটকা থাকে। ফলে, গাছের চারার জন্য অনুকূল যে উষ্ণতা, দিন রাত সর্বদা তা কাচের ঘরে রক্ষা পায়। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের নিম্নতর অঞ্চলে(ট্রোপোস্ফেয়ার) এমন কিছু গ্যাস আছে যেগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্গত তাপ (অবলোহিত বিকিরণ) শোষণ করে এবং পরে তার একটি ভগ্নাংশ আবার ভূপৃষ্ঠের দিকে ফেরত পাঠায়। এতে, ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল উষ্ণ থাকে। ঘটনাটি উপরে যে 'গ্রীন হাউজ' এর কথা বলা হয়েছে তার প্রভাবের অনুরূপ বলে বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের আলোচ্য প্রভাবকে 'গ্রীন হাউজ প্রভাব' এবং যেসব গ্যাস উক্ত প্রভাবে ভূমিকা পালন করে তাদের 'গ্রীন হাউজ গ্যাস' বলা হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প (H_2O), CO_2, CH_4, N_2O, CFC ($CFCl_3$ – freon 11, CF_2Cl_2 – freon 12) ও O_3 (ট্রোপোস্ফেয়ারে) এক একটি গ্রীন হাউজ গ্যাস এবং গ্রীন হাউজ প্রভাবে এদের এক একটির যে অবদান তা বায়ুমণ্ডলে তার প্রাচুর্য এবং অবলোহিত বিকিরণ (IR) শোষণকরার ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। গ্রীন হাউজ গ্যাসগুলোর মাঝে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প (H_2O) ও CO_2 এর প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি (সারণি ৪.৩)। গ্রীন হাউজ

প্রভাবে গ্যাস দুটি তাই, মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তবে, প্রাচুর্য কম হলেও বাকি গ্যাসগুলোর ভূমিকা এক্ষেত্রে মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা, ঐসব গ্যাসের কোনো কোনোটির বিকিরণ শোষণ করার ক্ষমতা H_2O কিংবা CO_2 এর তুলনায় বহুগুণ বেশি। আবার কোনো কোনোটি অবলোহিত বিকিরণের এমন অংশ শোষণ করে, H_2O কিংবা CO_2 গ্যাসে যা শোষিত হয় না।

সারণি ৪.৩ : বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রাচুর্য।

গ্যাস	বিদ্যমান প্রাচুর্য ppm	বছরে প্রবৃদ্ধি (%)	CO_2-এর সাপেক্ষে গুরুত্ব
H_2O (প্রাকৃতিক)	1,000-50,000	-	-
CO_2	360	0.4	1
CH_4	1.7	0.6	20
N_2O	0.00031	0.25	200
O_3	0.02	-	-
Freon -11	0.00028	-	12000
Freon-12	0.00048	-	16000

সূত্র :Houghton J.T.*etal* (eds.), Climate change: IPCC Scientific Assessment, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1990.

'গ্রীন হাউজ প্রভাব' নতুন কোনো ঘটনা না। পৃথিবীতে যখন বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে এটি কাজ করে চলেছে এবং ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা 15°C (288K)। বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাস H_2O ও CO_2 উপস্থিত না থাকলে গড় তাপমাত্রা পানির হিমাঙ্কেরও 18° নিচে নেমে যেত অর্থাৎ গ্রীন হাউজ গ্যাস দুটি ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা 33° বাড়িয়ে দিয়েছে যার ফলে পৃথিবীতে জীবনধারণের উপযোগী উষ্ণতা সৃষ্টি হতে পেরেছে। ভূ-পরিবেশের জন্য এমন কল্যাণকর যে গ্রীন হাউজ প্রভাব, সাম্প্রতিককালে তা উদ্বেগেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মানুষেরই কর্মকাণ্ড সে কারণটি সৃষ্টি করেছে। মানুষ তার জাগতিক প্রয়োজনে এমন কিছু কাজ করে চলেছে যাতে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাস, CO_2, CH_4, N_2O ও CFC এর ঘনমাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে (বস্তুত, 'গ্রীন হাউজ প্রভাব' কথাটি বর্তমানে 'অকল্যাণকর' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 'গ্রীন হাউজ গ্যাস' বলতে ঐ গ্যাস চারটিকে বুঝানো হয়। জলীয় বাষ্পকে (H_2O)'গ্রীন হাউজ গ্যাস' শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কেননা, জলীয় বাষ্পের উৎস প্রাকৃতিক এবং পরিবেশে এর ঘনমাত্রা ও প্রভাব পূর্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে)। বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর কথা ধরা যাক, শিল্প বিপ্লবের প্রথমদিকে (ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু) বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনমাত্রা ছিল 270 ppm; বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় 360 ppm-এ পৌঁছেছে। গ্রীন হাউজ গ্যাস যেহেতু ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপশক্তিকে (অবলোহিত বিকিরণ) আবার ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ফেরত পাঠায় তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে গ্রীন হাউজ গ্যাসের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াতে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে (প্রতি দশকে প্রায় 0.3°)এবং তাতে ভূ-

পরিবেশের উপর মারাত্মক কিছু প্রভাব পড়তে পারে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ধারণা, গ্রীন হাউজ গ্যাসের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ইতোমধ্যে কিছুটা (প্রায় 0.5°) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারই প্রভাবে সারাবিশ্বে ঝড় ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিশ্ব-পরিবেশের উপর কিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, একটি প্রকল্পিত মডেলের ভিত্তিতে কম্পিউটারের সাহায্যে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যেমনঃ

১. ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা যদি মাত্র 1.5°C বৃদ্ধি পায় তাহলে শস্যের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গম উৎপাদনের জন্য যে আবহাওয়া প্রয়োজন তা উত্তর গোলার্ধের রাশিয়া, কানাডার মতো ভূখণ্ডে বর্তমান, ঐসব ভূখণ্ডের কৃষিজমি উর্বর এবং গমের ফলনও হয় সেখানে খুব ভালো। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে গম উৎপাদনের জন্য অনুকূল যে আবহাওয়া তা মেরু প্রদেশের দিকে সরে যাবে। মেরু প্রদেশের ভূমি অনুর্বর। তাই, গমের উৎপাদন সে সময় বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেতে পারে।

২. ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার সাথে সমুদ্রের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। সামুদ্রিক পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে সেখানে জৈবিক উৎপাদন তথা জলজ খাদ্যের উৎপাদন হ্রাস পাবে।

৩. ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলে বরফের যে বিশাল স্তূপ ও হিমবাহ রয়েছে তা গলতে থাকবে। এতে সমুদ্রের আয়তন বৃদ্ধি পাবে, পানির স্তর প্রতি দশকে 3 – 10 cm স্ফীত হবে এবং পরিণতিতে একদিন উপকূল অঞ্চল ও বাংলাদেশের মতো সকল নিচু ভূখণ্ড পানিতে নিমজ্জিত হবে।

বহু বিজ্ঞানী আছেন, যারা কম্পিউটারের ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাদের যুক্তি, যে মডেলের ভিত্তিতে কম্পিউটারের বার্তা সংগৃহীত হয়েছে বাস্তব পরিবেশের তুলনায় তা অতি সরল। বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, ও জীবমণ্ডলের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা ভূ-পরিবেশ গঠিত হয়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো অতিশয় জটিল। তাই,সরল ও সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ামকের আলোকে পরিবেশ সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা হলে তাতে অনিশ্চয়তার প্রচুর সম্ভাবনা থাকা স্বাভাবিক। এসব বিজ্ঞানী আরও মনে করেন, গ্রীন হাউজ গ্যাসের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা যেমন বৃদ্ধি পেতে পারে তেমনি এমন কিছু পরিবেশও সৃষ্টি হতে পারে যাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা প্রতিহতও হবে। যেমন, গ্রীন হাউজ গ্যাসের অন্যতম উপাদান CO_2 এর ঘনমাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে উদ্ভিদ তত অধিক পরিমাণে তা শোষণ করবে। ফলে, সবুজ বনানীর বিস্তার ঘটবে এবং অধিক হারে সৌরশক্তি তাতে শোষিত হবে। একইভাবে, ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সমুদ্রের পানিও অধিকহারে বাষ্পীভূত হবে এবং বায়ুমণ্ডলে মেঘের আবরণও ঘনীভূত হবে। এতে বৃষ্টিপাত যেমন বেশি হবে তেমনি মেঘের আবরণ থেকে সৌর বিকিরণ অধিক হারে শূন্যে প্রতিক্ষিপ্ত হবে। উল্লিখিত ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটি ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতাকে

প্রতিহত করবে। কম্পিউটারের ভয়াবহ ঐসব ভবিষ্যদ্বাণী তাই সত্য না হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে এসব বিজ্ঞানী মনে করেন।

গ্রীন হাউজ গ্যাসের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াতে ভূ-পরিবেশের কিরূপ পরিবর্তন ঘটতে পারে সে বিষয়ে বিজ্ঞানী মহলে যেমন বিতর্কই থাক ঘটনাটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। কেননা, যেসব নিয়ামক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে তার কোনো একটিরও যদি আকস্মিক বিরাট কিছু পরিবর্তন ঘটে তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং জীবমণ্ডলের জন্য তা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। গ্রীন হাউজ গ্যাসের বিশেষ করে CO_2 এর ঘনমাত্রা বর্তমানে যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ঐরূপ একটি পরিণতির আশঙ্কা করা মোটেই অযৌক্তিক নয়।

বায়ুমণ্ডলে CO_2 ঘনমাত্রার ক্রমাগত যে বৃদ্ধি ঘটছে তার জন্য প্রধানত দুটি ঘটনা দায়ী - সারা বিশ্বব্যাপী খনিজ জ্বালানির ব্যবহার উত্তরোত্তর উচ্চহারে বৃদ্ধি পাওয়া এবং নির্বিচারে বৃক্ষ-নিধন। খনিজ জ্বালানির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র দুটি — বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইঞ্জিনচালিত যানবাহন। শিল্প বিপ্লবের ফলে একদিকে কলকারখানার প্রসার ও নগরসভ্যতার বিস্তার যেমন ঘটে চলেছে তেমনি সেই সাথে বিদ্যুতের চাহিদা ও যানবাহনের ব্যবহার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রে শক্তির মুখ্য যোগানদাতা (প্রায় 96%) খনিজ জ্বালানি। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, শিল্প বিপ্লবের প্রথম যুগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো শিল্পোন্নত দেশে প্রতিদিন মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার ছিল যেখানে 7×10^4 কিলোক্যালোরি, বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় 23×10^4 কিলোক্যালোরি (প্রায় 325% বৃদ্ধি)। শক্তির মুখ্য যোগানদাতা যেহেতু খনিজ জ্বালানি, শিল্প-বিপ্লোবোত্তর কালে এর ব্যবহার তাই বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

খনিজ জ্বালানি দগ্ধ করে শক্তি আহরণ করা হয়, CO_2 উক্ত প্রক্রিয়ার একটি উপজাত।

$[CH_2O] + O_2 \longrightarrow CO_2\,(g) + H_2O(g) +$ শক্তি ।

প্রায় তিন লক্ষ কোটি (3×10^{12}) মেট্রিক টন প্রাকৃতিক CO_2 প্রতি বছর পরিবেশের মাঝে (জল, বায়ু, জীব ও মৃত্তিকা) পরিক্রমণ করে। প্রাকৃতিক ঐ CO_2 এর সাথে, খনিজ জ্বালানির দহন থেকে প্রতি বছর আরও প্রায় 750 কোটি মেট্রিক টন CO_2 যুক্ত হয়। পরিবেশে CO_2 এর প্রধান গ্রাহক (sink) দুটি — সমুদ্রের পানি ও সবুজ বনানী (সালোকসংশ্লেষী)। মানুষের সৃষ্টি বিপুল পরিমাণ ঐ CO_2এর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গ্রাহক দুটি শোষণ করে নেয়। উদ্বৃত্ত CO_2 বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে যার দরুন গ্যাসটির ঘনমাত্রা বায়ুমণ্ডলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে (প্রতিবছর প্রায় 0.4 ppm) । ঘটনাটির আরও অবনতি ঘটছে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যত বাড়ছে, বাসস্থান, কৃষিজমি, জ্বালানি ও টিম্বারের (timber) প্রয়োজনে সারাবিশ্বে, বিশেষ করে অনুন্নত ও ঘনবসতিপূর্ণ ভূখণ্ডে বনভূমি নির্বিচারে তত ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে

বনভূমিতে CO_2 এর শোষণ হ্রাস এবং বায়ুমণ্ডলে উদ্বৃত্ত CO_2 এর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রীন হাউজ গ্যাসের আর এক উপাদান, মিথেন (CH_4). বায়ুমণ্ডলে এর ঘনমাত্রা ক্রমশ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতিবছর প্রায় 0.6%. গ্যাসটির বিশাল এই প্রবৃদ্ধি হারের কারণ কি তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে, ধারণা করা হয় যানবাহনের ইঞ্জিনে জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন এবং ধানের জমি ও গবাদি পশুর বর্জ্য থেকে উৎপন্ন CH_4 বায়ুমণ্ডলে গ্যাসটির ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান দুটি কারণ। পৃথিবীতে জনসংখ্যা ও যানবহানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে বায়ুমণ্ডলে মিথেনের ঘনমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে এরূপ ধারণা করা হয়। উই এবং ঘুন জাতীয় পোকাও (termites) CH_4 উৎপাদন করে এবং পরিবেশে গ্যাসটির ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াতে এদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকতে পারে। তাছাড়া, কয়লার খনি ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও পরিবহণ ব্যবস্থা থেকেও CH_4 বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC) বা ফ্রিয়ন গ্রীন হাউজ গ্যাসের বিশেষভাবে ক্ষতিকর একটি উপাদান; গ্যাসটি ওজোনেরও বিভাজন ঘটায়। বায়ুমণ্ডলে CFC এর ঘনমাত্রা নগণ্য (প্রায় 0.0005 ppm) তবে এর বিকিরণ-শোষণ ক্ষমতা তীব্র, এক অণু CFC এর বিকিরণ (তাপ) শোষণ প্রায় 15,000 অণু CO_2 এর সমান। ক্লোরোফ্লোরোকার্বন মানুষের তৈরি এক শ্রেণীর গ্যাসীয় পদার্থ। শীতলীকরণ, অ্যারোসল ছিটানো, প্লাস্টিক ফোম ফাঁপানো প্রভৃতি কাজে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশের উপর CFC এর যে ক্ষতিকর প্রভাব তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ সম্মেলনে (মন্ট্রিল প্রোটোকল, ১৯৮৮) গ্যাসটির উৎপাদন পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে এটির উৎপাদন অনেকখানি হ্রাসও পেয়েছে। তবে, গ্যাসটির উৎপাদন ও ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা হলেও অনেকদিন যাবৎ এটি পরিবেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকবে কেননা CFC প্রকৃতিতে বহুদিন টিকে থাকে (কোনো কোনো CFC একশ বছর পর্যন্ত); তাই, যে পরিমাণ CFC ইতিমধ্যে পরিবেশে যুক্ত হয়েছে, আগামী বহু বছর পর্যন্ত তার প্রভাব চলতে থাকবে।

বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইডের (N_2O) প্রাচুর্যও নগণ্য (0.31 ppb) তবে গ্রীন হাউজ প্রভাবে এর ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। কেননা, CO_2 এর তুলনায় এর প্রভাব প্রায় 200 গুণ বেশি তীব্র। গ্যাসটির সঠিক উৎস কি তা জানা যায় না। তবে, ধারণা করা হয়, কৃষি জমিতে ব্যবহৃত নাইট্রেট সার এবং শিল্প কারখানার NO_x নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা থেকে গ্যাসটি উৎপন্ন হয়ে বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়।

উপরে বর্ণিত গ্যাসগুলোর গ্রীন হাউজ প্রভাবে যে গুরুত্ব তা নির্ধারণ করা হয়েছে। বায়ুমণ্ডল অবলোহিত বিকিরণের বিভিন্ন অংশ কম বেশি শোষণ করে। তবে 8 – 12 μm বিকিরণে এটি সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছ (8 – 12 μm বাতায়ন)। উল্লেখ্য, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যে বিকিরণ নির্গত হয় তার সর্বোচ্চ তীব্রতাও উক্ত অঞ্চলে অবস্থান করে। গ্রীন হাউজ

গ্যাসগুলোর প্রত্যেকটিতে 8 – 12 μm বিকিরণের কোনো না কোনো অংশ কিছুটা শোষিত হয় এবং পরে তার একটি ভগ্নাংশ ভূ-পৃষ্ঠের দিকে আবার ফিরে আসে; এতে 8 – 12 μm বাতায়নের স্বচ্ছতা হ্রাস পায় এবং ভূ-পৃষ্ঠে তাপীয় প্রভাব পড়ে। 1980–1990 এর দশকে গ্রীন হাউজ গ্যাসগুলোর বায়ুমণ্ডলে যে ঘনমাত্রা ছিল এবং তাতে 8 – 12 μm বাতায়নের স্বচ্ছতায় তখন যে অবনতি ঘটে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে গ্রীন হাউজ প্রভাবে গ্যাসগুলোর নিম্নরূপ আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়েছেঃ

CO_2 – 55%, CFC 11 ও 12 – 17%, CH_4 – 15%, অন্যান্য CFC – 7% এবং N_2O – 6%

ট্রোপোস্ফেয়ারীয় ওজোনেরও এতে কিছুটা ভূমিকা থাকতে পারে তবে তার মাত্রা অনির্দিষ্ট।

[সূত্র : J.T. Houghton *et al.* eds., Climate Change: The IPCC Scientific Assessment, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1990].

পরিবেশে গ্রীন হাউজ গ্যাসের অবাঞ্ছিত প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় সুপারিশ করেছেন। গ্রীন হাউজ প্রভাবে CO_2 এর ভূমিকা যেহেতু মুখ্য তাই পরিবেশে CO_2 ঘনমাত্রার উত্তরোত্তর যে বৃদ্ধি ঘটছে (প্রতিবছর 0.4%) তা নিয়ন্ত্রণ করার উপর সুপারিশে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং প্রধান দুটি সুপারিশ রাখা হয়েছে এরূপ:

১. জীবাশ্ম জ্বালানির (গ্যাস, তেল ও কয়লা) ব্যবহার কমাতে হবে এবং

২. গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমি (tropical rain forest) যেভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে।

জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হলে শক্তির বিকল্প এমন কিছু উৎস খুঁজতে হবে যা CO_2 সৃষ্টি করে না। সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, পানিবিদ্যুৎ (hydroelectricity), ভূ-তাপীয় (geothermal) ও নিউক্লিয় শক্তি জীবাশ্ম জ্বালানির ঐরূপ বিকল্প এক একটি উৎস হতে পারে। সৌর ও বায়ুশক্তির ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং ছোট ছোট প্রকল্প পর্যায়ে তা সীমিত রয়েছে। নিউক্লিয় শক্তিও অনেক দেশে কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। তবে, এতে ভিন্নরকম ঝুঁকিও আছে। নিউক্লিয় প্রতিষ্ঠানে 'চেরনোবিল' এর মতো দুর্ঘটনা ঘটলে পরিবেশে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় দূষণ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অন্যদিকে বৃক্ষনিধনের সাথে যেসব কারণ জড়িত(অসাধু টিম্বার ব্যবসায়ী চক্রের অর্থলোভ, ভূমিহীন বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কৃষিজমি, আবাস ভূমি, জ্বালানির প্রয়োজন, প্রভৃতি) সেগুলো এতই জটিল যে, সমস্যাটির সমাধান সহজ নয়।

পরিবেশে CO_2 ঘনমাত্রার উত্তরোত্তর যে বৃদ্ধি ঘটছে তা রোধের লক্ষ্যে যেমন সুপারিশই করা হোক, বাস্তব অবস্থা এখনও ভিন্নরকম - CO_2 উৎপাদী জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার প্রতিবছর বাড়ছে। তাই বিশেষজ্ঞমহলের অনেকে মনে করেন,

জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের হার কমানো নয়, ব্যবহারের হার যে হারে বাড়ছে তা কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণই আপাতত বাস্তব সম্মত হবে। যাহোক, গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি (global warming) অনেকে যেমন মনে করেন, সত্যিসত্যি তেমনি গুরুতর একটি সমস্যা যদি হয় তবে বিজ্ঞানীদের দেয়া সুপারিশ দুটি ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪.৬ পৃথিবীতে তাপমাত্রার ভারসাম্য (Balance of Temperature on Earth)

চাঁদে যখন দিন তখন সেখানে তাপমাত্রা 100°C পর্যন্ত ওঠে এবং যখন রাত তখন সেখানে তাপমাত্রা -150°C পর্যন্ত নামে অর্থাৎ দিন ও রাতের মাঝে চাঁদের পৃষ্ঠে তাপমাত্রার ব্যবধান 250°। উক্ত ঘটনার বিপরীতে পৃথিবী পৃষ্ঠের কোনো স্থানে দিন ও রাতের মাঝে তাপমাত্রার যে পার্থক্য তা মাত্র কয়েক ডিগ্রি। চাঁদ ও পৃথিবী , উভয় স্থানে শক্তির উৎস একই সূর্য হওয়া সত্ত্বেও স্থান দুটিতে তাপমাত্রা ওঠানামার এই যে বিরাট পার্থক্য তার জন্য এদের পরিবেশগত ভিন্নতা দায়ী। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, বনভূমি, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও সমুদ্রস্রোতের সম্মিলিত প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা সংকীর্ণ এক গণ্ডির মাঝে সীমিত থাকে। চাঁদের পৃষ্ঠে উক্ত নিয়ামকগুলো অনুপস্থিত তাই সেখানে তাপমাত্রার ওঠানামায় এক চরম অবস্থা সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের কথা ধরা যাক; পৃথিবী প্রায় 500 কিলোমিটার পুরু একটি বায়ুমণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত। বায়ুমণ্ডলের মুখ্য উপাদান পাঁচটি নাইট্রোজেন (N_2), জলীয় বাষ্প (H_2O), অক্সিজেন (O_2), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও আর্গন (Ar); এছাড়া, বিপুল পরিমাণ বস্তুকণাও (particulates) বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে।

যে বিপুল পরিমাণ সৌরশক্তি বায়ুমণ্ডলের উপর নিক্ষিপ্ত হয় (1.73×10^{17} ওয়াট), বায়ুমণ্ডলের আবরণ না থাকলে, তার সবটুকু ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসতো এবং সমগ্র পৃথিবী জীবনহীন ধূলিঢাকা এক গ্রহে পর্যবসিত হতো। বায়ুমণ্ডলের উপর আপতিত সৌরশক্তির 31% মেঘ, বরফস্তর ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সরাসরি প্রতিফলিত (albedo) এবং 23% বায়ুমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত (scattered) হয়ে আবার শূন্যে ফিরে যায়। অবশিষ্ট কেবল 46% সৌরশক্তি পৃথিবীর মাটি, পানি ও উদ্ভিদ শোষণ করে। সৌরশক্তি অতিবেগুনি (UV), দৃশ্যমান (VIS) ও অবলোহিত (IR) বিকিরণ জুড়ে (200 – 40,000 nm) বিস্তৃত থাকে এবং তাতে দৃশ্যমান বিকিরণের (400 – 700 nm) অবদান থাকে প্রায় 46% । কিন্তু সৌরশক্তির যে ভগ্নাংশ পৃথিবীতে নেমে আসে তা প্রধানত দৃশ্যমান বিকিরণ কেননা বায়ুমণ্ডল দৃশ্যমান বিকিরণে স্বচ্ছ (বিকিরণ শোষিত হয় না)। অতিবেগুনি (<280 nm) ওজোনস্তরে (স্ট্রাটোস্ফেয়ার) এবং অবলোহিত (>1000 nm) CO_2 ও জলীয় বাষ্পে শোষিত হয়। যাহোক, ভূ-পৃষ্ঠের পানিরাশি, উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা সৌরশক্তি শোষণ করে এবং পরে তা আবার বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। সৌরশক্তি যে বিকিরণ আকারেই ভূ-পৃষ্ঠে শোষিত হোক, শক্তি যখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নির্গত হয় তখন তা

অবলোহিত বিকিরণ (তাপশক্তি) আকারে প্রকাশ পায়। কেননা বিকিরণের প্রকৃতি উৎসের তাপমাত্রা নির্ভর (উদাহরণ ৪.৪)। বায়ুমণ্ডলের CO_2 ও জলীয় বাষ্প উক্ত বিকিরণ শোষণ করে পরে তার একটি ভগ্নাংশ শূন্যে নিক্ষেপ করে এবং একটি ভগ্নাংশ আবার ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ফেরত পাঠায়। তাপীয় শক্তির শেষোক্ত ঐ ভগ্নাংশ ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরকে উষ্ণ রাখে, যাকে 'গ্রীন হাউজ প্রভাব' নামে অভিহিত করা হয় (৪.৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উপরে বর্ণিত ঘটনাবলি নির্দেশ করে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এক. সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি ভূ-পৃষ্ঠের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, বায়ুমণ্ডলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তার 50% আবার শূন্যে ফিরে যায় বলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা চাঁদের পৃষ্ঠের মতো তত বৃদ্ধি পেতে পারে না। দুই. ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্গত তাপশক্তির একটি ভগ্নাংশ বায়ুমণ্ডলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আবার ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ফিরে আসে বলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা চাঁদের পৃষ্ঠের মতো তত হ্রাস পেতেও পারে না। বায়ুমণ্ডলের উক্ত দ্বিমুখী প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রার এমন একটি ভারসাম্য স্থাপিত হয় যে, তাপমাত্রা ক্ষুদ্র একটি গণ্ডির মাঝে ওঠানামা করে এবং তার গড়মান দাঁড়ায় প্রায় 15°C ।

ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রার যে ভারসাম্য তার গুরুত্বপূর্ণ আর দুটি নিয়ামক মেঘ ও বস্তুকণা (particulates)। সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ (পুঞ্জীভূত জলীয় বাষ্প) সৃষ্টি হয়। এ সময়ে জলীয় বাষ্প পানি থেকে তাপশক্তি শোষণ করে (বাষ্পীভবন সুপ্ততাপ 580 cal/mol) আকাশে ওঠে এবং দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বাষ্প যখন বৃষ্টিপাত ঘটায় তখন তার সঞ্চিত সুপ্ত-তাপ বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয় যার একটি ভগ্নাংশ আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। মেঘ ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এভাবে ভূ-পৃষ্ঠের তাপ একস্থানে থেকে চারদিকে বিস্তার লাভ করে এবং পরিণতিতে বিভিন্ন স্থানের মাঝে তাপমাত্রার একটি সমতা আসে। পুঞ্জীভূত মেঘ আবার সৌররশ্মির দক্ষ একটি প্রতিফলক। ভূপৃষ্ঠের দিকে যে সৌর-রশ্মি ছুটে আসে মেঘের উপরতল থেকে তার একটি ভগ্নাংশ প্রতিফলিত হয়ে আবার শূন্যে মিলিয়ে যায়। এতে ভূ-পৃষ্ঠে সৌর রশ্মির প্রখরতা হ্রাস পায় এবং তাপমাত্রা সীমিত থাকে।

মেঘের মতো বায়ুমণ্ডলের বস্তুকণাও সৌররশ্মির একটি প্রতিফলক এবং একইভাবে ভূ-পৃষ্ঠে তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা পালন করে। প্রতিবছর প্রায় আড়াইশ কোটি মেট্রিক টন বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয় যার মাঝে প্রায় ছাব্বিশ কোটি মেট্রিক টন বস্তুকণা থাকে মানুষের সৃষ্টি। পৃথিবীতে শিল্পকারখানার প্রসার যত ঘটছে, মানুষের সৃষ্টি বস্তুকণা তত অধিক পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মাঝে অনেকেই তাই মনে করেন, 'গ্রীন হাউজ প্রভাবে' ভূ-পৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে, বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার প্রভাবে তা প্রতিহত হতে পারে।

ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রার ভারসাম্য স্থাপনে বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্র স্রোতের ভূমিকাও বিরাট। ভৌগোলিক অবস্থানভেদে পৃথিবীর এক এক স্থানে বায়ু ও সমুদ্র-পানির উষ্ণতা এক

এক প্রকার। উক্ত বায়ু ও পানি এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন ভূখণ্ডের মাঝে তাপমাত্রার সমতা আনে।

উদাহরণ ৪.৪ : সূর্যের উপরতলে তাপমাত্রা 6000 K এবং ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 288 K; সূর্য ও পৃথিবী থেকে যে বিকিরণ নির্গত হয়, কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তাদের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি থাকে?

কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ সংক্রান্ত বিয়েন সূত্র (Wien's Law) অনুসারে:

নির্গমন চূড়ার তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda_{max} = (2.987 \times 10^3 \mu m \cdot K) / T$

অতএব, সৌরবিকিরণের $\lambda_{max} = 0.5\ \mu m$ বা 500 nm (দৃশ্যমান) এবং

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নির্গত বিকিরণের $\lambda_{max} = 10.3\ \mu m$ বা 10,300 nm (অবলোহিত)।

বস্তুত, সৌরবিকিরণ 0.4 – 0.7 μm (দৃশ্যমান) এবং পৃথিবী থেকে নির্গত বিকিরণ 6-12 μm (অবলোহিত) এর মাঝে সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত থাকে।

৪.৭ বায়ুমণ্ডলে রাসায়নিক ও আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical and Photochemical Reactions in Atmosphere)

বায়ুমণ্ডলে যেসব বিক্রিয়া ঘটে তাদের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানা সম্ভব হয় না কারণ প্রধানত দুটি - এক. বিক্রিয়ক ও উৎপাদ উভয়েরই ঘনমাত্রা প্রায়ই এত নিম্ন থাকে যে, তাদের নির্ভুলভাবে শনাক্ত ও নির্ণয় করা যায় না; দুই. বায়ুমণ্ডলে বিশেষ করে এর উর্ধ্বস্তরে যে পরিবেশে একটি বিক্রিয়া ঘটে, গবেষণাগারে ঐরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না। বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে যেসব বিক্রিয়া ঘটে, সূর্যের বিকিরণ তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিকিরণের সক্রিয় অংশগ্রহণে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাকে আলোক-রাসায়নিক (photochemical) বিক্রিয়া বলে। আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মুখ্য ধাপ দুটি বিক্রিয়ক (reactant) কর্তৃক বিকিরণ শোষণ এবং বিকিরণ শোষণের ফলে উচ্চতর ইলেকট্রনীয় স্তরে বিক্রিয়কের উত্তেজন। পদার্থে ইলেকট্রনীয় উত্তেজন সৃষ্টি হওয়ার জন্য দৃশ্যমান অথবা অতিবেগুনি বিকিরণ প্রয়োজন হয়। অবলোহিত বিকিরণও পদার্থে শোষিত হতে পারে তবে তাতে ইলেকট্রনীয় উত্তেজন ঘটে না, কেবল কম্পন ও ঘূর্ণন স্তরের উত্তেজন ঘটে। যাহোক, ইলেকট্রনীয় স্তরে উত্তেজিত একটি বিক্রিয়ক বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য অতিশয় সক্রিয় থাকে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি তার উত্তেজন শক্তিকে অপসারিত করে। নিচে এরূপ কিছু প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো।

ভৌত অপনোদন (physical quenching) : একটি উত্তেজিত পদার্থ যখন দ্বিতীয় একটি পদার্থে শক্তি স্থানান্তরিত করে অনুত্তেজিত অবস্থায় ফিরে আসে তখন প্রক্রিয়াটিকে ভৌত অপনোদন বলে; যেমন,

$$O_3^* + M \longrightarrow O_3 + M^*$$

['*' উত্তেজিত অবস্থা এবং M উত্তেজন শক্তি অপসারণকারী পদার্থ]

উত্তেজন-শক্তির ভৌত অপনোদন ঘটার জন্য উত্তেজিত কণাকে শক্তি অপসারণকারী কণা, M-এর সংস্পর্শে আসার প্রয়োজন হয় এবং M-যে শক্তি গ্রহণ করে কালক্রমে তা তাপীয় শক্তি আকারে প্রকাশ পায়।

বিভাজন (dissociation) : উত্তেজিত কণার বিভাজন ঘটতে পারে; যেমন,

$$O_2 + h\nu\ (\lambda < 242\ nm) \longrightarrow O_2^* \longrightarrow O + O$$

বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে O_2 এর তুলনায় O ঘনমাত্রা বহুগুণ বেশি থাকে। উপরের বিক্রিয়াটি তার জন্য দায়ী।

প্রত্যক্ষ বিক্রিয়া (direct reactions): এক বস্তুর উত্তেজিত কণার সাথে ভিন্ন কোনো বস্তুর অনুত্তেজিত কণার বিক্রিয়া ঘটতে পারে; যেমন,

$$O_2^* + O_3 \longrightarrow 2O_2 + O$$ ।

দীপ্তি বিচ্ছুরণ (luminiscence): উত্তেজিত কণার অতিরিক্ত শক্তি যখন আবার বিকিরণ আকারে অপসারিত হয় তখন তাকে দীপ্তি বিচ্ছুরণ বলে। যেমন,

$$NO_2^* \longrightarrow NO_2 + h\nu$$

দীপ্তি বিচ্ছুরণ যখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উত্তেজিত একটি কণা থেকে ঘটে তখন তাকে রাসায়নিক দীপ্তি বিচ্ছুরণ (chemiluminiscence) বলে। বায়ুমণ্ডলে অনেক সময় একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা যায় যাকে বায়ুদীপ্তি (air-glow) বলা হয়ে থাকে; ধারণা করা হয়, বায়ুদীপ্তি রাসায়নিক দীপ্তি বিচ্ছুরণের ফল এবং নিম্নলিখিত বিক্রিয়া এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে:

$$H_2O + h\nu\ (\text{অতিবেগুনি}) \longrightarrow H + OH$$
$$O_3 + H \longrightarrow OH^* + O_2$$
$$OH^* \longrightarrow OH + h\nu\ (\text{দৃশ্যমান - অবলোহিত})$$ ।

আলোক-আয়নায়ন বিক্রিয়া (photoionisation reactions): বিকিরণ শোষণের ফলে উত্তেজিত অণু/পরমাণু যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়নে পরিণত হয় তখন তাকে আলোক-আয়নায়ন বিক্রিয়া বলে।সাধারণত উচ্চশক্তিসম্পন্ন অতিবেগুনি বিকিরণ আলোক-আয়নায়ন বিক্রিয়া ঘটায় এবং বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে (> 50 km) এটি ঘটে:

$$N_2 + h\nu \rightarrow N_2^+ + e$$
$$O + h\nu \rightarrow O^+ + e$$
$$O_2 + h\nu \rightarrow O_2^+ + e;\ (\lambda = 17 - 103\ nm)$$ ।

বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বস্তুকণার প্রাচুর্য এতই কম থাকে যে, আয়নায়ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন আয়ন ও ইলেকট্রন দীর্ঘ সময় ব্যাপী মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে। ঐ সময়ের মাঝে এরা এমন কোনো কণার সংস্পর্শে আসতে পারে না যাতে চার্জের প্রশমন ঘটে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 50 km ঊর্ধ্বে বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে তাই আয়নের প্রাচুর্য বেশি থাকে এবং অঞ্চলটিকে আয়নোস্ফেয়ার (ionosphere) নামে অভিহিত করা হয়।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে রেডিও বার্তা যে নিমেষে অপরপ্রান্তে পৌঁছে যায়, সে ঐ আয়নোস্ফেয়ারেরই প্রভাব। উচ্চতর ফ্রিকুয়েন্সির রেডিও তরঙ্গ ঊর্ধ্বাকাশে অবস্থিত আয়নোস্ফেয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌঁছে যায়।

৪.৮ বায়ুমণ্ডলে মুক্ত রেডিকেল (free redicals in atmosphere)

মুক্ত রেডিকেল অযুগ্ম ইলেকট্রনবাহী একশ্রেণীর চার্জবিহীন যৌগ; যেমন, হাইড্রোক্সিল, $\cdot OH$ একটি মুক্ত রেডিকেল। রেডিকেলটির ইলেকট্রনীয় গঠন ব্যাখ্যা করার জন্য H_2O এর যে কোনো একটি O-H বন্ধনের মাঝামাঝি বিভাজন কল্পনা করা যেতে পারে:

$$H{-}O{-}H \rightarrow HO\cdot + \cdot H$$

$\cdot OH$ ও $\cdot H$ উভয়ই চার্জবিহীন এবং উভয়ই একটি করে স্পিনমুক্ত ইলেকট্রন বহন করে। স্পিনমুক্ত একটি ইলেকট্রনের বিপরীত স্পিনযুক্ত দ্বিতীয় একটি ইলেকট্রনের সাথে মিলিত হওয়ার প্রবল আসক্তি থাকে। মুক্ত রেডিকেল তাই অতিমাত্রায় সক্রিয় এবং ফলত অস্থিতিশীল হয়। বায়ুমণ্ডলীয় রসায়নে মুক্ত রেডিকেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে হাইড্রোক্সিল ($\cdot OH$) ও পরক্সি (RO_2) রেডিকেল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

হাইড্রোক্সিল রেডিকেল ($\cdot OH$): হাইড্রোক্সিল রেডিকেল বায়ুমণ্ডলীয় রসায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী একটি যৌগ। আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এটি বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন হয়। তাই, ঋতু ও দিনের সময়ভেদে রেডিকেলটির প্রাচুর্য ওঠানামা করে। শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মে এবং দিনের প্রথম ও শেষভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগে বায়ুমণ্ডলে রেডিকেলটির ঘনমাত্রা সবচেয়ে বেশি থাকে। তত্ত্বীয় এক মডেলের ভিত্তিতে হিসাব করে দেখানো হয়েছে,শীতকালে এর ঘনমাত্রা $10^{-9} - 10^{-8}$ ppm এবং গ্রীষ্মকালে $10^{-7} - 10^{-6}$ ppm এর মাঝে ওঠানামা করে।

হাইড্রোক্সিল রেডিকেল বিভিন্ন কৌশলে উৎপন্ন হতে পারে; যেমন,

১. $HNO_2 + h\nu \rightarrow \cdot OH + NO\cdot$

২. $H_2O_2 + h\nu \rightarrow 2HO\cdot$

৩. $O_3 + h\nu \rightarrow \cdot O\ (^1D - \text{singlet}) + O_2$

$\cdot O\ (^1D) + H_2O \rightarrow 2HO\cdot$ ।

এছাড়া হাইড্রোপারক্সি রেডিকেল থেকেও হাইড্রোক্সিল রেডিকেল উৎপন্ন হয় (নিচে দ্র:)।

হাইড্রোক্সিল রেডিকেল বায়ুমণ্ডলের প্রাকৃতিক ও মিশাল,বহু গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে। উদাহরণস্বরূপ, শুষ্ক বায়ুতে যেসব বিক্রিয়ায় SO_2 এর জারণ ঘটে তার মাঝে $\cdot OH$ এর সাথে অক্সাইডটির বিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ:

$SO_2 + \cdot OH \rightarrow HOSO_2$;

$HOSO_2$ পরে O_2 ও H_2O এর সাথে বিক্রিয়া করে H_2SO_4 -এ পরিণত হয়;

$HOSO_2 + O_2 \rightarrow SO_3 + HO_2$

$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

বায়ুমণ্ডলে NO_2 থেকে HNO_3 উৎপন্ন হয়; এক্ষেত্রেও $\cdot OH$ এর ভূমিকা থাকে:

$NO_2 + \cdot OH \rightarrow HNO_3$

হাইড্রোক্সিল রেডিকেল,আলোক-রাসায়নিক স্মগ(photochemical smog) সৃষ্টিতে হাইড্রোকার্বনের যে জারণ ঘটে তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (আলোক-রাসায়নিক স্মগ, পঞ্চম অধ্যায় দ্র:)।

পারক্সি রেডিকেল (RO_2) : পারক্সি রেডিকেল দুই প্রকার – হাইড্রোপারক্সি(HO_2) ও অ্যালকাইলপারক্সি(RO_2). এদের মাঝে হাইড্রোপারক্সি রেডিকেলের ভূমিকা বায়ুমণ্ডলীয় রসায়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যদিও মিথাইল পারক্সি (CH_3O_2) ও ইথাইল পারক্সি ($C_2H_5O_2$) রেডিকেল দুটিও অনেকক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পারক্সি রেডিকেল বিভিন্ন কৌশলে উৎপন্ন হতে পারে। বস্তুত, যে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরমাণু (H) সৃষ্টি হয় তা শেষপর্যন্ত 'হাইড্রোপারক্সিতে পৌঁছায়; যেমন,

১. $HCHO + h\nu \rightarrow \cdot CHO + \cdot H$ (আলোক-বিভাজন)

$\cdot H + O_2 \rightarrow HO_2$

২. $CO + \cdot OH \rightarrow CO_2 + \cdot H$

$\cdot H + O_2 \rightarrow HO_2$

একইভাবে যে বিক্রিয়া অ্যালকাইল রেডিকেল সৃষ্টি করে তা অ্যালকাইলপারক্সিতে শেষ হয়; যেমন,

$CH_2 = CH_2 + O \rightarrow \cdot CH_3 + \cdot CHO$ (জারণীয় বিভাজন)

$\cdot CH_3 + O_2 \rightarrow CH_3O_2$ ।

পারক্সি রেডিকেল বায়ুমণ্ডলে NO কে NO_2 এ জারিত করে:

$\cdot CH_3O_2 + NO \rightarrow CH_3O\cdot + NO_2$

$HO_2 + NO \rightarrow \cdot OH + NO_2$;

বায়ুমণ্ডলীয় রসায়নে বিক্রিয়া দুটির তাৎপর্য বিশাল (আলোক রাসায়নিক স্মোগ,পঞ্চম অধ্যায় দ্র:)।

৪.৯ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন (Oxygen in Atmosphere)

বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের (O_2) প্রাচুর্য এখন প্রায় 21% এবং বিগত পাঁচ/ছয় কোটি বছর যাবৎ প্রাচুর্য প্রায় একই আছে। তবে, তথ্য প্রমাণ নির্দেশ করে, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর প্রায় তিনশকোটি বছর যাবৎ (পৃথিবীর বয়স প্রায় পাঁচশ কোটি বছর) এর যে বায়ুমণ্ডল ছিল তাতে মুক্ত O_2 ছিল না। অক্সিজেন অতীব সক্রিয় একটি মৌল। তাই, মুক্ত অবস্থায় এটি বেশিদিন থাকতে পারে না, অন্য মৌলের সাথে যৌগ গঠন করে অবস্থান করে (যেমন, H_2O ধাতু অক্সাইড, প্রভৃতি)। বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের প্রবেশ শুরু হয় আজ থেকে প্রায় দুশ কোটি বছর আগে সালোকসংশ্লেষী সবুজ উদ্ভিদের

উদ্ভব ঘটার পর (অনুচ্ছেদ ৪.৪ দ্রষ্টব্য) এবং হিসাব করে দেখানো হয়েছে। এ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে 2×10^{22} গ্রাম O_2 মুক্ত হয়েছে (উদাহরণ ৪.৩ দ্রষ্টব্য)। ধারণা করা হয়, উক্ত O_2 এর বেশিরভাগ (প্রায় 95%) অজৈব খনিজের জারণে ব্যয় হয়েছে এবং অবশিষ্ট মাত্র 5% O_2 এখন বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অবস্থায় আছে। বিশ্বব্যাপী O_2 এর উৎপত্তি ও অপসরণ যেপথ অনুসরণ করে তার একটি স্থূল রূপরেখা চিত্রে দেখানো হলো (চিত্র ৪.৩)।

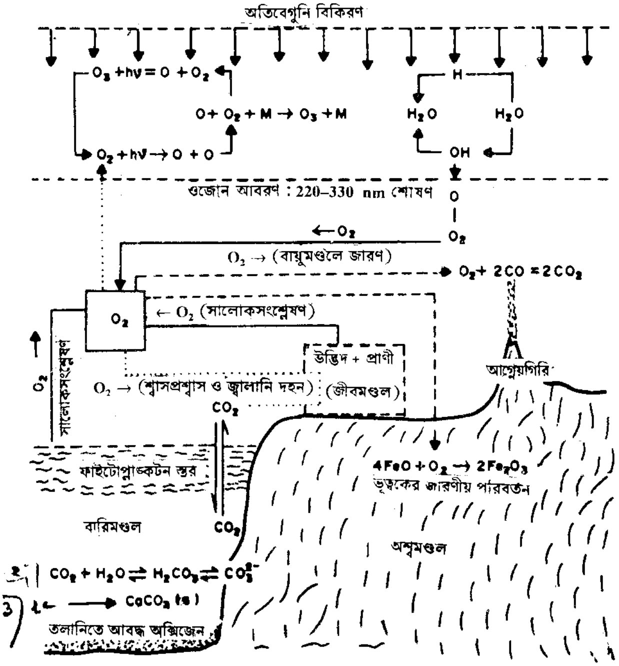

চিত্র ৪.৩ : বিশ্বব্যাপী O_2 - এর উৎপত্তি ও অপসারণ।

বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন রসায়ন (oxygen chemistry in atmosphere) : বায়ুমণ্ডলের স্তরভেদে সৌররশ্মি ও বস্তুকণার বণ্টন ভিন্ন হয় বলে অক্সিজেন তথা যে কোনো বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের রসায়নও স্তরভেদে ভিন্ন হয়। বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে বস্তুকণা বিরল, পাশাপাশি উচ্চশক্তিসম্পন্ন অতিবেগুনি ও মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব সেখানে তীব্র। ঐরূপ পরিবেশে অক্সিজেন সেখানে এমন অবস্থায় অবস্থান করে, বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে (ট্রোপোস্ফেয়ার) যা স্থিতিশীল হতে পারে না। উর্ধ্বস্তরে সূর্যের উচ্চশক্তি সম্পন্ন বিকিরণের প্রভাবে আণবিক অক্সিজেনের উত্তেজন ও বিভাজন ঘটে। আণবিক অক্সিজেনের (O_2) প্রাচুর্য তাই উর্ধ্বস্তরে নগণ্য এবং প্রধানত অক্সিজেন পরমাণু (O),

উত্তেজিত অক্সিজেন (O_2^*), অক্সিজেন আয়ন (O^+) ও ওজোন (O_3) আকারে তা সেখানে অবস্থান করে। যাহোক, বায়ুমণ্ডলের স্তরভেদে অক্সিজেনের নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলো সাধারণত ঘটে:

১. আয়নোস্ফেয়ার (50-500 km) : থার্মোস্ফেয়ার ও মেসোস্ফেয়ারকে একত্রে আয়নোস্ফেয়ার বলা হয় কেননা আয়ন এখানে স্থিতিশীল। আয়নোস্ফেয়ারে O_2 - এর যেসব বিক্রিয়া ঘটে তাদের মাঝে আলোক-বিভাজন ও আয়নায়ন মুখ্য। এখানে, একদিকে সূর্যের তীব্র শক্তিসম্পন্ন অতিবেগুনি বিকিরণের আঘাতে অক্সিজেন অণুর (O_2) অক্সিজেন পরমাণুতে (O) এবং অক্সিজেন পরমাণুর অক্সিজেন আয়নে (O^+) বিভাজন ঘটে, অন্যদিকে বস্তুকণা বিরল বলে পরমাণু, আয়ন ও ইলেকট্রন দীর্ঘস্থায়ী হয়। আয়নোস্ফেয়ারে অক্সিজেনের নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলো সাধারণত ঘটে থাকে:

$$O_2 + h\nu \xrightarrow{\text{135- 260 nm}} O + O$$

$$O + h\nu \xrightarrow{\text{অতিবেগুনি}} O^+ + e$$

$$O^+ + O_2 \longrightarrow O_2^+ + O$$

$$O^+ + N_2 \longrightarrow NO + N$$

$$O_2 + h\nu \xrightarrow{\text{17-103 nm}} O_2^+ + e$$

২. স্ট্রাটোস্ফেয়ার (12-50 km) : ওজোন-সৃষ্টি হওয়া স্ট্রাটোস্ফেয়ারে অক্সিজেনের মুখ্য বিক্রিয়া (অনুচ্ছেদ ৪.৩ দ্রঃ)।

$$O_2 + h\nu \xrightarrow{< 242 \text{ nm}} O + O$$

$$O_2 + O + M \longrightarrow O_3 + M;$$

M (তৃতীয় বস্তু) = O_2, N_2, প্রভৃতি ।

স্ট্রাটোস্ফেয়ারে O_3 এর গড় প্রাচুর্য প্রায় 1.5 ppm (0°C তাপমাত্রা ও 1-atm বায়ুচাপে প্রকাশ করা হলে স্ট্রাটোস্ফেয়ারে O_3 স্তরের পুরুত্ব দাঁড়ায় 3 mm), 25 -50 km এর মাঝে প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি থাকে, প্রায় 10 ppm । ওজোন অতিবেগুনি বিকিরণের (λ < 300 nm) দক্ষ একটি শোষক। স্ট্রাটোস্ফেয়ারের ওজোন স্তর তাই ক্ষতিকর অতিবেগুনি বিকিরণের বিরুদ্ধে দৃঢ় একটি বর্ম হিসেবে কাজ করে এবং বিকিরণটির আঘাত থেকে পৃথিবীর জীবকে বাঁচায়। তবে, অতিবেগুনি বিকিরণ শোষণ করার ফলে ওজোনের বিভাজনও ঘটে:

$$O_3 + h\nu \rightleftharpoons O_2 + O$$

এভাবে প্রতিনিয়ত উৎপত্তি ও বিভাজনের মাধ্যমে ওজোন তার সাম্যঘনমাত্রায় অবস্থান করে।

স্ট্রাটোস্ফেয়ারের ওজোন ভূ-পৃষ্ঠে জীবের জন্য একটি রক্ষাকবচ হলেও ভূপৃষ্ঠে এর উচ্চমাত্রায় উপস্থিতি (> 0.15 ppm) জীবের জন্য ক্ষতিকর। উচ্চ ঘনমাত্রার O_3

মাথাব্যথা ও দেহে, বিশেষ করে চোখে জ্বালা সৃষ্টি করে। ভূ-পৃষ্ঠে ওজোনের স্বাভাবিক প্রাচুর্য 0.05 ppm এর কম। তবে, দূষিত বায়ু ও বৈদ্যুতিক স্থাপনার নিকট এর ঘনমাত্রা 0.15 ppm কিংবা তারও বেশি হতে পারে। জীবের জন্য এটি একটি আশীর্বাদ যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে, স্ট্রাটোস্ফেয়ারের মতো উচ্চমাত্রার O_3 সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা, ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলে (ট্রোপোস্ফেয়ার 0-11 km) অক্সিজেন পরমাণুর উপস্থিতি নগণ্য। অতিবেগুনি বিকিরণের আঘাতে O_2 অণু ভেঙ্গে O পরমাণু তৈরি হয় কিন্তু স্ট্রাটোস্ফেয়ারের ওজোন স্তরে শোষিত হবার পর বিকিরণটির যে ভগ্নাংশ নিচে (ট্রোপোস্ফেয়ারে) নেমে আসে তা এতই ক্ষুদ্র থাকে যে, তার দ্বারা উল্লেখযোগ্য ঘনমাত্রার O পরমাণু ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলে তৈরি হতে পারে না।

৩. ট্রোপোস্ফেয়ার (0-11 km): ট্রোপোস্ফেয়ারে অক্সিজেন কার্যত আণবিক অবস্থায় (O_2) থাকে এবং পদার্থের রাসায়নিক জারণ ঘটায়। জীবের শ্বসন, জ্বালানির দহন, জৈব ও অজৈব বস্তুর বিভাজন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে O_2 জারক (ইলেকট্রন গ্রাহক) হিসেবে কাজ করে।

৪.১০ বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন রসায়ন (Nitrogen Chemistry in Atmosphere)

বায়ুতে যেসব উপাদান রয়েছে তার মাঝে N_2 এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, প্রায় 3.8×10^{15} মেট্রিক টন, ঘনআয়তন হিসেবে যার প্রাচুর্য প্রায় 78%। বিশাল ঐ N ভাণ্ডার থেকে মৌলটি যৌগ আকারে মৃত্তিকায় আবদ্ধ (fixed) হয় এবং মানুষ ও আণুবীক্ষণিক জীব তাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, প্রতিবছর নাইট্রোজোনের 8 -10 কোটি মেট্রিক টন মানুষের সম্পাদিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (সার, বিস্ফোরক প্রভৃতি তৈরিতে), 5 - 6 কোটি মেট্রিক টন জৈবিক প্রক্রিয়ায় এবং প্রায় এক কোটি মেট্রিক টন বিজলি বজ্রপাতে বায়ুমণ্ডল থেকে মৃত্তিকা ও বারিমণ্ডলে আবদ্ধ হয়। আবদ্ধ N আবার বায়ুমণ্ডলে N_2 আকারে ফিরে যায় এবং একমাত্র আণুবীক্ষণিক জীবের অনুঘটনে রূপান্তরটি ঘটে। নাইট্রোজেন বর্তমানে বায়ুমণ্ডল থেকে যে হারে পৃথিবীতে আবদ্ধ হয় তার থেকে নিম্নতর হারে তা আবার বায়ুমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন করে। এতে বায়ুমণ্ডলের বিশাল যে N_2 ভাণ্ডার তার উপর লক্ষণীয় কোনো প্রভাব পড়ে না ঠিকই কিন্তু, সার্বিক পরিবেশের উপর ঘটনাটি ক্ষতিকার প্রভাব ফেলতে পারে। পৃথিবীতে আবদ্ধ অতিরিক্ত ঐ নাইট্রোজেন শেষপর্যন্ত বারিমণ্ডলে স্থান পায়। এতে জলাধারের ইউট্রোফিকেশন ত্বরান্বিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

নাইট্রোজেন বহুলাংশে নিষ্ক্রিয় একটি মৌল। আণবিক নাইট্রোজেনের ত্রিবন্ধন ($N\equiv N$, বন্ধনশক্তি 942 kJ/mol) মৌলটির স্থিতিশীলতার জন্য দায়ী। অতিবেগুনি বিকিরণের আঘাতে আণবিক O_2 (বন্ধনশক্তি 494 kJ/mol) যেখানে পরমাণুতে কার্যত সম্পূর্ণরূপে বিভাজিত হয়, N_2 এর সেখানে খুব সামান্যই বিভাজন ঘটে। বায়ুমণ্ডলে 100 km এর ঊর্ধ্বে মৌলটির কিছুটা আলোক-বিভাজন ঘটে বলে ধারণা করা হয়:

$$N_2 + h\nu = N + N$$

মনে রাখতে হবে, বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে যেসব বিক্রিয়া ঘটে তাদের কৌশল সঠিকভাবে জানা যায় না, উৎপাদ ও বিদ্যমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে কৌশলটি অনুমান করা যায় মাত্র। বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফেয়ারে (> 50 km) N_2^+ ও NO^+ শনাক্ত করা হয়েছে। সম্ভবত, নিম্নলিখিত কৌশলে এগুলো সেখানে সৃষ্টি হয়:

$$N_2 + h\nu \xrightarrow[\text{বিকিরণ}]{\text{মহাজাগতিক}} N_2^+ + e \qquad (\sim 50\ km)$$

$$N_2^+ + O = NO + N \qquad (> 85\ km)$$

$$NO + h\nu = NO^+ + e \qquad (50 - 85\ km)$$

$$N_2 + O^+ = NO^+ + N$$

৪.১১. বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প (Water Vapour in Atmosphere)

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্য মোট গ্যাসীয় উপাদানের 0.1-5%। ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় জলাধার ও জীবমণ্ডল থেকে পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে স্থান পায় এবং জলীয় বাষ্প বৃষ্টি ও তুষারপাত আকারে আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে। যদিও বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প বারিমণ্ডলের মোট যে পানিরাশি (150 কোটি ঘন কিলোমিটার) তার অতি নগণ্য এক ভগ্নাংশ (0.001%) তথাপি ভূ-পরিবেশের উপর তার প্রভাব বিশাল। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প না থাকলে আবহাওয়া বলেই কিছু থাকত না।

সারা বিশ্বব্যাপী পানির যে প্রদক্ষিণ চক্র, জলীয়বাষ্প তার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। পৃথিবীতে বার্ষিক গড় বাষ্পীভবন ও বৃষ্টিপাত প্রায় 100 cm (পৃথিবী-পৃষ্ঠের মোট আয়তন 51 কোটি বর্গ কিলোমিটারের উপর 100 cm পুরু)। যে উৎস থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তার সন্নিকটে অথবা সেখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বৃষ্টি তুষারপাত আকারে তা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময় কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণভাবে ধরা হয়, বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের গড় স্থিতিকাল নয়/দশ দিন। বিশ্বব্যাপী জলীয় বাষ্পের পরিক্রমণ পানির বণ্টনকেই কেবল নিয়ন্ত্রণ করে না, বিশ্বের তাপমাত্রাকেও তা স্থিতিশীল রাখে। যে প্রচণ্ড সৌরশক্তি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তার সবটুকু যদি ভূপৃষ্ঠে পতিত হত তাহলে পৃথিবী বাষ্পাকারে উবে যেত। ঐ শক্তির প্রায় 50% বায়ুমণ্ডল থেকে আবার শূন্যে প্রতিফলিত হয়। আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘ তাতে একটি প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে, ভূপৃষ্ঠ থেকে যে তাপশক্তি (অবলোহিত বিকিরণ) শূন্যে নির্গত হয়, জলীয় বাষ্প তার একটি ভগ্নাংশ শোষণ করে নেয় এবং পরে ভূপৃষ্ঠের দিকে আবার তা ফেরত পাঠায় (গ্রীন হাউজ প্রভাব,দ্রষ্টব্য)।

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ভূমিকা মূলত কল্যাণকর। তবে, কিছু কিছু বায়ুদূষক আছে যাদের সাথে যুক্ত হয়ে এটি অনেক সময় অকল্যাণও বয়ে আনে। যেমন, বায়ুমণ্ডলে SO_x ও NO_x প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকলে (শিল্পাঞ্চলে সাধারণত থাকে)

জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে এরা পৃথিবীতে অম্ল বৃষ্টি সৃষ্টি করে। যানবাহন বহুল শহর অঞ্চলের জৈব ও অজৈব কিছু বায়ুদূষক জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষতিকর 'স্মগ' সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর ধূলিকণা উপস্থিত থাকলে (শিল্পাঞ্চলে সাধারণত থাকে) জলীয়বাষ্প ধূলিকণা-পৃষ্ঠে পরিশোষিত হয়ে আকাশের স্বচ্ছতা নষ্ট করে ইত্যাদি।

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের তেমন গুরুত্বপূর্ণ আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া বেশি কিছু নাই। তবে মনে করা হয়, অতিবেগুনি বিকিরণের আঘাতে জলীয় বাষ্পের (H_2O) H ও OH রেডিকেলে কিছুটা বিভাজন ঘটে এবং বায়ুমণ্ডলে যে সামান্য পরিমাণ H_2 বিদ্যমান, উক্ত আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া তার প্রধান একটি উৎস:

$$H_2O + h\nu \rightarrow H + OH$$

ওজোনের (O_3) সাথে H এর সংঘর্ষে উত্তেজিত OH^* মুক্ত রেডিকেল সৃষ্টি হয় এবং OH^* যে উত্তেজন শক্তি ছেড়ে দেয় তা দৃশ্যমান এর শেষপ্রান্ত থেকে অবলোহিত অঞ্চলের বিরাট অংশ জুড়ে বিকিরণ আকারে প্রকাশ পায়। উক্ত বিকিরণ বায়ুপ্রভা (airglow) সৃষ্টির জন্য অংশত দায়ী বলে মনে করা হয়:

$$H + O_3 = OH^* + O_2$$

$$OH^* \rightarrow OH + h\nu \text{ ।}$$

প্রশ্নমালা

১. বায়ুমণ্ডলের মুখ্য উপাদান কি কি? তাদের প্রাচুর্য উল্লেখ কর।

২. পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার প্রথম দিকে প্রায় তিনশ কোটি বছর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন ছিল না, পরে এর উদ্ভব ঘটেছে - বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

৩. বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশগুলো কি কি? অংশগুলোর প্রত্যেকটিতে মুখ্য উপাদান কি কি? কিভাবে সেগুলোর উদ্ভব ঘটে, ব্যাখ্যা কর।

৪. বায়ুমণ্ডলীয় বিলোপন হার (lapse rate) কাকে বলে? থার্মোস্ফেয়ার ও স্ট্রাটোস্ফেয়ারে বিলোপন হার ধনাত্মক কিন্তু মেসোস্ফেয়ার ও ট্রোপোস্ফেয়ারে এটি ঋণাত্মক কেন? ব্যাখ্যা কর।

৫. ট্রোপোপজ না থাকলে পৃথিবীপৃষ্ঠ হয়ত একদিন পানিশূন্য হয়ে যেত - ব্যাখ্যা কর।

৬. O_2 এর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় আলোক-বিভাজন ঘটে কিন্তু N_2 এর আলোক বিভাজন নগণ্য, কেন?

৭. বায়ুমণ্ডলে বর্তমানে যে মুক্ত অক্সিজেন বিদ্যমান তা জৈব কার্বন স্তরীভূত হওয়ার পরিণতি ব্যাখ্যা কর। পাললিক শিলার পরিমাণ 2×10^{24} g; এতে জৈব

কার্বনের গড় প্রাচুর্য 0.4%। প্রকৃতিতে C- চক্র থেকে কি পরিমাণ অক্সিজেনমুক্ত হয়েছে?

৮. গ্রীন হাউজ প্রভাব কি? বিষয়টি মূলত কল্যাণকর কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে এটি বর্তমানে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে - ব্যাখ্যা কর।

৯. গ্রীন হাউজ গ্যাস কাকে বলে? কিভাবে এরা পরিবেশকে প্রভাবিত করে? কোন কোন গ্যাসকে গ্রীন হাউজ গ্যাস বলা হয়?

১০. পরিবেশের জন্য CFC অতীব মারাত্মক একটি গ্যাস - কেন?

১১. পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের একটি গোষ্ঠী মনে করেন, 'গ্রীন হাউজ প্রভাব' পরিবেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে, অপর গোষ্ঠী দ্বিমত পোষণ করেন - বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

১২. জীবাশ্ম জ্বালানির দহন ও নির্বিচারে বৃক্ষনিধন গ্রীন হাউজ প্রভাবকে উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত করেছে - ব্যাখ্যা কর।

১৩. গ্রীন হাউজ প্রভাবের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে?

১৪. চাঁদের পৃষ্ঠে দিন রাতে তাপমাত্রার ওঠানামা প্রায় 250° অথচ পৃথিবীপৃষ্ঠে এটি মাত্র কয়েক ডিগ্রির মাঝে সীমিত থাকে - কারণ ব্যাখ্যা কর।

১৫. পৃথিবীতে তাপমাত্রার ভারসাম্য কিভাবে রক্ষিত হয়?

১৬. বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে যেসব বিক্রিয়া ঘটে, গবেষণাগারে পরীক্ষা করে তাদের সঠিক কৌশল নির্ধারণ করা যায় না - বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

১৭. বায়ুমণ্ডলে যেসব আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৮. মুক্ত রেডিকেল কি? বায়ুমণ্ডলীয় রসায়নে এদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ - বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

১৯. বায়ুমণ্ডলীয় রসায়নে হাইড্রোক্সিল ও পারক্সি রেডিকেলের ভূমিকা আলোচনা কর।

২০. বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে মুক্ত অক্সিজেনের প্রধান প্রধান যেসব বিক্রিয়া ঘটে সেগুলো বর্ণনা কর।

২১. বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ভূমিকা আলোচনা কর।

২২. টীকা লিখ : ক. গ্রীন হাউজ প্রভাব খ. এটকেন গ. বায়ুপ্রভা, ঘ.আয়নোস্ফেয়ার ঙ. স্ট্রাটোস্ফেয়ার ও ট্রোপোস্ফেয়ারে ওজোন চ. মুক্ত রেডিকেল, ছ.বায়ুমণ্ডলে O_2 উৎপত্তি জ.ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রার ভারসাম্য ঝ. CFC ।

গ্রন্থপঞ্জি

1. M.N. Rao & H.V. N. Rao; 'Air Pollution', Tata McGraw-Hill, New Delhi, India, 1997.

2. Carole L. Hamilton (Introduction), 'Chemistry in the Environment (Collection from Scientific American), Freeman, USA, 1952-73.

3. S.E. Manahan, 'Environmental Chemistry', 6th Edn., Lewis Publishers, USA, 1994.

4. R.M. Harrison & S.J. de Mora., "Introductory Chemistry for the Environmental Sciences: 2nd Ed., Cambridge Univ. press. U.K. 1996.

5. D.D. Ebbing & M.S. Wrighton. 'General Chemistry' 2nd Ed., Houghton Mifflin, Boston, USA, 1987.

পঞ্চম অধ্যায়

বায়ুমণ্ডলের দূষণ

(Pollution Of Atmosphere)

৫.১ ভূমিকা

দূষক কোনো বস্তুর অনন্য একটি পরিচয় নয়। একই বস্তু একস্থানে বা একঘনমাত্রায় দূষক, ভিন্ন স্থান বা নিম্নতর ঘনমাত্রায় তা অপরিহার্য (essential) হতে পারে। তবে 'দূষণ' বলতে কি বুঝায় তা যেমন সাধারণভাবে ধারণা করা যায় তেমনি এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাও প্রদান করা হয়েছে (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। যাহোক, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক (U.S. Public Health Service) 'বায়ু দূষণ' এর যে সংজ্ঞাটি প্রদান করা হয়েছে তা নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো:

"এক বা একাধিক মিশাল (contaminant) বা একাধিক মিশালের সংযুক্তিতে সৃষ্ট কোনো বস্তু বহির্গৃহে বায়ুমণ্ডলে যদি এমন পরিমাণে ও এমন সময়ব্যাপী উপস্থিত থাকে যাতে তা মানুষ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু কিংবা কোনো সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হয় কিংবা ক্ষতিকর হওয়ার প্রবণতা দেখায় অথবা জীবন কিংবা সম্পদের উপভোগে বা কাজে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে বায়ুমণ্ডলে উক্ত মিশালের উপস্থিতিকে বায়ুর দূষণ বলে।"

বায়ুমণ্ডল একটি গতিশীল সিস্টেম; পরিবেশের অন্যান্য অঙ্গ থেকে (বারিমণ্ডল, শিলামণ্ডল, জীবমণ্ডল) গ্যাস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন বস্তুকণা প্রতিনিয়ত এতে যুক্ত যেমন হচ্ছে তেমনি আবার সেখান থেকে অঙ্গসমূহে অপসারিত হচ্ছে। এভাবে, বায়ুমণ্ডলের কোনো অংশে যে হারে বস্তু প্রবেশ করে, সেই একই হারে যতক্ষণ তা অপসারিত হয় ততক্ষণ সেখানে এক প্রকার গতিশীল সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। তবে, বায়ুমণ্ডলে বস্তুর প্রবেশের হার অপসারিত হওয়ার হারের তুলনায় বেশি হলে ধীরে ধীরে তা সেখানে জমা হতে থাকে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং জীবজগতের উপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

বায়ুমণ্ডলে যেসব বস্তু প্রবেশ করে তাদের উৎস দুই প্রকার - প্রাকৃতিক (natural) ও মানুষের সৃষ্টি (anthropogenic)। উভয় শ্রেণীতে উৎসের সংখ্যা অনেক; যেমন-

প্রাকৃতিক উৎস : আগ্নেয়গিরির উদগীরণ, দাবানল, জৈব পদার্থের জৈবিক বিভাজন, উদ্ভিদ থেকে উদ্বায়ী পদার্থের নির্গমন, বায়ুপ্রবাহ, ধূলিঝড় প্রভৃতি।

মানুষের সৃষ্ট উৎস : জীবাশ্ম জ্বালানির দহন, শিল্পকারখানার বর্জ্য প্রভৃতি। প্রাকৃতিক উৎসের তুলনায় মানুষের সৃষ্টি উৎস সংখ্যায় হয়ত কম কিন্তু মানুষের সৃষ্টি

উৎস থেকে যে পরিমাণ গ্যাস ও কঠিন কণা বায়ুমণ্ডলে মেশে তা প্রাকৃতিক উৎসের তুলনায় বহুগুণ বেশি হয়।

৫.২ বায়ু দূষক এর ঘনমাত্রার একক (Untis of Concentration of Air Pollutant)

বায়ুমণ্ডলে যেসব দূষক থাকে তাদের ঘনমাত্রা প্রকাশ করার বেশ কয়েকটি একক প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন এককে প্রকাশিত উপাত্ত আদান-প্রদান ও বিশ্লেষণের সময় যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় সেজন্য একককগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক জানা থাকা আবশ্যক। নিচে একককগুলোর সংজ্ঞা ও পারস্পরিক সম্পর্ক সমীকরণের সাহায্যে দেখানো হলো।

১. ভর - ঘনমাত্রা, $w_p = m_p / (m_a + m_p)$ (৫.১)

২. ঘনআয়তন ঘনমাত্রা, $y_P = \nu_P / (\nu_a + \nu_p)$ (৫.২)

৩. পিপিএম (ppm), $Y_{ppm} = y_p \times 10^6$ (৫.৩)

৪. ভর ঘনআয়তন ঘনমাত্রা, $p_p = m_p / (\nu_a + \nu_p)$ (৫.৪)

যখন, m_p ও ν_p যথাক্রমে দূষকের ভর ও ঘনআয়াতন এবং m_a ও v_a যথাক্রমে বায়ুর ভর ও ঘনআয়তন। একককগুলোর মাঝে পিপিএম (Y_{ppm}) ও ভর ঘনআয়তন (p_p) একক দুটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিচে দেখানো হলো।

সমীকরণ (৫.২), (৫.৩) ও (৫.৪) একত্রিত করে:

$$p_p = \frac{m_p}{v_p} Y_{ppm} \times 10^{-6} \qquad (৫.৫)$$

বায়ু দূষকের ক্ষেত্রে আদর্শ গ্যাস সূত্র প্রযোজ্য হয় ধরে নিয়ে দেখানো যায়,

$$m_p / v_p \, (\mu g / m^3) = \frac{PM_p (10^9)}{8.314 \times 10^{-2} T}$$

যখন, P = বার এককে (bar) মোট চাপ

M_p = দূষকের আণবিক ভর

T = K এককে তাপমাত্রা ও

8.314×10^{-2} = গ্যাস ধ্রুবক (m^3 bar /kg-mol-K) ।

প্রমাণ তাপমাত্রা ও বায়ুচাপে (25°C ও 1.0133 bar):

$$m_p / \nu_p = M_p \, 10^9 / 24.45 \qquad (৫.৬)$$

সমীকরণ (৫.৫) - এ সমীকরণ (৫.৬) বসিয়ে;

$$p_p = \frac{M_p \, Y_{ppm}}{24.45} (10^3) \qquad (৫.৭)$$

অর্থাৎ, 25°C তাপমাত্রা ও 1-atm বায়ুচাপে

$$p_p(\mu g/m^3) = \frac{M_p Y_{ppm}}{24.45}(10^3) \qquad (৫.৮)$$

$$= \frac{ppm \times \text{দূষকের আণবিক ওজন}}{24.45} \times 10^3 \qquad (৫.৯)$$

নিচে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বায়ুদূষকের ঘনমাত্রা ppm একক থেকে $\mu g / m^3$ এককে পরিবর্তন করার গুণনীয়ক লিপিবদ্ধ করা হলো (সারণি ৫.১)।

সারণি ৫.১ : বায়ুদূষকের ঘনমাত্রা, ppm $\rightarrow \mu g / m^3$ ।

দূষক (চাপ 1 atm, তাপমাত্রা 25°C)	$\mu g / m^3$ (1 ppm এর তুল্যমান)
CO	1,145
SO_2	2,620
NO	1,230
NO_2	1,880
CO_2	1,800

উদাহরণ ৫.১ : দিনের ব্যস্ত সময়ে ঢাকা শহরের বায়ুতে CO এর ঘনমাত্রা 35 ppm; 25°C তাপমাত্রা ও 1 atm বায়ুচাপে দূষকটির ঘনমাত্রা $\mu g / m^3$ এককে প্রকাশ কর।

সমীকরণ (৫.৮) অনুসারে,

$$p_p(\mu g/m^3) = \frac{M_p Y_{ppm}}{24.45}(10^3) = \frac{28 \times 35}{24.45} \times 10^3$$

$$= 40 \times 10^3 \text{ ।}$$

উদাহরণ ৫.২: মোম্বাই শহরের বায়ুতে SO_2 এর গড় ঘনমাত্রা $47 \mu g/m^3$; তাপমাত্রা 25°C ও বায়ুচাপ 1-atm এ দূষকটির ঘনমাত্রা ppm এককে প্রকাশ কর।

সমীকরণ (৫.৮) অনুসারে,

$$Y_{ppm} = \frac{p_p(\mu g/m^3) \times 24.45}{M_p \times 10^3} = \frac{47 \times 24.45}{64 \times 10^3} = 0.018$$

উদাহরণ ৫.৩ : মোটরগাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় CO এর ঘনআয়তন ঘনমাত্রা 2%, তাপমাত্রা 25°C ও বায়ুচাপ 1-atm এ গ্যাসটির ঘনমাত্রা mg / m^3 এককে প্রকাশ কর।

$$Y_{ppm} = y_p \times 10^6 = 0.02 \times 10^6$$

$$p_p(\mu g/m^3) \frac{M_p Y_{ppm}}{24.45} = \frac{28 \times 0.02 \times 10^6}{24.45}$$

$$= 2.28 \times 10^4$$

৫.৩ বায়ু দূষণের উপর আবহাওয়ার প্রভাব (Metereological Factors Affecting Air Pollution)

দূষক বিভিন্ন উৎস থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে যখন কোনো একটি অঞ্চলে সঞ্চিত হতে থাকে তখন অঞ্চলটির আবহাওয়াগত অবস্থা দ্বারা সেখানে বায়ুদূষণের মাত্রা বহুলাংশে নির্ধারিত হয়। অঞ্চলটিতে দূষক প্রতিদিন একই হারে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু আবহাওয়া সেখানে এক একদিন এক এক প্রকার হলে বায়ুদূষণের মাত্রাও সেখানে এক একদিন এক একপ্রকার হয়। বস্তুত, আবহাওয়ার অবস্থাই বায়ুদূষণ জন্ম দেয়। যদিও অনেকক্ষেত্রে বায়ুদূষণও আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। আবহাওয়াগত যেসব নিয়ামক দ্বারা বায়ুদূষণ প্রভাবিত হয় তাদের মাঝে বাতাসের দিক ও বেগ, তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, সৌর বিকিরণ ও দৃশ্যমানতা (visibility) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলে যে দূষক নিক্ষিপ্ত হয়, প্রবাহমান বাতাসের সাথে তা দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দূষকের উৎসে বা তার সন্নিকটে বাতাসের বেগ যত তীব্র হয়, দূষকের বিক্ষেপণ তত দ্রুততার সাথে ঘটে, এতে দূষণের মাত্রা হ্রাস পায়। দূষক বাতাসের সাথে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। তবে সামনে উঁচু দালানকোঠা কিংবা পাহাড় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হলে বাতাস ঊর্ধ্বগামী হয় এবং দূষকও সেই সাথে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। উপত্যকার মাঝে বাতাসের প্রবাহ বিক্ষিপ্ত থাকে,এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে একসময় তা ঊর্ধ্ব বা নিম্নগামী হয়। দূষকও সেইসাথে হয় উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে অন্যথায় নিচে নেমে ঘনীভূত হয়। উপত্যকা যত গভীর হয়, বাতাস ও তার সাথে দূষকের ঐরূপ প্রবাহ তত তীব্র আকার ধারণ করে।

বায়ুর দূষণ অপসারণে বৃষ্টি / তুষারপাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; দূষক বৃষ্টি / তুষারপাতের সাথে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে এসে বায়ুকে দূষণমুক্ত করে। তবে, বায়ুতে দূষণের মাত্রা তীব্র হলে তাতে ভূপৃষ্ঠে কিংবা জলাধারে দূষণ সৃষ্টিও হতে পারে (যেমন, অম্লবৃষ্টি)।

বায়ুর আর্দ্রতা দ্বারা বায়ু দূষণের ক্রিয়া অনেক সময় প্রভাবিত হয়। বহু দূষক আছে (যেমন, SO_3, NO_2 প্রভৃতি), যেগুলো ক্ষয়কর (corrosive)। বায়ুতে আর্দ্রতা যত বেশি থাকে, এদের ক্ষয়ক্রিয়া তত বৃদ্ধি পায়।

বায়ুদূষণের উপর সৌরবিকিরণের প্রভাব ক্ষতিকর ও কল্যাণকর, দুই প্রকারই হতে পারে। সূর্যের বিকিরণ আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক সময় বায়ু-দূষণ সৃষ্টি করে। তবে, সাধারণভাবে সূর্যকিরণে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় যাতে দূষকসহ বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং দূষণের মাত্রা হ্রাস পায়।

বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতা (stability) **ও দূষকের বিচ্ছুরণ** (dispersal) : বায়ুমণ্ডল স্বভাবত অস্থিতিশীল; ভূপৃষ্ঠ থেকে যে তাপ নির্গত হয় তাতে নিম্নস্তরের বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরে ওঠে এবং উপর থেকে ঠাণ্ডা ভারি বায়ু নিচে নেমে এসে সে স্থান

দখল করে। বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগমনের এই যে স্বাভবিক ধারা তা যখন ব্যহত হয় তখন বায়ুমণ্ডলকে 'স্থিতিশীল' (stable) বলা হয়। আবহাওয়াগত ও ভূ-প্রকৃতিগত বিভিন্ন স্থিতিমাপ বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং স্থিতিশীলতার মাত্রা দ্বারা বায়ুমণ্ডলের দূষক বিচ্ছুরণের ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ধারিত হয়।

বায়ুমণ্ডলে নিচ থেকে ঊর্ধ্বস্তরের দিকে তাপমাত্রার যে পরিবর্তন ঘটে এবং ঊর্ধ্বগামী একটি বায়ুস্তম্ভে তাপমাত্রার যে পরিবর্তন ঘটে, তাদের আপেক্ষিক প্রাবল্য দ্বারা বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতা নির্ধারিত হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে তাপমাত্রার যে পরিবর্তন ঘটে তাকে তাপমাত্রার 'বায়ুমণ্ডলীয় বিলোপন হার'(lapse rate) , $-(dT/dz)_{atm}$ এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে একে তাপমাত্রার 'বদ্ধতাপীয় বিলোপন হার' (adiabatic lapse rate), $-(dT/dz)_{ad}$ বলে। হার দুটি সমান হলে ঊর্ধ্বগামী শুষ্ক বায়ুস্তম্ভ ও পারিপার্শ্বিক বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ ও ঘনত্ব পরস্পর সমান হয়। ঐরূপ অবস্থায় ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্তম্ভের উপর প্লবমান বল (boyant force) কাজ করে না এবং বায়ুমণ্ডলকে তখন 'নিরপেক্ষ স্থিতিশীল' (neutrally stable) বলা হয়। এরূপ একটি বায়ুমণ্ডলে নিম্নস্তরের বায়ু ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুর সাথে মিশতে পারে না। ফলে, বায়ুতে যে দূষক থাকে তা কেবল ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চারদিকে বিস্তারলাভ করে। প্রক্রিয়াটি অতিশয় মন্থর তাই অঞ্চল জুড়ে দূষকের দ্রুত ঘনীভবন ঘটে।

যখন বায়ুমণ্ডলীয় বিলোপন হার শুষ্ক বদ্ধতাপীয় বিলোপন হারের তুলনায় উচ্চতর হয় $[-(dT/dz)_{atm} > -(dT/dz)_{ad}]$ তখন বায়ুমণ্ডলকে 'অতি বদ্ধতাপীয়' (super adiabatic) বলা হয়ে থাকে। এসময় ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্তম্ভ পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলের তুলনায় বেশি উষ্ণ ও হালকা থাকে। ফলে, এর প্লবমানতা ও ঊর্ধ্বমুখী গতি বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলকে এরূপ অবস্থায় 'অস্থিতিশীল' বলা হয়। অস্থিতিশীল বায়ুমণ্ডলে বায়ু বিভিন্ন উচ্চতা থেকে এসে একত্রে মেশে; বায়ুমণ্ডলের দূষক অপসারণের জন্য এটি অতি প্রয়োজনীয় একটি শর্ত। অস্থিতিশীলতার মাত্রা যত বৃদ্ধি পায়, দূষকের অপসারণ তত দ্রুত ও কার্যকরভাবে ঘটে।

অন্যদিকে, বায়ুমণ্ডলীয় বিলোপন হার যখন বদ্ধতাপীয় বিলোপন হারের তুলনায় নিম্নতর হয় $[-(dT/dz)_{atm} < -(dT/dz)_{ad}]$ তখন পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলের তুলনায় ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্তম্ভের তাপমাত্রা হ্রাস ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বায়ুস্তম্ভটি নিচে তার পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে আসতে চায়। বায়ুমণ্ডলের এরূপ অবস্থাকে তার স্থিতিশীল অবস্থা এবং বিলোপন হারকে 'অধঃবদ্ধতাপীয়'(Sub-adiabatic) বলা হয়। বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীল অবস্থায় বায়ুর খাড়াখাড়ি মিশ্রণ খুব সামান্যই ঘটে এবং দূষকের বিচ্ছুরণ মন্থর হয়। ফলে , দূষক বায়ুমণ্ডলে খুব দ্রুত জমে ওঠে।

বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতা চরমাবস্থায় পৌঁছে যখন তার বিলোপন হার $[(dT/dz)_{atm}]$ ঋণাত্মক হয় অর্থাৎ উচ্চতার সাথে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলের

ঐরূপ অবস্থাকে 'উল্টাধারা' (inversion)বলে। বায়ুমণ্ডলের উল্টাধারায় দূষকের ঊর্ধ্বমুখী বিচ্ছুরণ কার্যত লোপ পায়।

বায়ুমণ্ডলীয় উল্টাধারা (atmospheric inversion) : ট্রোপোস্ফেয়ারে উত্তমরূপে মিশ্রিত বায়ুতে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতার জন্য তাপমাত্রা 6.5°C হ্রাস পায়। উচ্চতার সাথে তাপমাত্রার উক্ত পরিবর্তন হারকে 'তাপমাত্রার বায়ুমণ্ডলীয় বিলোপন হার' (lapse rate) বলে। আবহাওয়াগত ও ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতিগত কিছু কিছু কারণে বিলোপন হার বিপরীতমুখীও (ঋণাত্মক: উচ্চতার সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি) হতে পারে। ঐরূপ অবস্থাকে 'বায়ুমণ্ডলের উল্টাধারা' বলা হয়। বায়ুমণ্ডলের উল্টাধারায় ঠাণ্ডা, ভারি একটি বায়ুস্তরের উপর উষ্ণ হালকা একটি বায়ুস্তর অবস্থান করে; এ সময় বায়ুর ঊর্ধ্বগমন লোপ পায় এবং ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুর স্তরে দূষকের ঘনীভবন ঘটে। তবে, বাতাস প্রবাহিত হতে থাকলে দূষক সমান্তরালভাবে দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

বায়ুমণ্ডলের উল্টাধারা তিনভাবে সৃষ্টি হতে পারে এবং সে অনুসারে একে তিনভাগে ভাগ করা হয় যথা, অ্যাডভেকটিভ (advective), নৈশকালীন (noctural) ও অধোগামী (subsidence) উল্টাধারা।

১. অ্যাডভেকটিভ উল্টাধারা (advective inversion): উষ্ণ একটি বায়ুস্তর যখন শীতল একটি বায়ুস্তর অথবা শীতল একটি কঠিন তলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন বায়ুমণ্ডলে অ্যাডভেকটিভ উল্টাধারা সৃষ্টি হয়। সাধারণত, পাহাড়ি অঞ্চলে এরূপ ঘটনা ঘটে (চিত্র ৫.১)

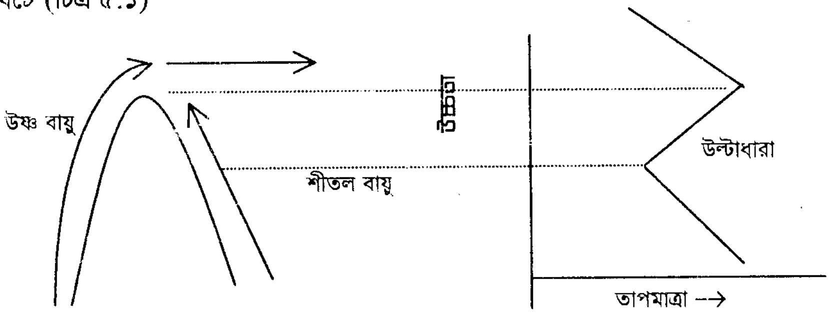

চিত্র ৫.১: বায়ুমণ্ডলে অ্যাডভেকটিভ উল্টাধারা (inversion)।

ভূপৃষ্ঠের উষ্ণ বায়ু এবং সমুদ্রের শীতল বায়ু যখন পরস্পর বিপরীত দিক থেকে পাহাড়ের দিকে ছুটে আসে তখন উষ্ণ হালকা বায়ুর স্তর শীতল ভারি বায়ুস্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং অ্যাডভেকটিভ উল্টাধারার উদ্ভব ঘটে।

২. নৈশকালীন উল্টাধারা (noctural inversion) : রাতের বেলায় এটি সৃষ্টি হয়। পৃথিবী রাতের বেলায় বিকিরণ নির্গমনের মাধ্যমে তাপ ছেড়ে দেয়, এতে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুর স্তর তখন শীতল হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েকশত মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শীতল ঐ বায়ুর স্তর বিস্তার লাভ করে এবং তার ঊর্ধ্বে আবার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ একটি বায়ুর

স্তর থাকে; ফলে উল্টাধারা সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মের তুলনায় শীতকালে নৈশকালীন উল্টাধারার ঘটনা বেশি ঘটে কেননা শীতকালে রাতের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বড় থাকে। উপত্যকা ও নিম্নভূমি অঞ্চলে এরূপ উল্টাধারা প্রায়ই সৃষ্টি হয় কেননা উঁচু ভূখণ্ড দ্বারা পরিবৃত থাকার কারণে বাতাস সেখানে নিচু অঞ্চল দিয়ে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হতে পারে না।

উল্টাধারায় পতিত বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্প বেশি থাকলে এবং ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা 'শিশির বিন্দু তাপমাত্রার'(dew point) নিচে নেমে গেলে সেখানে কুয়াশা (fog) সৃষ্টি হয়। যাহোক, রাতের শেষে আকাশে যখন সূর্য ওঠে তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ আবার উত্তপ্ত হয় এবং নৈশকালীন উল্টাধারার অবলুপ্তি ঘটে।

৩.অধোগামী উল্টাধারা (subsidence inversion) : অধোগামী উল্টাধারা নাতিগ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রতিঘূর্ণিবাত্যার (subtropical anticyclone) সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ একটি ঘটনা এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেশ কিছু ঊর্ধ্বে (প্রায়1.5 km) এটি সৃষ্টি হয়। প্রতিঘূর্ণিবাত্যায় বায়ুর উচ্চচাপ অঞ্চল নিম্নচাপ অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। উচ্চচাপ অঞ্চলের ঘূর্ণায়মান বায়ু যখন ধীরে ধীরে (প্রতিদিনে প্রায় এক কিলোমিটার) নিচে নেমে আসতে থাকে তখন তার সংকোচন ঘটে এবং উষ্ণ ভারি একটি স্তরে এটি পরিণত হয়। উক্ত স্তরের নিচে অপেক্ষাকৃত শীতল একটি স্তর অবস্থান করে, এতে উল্টাধারাটির উদ্ভব ঘটে (চিত্র ৫.২)। অধোগামী উল্টাধারা একদিকে যেমন ঘনঘন সৃষ্টি হয় তেমনি এর স্থায়িত্বও দীর্ঘ হয়। অধোগামী উল্টাধারা কখনো কখনো বেশ নিচে নেমে আসে; যখন এটি 200 মিটারেরও নিচে নামে তখন বায়ুমণ্ডলে তীব্র দূষণ-সৃষ্টি হয়। অধোগামী ও নৈশকালীন উল্টাধারা অনেক সময় একই সাথে অবস্থান করে; এরূপ ঘটনাকে উল্টাধারার দ্বিত্ব (double inversion) বলা হয়ে থাকে।

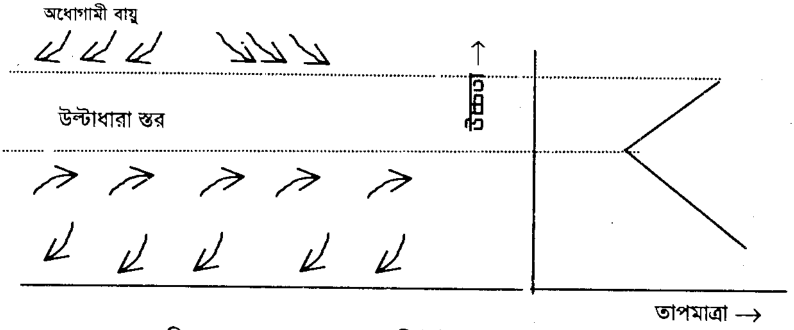

চিত্র ৫.২: বায়ুমণ্ডলে অধোগামী উল্টাধারার উৎপত্তি।

৫.৪ দূষকের শ্রেণীবিভাগ

বায়ুমণ্ডলের দূষককে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে; যথা-

১. প্রাকৃতিক দূষক: যেমন, প্রাকৃতিক ঘন কুয়াশা (fog),পরাগরেণু (pollen grain), ব্যাকটেরিয়া ও আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থিত ধুলা, গ্যাস প্রভৃতি।

২. অ্যারোসল (aerosols) বস্তুকণা; যেমন, ধূলি, ধোঁয়া, কুয়াশা, প্রভৃতি

৩. গ্যাস ও বাষ্প: যেসব গ্যাস ও বাষ্প বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি থাকে, নিচে সারণিতে (সারণি ৫.২) তাদের একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

সারণি ৫.২: বায়ু দূষক গ্যাস ও বাষ্প।

শ্রেণী	উদাহরণ
সালফার যৌগ	SO_2, SO_3, H_2S, মারক্যাপট্যান
নাইট্রোজেন যৌগ	NO, NO_2, NH_3
অক্সিজেন যৌগ	O_3 (ট্রোপোস্ফেয়ার)
হ্যালোজেন যৌগ	HF, HCI
কার্বন যৌগ	CO ও CO_2
জৈব যৌগ	অ্যালডিহাইড, হাইড্রোকার্বন
তেজস্ক্রিয় যৌগ	I-131, P-32, Co-60, Sr-90, Ra-226, প্রভৃতি।

সকল বায়ুদূষককে আবার সাধারণ বিস্তীর্ণ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: যথা 'প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি। 'প্রাইমারি দূষক' উৎস থেকে সরাসরি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে দূষণ সৃষ্টি করে। যেমন, বস্তুকণা, সালফার যৌগ, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হ্যালোজেন যৌগ, জৈব যৌগ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ। পক্ষান্তরে, 'সেকেন্ডারি দূষক' বায়ুমণ্ডলে তৈরি হয়। বায়ুমণ্ডলের দুই বা ততোধিক মিশালের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় অথবা মিশালের সাথে বায়ুর কোনো উপাদানের বিক্রিয়ায় অথবা মিশাল কিংবা বায়ুর উপাদানের আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে দূষক বায়ুমণ্ডলে তৈরি হয় তাকে সেকেন্ডারি দূষক বলে। উদাহরণস্বরূপ, ওজোন, ফরমালডিহাইড, পারক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN), আলোক রাসায়নিক স্মগ, অম্ল কুয়াশা (H_2SO_4: $SO_2 + O + H_2O$) প্রভৃতি এক একটি সেকেন্ডারি দূষক।

উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রাকৃতিক দূষক বাদে আর যেসব পদার্থ উপরে দূষকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদেরও অধিকাংশ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় এবং বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ কর। তবে, এভাবে বায়ুমণ্ডলে যেসব পদার্থ স্থান পায় তাদের ঘনমাত্রা সাধারণত নিম্ন থাকে। উক্ত ঘনমাত্রাকে 'পটভূমি ঘনমাত্রা' (background concentration) বলে। দূষকের পটভূমি ঘনমাত্রা ক্ষতিকর নয় বলে সাধারণভাবে ধরা হয়। সালফারডাইঅক্সাইড (SO_2) এর কথা ধরা যাক; প্রাকৃতিক উপায়েও গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং এর পটভূমি ঘনমাত্রা 2×10^{-4}ppm; গ্যাসটির ঘনমাত্রা যখন উক্ত মানের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয় তখন এটি দূষণ সৃষ্টি করে।

প্রাকৃতিক দূষণ ও মানুষের তৈরি দূষণের মাঝে প্রকৃতিগত বেশকিছু পার্থক্য আছে। প্রাকৃতিক দূষণ বিশ্বব্যাপী বিরাট অঞ্চল জুড়ে সৃষ্টি হয় এবং বাইরের হস্তক্ষেপ না থাকলে এক সময় তা আপনা-আপনি দূর হয়ে যায়; মাটি ও পানি দূষক শোষণ করে নেয়। পক্ষান্তরে, মানুষের সৃষ্টি দূষণ বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমিত থাকে এবং

দিনের পর দিন দূষক সেখানে যুক্ত হয়। এতে দূষণের মাত্রা সেখানে এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, প্রকৃতি তাকে আত্মস্থ করে নিতে পারে না। পরিবেশের দূষণ সৃষ্টিতে তাই যেসব উৎস উদ্বেগের কারণ হয় সেগুলো প্রধানত মানুষের সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান (সারণি ৫.৩ক) বায়ুমণ্ডলে দূষণ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

সারণি ৫.৩ক : বায়ু দূষণের উৎস।

উৎসের শ্রেণী	অ্যারোসল	গ্যাস ও বাষ্প
দহন প্রক্রিয়া - গার্হস্থ্য দহন, তাপীয় পাওয়ার প্লান্ট, জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত যানবাহন, বর্জ্য ভস্মীভূতকরণ প্রভৃতি।	ধূলি ধোঁয়া, ধুম।	SO_2, NO_2, CO, জৈব বাষ্প, গন্ধ।
রাসায়নিক প্রক্রিয়া - কাগজ, সিমেন্ট, সার শিল্প প্রভৃতি।	ধূলি, ধোঁয়া, ধূম, কুয়াশা।	SO_2, H_2S, NH_3, CO, NO_2, জৈব বাষ্প, গন্ধ (প্রক্রিয়া নির্ভর)।
পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ।	ধূলি, কুয়াশা।	SO_2, H_2S, NH_3, CO হাইড্রোকার্বন,মারক্যাপটান।
ধাতু প্রক্রিয়াকরণ (যেমন, স্টিল প্লান্ট, অ্যালুমিনিয়াম শোধানাগার প্রভৃতি)।	ধূলি, ধূম।	SO_2, CO ফ্লোরাইড, জৈব বাষ্প (প্রক্রিয়া নির্ভর)।
আকরিক প্রক্রিয়াকরণ।	ধূলি, ধূম।	(প্রক্রিয়ানির্ভর) SO_2, CO, ফ্লোরাইড, জৈব বাষ্প।
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ।	ধূলি, কুয়াশা।	গন্ধযুক্ত বস্তু।
কৃষিকাজ সংক্রান্তঃ সার, কীটনাশক ছিটানো, মাঠ পোড়ানো।	ধূলি, কুয়াশা ধোঁয়া, উড়া ভস্ম।	ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন SO_x, জৈব বাষ্প।
নিউক্লিয় শক্তি প্রোগ্রাম (আকরিক প্রক্রিয়াকরণ, জ্বালানি প্রস্তুতকরণ, বোমা বিস্ফোরণ)।	ধূলি	ফ্লোরাইড, I-131, Ar-41, তেজস্ক্রিয় গ্যাস (Sr-90, Cs-137, C-14 প্রভৃতি)।

বায়ুমণ্ডল দূষণে শিল্প কারখানা ও ইঞ্জিনচালিত যানবাহনের মুখ্য ভূমিকা থাকে; তাই পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে বায়ুমণ্ডল সবচেয়ে বেশি দূষণের শিকার হয়। একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিবছর যে পরিমাণ দূষক বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তার আংশিক একটি পরিসংখ্যান নিচে দেয়া হলো (সারণি ৫.৩খ)।

উল্লেখ্য, ১৯৭০ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আমেরিকার জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে 30 ও 40%এবং মোটরচালিত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় চার গুণ অথচ পরিবেশে দূষক নিঃসরণের হার প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৫.৩খ দ্র:)। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা এবং দূষকের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নিঃসরণের হার সাধারণভাবে কমেছে।

সারণি ৫.৩খ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর (১৯৯৭ এর হিসাব) বায়ুমণ্ডলীয় দূষকের নিঃসরণ (লক্ষ ছোট টন এককে; ছোট টন = 0.907 মেট্রিক টন)

উৎস	PM_{10}	SO_2	CO	NO_x	VOC	Pb
যানবাহন	7	14	670	116	77	0.0052
জ্বালানি দহন	11	173	48	107	9	0.0050
শিল্প কারখানা	13	17	61	9	98	0.029
অন্যান্য	-	0.0	96	3	8	-
মোট	31	204	875	235	192	0.039
১৯৭০-এর তুলনায়	-	65%	78%	116%	70%	1.7%

[PM_{10} = বস্তুকণা (particulate matter), 10 μm অথবা ক্ষুদ্রতর; SO_2 = সকল প্রকার সালফারঅক্সাইড, প্রধানত SO_2; NO_x = সকল প্রকার নাইট্রোজেন অক্সাইড, প্রধানত NO ও NO_2; VOC = উদ্বায়ী জৈব যৌগ; 'অন্যান্য' উৎসে 'দাবানল' এর ভূমিকা মুখ্য]

সূত্র:

1. National Air Quality and Emissions Trend Report, 1997, EPA –454/R-98-016;
2. National Air Pollution Emissions Estimates, 1940-1990, EPA-450/4-91-026

তবে সীসা নিঃসরণের ক্ষেত্রে হারের যে বিশাল অবনতি ঘটেছে তা যানবাহনের জ্বালানি পরিবর্তন করার জন্য মুখ্যত সম্ভব হয়েছে -পূর্বে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে যেখানে একমাত্র সীসাযুক্ত গ্যাসোলিন ব্যবহৃত হতো, ১৯৭০ সালের পর সেখানে সীসামুক্ত গ্যাসোলিনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছে। তথাপি, বায়ু দূষণ বর্তমানে যে গতিতে বেড়ে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দূষণ নিঃসরণের হার এ পর্যন্ত যে গতিতে হ্রাস পেয়েছে তা সন্তোষজনক নয় এবং ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতি ঘটানো আরও বেশি কঠিন হবে।

৫.৫ প্রাকৃতিক দূষক (Natural Pollutant)

প্রাকৃতিক বায়ু-দূষকের মাঝে পরাগরেণু (pollen grain) অন্যতম। লতাগুল্ম, ঘাস ও গাছপালা থেকে এটি বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়। পরাগরেণুর বিশেষ একটি ধর্ম - ব্যক্তি বিশেষের বিভিন্ন অঙ্গে (বিশেষ করে, শ্বাসনালী, চর্ম, চোখ ও কান) এটি যন্ত্রনাদায়ক অনুভূতি সৃষ্টি করে যাকে অ্যালার্জী (allergy) বলে। কারো কারো ক্ষেত্রে এতে অ্যাজমা (asthma),সর্দি,কাশি,মাথাধরাসহ জ্বর (hay-fever), ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) প্রভৃতি রোগও সৃষ্টি হয়। পরাগরেণুর ব্যাস সাধারণত 10-50 μm এর মাঝে অবস্থান করে। পরাগরেণু বাদে বায়ুবাহিত আরও কিছু কণা অ্যালার্জী সৃষ্টি করে থাকে; যেমন, ইস্ট (yeast), ছাতা (mould), জীবজন্তুর লোম, পাখির পালক প্রভৃতি।

৫.৬ কার্বন মনোক্সাইড, CO

বায়ুতে CO-এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা (U.S. স্ট্যান্ডার্ড): 10 mg/m^3 (9 ppm) সর্বোচ্চ আট ঘণ্টার মান, বছরে একবার হতে পারে; 40 mg /m^3 (35 ppm) সর্বোচ্চ এক ঘণ্টার

মান, বছরে একবার হতে পারে। কার্বন মনোক্সাইড রঙ-স্বাদ-গন্ধহীন, পানিতে দ্রবণীয় একটি গ্যাস (b.p. - 192°C); জৈব-বস্তুর অসম্পূর্ণ দহন গ্যাসটির প্রধান একটি উৎস। কার্বন মনোক্সাইড তীব্র বিষাক্ত একটি গ্যাস এবং শ্বাসরোধক হিসেবে এটি পরিচিত।

প্রতিবছর প্রায় ৩৮০ কোটি মেট্রিক টন CO বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, এর মাত্র এক নবমাংশ মানুষের সৃষ্টি (anthropogenic) অবশিষ্ট সিংহভাগের উৎস প্রাকৃতিক (সারণি ৫.৪)। প্রাকৃতিক উৎসের মাঝে ক. জৈবিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন মিথেন (CH_4)ও ফরমালডিহাইডের (HCHO) জারণ,খ.গাছপালা, সামুদ্রিক শৈবাল প্রভৃতি উদ্ভিদে ক্লোরোফিলের বিভাজন ও গ.টারপিনের আলোক-রাসায়নিক জারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, CH_4 ও HCHO এর জারণ থেকে যে CO বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তা বায়ুমণ্ডলীয় মোট CO এর প্রায় ৪৪%। অপরদিকে, CO এর যে ভগ্নাংশ মানুষের সৃষ্টি তার প্রায় 70% এর উৎস জীবাশ্ম জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন, যানবাহনের ধোঁয়ার মাধ্যমে যা বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়।

সারণি ৫.৪ : বায়ুমণ্ডলে CO -এর বার্ষিক অনুপ্রবেশ (কোটি মেট্রিক টন)।

প্রাকৃতিক	পরিমাণ	মানুষের সৃষ্ট উৎস	পরিমাণ
মিথেন ও ফরমালডিহাইডের জারণ :	300	জীবাশ্ম জ্বালানির দহন	70%
ক্লোরোফিলের সংশ্লেষণ ও বিভাজন :	9	শস্যক্ষেত্রের অবশেষ পোড়ানো, দাবানল	17%
টারপিনের আলোক-রাসায়নিক জারণ:	5.4	লৌহ ইস্পাত কারখানার বৈদ্যুতিক ও বাত্যাচুল্লি, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, কাগজ শিল্প, গ্যাস উৎপাদন কয়লা খনি প্রভৃতি :	9%
সমুদ্রের পানি থেকে নির্গমন, আগ্নেয়গিরির উদগীরণ, বীজের অঙ্কুরোদ্গম, বায়ুমণ্ডলে বিজলি সঞ্চালন প্রভৃতি :	22		
মোট :	336.4	মোট :	40 প্রায়

সূত্র: L.S. Jaffe, 'J. Geophys. Res.,' Vol.78 (1973), p. 5293 ।

বায়ুমণ্ডলে CO এর যে অনুপ্রবেশ ঘটে তাতে মানুষের ভূমিকা যতই গৌণ হোক, বায়ুমণ্ডলে গ্যাসটির যে দূষণ সৃষ্টি হয়, মানুষের সৃষ্টি CO-ই তার জন্য মুখ্যত দায়ী থাকে। গ্রামাঞ্চলের বায়ুতে CO এর গড় ঘনমাত্রা যেখানে মাত্র 0.1 ppm (বায়ুমণ্ডলে CO এর পটভূমি ঘনমাত্রা), শহরাঞ্চলের বায়ুতে তা সেখানে 10-40 ppm; এমনকি ব্যস্ত সময়ে (9 a.m.-10 p.m.) তা কখনো কখনো 100 ppm এরও বেশি হতে পারে। গ্রাম ও শহরের বায়ুতে CO-ঘনমাত্রার এই যে বিরাট পার্থক্য তার জন্য মানুষের সৃষ্টি

CO কার্যত দায়ী থাকে। শহর অঞ্চলের বায়ুতে যানবাহনের ধোঁয়া প্রবেশ করে, এতে প্রচুর পরিমাণ CO থাকে যা সেখানকার বায়ুতে গ্যাসটির ঘনমাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

বায়ুমণ্ডল থেকে CO অপসারণ: বায়ুমণ্ডলে CO এর স্থিতিকাল বেশ উচ্চ, গড়ে প্রায় 70 দিন। বায়ুমণ্ডলে গ্যাসটির জারণ মন্থর; সূর্যালোকে প্রতিঘণ্টায় মাত্র 0.1% CO এভাবে অপসারিত হয়:

$$2CO + O \rightarrow 2CO_2$$

গ্যাসটির বায়ুমণ্ডলীয় জারণে হাইড্রোক্সিলমুক্ত রেডিকেল (OH) অনুঘটক হিসেবে কাজ করে বলে মনে করা হয় এবং ধারণাটির সপক্ষে নিম্নরূপ একটি কৌশলও প্রদান করা হয়েছে:

$$OH + CO = CO_2 + H$$
$$H + O_2 + M = HO_2 + M$$
$$HO_2 + NO = HO + NO_2 \text{ ।}$$

বায়ুমণ্ডলীয় CO এর প্রধান অপসারণকারক সম্ভবত মৃত্তিকা এবং বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া ও ফাংগাস এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এক নিরীক্ষায় দেখানো হয়েছে, 120 ppm CO সমৃদ্ধ বায়ু মাত্র তিন ঘণ্টা যাবৎ 2.8 kg মৃত্তিকার সংস্পর্শে অবস্থান করলে বায়ু থেকে CO সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় অথচ জীবাণুমুক্ত (sterilised) মৃত্তিকার অথবা জীবাণুমক্ত পরিবেশে উৎপাদিত উদ্ভিদের CO অপসারণের কোনো ক্ষমতা থাকে না।

জনস্বাস্থ্যের উপর CO-এর প্রভাব: কার্বন মনোক্সাইড ফুসফুস (lungs) থেকে রক্তে যুক্ত হয় এবং সেখানে রক্তের লালকণিকা, হিমোগ্লোবিন এর সাথে বিক্রিয়া করে কার্বোক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে (COHb)। হিমোগ্লোবিনের প্রতি CO-এর আসক্তি O_2-এর তুলনায় প্রায় 270 গুণ বেশি প্রবল তাই CO-এর উপস্থিতিতে হিমোগ্লোবিনের O_2 বহন করার ক্ষমতা বিপুল মাত্রায় হ্রাস পায় এবং দেহকোষে O_2 তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশিত হতে পারে না। এতে CO দূষণে আক্রান্ত ব্যক্তি শ্বাসকষ্টে ভোগে, এমনকি তার মৃত্য পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাছাড়া, রক্তে COHb উৎপন্ন হলে অক্সিহিমোগ্লোবিনের (O_2Hb) বিয়োজন হ্রাস পায়; পরিণামে দেহ কলায় O_2 পরিবেশনে আরও ব্যাঘাত ঘটে। বায়ুতে CO-এর ঘনমাত্রা যত বেশি থাকে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি যত বেশি শারীরিক শ্রম করে, রক্তে COHb-এর মাত্রা তত বৃদ্ধি পায়। যাহোক, বায়ুতে CO-এর মাত্রাভেদে মানুষের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয় (সারণি ৫.৫)। CO দূষিত বায়ুতে (CO<100 ppm) শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে রক্তে COHb যে সাম্যঘনমাত্রায় অবস্থান করে তা নিম্নলিখিত সমীকরণের* সাহায্যে স্থূলভাবে হিসাব করা যায়:

রক্তে COHb (%) = 0.16 (বায়ুতে ppm CO) + 0.15;

[*USEPA, 'Air Quality Criteria for CO.' 1970]

সারণি ৫.৫: মানুষের শরীরে রক্তের COHb -মাত্রার প্রভাব।

মাত্রা (%)	স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির উপর প্রভাব।	হৃদরোগীর উপর প্রভাব
1 - 5	রক্তের হ্রাসপ্রাপ্ত O_2 বহন ক্ষমতা পূরণ হতে কোনো কোনো অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গে রক্তের প্রবাহ বেড়ে যায়।	হৃদরোগীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহ সম্ভব না হতে পারে।
5 - 9	দেখার জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় যে আলো প্রয়োজন তার থেকে বেশি আলো প্রয়োজন হয়।	
16 - 20	শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট (কর্মরত অবস্থায়), দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়।	হৃদরোগ তীব্র হলে মৃত্যু ঘটতে পারে।
20 – 30	মাথাধরা, বমিভাব লাগে।	
30 - 40	তীব্র মাথাধরা, বমিভাব, বমি হতে পারে, মাথা ঝিমঝিম করে।	
50 - 60	খিঁচুনি, সংজ্ঞাহীন (coma) অবস্থা সৃষ্টি হয়।	
60 - 70	চিকিৎসা করা না হলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।	

[সূত্র: R.D. Stewart, 'The Effects of CO on Humans', Annual Review of Pharmacology, Vol. 15 (1975), p-409.]

বায়ুমণ্ডলে CO এর দূষণ নিয়ন্ত্রণ : বায়ুমণ্ডলে CO এর যে দূষণ ঘটে তার জন্য যানবাহনের ধোঁয়া প্রধানত দায়ী। মানুষের তৈরি মোট যে CO বায়ুমণ্ডলে স্থান পায় তার প্রায় 70% এর উৎস অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিনের (internal combustion engine) ধোঁয়া। অতএব,বায়ুমণ্ডলে CO এর দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থাই বিবেচনা করা হোক তা কার্যত ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় CO এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি ব্যবস্থা হতে হবে। চারটি উপায়ে উক্ত ধোঁয়ায় CO এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে; যথা,

১. ইঞ্জিনের গঠন রূপান্তরণ

২. বহির্গামী ধোঁয়া যথাযথ বিক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরণ;

৩. গ্যাসোলিনের পরিবর্তে অন্য কোনো জ্বালানি ব্যবহার যাতে CO এর উৎপাদন না ঘটে কিংবা কম ঘটে এবং

৪. অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিনের পরিবর্তে শক্তির অন্য কোনো উৎস ব্যবহার যা দূষণ সৃষ্টি করে না।

ইঞ্জিনের গঠন-রূপান্তর সম্পর্কে যেসব কাজ এ পর্যন্ত হয়েছে তার ফলাফল মিশ্র। ধোঁয়ায় CO এর পরিমাণ হ্রাস করা যায় কিন্তু সাথে সাথে ইঞ্জিনের ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

অনুঘটকের (catalyst) উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইঞ্জিনের বহির্গামী ধোঁয়ার রূপান্তর সম্ভব হয়েছে এবং ব্যবস্থাটি শিল্পোন্নত দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃতও হচ্ছে। ক্যাটালিটিক কনভারটর (catalytic convertor) নামে এটি পরিচিত। তবে, এতে খরচ যেমন বেশি তেমনি সীসাযুক্ত[টেট্রাইথাইল লেড $Pb(C_2H_5)_4$] জ্বালানি এতে ব্যবহার করা যায় না; সীসা অনুঘটকের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।

অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হয় তাতে CO বাদে NO_x, হাইড্রোকার্বন (HC) ও বস্তুকণাও (particulates) উপস্থিত থাকে। সবগুলো উপাদানই বায়ুদূষক; দুই স্তর বিশিষ্ট কনভারটরের সাহায্যে সবগুলো গ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কনভারটরের প্রথম স্তরে Pt-অনুঘটকের উপস্থিতিতে NO_x গ্যাস N_2 ও NH_3-তে বিজারিত হয়। বিজারিত ধোঁয়া দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করে। বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে স্তরটিকে জারণীয় পরিবেশে রাখা হয় এবং ধোঁয়ায় যে HC ও CO থাকে CO_2 ও H_2O-তে তাদের জারণ ঘটে।

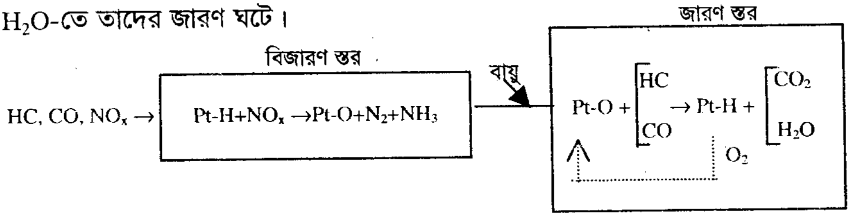

এভাবে কনভারটরের দুটি স্তর পার হয়ে যে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে তা দূষকমুক্ত থাকে।

কার্বনমনোক্সাইড নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গ্যাসোলিনের পরিবর্তে সংনমিত (compressed) ও তরল, উভয় প্রকার প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে পরীক্ষা চালনা হয়েছে। এতে বহির্গামী ধোঁয়া দূষকমুক্ত থাকে ঠিকই তবে গ্যাসের সংরক্ষণ ও নিয়ত (steady) পরিবেশনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। অ্যালকোহলও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এতে অ্যালডিহাইড তৈরি হয় যা চোখে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

যানবাহনে অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিনের বিকল্প হিসেবে ইলেকট্রিক, জলীয়বাষ্প (steam) ও গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিনের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। তবে, বিকল্পগুলোর প্রত্যেকটি গ্যাসোলিনের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

৫.৭ নাইট্রোজেনের অক্সাইড (Oxides of Nitrogen), NO_x

[বায়ুতে NO_x এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা (U.S. স্টান্ডার্ড) : 100 $\mu g/m^3$ (0.05 ppm) NO_2, বার্ষিক গাণিতিক গড়]

নাইট্রোজেনের অক্সাইড সংখ্যা সাত-N_2O, NO, NO_2, NO_3, N_2O_3, N_2O_4, ও N_2O_5। এদের মাঝে মাত্র তিনটি, নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ও নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) বায়ুমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত থাকে। অক্সাইড তিনটির মাঝে N_2O বিষাক্ত নয়, হাসি উদ্দীপক গ্যাস (laughing gas) নামে এটি পরিচিত; বাকি দুটি অক্সাইড, NO ও NO_2 বায়ুমণ্ডলে দূষণ সৃষ্টি করে। নাইট্রিক

অক্সাইড (NO) রঙহীন, গন্ধহীন, একটি গ্যাস; পক্ষান্তরে, NO_2 (b.p. 21°C) এর রঙ লাল-বাদামি এবং গন্ধ কটু ও শ্বাসরুদ্ধকর। নাইট্রিক অক্সাইডের বিষক্রিয়া মৃদু কিন্তু NO_2 তীব্র একটি বিষ।

নাইট্রোজেনের অক্সাইড প্রধানত NO আকারে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং অল্পদিনের মাঝে তা কার্যত সম্পূর্ণরূপে NO_2 এ পরিণত হয়। তাই, বায়ুমণ্ডলে N-অক্সাইডের যে দূষণ ঘটে তাতে কোন অক্সাইডের ভূমিকা কতখানি থাকে তা প্রায়ই সঠিকভাবে জানা যায় না। উক্ত দূষণকে তাই 'মোট N-অক্সাইড' বা NO_x এর দূষণ হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবছর প্রায় ১০০ কোটি মেট্রিক টন NO_xবায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে; এতে প্রাকৃতিক উৎসের ভূমিকা থাকে মুখ্য। বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ NO_x মানুষের কাজের মাধ্যমে যুক্ত হয় তার প্রায় বিশগুণ বেশি যুক্ত হয় প্রাকৃতিক উৎস থেকে (সারণি ৫.৬)। প্রাকৃতিক NO_xএর প্রধান দুটি উৎস,মৃত্তিকায় আণুবীক্ষণিক জীবের জৈবিক প্রক্রিয়া এবং বায়ুমণ্ডলে বিজলির প্রবাহ। অন্যদিকে মানুষের সৃষ্টি যে NO_x তার উৎস কার্যত একটি, বায়ুপ্রবাহের উপস্থিতিতে উচ্চতাপে জ্বালানি দহন, উচ্চতাপে বায়ুর N_2 ও O_2 এর বিক্রিয়ায় NO উৎপন্ন হয়:

$$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$$

সারণি ৫.৬ : বায়ুমণ্ডলে NO_x এর বার্ষিক অনুপ্রবেশ (কোটি মেট্রিক টন)।

প্রাকৃতিক উৎস		মানুষের সৃষ্টি (NO_2)	
মৃত্তিকায় জৈবিক ক্রিয়া, বায়ুমণ্ডলে বিজলি সঞ্চলন (NO):	45.5	কয়লা দহন	: 2.44
(N_2O) :	53.7	খনিজ তেল দহন	: 2.02
		প্রাকৃতিক গ্যাস দহন	: .19
		অন্যান্য জ্বালানি দহন	: 0.14
		মোট	: 4.79

[সূত্র: E. Robinson and R.C. Robbins, Gaseous Nitrogen Compound Pollutants from Urban and Natural Sources, *J. Air Pollutant Control Assoc.*, Vol. 20 (1970). p. 303.]

নাইট্রোজেন-অক্সিজেন বিক্রিয়ার হার ও সাম্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন, 3% O_2 ও 72% N_2 এর একটি মিশ্রণ থেকে (অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিনের টিপিক্যাল মিশ্রণ) 1315°C তাপমাত্রায় 23 মিনিটে 500 ppm NO উৎপন্ন হয়; উক্ত মিশ্রণ থেকে একই মাত্রার NO উৎপন্ন হতে 1980°C তাপমাত্রায় সময় লাগে মাত্র 0.117 সেকেন্ড। আবার, বিক্রিয়াটি কক্ষতাপে (27°C) সম্পাদিত হলে যে NO উৎপন্ন হয় তার সাম্যঘনমাত্রা থাকে 1.1×10^{-10} ppm। অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন বায়ুমণ্ডলে NO এর প্রধান একটি পরিবেশক; ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়া দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায় বলে নিম্নতাপে NO এর যে সাম্যঘনমাত্রা পাওয়া যায় তার তুলনায়

অনেক বেশি NO নির্গত ধোঁয়ায় উপস্থিত থাকে; স্থায়ী একটি চুল্লির ধোঁয়ায় যে NO থাকে তার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

নাইট্রিক অক্সাইডের (NO) সাথে O_2 এর বিক্রিয়ায় NO_2 উৎপন্ন হয়:

$$2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2 \, ;$$

বিক্রিয়াটির জন্যও উচ্চ তাপমাত্রা (প্রায় 1100°C) অনকূল একটি শর্ত। তবে, ঐরূপ তাপেও যে পরিমাণ NO_2 উৎপন্ন হয় তা মোট NO_x এর ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ, 0.5% এরও কম। আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেও NO থেকে বায়ুমণ্ডলে NO_2 উৎপন্ন হয় তবে বায়ুতে হাইড্রোকার্বন উপস্থিত থাকলে বিক্রিয়াটিতে ব্যাঘাত ঘটে।

বায়ুমণ্ডল থেকে NO_x অপসারণ : দূষণহীন বায়ুতে NO এর গড় স্থিতিকাল (residence time) প্রায় চারদিন তবে বায়ু অতিমাত্রায় দূষিত হলে গ্যাসটির স্থিতিকাল হ্রাস পায়, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় তা নেমে আসে। বায়ুমণ্ডল থেকে NO গ্যাসটি NO_2 আকারে অপসারিত হয়; বেশকিছু উপায়ে NO গ্যাস NO_2এ পরিণত হতে পারে; যেমন, O_2 এর সাথে NO-এর বিক্রিয়া:

$$2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2; \; K'_p = 1.38 \times 10^6 \text{ atm}^{-1/2} \qquad (৫.১০)$$

সাম্যধ্রুবক, K'_pএর উল্লিখিত মানটি নির্দেশ করে, বায়ুমণ্ডলে (p_{O_2} = 0.21 atm) বিক্রিয়াটির সাম্যাবস্থায় NO কার্যত সম্পূর্ণরূপে NO_2 এ পরিণত হয় ($\frac{p_{NO_2}}{p_{NO}} = 6.3 \times 10^5$); বিক্রিয়াটির সঠিক কৌশল অজানা। ওজোন (O_3) ও পারমাণবিক অক্সিজেন দ্বারাও অক্সাইডটি NO_2 -এ জারিত হতে পারে:

$$NO + O_3 \rightleftharpoons NO_2 + O_2 \qquad (৫.১১)$$

$$NO + O + M \rightleftharpoons NO_2 + M \qquad (৫.১২)$$

বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে কিছু পরিমাণ O_3 থাকে (0.03-0.05 ppm) এবং O_3এর সাথে NO এর বিক্রিয়া হারও উচ্চ। যাহোক, NO-O_2 তাপীয় বিক্রিয়ায় (5.10) তিন অণু সংশ্লিষ্ট বলে এর হার নিম্ন হওয়া স্বাভাবিক এবং যে হারে NO বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারিত হয় তার সাথে উক্ত বিক্রিয়ার হার সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। তাই, ধারণা করা হয়, বায়ুমণ্ডল থেকে NO -এর অপসারণে (NO_2 রূপান্তর) O_3 এর সাথে অক্সাইডটির বিক্রিয়া সম্ভবত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য, NO যখন NO_2 এ পরিণত হয় তখন বায়ুমণ্ডল থেকে NO_x দূষকের অপসারণ ঘটে না বরং এর তীব্রতা বাড়ে। কেননা, দূষক হিসেবে NO এর তুলনায় NO_2 তীব্রতর । বায়ুমণ্ডল থেকে দূষক, NO_x এর অপসারণ বলতে তাই কার্যত NO_2 এর অপসারণ বুঝায়।

বায়ুমণ্ডল থেকে NO_2 বেশকিছু বিক্রিয়ার মাধ্যমে অপসারিত হতে পারে; এদের মাঝে NO_2 এর আলোক-বিভাজন ও হাইড্রোক্সিল মুক্ত রেডিকেল-এর সাথে NO_2 এর বিক্রিয়া সম্ভবত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অতিবেগুনি বিকিরণের প্রভাবে NO_2 বিভাজিত হয়:

$$NO_2 + h\nu \xrightarrow{\lambda \le 435nm} NO + O \qquad (৫.১৩)$$

বিক্রিয়াটির কোয়ান্টাম দক্ষতা (quantum efficiency) প্রায় এক (যখন, $\lambda < 370$ nm) তবে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বাড়ে, দক্ষতা তত দ্রুত হ্রাস পায়। বিভাজন বিক্রিয়ার পরবর্তী ধাপে উৎপাদ দুটি আবার পরস্পর বিক্রিয়া করে:

$$O + O_2 + M \rightarrow O_3 + M\ (M = N_2, O_2) \qquad (৫.১৪)$$

$$O_3 + NO \rightarrow NO_2 + O_2 \qquad (৫.১৫)$$

উপরের সবগুলো বিক্রিয়া দ্রুততার সাথে ঘটে এবং আলোকস্থিতি অবস্থা (photostationary state) প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত অবস্থা বায়ুমণ্ডলে NO_2/NO অনুপাতকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তত্ত্বীয় যুক্তির সাহায্যে দেখানো যায়,

$$\frac{[NO_2]}{[NO]} = \frac{k_3[O_3]}{J_1} \qquad (৫.১৬)$$

যখন k_3, বিক্রিয়া (৫.১৫) এর হার-সহগ এবং J_1 আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া (৫.১৩) এর হার-সহগ। রাতের বেলা $J_1 = 0$ এবং গ্রীষ্মের দুপুরে $J_1 \cong 20\ h^{-1}$ (সর্বোচ্চ) হয়; সমীকরণ (৫.১৬)-এ J_1 এর উক্ত মান বসিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, রাতের বেলা NO_2/NO অনুপাত সর্বোচ্চ এবং গ্রীষ্মের দুপুরে তা সর্বনিম্ন থাকে; বায়ুমণ্ডলে বাস্তবে ঘটেও তাই। যাহোক, NO_2এর আলোক-বিভাজন ঘটার পর নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলোও ঘটার সম্ভাবনা থাকে:

$$NO_2 + O_3 \rightarrow NO_3 + O_2 \qquad (৫.১৭)$$

$$O + NO_2 + M \rightarrow NO_3 + M \qquad (৫.১৮)$$

$$NO_2 + NO_3 \rightarrow N_2O_5;\ N_2O_5 + H_2O \rightarrow HNO_3 \qquad (৫.১৯)$$

$$NO + NO_3 \rightarrow 2NO_2 \qquad (৫.২০)$$

বায়ুমণ্ডল থেকে NO_2 অপসারিত হওয়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ, OH মুক্ত রেডিকেলের সাথে অক্সাইডের বিক্রিয়া:

$$NO_2 + OH \rightarrow HNO_3 \qquad (৫.২১)$$

মুক্ত রেডিকেল, OH অতিমাত্রায় সক্রিয় একটি উপাদান। বায়ুমণ্ডলে এর সময়ভিত্তিক গড় 1.0×10^{-7} ppm। উক্ত তথ্যের আলোকে হিসাব করে দেখানো যায় (উদাহরণ ৫.৪), অনবরত NO_x যুক্ত হচ্ছে, বায়ুমণ্ডলের এমন একটি অংশ থেকে OH এর সাথে বিক্রিয়ায় প্রতিঘণ্টায় NO_2 অপসারিত হয় 9% হারে।

উপরের বিক্রিয়াটি (৫.২১) স্ট্রাটোস্ফেয়ারেও ঘটে তবে আলোক-রাসায়নিক অথবা OH এর সাথে বিক্রিয়ায় HNO_3 অ্যাসিড সেখানে আবার বিভাজিতও হয়। স্ট্রাটোস্ফেয়ারের HNO_3 অ্যাসিড NO_2 এর ক্ষণস্থায়ী একটি অপসারক:

$$HO + HNO_3 \rightleftharpoons NO_3 + H_2O$$

$$HNO_3 + h\nu \rightarrow NO_2 + OH$$

N-অক্সাইডের দূষক HNO_3 অ্যাসিড অথবা নাইট্রেট কণা আকারে শেষপর্যন্ত একদিন বৃষ্টির পানির সাথে বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে এবং বায়ুমণ্ডলে NO_x এর দূষণ তীব্র হলে তাতে অম্লবৃষ্টি সৃষ্টি হতে পারে।

উদাহরণ ৫.৪: অবিরাম দূষণে আক্রান্ত বায়ুমণ্ডলের একটি খণ্ডে NO_2 এর ঘনমাত্রা 10 ppb; বায়ুমণ্ডলে OH মুক্ত রেডিকেলের ঘনমাত্রা 1.0×10^{-7} ppm হলে মুক্ত রেডিকেলের সাথে বিক্রিয়ায় NO_2 প্রতি ঘণ্টায় কি হারে অপসারিত হয় ?

$$NO_2 + OH \rightarrow HNO_3,\ k = 2.5 \times 10^2\ ppm^{-1}\ s^{-1}$$
$$(d/dt)\ [HNO_3] = k\ [NO_2]\ [OH]$$ ।

OH রেডিকেলটি অতীব সক্রিয় একটি উপাদান বলে বিক্রিয়াটির সাম্য প্রতিষ্ঠায় 'স্থিতি অবস্থা নীতি'(steady state principle) প্রযোজ্য হয় এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যাপ্তিতে (কয়েক ঘণ্টা) OH এর ঘনমাত্রা আলোচ্য ক্ষেত্রে ধ্রুবক ধরা যেতে পারে। অতএব,

$$(d/dt)\ [HNO_3] = k'\ [NO_2];$$

যখন k' (নকল প্রথম ধারা হার ধ্রুবক) $= k\ [OH]$

$$= 2.5 \times 10^2\ ppm^{-1}\ s^{-1} \times 1.0 \times 10^{-7}\ ppm$$
$$= 2.5 \times 10^{-5}\ s^{-1}$$

$\therefore$ হার $= (d/dt)\ [HNO_3] = k'\ [NO_2]$

$$= 2.5 \times 10^{-5}\ s^{-1} \times 3600 s \times 0.01\ ppm$$
$$= 9 \times 10^{-4}\ ppm\ h^{-1}$$ বা $0.9\ ppb\ h^{-1}$

অতএব, বিক্রিয়াটির ফলে NO_2 এর প্রতিঘণ্টায় অপসারণ হার:

$\%$ অপসারণ $= (9 \times 10^{-4} / 0.01) \times 100 = 9\%\ h^{-1}$;

এবং HNO_3 তৈরি হওয়ার হার $= 0.9\ ppb\ h^{-1}$। শহরাঞ্চলের দূষিত বায়ুতে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে।

উদাহরণ ৫.৫: বায়ুমণ্ডল থেকে NO_2 হাইড্রোক্সিল রেডিকেল (OH) এর সাথে বিক্রিয়ায় অপসারিত হলে বায়ুমণ্ডলে এর স্থিতিকাল (residence time) কত হবে, যখন বায়ুমণ্ডলে OH এর সময়ভিত্তিক গড় 1.0×10^{-7} ppm ?

একটি পদার্থ প্রথম ধারা অথবা নকল প্রথম ধারা (pseudo-first-order) অনুসারে অপসারিত হলে, তার স্থিতিকাল, $\tau = (k')^{-1}$; যখন, k' সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার হার-ধ্রুবক। বায়ুমণ্ডলে OH এর সাথে NO_2 এর যে বিক্রিয়া ঘটে তা 'নকল প্রথম ধারা' অনুসারে প্রকাশ করা যেতে পারে। অতএব, বায়ুমণ্ডলে NO_2 এর স্থিতিকাল,

$$\tau = (k')^{-1} = \{\ k\ [\ OH\ ]\ \}^{-1}$$
$$= (2.5 \times 10^2 \times 1.0 \times 10^{-7})^{-1}\ s = 4 \times 10^4\ s$$
$$= 11.1\ h.$$

বায়ুমণ্ডলে NO_x - দূষকের প্রভাব : প্রতিবছর মোট যে পরিমাণ NO_x বায়ুমণ্ডলে স্থান পায় তার ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ (প্রায় এক দশমাংশ) মানুষের সৃষ্টি অথচ বায়ুমণ্ডলে গ্যাসটির যে দূষণ সৃষ্টি হয়, মানুষের সৃষ্টি ক্ষুদ্র ঐ ভগ্নাংশই তার জন্য কার্যত দায়ী

থাকে। প্রাকৃতিক NO_x বিশ্বব্যাপী বিশাল বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে এবং প্রাকৃতিক উপায়েই তার অপসারণ ঘটে বলে পরিমাণ যতই বিশাল হোক তাতে বায়ুমণ্ডলে এর ঘনমাত্রা কদাচিত দূষণ স্তরে পৌঁছায়। পক্ষান্তরে, মানুষের সৃষ্টি NO_x একদিকে যেমন বায়ুমণ্ডলের ছোটো ছোটো খণ্ডে সীমিত থাকে তেমনি দিনের পর দিন তা সেখানে যুক্ত হয়। ফলে, অচিরেই এর প্রাচুর্য দূষণমাত্রায় পৌঁছে যায়। মানুষের সৃষ্টি যে NO_x বায়ুমণ্ডলে দূষণ সৃষ্টি করে, যানবাহনের অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন তার প্রধান একটি উৎস; ইঞ্জিনে NO সৃষ্টি হয়, ধোঁয়ার সাথে যা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের বায়ুতে তাই NO_x এর ঘনমাত্রা অনেক বেশি থাকে, ১০-১০০ গুণ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী অঞ্চলে বায়ুতে NO_x এর গড় ঘনমাত্রা যেখানে মাত্র 2 ppb, শহরাঞ্চলের বায়ুতে তা 500 ppb পর্যন্ত হয়ে থাকে। যানবাহনের ধোঁয়া যেহেতু শহরের বায়ুতে NO_x এর প্রধান উৎস তাই সময়ের সাথে এর ঘনমাত্রার ওঠানামাও ঘটে। ভোরের দিকে যানবাহন যখন কম তখন বায়ুতে NO_x এর ঘনমাত্রাও কম থাকে এবং দিনের ব্যস্ত সময়ে (8-10 টা) গ্যাসটির ঘনমাত্রা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সময়ের সাথে NO ও NO_2 এর (NO_x এর উপাদান) আপেক্ষিক মাত্রারও ওঠানামা ঘটে। সূর্যের প্রখরতা যত বাড়ে, বায়ুতে NO_2-এর ঘনমাত্রা তত বাড়ে এবং NO-এর ঘনমাত্রা তত কমে। সূর্যের প্রখরতা যখন বাড়ে তখন অতিবেগুনি বিকিরণের তীব্রতাও বাড়ে; অতিবেগুনি বিকিরণের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে O_3 সৃষ্টি হয় যা NO কে NO_2 এ জারিত করে।

বায়ুমণ্ডলে NO_x এর দূষণ জনস্বাস্থ্য ও উদ্ভিদ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর তবে NO এর দূষণ তেমন তীব্র নয়। নাইট্রিক অক্সাইড (NO), CO এর মতো রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে আবদ্ধ হয়ে হিমোগ্লোবিনের O_2 পরিবহণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, বায়ুতে দূষণ যখন সৃষ্টি হয় তখন তাতে NO এর তুলনায় CO এর ঘনমাত্রা অনেক বেশি থাকে। তাই, হিমোগ্লোবিনের উপর যে প্রভাব পড়ে তা কার্যত CO এর প্রভাব, NO এর ভূমিকা তাতে থাকে না বললেও চলে। বস্তুত, দূষক হিসেবে NO এর যে পরিচিতি তা গ্যাসটি NO_2 এ পরিণত হয় বলেই মূলত সৃষ্টি হয়েছে।

নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) জনস্বাস্থ্যের জন্য বিষাক্ত একটি গ্যাস। বায়ুতে NO_2 যখন 50-100 ppm মাত্রায় উপস্থিত থাকে তখন তাতে কয়েক মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস নিলেই ফুসফুসের কলায় ফোলা ও প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে তবে 6-8 সপ্তাহ পর তা আপনা আপনি আবার নিরাময় হয়। NO_2 ফুসফুসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রে জমা হয়ে HNO_3 ও HNO_2 অ্যাসিডে ধীরে ধীরে বিভাজিত হতে থাকে। HNO_3 ও HNO_2 অ্যাসিড দুটি কলায় প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং তার বিভাজন ঘটায়। বায়ুতে দূষণের মাত্রা যত বেশি হয়, স্বাস্থ্যের উপর তার ক্ষতিকর প্রভাব তত বাড়ে।

500 ppm কিংবা তারও বেশি মাত্রার NO_2 বায়ুতে উপস্থিত থাকলে সে বায়ুতে 2-10 দিনের মধ্যে একজনের মৃত্যুও ঘটতে পারে। NO_2 এর দূষণ বহুলাংশে পেশাগত

একটি সমস্যা; HNO_3 অ্যাসিডের বাণিজ্যিক উৎপাদন, ইলেকট্রিক আর্কের সাহায্যে ঢালাই, নাইট্রোজেন বিস্ফোরক ব্যবহার করে খনি-খনন প্রভৃতি পেশায় কর্মরত ব্যক্তিদের NO_2 দূষণে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যাহোক, বিভিন্ন মাত্রার NO_2 স্বাস্থ্যের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা নিচে (সারণি ৫.৭) লিপিবদ্ধ করা হলো।

সারণি ৫:৭ : শরীরের উপর বায়ুমণ্ডলীয় NO_2 এর প্রতিক্রিয়া।

প্রতিক্রিয়া	NO_2 ঘনমাত্রা, ppm	প্রভাবাধীন কাল (exposure)
শ্বাস-প্রশ্বাসের বিষম ব্যাধি	0.06-0.1	2-3 বছর
স্কুলগামী শিশুদের শ্বাসনালীর প্রদাহ (bronchitis)	≥0.1	6 মাস
ঘ্রাণ সমস্যার সূত্রপাত (olfactory threshold)	0.12	< 24 ঘণ্টা
শ্বাসনালীর প্রতিবন্ধকতা	5	10 মিনিট
ফুসফুসের শোথরোগ (pulmonary edema)	90	30 মিনিট

[সূত্র: U.S. EPA, "Air Quality Criteria for Nitrogen Oxides', AP-84 (USEPA, Washington D.C.), 1971.]

উল্লিখিত প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ছাড়াও NO_2 বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোকার্বনের সাথে মিশে 'আলোক-রাসায়নিক স্মগ'(photochemical smog) সৃষ্টি করে। আলোক-রাসায়নিক স্মগ জারণধর্মী একটি সেকেন্ডারি দূষক; এটি জনস্বাস্থ্য ও উদ্ভিদের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। বস্তুত, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডে (NO_2) উদ্ভিদের যে ক্ষতি হয় তা স্মগজনিতও হতে পারে ।

সাম্প্রতিক কিছু তথ্য প্রমাণ নির্দেশ করে, স্ট্রাটোস্ফেয়ারে যে O_3 স্তর বিদ্যমান, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। NO_x-এর এক্ষেত্রেও কিছুটা ভূমিকা আছে বলে ধারণা করা হয়। মূলত অধিশাব্দিক (supersonic) জেট বিমান থেকে নির্গত ধোঁয়ার মাধ্যমে NO_x স্ট্রাটোস্ফেয়ারে স্থান পায়। NO_x এর প্রভাবে O_3 এর যে বিভাজন ঘটে তার সাপেক্ষে নিম্নলিখিত কৌশল প্রদান করা হয়েছে:

$$\begin{aligned} O_3 + NO &= NO_2 + O_2 \\ NO_2 + O &= NO + O_2 \\ \hline O_3 + O &= 2O_2 \end{aligned} \qquad (৫.২২)$$

অর্থাৎ, স্ট্রাটোস্ফেয়ারে O_3 স্তরের ক্ষয়সাধনে NO অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

NO_x দূষণের নিয়ন্ত্রণ : মানুষের সৃষ্টি NO_x এর উৎসগুলোকে বিস্তীর্ণ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা নিশ্চল (stationary) ও সচল (mobile) উৎস। নিশ্চল উৎসের মধ্যে পাওয়ার প্লান্টের চুল্লি এবং সচল উৎসের মাঝে যানবাহনের ইঞ্জিন অন্যতম। নিশ্চল উৎস থেকে 50-1000 ppm NO গ্যাস বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বিক্রিয়ার গতি ও সাম্য উভয় স্থিতিমাপের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা ও অতিরিক্ত O_2 অনুকূল দুটি শর্ত: N_2

$+ O_2 = 2NO$। নিশ্চল উৎসের ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত দুটি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে নির্গত ধোঁয়ায় NO এর পরিমাণ হ্রাস পায়। দুই স্তরবিশিষ্ট কনভারটর এরূপ একটি ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ৫.৬ – CO)।

দুই স্তর কনভারটরে জ্বালানি সম্পূর্ণ দগ্ধ হতে যে পরিমাণ O_2 (বায়ু) লাগে, প্রথম স্তরে তার 90-95% এর উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায় জ্বালানি দগ্ধ করা হয়। অক্সিজেন অপর্যাপ্ত থাকে বলে এখানে NO এর উৎপাদন হ্রাস পায় তবে হাইড্রোকার্বন (HC), CO ও ভূসার উৎপাদন এতে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় স্তরে অতিরিক্ত বায়ুর উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত নিম্নতাপে জ্বালানিকে দগ্ধ করা হয়। এ সময় তাপমাত্রা নিম্ন থাকে বলে NO এর উৎপাদন কার্যত বন্ধ থাকে কিন্তু O_2 বেশি থাকে বলে HC ও CO এর জারণ সম্পূর্ণরূপে ঘটে। দ্বিস্তর কনভারটরের সাহায্যে এরূপ ব্যবস্থায় NO এর নির্গমন 90% পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে, তাপমাত্রা নিম্ন রাখা হয় বলে চুল্লির দক্ষতা এতে কিছুটা হ্রাস পায়।

চিমনির ধোঁয়ার মধ্যে যে NO_x উপস্থিত থাকে তা দূর করা বেশ বড় একটি সমস্যা। ধোঁয়া H_2SO_4, $Ca(OH)_2$ অথবা $Mg(OH)_2$ শোষক দ্রবণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করে তার NO অপসারণ করা যেতে পারে; শোষক দ্রবণে SO_2 গ্যাসও অপসারিত হয়। ধোঁয়া শোষক দ্রবণে প্রেরণের পূর্বে তার সাথে NO_2 মিশানো হয়। এতে NO গ্যাসের N_2O_3 এ জারণ ঘটে। N_2O_3 শোষক দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয় কিন্তু NO শোষিত হয় না:

$$NO_2 + NO \rightarrow N_2O_3$$

মোট চারটি ধাপ প্রক্রিয়াটিতে জড়িত থাকে এবং শেষ ধাপে NO_2 পুনরুদ্ধার হয় যা আবার প্রথম ধাপে ফিরে আসে:

i. জারণ: $SO_2 + H_2O$ (চিমনির ধোঁয়া) $+ NO_2 \rightarrow H_2SO_4 + NO$

ii. পরিষ্কারকরণ (scrubbing): $NO_2 + NO \rightarrow N_2O_3 \xrightarrow{H_2SO_4} 2NOHSO_4 + H_2O$; পরিচ্ছন্ন ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

iii. বিভাজন: $2NOHSO_4 + H_2O \xrightarrow{\text{বায়ু}} 2H_2SO_4 + 2NO_2$

H_2SO_4 অ্যাসিডের একটি ভগ্নাংশ দ্বিতীয় ধাপে (ii) প্রেরিত হয়।

iv. HNO_3 অপসারণ: $3NO_2 + H_2O \rightleftharpoons 2HNO_3 + NO$;
অবশিষ্ট NO_2 ও NO আবার প্রথম ধাপে (i) ফিরে যায়।

যানবাহনের ধোঁয়ার সাথে যে NO বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, ইঞ্জিনে (অভ্যন্তরীণ দহন-ইঞ্জিন) ক্যাটালিটিক কনভারটর (catalytic convertor) ব্যবহার করে তা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ব্যবস্থাটির নীতি পূর্বে (CO নিয়ন্ত্রণ অনুচ্ছেদ ৫.৬ দ্র:) আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৮. সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)

[বায়ুতে SO_2 এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা (U.S. স্টান্ডার্ড : 80 μg/m^3 (0.03 ppm), বার্ষিক গাণিতিক গড়; 365 μg/m^3 (0.14 ppm), 24 ঘণ্টার মান, বছরে একবার হতে পারে]।

সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) বর্ণহীন কটুগন্ধযুক্ত একটি গ্যাস। বায়ুমণ্ডলীয় দূষকের এটি অন্যতম একটি উপাদান। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে প্রাণীদেহে প্রবেশ করে গ্যাসটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে (mucous membrane) আক্রমণ ও তাতে প্রদাহ সৃষ্টি করে, উদ্ভিদের জন্যও গ্যাসটি ক্ষতিকর।

বিশ্বব্যপী প্রতিবছর প্রায় ৩৫ কোটি মেট্রিক টন SO_2 বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এর প্রধান অংশ (প্রায় ২০ কোটি মেট্রিক টন) প্রাকৃতিক, বাকিটা মানুষের সৃষ্টি (anthropogenic) (সারণি ৫.৮)। প্রাকৃতিক SO_2 এর প্রায় পুরাটাই (প্রায় 90%) আবার সেকেন্ডারি -ভূপৃষ্ঠ ও জলাশয়ে অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে সালফার ঘটিত বস্তুর যখন বিভাজন ঘটে তখন তা থেকে H_2S গ্যাস উৎপন্ন হয়। উক্ত H_2S বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং SO_2 এ সেখানে তার জারণ ঘটে:

$$\text{সালফারঘটিত বস্তু} \xrightarrow[\text{ব্যাকটেরিয়া}]{\text{অবায়ুজীবী}} H_2S \xrightarrow[\text{বায়ুমণ্ডল}]{[O]} SO_2 + H_2O$$

প্রাকৃতিক SO_2 এর উল্লেখযোগ্য আর একটি উৎস, আগ্নেয়গিরির উদগীরণ। SO_2 ও H_2S উভয় গ্যাসই উৎসটি থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

সারণি ৫.৮: বায়ুমণ্ডলে SO_2 এর বার্ষিক অনুপ্রবেশ (কোটি মেট্রিক টন)।

প্রাকৃতিক	মানুষের সৃষ্টি	
সালফার (S) হিসেবে প্রকাশিত H_2S এর জৈবিক বিভাজন : 9.0	কয়লা	9.2
সামুদ্রিক পানির ছিঁটা (সালফেট) : 4.0	খনিজ তেল	2.6
	আকরিক প্রক্রিয়াকরণ	1.4
মোট = 13.0	মোট =	13.2

[সূত্র: E. Robinson and R.C. Robbins, 'Gaseous Sulfur Pollutants from Urban and Natural Sources', J Air Pollutant Control Assoc., Vol. –20 (1970), P-223]

মানুষের সৃষ্টি যে SO_2 তার প্রধান উৎস জীবাশ্ম জ্বালানি বিশেষ করে কয়লার দহন (প্রায় 70%)। কয়লার মধ্যে বেশকিছু পরিমাণ সালফার থাকে এবং কয়লার মানভেদে তাতে S এর পরিমাণ কমবেশি হয়। যেমন, ভালোমানের অ্যানথ্রাসাইটে S এর পরিমাণ 1% এর কম কিন্তু বিটুমিন কয়লায় এটি 4% এরও বেশি হতে পারে। খনিজ তেলে S: 1-5% এবং প্রাকৃতিক গ্যাসেও এটি সামান্য পরিমাণে উপস্থিত থাকে। জ্বালানি যখন পোড়ানো হয়, তখন কয়লার সালফার প্রায় 80% এবং তরল ও গ্যাসীয়

জ্বালানির সালফার প্রায় সম্পূর্ণরূপে SO_2 -এ জারিত হয় এবং চিমনির ধোঁয়ার সাথে গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। চিমনির ধোঁয়ায় SO_2 এর পরিমাণ থাকে 0.05 – 0.25%, যদিও কখনো কখনো তা 0.4% পর্যন্ত হতে পারে।

মানুষের সৃষ্টি যে SO_2 তার সাধারণ আর একটি উৎস আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন। দস্তা (Zn), তামা (Cu),সীসা (Pb) প্রভৃতি ধাতুর বেশিরভাগ আকরিক সালফাইড ঘটিত। ধাতু পৃথককরণের নিমিত্তে আকরিক যখন বায়ুর উপস্থিতিতে উচ্চ তাপে গলানো হয় তখন সালফাইডের SO_2এ জারণ ঘটে। উক্ত SO_2 গ্যাসকে H_2SO_4 অ্যাসিড আকারে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। সালফিউরিক অ্যাসিড কারখানা ও কাগজ উৎপাদনের কারখানা থেকেও SO_2 গ্যাস নির্গত হয়। তবে, এর পরিমাণ তাতে কম থাকে এবং উৎসটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। মিউনিসিপ্যালিটির বর্জ্য খোলা আকাশের নিচে পোড়ানো হলে তা থেকেও কিছু পরিমাণ SO_2 বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

প্রাকৃতিক SO_2 এর তুলনায় মানুষের সৃষ্টি SO_2 পরিমাণে যদিও কম কিন্তু বায়ু দূষণে এর ভূমিকাই মুখ্য থাকে। শেষোক্ত ঐ SO_2এর উৎসগুলো সাধারণত লোকালয়ের কাছে থাকে এবং নির্গত গ্যাস ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করে। তাই, গ্যাসের পরিমাণ কম হলেও সংশ্লিষ্ট ছোট এলাকায় তা সহজেই দূষণ মাত্রায় পৌঁছে যায় এবং পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

বায়ুমণ্ডল থেকে SO_2 অপসারণ: স্বাভাবিক আবহাওয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে SO_2 অপসারিত হওয়ার পথ প্রধানত একটি - SO_3 -এ গ্যাসটির জারণ: $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$। সালফার ট্রাই-অক্সাইড ($SO_3$) অতিশয় সক্রিয় একটি গ্যাস; তৈরি হওয়ার সাথে সাথে জলীয় বাষ্প (H_2O), NH_3 অথবা ধাতু-আয়নের সংস্পর্শে এটি H_2SO_4/সালফেট লবণের অ্যারোসলে পরিণত হয় এবং বায়ু প্রবাহ অথবা মাধ্যাকর্ষণ বলে তা একসময় ভূপৃষ্ঠ/ বারিমণ্ডলে নেমে আসে:

$$SO_2 + O \rightarrow SO_3 \xrightarrow{+H_2O} H_2SO_4 + (H_2SO_4)_n \text{ অ্যারোসল}$$

$$SO_2 + O \rightarrow SO_3 \xrightarrow{+NH_3} [\,(NH_4)_2SO_4,\ NH_4HSO_4] \text{ অ্যারোসল}$$

সালফার ট্রাইঅক্সাইড সক্রিয় বলে এটি মুক্ত অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায় না বললে চলে। বায়ুতে SO_2 এর দূষণ যখন তীব্র হয় তখন সেখানে বৃষ্টির পানি 'অম্ল বৃষ্টি' আকারে নেমে আসতে পারে। বায়ুতে উচ্চ ঘনমাত্রার SO_3 তথা H_2SO_4 থাকে বলে বৃষ্টির পানির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায় ($pH < 4$)।

অক্সিজেনের সাথে SO_2 এর বিক্রিয়া বেশ মন্থর অথচ বায়ুমণ্ডলে SO_2 -এর স্থিতিকাল (residence time) বেশ কম, মাত্র চারদিন। তাই, ধারণা করা হয়, নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলো বায়ুমণ্ডলে SO_2 এর জারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১.আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া: বিকিরণ শোষণ করে SO_2 ইলেকট্রনীয় স্তরে উত্তেজিত হয় (SO_2^*):

$$SO_2 + h\nu \rightarrow SO_2^* \ (\lambda \cong 384 \text{ nm}) \qquad (৫.২৩)$$

SO^*_2 সক্রিয় একটি যৌগ; এটি SO_2 এর জারণ দ্রুততর করে:

$$SO^*_2 + O_2 \rightarrow SO_3 + O \qquad (৫.২৪)$$

২. OH রেডিকেল-এর মাধ্যমে SO_2 এর জারণ (বায়ুমণ্ডলের নিম্ন আর্দ্রতায়):

$$SO_2 + OH \rightarrow HOSO_2 \qquad (৫.২৫)$$

$$HOSO_2 + O_2 \rightarrow SO_3 + HO_2 \qquad (৫.২৬)$$

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4 \qquad (৫.২৭)$$

৩. ভিজা আবহাওয়ায় SO_2 এর জারণ:

$$SO_2(g) + H_2O \rightleftharpoons SO_2\ (aq) \qquad (৫.২৮)$$

$$SO_2\ (aq) + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HSO_3^- \qquad (৫.২৯)$$

$$HSO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + SO_3^{2-} \qquad (৫.৩০)$$

অবস্থান্তর ধাতুর (যেমন Cu^{2+}, Fe^{3+}) অনুঘটনে SO_3^{2-} এর সাথে O_2 এর বিক্রিয়া দ্রুততর হয়:

$$2SO_3^{2-} + O_2 \rightarrow 2SO_4^{2-} \qquad (৫.৩১)$$

নিম্নলিখিত বিক্রিয়া দুটিও SO_2 এর জারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে:

$$HSO_3^- + O_3 \rightarrow HSO_4^- + O_2 \text{ (pH উচ্চতর)} \qquad (৫.৩২)$$

$$SO_3^{2-} + H_2O_2 \rightarrow SO_4^{2-} + H_2O \qquad (৫.৩৩)$$

এরূপও প্রমাণ পাওয়া যায়, বায়ুমণ্ডলে NO_x ও অলিফিনীয় হাইড্রোকার্বন উপস্থিত থাকলে কিংবা বৃষ্টির ফোঁটায় NH_3 ও ধাতুর আয়ন দ্রবীভূত থাকলে স্বাভাবিক সূর্যালোকে SO_2 এর জারণ ত্বরান্বিত হয়। বায়ুমণ্ডলের ভাসমান বস্তুকণাও SO_2 এর জারণ দ্রুততর করে।

SO_2 **দূষণের প্রভাব :** (১) মানুষের শরীরে প্রভাব- সালফার ডাইঅক্সাইড শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে আক্রমণ করে তাই SO_2- দূষিত বায়ুতে শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসনালীর প্রদাহ সৃষ্টি হয়। গ্যাসটি শ্লেষ্মা উদ্দীপ্ত করে। যেসব ব্যক্তি শ্বাসকষ্টে ভোগে, SO_2 দূষিত বায়ুতে তাদের অবস্থার সহজেই অবনতি ঘটে। 1.6 ppm দূষণমাত্রার (SO_2) বায়ুতে একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিও যদি মাত্র কয়েক মিনিট শ্বাস গ্রহণ করে তাহলে তার শ্বাসকষ্ট হতে

পারে; অতি উচ্চমাত্রার দূষণে (প্রায় 500 ppm SO_2) একজন সুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। বিভিন্ন মাত্রার SO_2-দূষণ মানুষের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো (সারণি ৫.৯)।

সালফার ডাই-অক্সাইড সৃষ্ট বায়ুদূষণে ভয়ের কারণ SO_2 গ্যাস নিজে যতখানি, তার থেকে বেশি SO_2 থেকে উৎপন্ন H_2SO_4 ও সালফেট অ্যারোসল; অ্যারোসল ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে স্বাস্থ্য সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলে।

সারণি ৫.৯ : মানুষের শরীরে SO_2 দূষণের প্রতিক্রিয়া।

ঘনমাত্রা (ppm)	প্রতিক্রিয়া
0.2	প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম সর্বনিম্ন ঘনমাত্রা
0.5	ঘ্রাণ অনুভূত হয়
1.6	স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরও শ্বাস কষ্ট সৃষ্টি হয় তবে দূষণ উৎসের অপসারণে তা আবার নিরাময় হতে পারে
8-12	কণ্ঠনালীতে সাথে সাথে প্রদাহ সৃষ্টি হয়
10	চোখে প্রদাহ সৃষ্টি হয়
20	সাথে সাথে কাশি শুরু হয়।

[সূত্র: S.H. Stoker and S.L. Seager, Environmental Chemistry: Air and Water-Pollution; Scott Foresman; NY, 1976]

(২) উদ্ভিদের উপর প্রভাব: বায়ুমণ্ডলে SO_2 এর দূষণ উদ্ভিদের ক্ষতিসাধন করে। দূষণের মাত্রা উচ্চ হলে পাতার কলা ধ্বংস হয় এবং বহুদিন যাবৎ দূষণ চলতে থাকলে পাতা হলদে বা ফ্যাকাসে হয়ে যায়; বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকলে উদ্ভিদও ক্ষতির শিকার হয়। উচ্চ ঘনমাত্রার SO_2 বায়ুতে H_2SO_4 অ্যাসিডের অ্যারোসল সৃষ্টি করে। উক্ত অ্যারোসল গাছের পাতার উপর যেখানে পড়ে সেখানে ছোট ছোট দাগ সৃষ্টি হয়; তাছাড়া, H_2SO_4 -জনিত 'অম্ল বৃষ্টি' জীব ও সম্পদ, উভয়েরই প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

(৩) সম্পদের ক্ষতি : বায়ুমণ্ডলে দূষণ সৃষ্টি করে এমন বেশকিছু উপাদান আছে যেগুলো সম্পদেরও ভীষণ ক্ষতি করে। বিষয়টি সবার জানা, ভূসা, ধূলি, ধূম (fume) প্রভৃতি বস্তুকণায় পোষাক-পরিচ্ছদ, রঙিন চিত্র, দালানকোঠা ময়লালিপ্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সম্পদের জন্য ক্ষতিকর যেসব বায়ু দূষক, তাদের মধ্যে SO_2 সবচেয়ে মারাত্মক। এমন তথ্য পাওয়া যায়, বায়ুতে SO_2 বার্ষিক গড়ে মাত্র 0.02 ppm (52 $\mu g/m^3$) ঘনমাত্রায় উপস্থিত থাকলে তাতে ইস্পাতের মতো শক্ত ধাতুও ক্ষয় হয় এবং 0.9-1 ppm ঘনমাত্রায় সুতিবস্ত্র, চামড়া ও রঙের ক্ষতি হয়। গ্যাসটি চামড়ায় খুব সহজে শোষিত হয় এবং চামড়ার বিভাজন ঘটায়। সালফার ডাই-অক্সাইডে কাগজের রঙ নষ্ট এবং কাগজ ভঙ্গুর হয়ে যায়। সালফার ডাই-অক্সাইডের দূষণ থেকে বায়ুমণ্ডলে H_2SO_4

অ্যারোসল সৃষ্টি হয়। অ্যারোসলটি মার্বেল, চুনাপাথরের মতো নির্মাণ-সামগ্রীকেও ধ্বংস করে। সারাবিশ্বে, বিগত মাত্র কয়েক দশকে, মার্বেল পাথরের তৈরি বহু অমূল্য ভাস্কর্য ও অট্টালিকা এ কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

SO_2 এর দূষণ নিয়ন্ত্রণ: বায়ুমণ্ডলে SO_2 এর দূষণ চারভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে; যথা; চিমনির ধোঁয়া থেকে SO_2 অপসারণ, কয়লা পোড়ানোর পূর্বে তার সালফার অপসারণ, নিম্ন সালফার জ্বালানির ব্যবহার এবং জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার।

মানুষের সৃষ্টি যে SO_2 বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তার প্রধান উৎস পাওয়ার প্লান্টে জ্বালানি হিসেবে কয়লার দহন। পাওয়ার প্লান্টে চুল্লির চিমনি সাধারণত খুব উঁচুতে স্থাপিত থাকে; ফলে, চিমনির ধোঁয়া দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবস্থাটির ভাল মন্দ, দুটো দিকই আছে - এতে প্লান্টের নিকটবর্তী অঞ্চলে দূষণের মাত্রা নিম্ন থাকে, কিন্তু দূষণের ক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যাহোক, চিমনির ধোঁয়া থেকে SO_2 গ্যাস অপসারণের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সারণি ৫.১০ এ গুরুত্বপুর্ণ কয়েকটি পদ্ধতির নীতি সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রদান করা হলো।

সারণি ৫.১০ : চিমনির ধোঁয়া থেকে SO_2 গ্যাস অপসারণের কিছু পদ্ধতি।

পদ্ধতি	রাসায়নিক বিক্রিয়া	প্রধান সুবিধা/অসুবিধা
চুন-কর্দমে পরিচ্ছন্নকরণ।	$Ca(OH)_2 + SO_2 \rightarrow CaSO_3 + H_2O$	প্রতি টন কয়লার জন্য প্রায় 200 kg চুন প্রয়োজন হয় এবং বিশাল পরিমাণ বর্জ্য সৃষ্টি হয়।
চুনাপাথর কর্দমে পরিচ্ছন্নকরণ।	$CaCO_3 + SO_2 \rightarrow CaSO_3 + CO_2(g)$	চুন-কর্দম পদ্ধতির তুলনায় pH কম; দক্ষতা অপেক্ষাকৃত কম।
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড কর্দমে পরিচ্ছন্নকরণ।	$Mg(OH)_2 + SO_2 \rightarrow MgSO_3 + H_2O$	শোষক পদার্থ পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।
সোডিয়াম ক্ষার পরিচ্ছন্নকরণ।	$Na_2SO_3 + H_2O + SO_2 \rightarrow$ $2NaHSO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2SO_3 + SO_2 + H_2O$ (পুনরুদ্ধার)	খরচ অপেক্ষাকৃত বেশি তবে প্রযুক্তিগত খুব বেশি অসুবিধার কিছু নেই।
দ্বিবিধক্ষারে পরিচ্ছন্নকরণ।	$2NaOH + SO_2 \rightarrow Na_2SO_3 + H_2$ $Ca(OH)_2 + Na_2SO_3 \rightarrow CaSO_3(s) + 2NaOH$	দামি Na-ক্ষার সস্তা চুন দ্বারা পুনরুদ্ধার করা যায়।

প্রথম দুটি পদ্ধতির উৎপাদ (সারণি ৫.১০) ফেলে দেয়া হয়; বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এটি বিরাট এক সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রতি পাঁচ টন কয়লার জন্য চুনাপাথর লাগে প্রায় এক টন; বর্জ্যের পরিমাণ তাই বিশাল আকার ধারণ করে। কয়লার ধোঁয়া থেকে SO_2 গ্যাস অপসারণের যত পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাদের সবগুলোর নীতি একই, অম্ল-ক্ষার বিক্রিয়ার মাধ্যমে SO_2 গ্যাসের শোষণ ঘটানো। যেমন, পরিচ্ছন্নকারক (scrubber), চুনাপাথর কর্দম' (slurry) হলে তাতে নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলো ঘটে:

$$SO_2(g) \rightleftharpoons SO_2\,(aq)$$

$$SO_2(aq) + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$$

$$HSO_3^- \rightleftharpoons H^+ + SO_3^{2-}$$

$$CaCO_3(s) + H^+ \rightleftharpoons Ca^{2+} + HCO_3^-$$

$$CaCO_3(s) + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^-$$

$Ca^{2+} + SO_3^{2-} + ½\,H_2O \rightleftharpoons CaSO_3.\,½\,H_2O$ (অতিশয় অদ্রবণীয় $CaSO_3$ হেমিহাইড্রেট)।

পরিচ্ছন্নকারক 'চুন-কর্দম' হলে সেখানেও একই প্রকার বিক্রিয়া ঘটে। পার্থক্য শুধু, এক্ষেত্রে H^+ সরাসরি OH^- দ্বারা প্রশমিত হয়। 'চুন-কর্দম' ও 'চুনাপাথর কর্দম', উভয় পরিচ্ছন্নকারকের ক্ষেত্রে বর্তমানে কর্দম ইনজেকশনকরণ পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। পদ্ধতিটি যথাযথভাবে সম্পাদিত হলে কয়লার ধোঁয়া থেকে SO_2 ও উড়া ভস্ম (fly ash), প্রত্যেকটি উপাদান 90% এরও বেশি অপসারিত হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পরিবেশ সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি পদ্ধতি বাঞ্ছনীয়, যাতে ব্যবহৃত পরিচ্ছন্নকারক থেকে S-যৌগ পুনরুদ্ধার করা যায়। বেশকিছু পদ্ধতি, উক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মাঝে 'ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড কর্দম', 'সোডিয়াম সালফাইড দ্রবণ' 'অ্যামোনিয়া দ্রবণ' ও 'সাইট্রেট দ্রবণ' পরিচ্ছন্নকরণ পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চিমনির গ্যাস পরিচ্ছন্নকরণ পদ্ধতিতে যে SO_2 শোষিত হয়, 'বিশ্লেষণ-গ্যাস' (H_2, CO, CH_4) এর সাহায্যে তাকে H_2S এ পরিণত করা যায়:

$$SO_2 + (H_2, CO, CH_4) \rightleftharpoons H_2S + CO_2$$

ক্লস পদ্ধতির (Claus method) সাহায্যে উক্ত H_2S-কে মৌলিক সালফারে পরিণত করা যেতে পারে:

H_2S (মোট পরিমাণের 1/3) $+ O_2 \rightarrow SO_2 + H_2O$

$SO_2 + 2H_2S$ (অবশিষ্ট H_2S) $\xrightarrow{\text{অনুঘটক}} 3S + 2H_2O$

অথবা, H_2S গ্যাস Fe_2O_3 এর উপর পরিশোষিত হয়ে H_2SO_4 উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে:

$$H_2S(g) + Fe_2O_3 \xrightarrow{400°C} Fe_2O_3.\ H_2S \xrightarrow{800°C} SO_2(g) \downarrow H_2SO_4$$

পরিবেশে SO_2 গ্যাসের দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায়, কয়লা পোড়ানোর পূর্বে তা থেকে সালফার অপসারণ করা। অপসারণের পদ্ধতি সালফারের প্রকৃতি ও কয়লার মানের উপর নির্ভর করে। সালফার 'পাইরাইট' (pyrite) আকারে থাকলে, পাইরিট খণ্ড বেছে পৃথক করার পর তা গুড়া করে ধৌত করা হলে উক্ত সালফার অনেকাংশে অপসারিত হয়। তবে, জৈব সালফার এভাবে অপসারণ করা যায় না, তার জন্য কয়লার কার্বনকরণ (carbonization), তরলকরণ (liquefication) বা গ্যাসকরণ (gassification) প্রভৃতি জটিল প্রক্রিয়া প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, নিম্ন-সালফার কয়লা কিংবা কয়লার বিকল্প, জীবাশ্ম নয় এমন কোনো জ্বালানি আর্থিক দিক দিয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল। এ জাতীয় জ্বালানির ব্যবহার এখনো গবেষণা পর্যায়ে সীমিত রয়েছে।

৫.৯. বায়ুমণ্ডলে H_2S ও জৈব সালফাইডের দূষণ

হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) দুর্গন্ধযুক্ত (পচা ডিমের গন্ধ) বিষাক্ত একটি গ্যাস। প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্টি উভয় শ্রেণীর উৎস থেকে গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বায়ুমণ্ডলে এর স্থিতিকাল বেশি নয়, SO_2 গ্যাসে এর জারণ ঘটে:

$$2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2SO_2 + 2H_2O \ ।$$

হাইড্রোজেন সালফাইডের প্রাকৃতিক যেসব উৎস তাদের মাঝে ভূ-পৃষ্ঠ, জলাভূমি ও সামুদ্রিক পানিতে সালফার ঘটিত বস্তুর অবায়বীয় জৈবিক বিভাজন (anaerobic bio-degradation) সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় দশ কোটি মেট্রিক টন H_2S প্রতিবছর এভাবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। তাছাড়া, আগ্নেয়গিরি ও প্রাকৃতিক প্রস্রাবণ থেকেও কিছু পরিমাণ H_2S বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়।

মানুষের সৃষ্টি যে H_2S, তার প্রধান উৎস ক্রাফট মণ্ড তৈরির কারখানা; সালফাইড ব্যবহার করে এতে মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। আর যেসব কারখানা থেকে H_2S নির্গত হয় তাদের মাঝে পেট্রোলিয়াম শোধনাগার (refinery), কোক-চুল্লি প্লান্ট ও ভিসকাস (viscose) রেয়ন প্লান্ট উল্লেখযোগ্য।

বেশ কিছু জৈব সালফাইডও আছে যেগুলো বায়ুমণ্ডলে দূষণ সৃষ্টি করে। মিথাইল ম্যারকেপট্যান, (CH_3SH), ডাইমিথাইল সালফাইড [$(CH_3)_2S$], ডাইমিথাইল ডাইসালফাইড [$(CH_3)_2S_2$] এবং এদের উচ্চতর হোমোলগ ঐসব জৈবসালফাইডের অন্তর্গত কিছু পদার্থ। পদার্থগুলোর বাষ্প অতীব দুর্গন্ধযুক্ত, সাধারণত প্রোটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিডের জৈবিক বিভাজন থেকে পদার্থগুলো সৃষ্টি হয়; যেমন, S-মিথাইলসিসটেন ও মিথিওনাইন থেকে CH_3SH, মিথিওনাইন ও S-মিথাইল

মিথিওনাইন থেকে $(CH_3)_2S$ এর নির্গমন ঘটে। আণুবীক্ষণিক জীবের অনুঘটনে প্রাকৃতিক সালফেটের (SO_4^{2-}) বিজারণ- মিথাইলেশন বিক্রিয়ায়ও জৈব সালফাইড সৃষ্টি হয় বলে জানা যায়:

$$SO_4^{2-} \xrightarrow{+e} SO_3^{2-} \xrightarrow{CH_3^+} CH_3SO_2^- \xrightarrow{CH_3^+} (CH_3)_2SO_2 \xrightarrow{+e} (CH_3)_2SO$$
$$\xrightarrow{+e} CH_3SH \longrightarrow (CH_3)_2S + H_2S \qquad (৫.৩৪)$$

প্রাকৃতিক ঐসব উৎস ছাড়া কিছু কিছু মণ্ড তৈরির কারখানা, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকরণ কারখানা থেকে অন্যান্য দূষকের সাথে মারকেপট্যানও বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

৫.১০ অম্ল বৃষ্টি (Acid rain)

বৃষ্টির পানি স্বাভাবিক অবস্থাতেই অম্লীয়, pH 5.6 - 5.7 তবে ঐরূপ বৃষ্টিকে অম্ল বৃষ্টি বলা হয় না। বৃষ্টিকে তখন অম্ল বৃষ্টি বলা হয় যখন পানির pH 4.5 কিংবা তারও নিচে নেমে যায়। বৃষ্টি 'স্বাভাবিক' কিংবা 'অম্ল বৃষ্টি' যেমনই হোক তার pH বায়ুমণ্ডলীয় CO_2, NO_x ও SO_2 দ্বারা সাধারণত নির্ধারিত হয়; জলীয় বাষ্প/অক্সিজেন-জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে গ্যাসগুলোর নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটে এবং প্রত্যেকটি থেকে অম্ল উৎপন্ন হয় যা বৃষ্টির পানিকে অম্লীয় করে:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$
$$NO_x \xrightarrow{O_2/O_3} N_2O_5 \xrightarrow{H_2O} HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$$
$$SO_2 \xrightarrow{O_2} SO_3 \xrightarrow{H_2O} H_2SO_4 \longrightarrow H^+ + HSO_4^-$$

H_2CO_3 দুর্বল একটি অম্ল কিন্তু HNO_3 ও H_2SO_4 অ্যাসিড উভয়ই শক্তিশালী। (NO_x ও SO_2 এর জারণ-কৌশল পূর্বে সমীকরণ (৫.১৩) – (৫.২১) ও সমীকরণ (৫.২৩) – (৫.৩৩) এর সাহায্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

দূষণহীন বায়ুমণ্ডলে NO_x ও SO_2 এর ঘনমাত্রা নগণ্য থাকে; ঐরূপ বায়ুমণ্ডল থেকে যে বৃষ্টি নামে (স্বাভাবিক বৃষ্টি) তার অম্লত্ব তাই কার্যত H_2CO_3 দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং অম্লটি দুর্বল বলে পানির pH 5.5 এর নিচে নামতে পারে না। পক্ষান্তরে, বায়ুতে যখন NO_x কিংবা SO_2 কিংবা উভয় অক্সাইডের তীব্র দূষণ ঘটে তখন সেখানে অক্সাইড তথা অক্সাইড থেকে উৎপন্ন HNO_3 / H_2SO_4 অ্যাসিডের ঘনমাত্রা উচ্চ থাকে এবং ঐরূপ দূষিত বায়ুমণ্ডল থেকে যে বৃষ্টি নেমে আসে তার pH মুখ্যত HNO_3 / H_2SO_4 দ্বারা নির্ধারিত হয়। অ্যাসিড দুটি শক্তিশালী বলে বৃষ্টির পানির pH বেশ নিচে

($pH<4.5$) নেমে যায় এবং ঐরূপ বৃষ্টিকে তখন 'অম্ল বৃষ্টি' বলা হয়। অর্থাৎ, অম্ল বৃষ্টির জন্য বায়ুমণ্ডলে NO_x ও SO_2 এর তীব্র দূষণ তথা HNO_3 ও H_2SO_4 অ্যাসিড দায়ী। তবে, কয়লা বা আবর্জনা পোড়ানোর সময় বেশকিছু পরিমাণ HCl বায়ুমণ্ডলে সরাসরি প্রবেশ করে এবং অম্ল বৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অম্ল বৃষ্টির সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য, দূষকের উৎস থেকে শত সহস্র মাইল দূরেও তা নেমে আসতে পারে। যেসব বিক্রিয়ার মাধ্যমে NO_x ও SO_2 সংশ্লিষ্ট অ্যাসিডে (HNO_3 /H_2SO_4) রূপান্তরিত হয়, সেগুলো মন্থর বলে অক্সাইড অ্যাসিডে রূপান্তরিত হওয়ার মাঝে যে সময় অতিবাহিত হয় সে সময়ের মাঝে অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে দূর দূরান্তে ভেসে যেতে পারে এবং এক সময় অম্লে পরিণত হয়ে সেখানে অম্লবৃষ্টি সৃষ্টি করে। কানাডা ও সুইডেনে অম্ল বৃষ্টির ঘটনা প্রচুর ঘটে। ধারণা করা হয়, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পাঞ্চল থেকে যে SO_2 গ্যাস বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তা উক্ত অম্ল বৃষ্টির জন্য দায়ী। যাহোক, HCl -জনিত যে অম্ল বৃষ্টি তা দূষকের উৎসে সাধারণত সীমিত থাকে কেননা HCl সরাসরি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

পরিবেশের উপর অম্ল বৃষ্টির প্রভাব : বিশ্বপরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বড় বড় যেসব ঘটনা ঘটে, অম্ল বৃষ্টি তাদের একটি। অম্ল বৃষ্টি জীবন ও সম্পদ উভয়ের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। সম্পদের কথা ধরা যাক; মার্বেল, চুনাপাথর, স্লেট ও চুন সুরকি দ্বারা যেসব দালানকোঠা ও ভাস্কর্য নির্মিত, অম্ল বৃষ্টিতে সেগুলোই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব সম্পদের নির্মাণ-সামগ্রীর মাঝে সাধারণ একটি উপাদান থাকে $CaCO_3$; অম্ল $CaCO_3$ কে ক্ষয় করে যার দরুন গঠন-কাঠামোর বিভিন্ন স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং পরিণতিতে সামগ্রিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে:

$$CaCO_3(s) + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + H_2O$$

গ্রীস ও ইটালিতে পাথরের বহু মূল্যবান ভাস্কর্য অম্ল বৃষ্টিতে ক্ষয় হয়েছে; আগ্রার তাজমহলও আজ একই কারণে হুমকির সম্মুখীন; অম্ল বৃষ্টি ধাতু ও রঙিন চিত্রকেও ক্ষয় করে।

অম্ল বৃষ্টির দরুন হ্রদের পানির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায় যা শৈবাল ও অন্যান্য জলজ জীবের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। ১৯৭৯ সালের এক সমীক্ষায় প্রকাশ করা হয়েছে, সুইডেনে অম্ল বৃষ্টিতে প্রায় বিশ হাজার হ্রদের উপর এরূপ ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। ১৯৬৬ সালে সুইডেনে এক ভয়াবহ অম্ল বৃষ্টির ঘটনা ঘটে তাতে পানির pH ছিল 4.5 । ঐ বৃষ্টির ফলে গাছের পাতা ও লতাগুল্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং বনভূমিতে উদ্ভিদের জন্ম ও বিস্তার এমন হ্রাস পায় যে তাতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অম্ল বৃষ্টিতে মৃত্তিকার অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়; এতে মৃত্তিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ধ্বংস এবং পরিণতিতে N- আবদ্ধকরণ (fixation) প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। ঘটনাটি উদ্ভিদের জন্ম ও বিস্তারের উপর পরোক্ষ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

অম্ল বৃষ্টি জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে ফুসফুস, চর্ম ও চুলের ক্ষতি করে। অম্ল বৃষ্টির সাথে বহু ভারি ধাতু আয়ন ভূ-পৃষ্ঠে ও জলাশয়ে নেমে আসে; খাদ্য ও পানীয়ের সাথে মিশে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

অম্ল বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ: অম্ল বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বলতে সেসব ব্যবস্থা বুঝায় যা বৃষ্টির পানিতে অম্লত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অম্ল বৃষ্টির জন্য বায়ুমণ্ডলে NO_x ও SO_2 এর তীব্র দূষণ মুখ্যত দায়ী; তাই, যেসব ব্যবস্থায় বায়ুমণ্ডলে ঐসব গ্যাসের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলো অম্ল বৃষ্টিরও নিয়ন্ত্রক। ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৫.৭ ও ৫.৮)।

৫.১১ বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোকার্বন

প্রতিবছর প্রায় ১৭০ কোটি মেট্রিক টন হাইড্রোকার্বন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে; এর প্রায় 90% প্রাকৃতিক, বাকিটা মানুষের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক উৎসের যে হাইড্রোকার্বন তার প্রায় 90% আবার মিথেন। জলাভূমি, বিল প্রভৃতি অক্সিজেন-অপ্রতুল পরিবেশে কার্বনঘটিত যৌগের অবায়বীয় জৈবিক বিভাজন (anaerobic bio-degradation) এর প্রধান একটি উৎস:

$$[CH_2O] \xrightarrow[\text{ব্যাকটেরিয়া}]{\text{অবায়ুজীবী}} CO_2 + CH_4$$

উদ্ভিদও বায়ুমণ্ডলীয় হাইড্রোকার্বনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস । উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন প্রকার হাইড্রোকার্বন বাষ্প স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত হয়। টারপিন শ্রেণীর যৌগ, বিশেষ করে, α-পাইনিন, এদের অন্যতম। আইসোপ্রিন ও হেমিটারপিনও টারপিন শ্রেণীর দুটি যৌগ, তুলাকাঠ, ওক (oak), ইউকেলিপটাস ও সাদা স্প্রুস গাছ থেকে এদের নিঃসরণ ঘটে। তাছাড়া, গ্যাসক্ষেত্র, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম খনি, দাবানল প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎস থেকেও বেশ কিছু হাইড্রোকার্বন বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়।

মানুষের দ্বারা বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোকার্বনের যে প্রবেশ ঘটে, বছরে তার পরিমাণ প্রায় নয় কোটি মেট্রিক টন। উক্ত হাইড্রোকার্বনের প্রধান একটি অংশ (প্রায় 55%) আসে পেট্রোলিয়ামের প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহার থেকে; এছাড়া আর যেসব উৎস আছে তাদের মাঝে কয়লা ও কাঠের অসম্পূর্ণ দহন, আবর্জনা ভস্মকরণ, প্রলেপ ও পরিষ্কারকরণে ব্যবহৃত দ্রাবকের বাষ্পীভবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বায়ুমণ্ডলে মানুষের দ্বারা যুক্ত হয় যে হাইড্রোকার্বন তার পরিমাণ প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বনের তুলনায় যতই কম হোক বায়ুমণ্ডলের দূষণে এর ভূমিকা থাকে মুখ্য কেননা মানুষের সৃষ্টি হাইড্রোকার্বনের যেসব উৎস, সেগুলো একদিকে যেমন সাধারণত লোকালয়ের সন্নিকটে স্থাপিত থাকে তেমনি তাদের প্রভাবের ক্ষেত্রও সীমিত হয়। সীমিত ক্ষেত্রে নিম্ন পরিমাণের নিঃসরণও অতি সহজে দূষণ মাত্রায় পৌঁছে যায়। এ প্রসংগে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বনের মুখ্য উপাদান মিথেন দূষক হিসেবে বিবেচিত

হয় না। বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোকার্বনের যে দূষণ ঘটে তাতে হাইড্রোকার্বনের নিজের ভূমিকা যতখানি থাকে তার থেকে বহুগুণ বেশি থাকে সেই হাইড্রোকার্বনের কোনো উৎপাদের যা বায়ুমণ্ডলে জারণ বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। মিথেন গ্যাসটির কার্যত কোনো জারণ ঘটে না বলে বায়ুমণ্ডলে এর প্রাচুর্য যেমনই হোক তাতে দূষণ সৃষ্টি হয় না বললে চলে।

বায়ুর হাইড্রোকার্বন-দূষণে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া মুখ্য ভূমিকা পালন করে; ইঞ্জিনে উচ্চতাপ ও চাপে আংশিক দগ্ধ গ্যাসোলিনের যে বিক্রিয়া ঘটে তাতে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকশত হাইড্রোকার্বন সেখানে উৎপন্ন হয় এবং ধোঁয়ার সাথে মিশে তা বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়। উক্ত ধোঁয়ায় মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, পেনটেন, অ্যাসিটিলিন, ইথিলিন, টলুয়েন, জাইলিন প্রভৃতি অ্যালিফেটিক ও অ্যরোমেটিক যৌগ যেমন থাকে তেমনি বেনজো α-পাইরিনের মতো সন্দেহজনক ক্যান্সার সৃষ্টিকারী (carcinogenic) পলিঅ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH) শ্রেণীর যৌগও থাকে। শহর অঞ্চলের বায়ুতে PAH এর সাধারণ উপস্থিতি প্রায় $20\ \mu g/m^3$; কোনো কোনো ধোঁয়ার মাঝে PAH এর পরিমাণ আরো অনেক বেশি থাকে; যেমন, কয়লার চুল্লি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় এর পরিমাণ $1000\ \mu g/m^3$ এবং সিগারেটের ধোঁয়ায় $100\ \mu g/m^3$ পর্যন্ত হতে পারে। কয়লা কিংবা কাঠ যখন পোড়ানো হয় তখন তাদের মাঝে উচ্চ প্যারাফিন শ্রেণীর যেসব যৌগ থাকে সেগুলো ভেঙ্গে PAH উৎপন্ন হয় বলে ধারণা করা হয়। যাহোক, হাইড্রোকার্বন-দূষণের সবচেয়ে ক্ষতিকর যে দিক তা সম্ভবত বায়ুমণ্ডলে আলোক-রাসায়নিক স্মগ সৃষ্টিতে এর সংশ্লিষ্টতা (বিষয়টি নিচে আলোচনা করা হলো)।

৫.১২ আলোক রাসায়নিক স্মগ (Photochemical Smog)

'স্মোক' (smoke – ধোঁয়া) ও 'ফগ'(fog-কুয়াশা) শব্দ দুটি একত্রিত হয়ে 'স্মগ' (smog) শব্দটি গঠিত হয়েছে। জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর বহু বছর যাবৎ লণ্ডন নগরীর পরিবেশ নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর যেমন ছিল তেমনি নগরীর আকাশ ঘন কালো কুয়াশায় সর্বদা ঢাকা থাকতো। নগরীর বায়ুতে কয়লার কালো ধোঁয়া মিশে কুৎসিত ঐ কুয়াশা সৃষ্টি হতো এবং তার নাম দেয়া হয়েছিল'স্মগ'। কয়লার ধোঁয়া থেকে সৃষ্টি হতো বলে স্মগের মাঝে প্রচুর পরিমাণে SO_2 থাকত। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস অববাহিকা অঞ্চলের বায়ুতে, লন্ডন নগরীর স্মগের মতো দেখতে, এক প্রকার ঘন কুয়াশা সৃষ্টি হতে থাকে, একেও স্মগ নাম দেয়া হয়; কিন্তু, পরে দেখা যায়, লণ্ডন নগরীর স্মগ থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। লন্ডন নগরীর স্মগ ছিল বিজারণধর্মী (SO_2 এর কারণে) কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলস অববাহিকার যে স্মগ তা জারণধর্মী ; SO_2 কিংবা কুয়াশা, কোনোটি এই স্মগের জন্য প্রয়োজন তো নয়ই, বরং তীব্র সূর্যকিরণ ছাড়া এটি সৃষ্টিই হতে পারে না। সূর্যালোকের প্রভাবে এটি সৃষ্টি হয় বলে একে 'আলোক রাসায়নিক স্মগ' বলা হয়ে থাকে। বস্তুত, 'আলোক-রাসায়নিক স্মগ' তীব্র সূর্যকিরণের প্রভাবে অক্সিজেন (O_2), উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন (CH_4 বাদে) ও NO_x এর পারস্পরিক বিক্রিয়ায়-উৎপন্ন বহু সংখ্যক গ্যাসের জটিল একটি

মিশ্রণ। আলোক-রাসায়নিক স্মগ ভয়ংকর একটি বায়ু দূষক। চোখে প্রদাহ সৃষ্টি এবং দৃষ্টিসীমা সংকুচিত করা এর প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য। আমেরিকা ও ইউরোপের বহু স্থানে ঐরূপ স্মগ সৃষ্টি হয়। ভূ-তাত্ত্বিক ও আবহাওয়াগত নিম্নলিখিত শর্তগুলো আলোক-রাসায়নিক স্মগ সৃষ্টি হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক:

১. ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার বিপরীতমূখী একটি স্তর (inversion layer, অনুচ্ছেদ ৫.৩.দ্রঃ) এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে যানবাহনের ধোঁয়া আবদ্ধ থাকতে হবে। যানবাহনের ধোঁয়ায় যেসব বায়ু-দূষক থাকে, অলিফিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন ও NO_x তাদের মুখ্য দুটি উপাদান।

২. সংশ্লিষ্ট স্থানের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন এমন হতে হবে যাতে বায়ু সেখানে আটকা পড়ে এবং বিপরীতমুখী স্তরে আবদ্ধ যানবাহনের ধোঁয়া দ্রুত সেখান থেকে অপসারিত হতে না পারে।

৩. দিন রৌদ্রোজ্জল ও উষ্ণ হতে হবে।

আলোক-রাসায়নিক স্মগের মাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর যেসব পদার্থ থাকে তাদের মাঝে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো মুখ্য:

(১). ওজোন : প্রায় 0.4 ppm ঘনমাত্রার ওজোন (O_3) স্মগে তৈরি হয়; উক্ত ঘনমাত্রা স্তরে এটি মানুষ ও উদ্ভিদ উভয়ের জন্য একটি বিষ।

(২). পারক্সিঅ্যাসাইল নাইট্রেট : পারক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN) এই শ্রেণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি যৌগ: প্রায় 0.05 ppm ঘনমাত্রায় এটি স্মগে উপস্থিত থাকে:

$$CH_3\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C} - O - O - NO_2 \text{ (PAN)}$$

মানুষের জন্য পদার্থটি কতখানি বিষাক্ত তা বিশদভাবে অন্বেষণ করা হয়নি তবে এটি উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর।

(৩). অ্যালডিহাইড : স্মগে অ্যালডিহাইড শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপাদান - ফরমালডিহাইড (HCHO), অ্যাসিটালডিহাইড (CH_3CHO) ও অ্যাক্রোলিন ($CH_2 = CHCHO$); এরা বায়ুতে গন্ধ ও চোখে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

(৪). অ্যালকাইল নাইট্রেট : স্মগে এই শ্রেণীর অন্যতম উপাদান মিথাইল নাইট্রেট (CH_3ONO_2)।

(৫). অ্যারোসল : স্মগে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান অ্যারোসল; প্রধানত $(NH_4)_2SO_4$ ও NH_4NO_3 দ্বারা এটি তৈরি হয়। স্মগে যে পরিবেশ থাকে তা H_2SO_4 ও HNO_3 অ্যাসিড তৈরি হওয়ার জন্য বিশেষ অনুকূল। যে যানবাহনের ধোঁয়া স্মগের উৎস, তাতে SO_2 ও NO_x গ্যাস থাকে; উক্ত অক্সাইড থেকে অ্যাসিড দুটি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, প্রধানত জীবজন্তুর মূত্র থেকে যে NH_3 উৎপন্ন হয় তার একটি ভগ্নাংশ

বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়। উক্ত NH_3 অ্যাসিড দুটির সাথে বিক্রিয়া করে স্মগে অ্যারোসল তৈরি করে। অ্যারোসলের দরুন, স্মগের মাঝে দৃষ্টিসীমার সংকোচন ঘটে:

$$H_2SO_4 + 2NH_3 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$$

$$HNO_3 + NH_3 \rightarrow NH_4NO_3$$

আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস অববাহিকায় যে আলোক-রাসায়নিক স্মগ সৃষ্টি হয় তাতে কিছু কিছু উপাদানের ঘনমাত্রা এক বিশেষ ধারায় ওঠানামা করে (চিত্র ৫.৩); যেমন:

১. দিনের প্রথম প্রহরে NO ও হাইড্রোকার্বনের (HC) ঘনমাত্রা ক্রমশ বাড়ে এবং পরে তা আবার ক্রমশ কমে সর্বনিম্ন মানে পৌঁছায়;

২. NO এর ঘনমাত্রা যখন কমে তখন NO_2 এর ঘনমাত্রা বাড়ে এবং পরে আবার কমে এবং

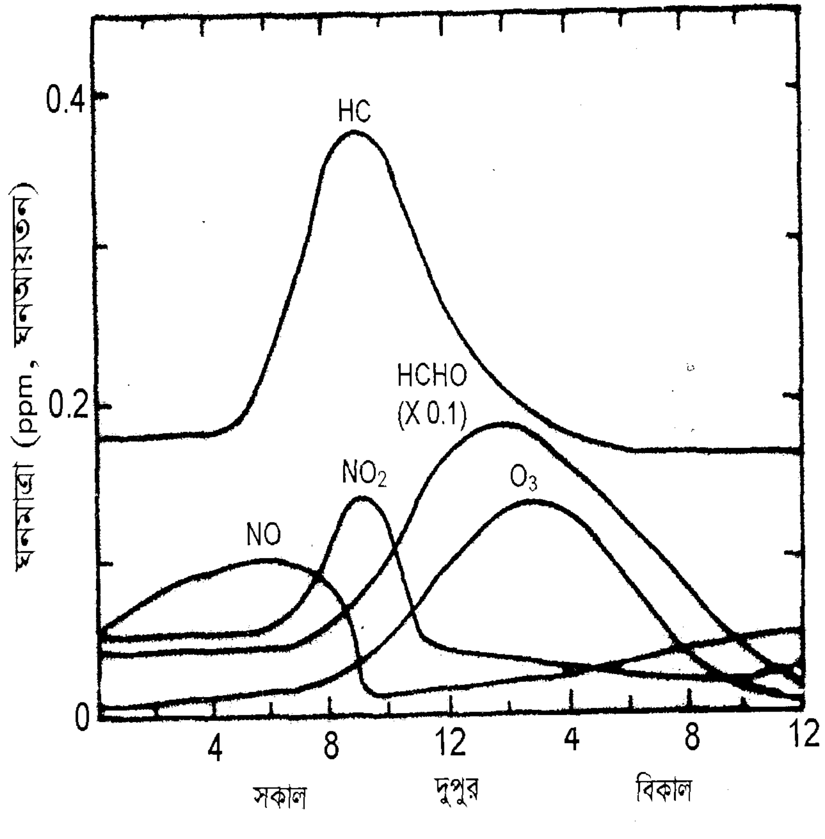

চিত্র ৫.৩: আলোক-রাসায়নিক স্মগে মুখ্য গ্যাসের দৈনিক টিপিক্যাল ওঠানামা।

৩. NO_2 ও HC এর ঘনমাত্রা যখন কমে (দিনের মধ্যভাগে), ওজোন (O_3) ও অ্যালডিহাইডের ঘনমাত্রা তখন বাড়ে।

ঘটনাগুলোর সাথে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং স্মগে সংঘটিত আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সুস্পষ্ট একটি সম্পর্ক রয়েছে; যেমন,

১. দিনের প্রথম প্রহরে বেলা যত বাড়ে যানবাহনের চলাচলও তত বাড়ে এবং ধোঁয়ার সাথে প্রাইমারি দূষক, NO ও HC তত বেশি পরিমাণে স্মগে স্থান পায়;

২. সূর্যরশ্মির প্রখরতা যত বাড়ে, আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রাইমারি দূষক থেকে তত বেশি পরিমাণ সেকেন্ডারি দূষক (NO_2, O_3 ও অ্যালডিহাইড) স্মগে উৎপন্ন হয়।

উল্লিখিত তথ্যগুলোর আলোকে স্মগ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলোর একটি কৌশল প্রদান করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, স্মগ সৃষ্টির সাথে অসংখ্য হাইড্রোকার্বন জড়িত থাকে এবং তা প্রক্রিয়ার কৌশলকে অতিশয় জটিল করে দেয়; কৌশলটি তাই অনেকাংশে সাময়িক (tentative)।

স্মগ সৃষ্টির কৌশল : ১. হাইড্রোকার্বনের জারণ স্মগ সৃষ্টির প্রধান একটি বিক্রিয়া; আণবিক অক্সিজেন দ্বারা হাইড্রোকার্বন জারিত হয় না, পারমাণবিক অক্সিজেন দ্বারা হয়। তাই, ধারণা করা হয়, NO_2 এর অক্সিজেন পরমাণুতে (O) আলোক-বিভাজন ঘটে এবং এটি স্মগ সৃষ্টির প্রথম ধাপ:

$$NO_2 + h\nu \rightarrow NO + O \qquad (৫.৩৫)$$

উক্ত O ওজোন (O_3) উৎপাদন করে এবং O_3 এর সাথে NO এর বিক্রিয়ায় আবার NO_2 তৈরি হয়:

$$O + O_2 + M \rightarrow O_3 + M \qquad (৫.৩৬)$$

$$O_3 + NO \rightarrow NO_2 + O_2 \qquad (৫.৩৭)$$

উল্লিখিত চাক্রিক বিক্রিয়ায় O ও O_3 এর ঘনমাত্রা একটি স্থিতিশীল (steady state) নিম্নমানে স্থাপিত হয়; O ও O_3 অতিমাত্রায় সক্রিয় দুটি উপাদান যা হাইড্রোকার্বনের সাথে বিক্রিয়া করে।

২. অ্যালকিন (alkene) হাইড্রোকার্বনের অতিশয় সক্রিয় এক শ্রেণীর যৌগ; O ও O_3, উভয় উপাদান দ্বারা এরা আক্রান্ত হয়; প্রোপিন ও বিউটিন এর ক্ষেত্রে যে বিক্রিয়া ঘটে তা নিম্নরূপ:

$$CH_3CH = CH_2 + O \rightarrow C_2H_5 + CHO \qquad (৫.৩৮)$$

$$CH_3CH = CHCH_3 + O_3 \rightarrow CH_3CHO_2 + CH_3CHO \qquad (৫.৩৯)$$

বিক্রিয়া দুটি পরে শৃঙ্খল আকারে অগ্রসর হতে পারে; যেমন,

$$C_2H_5 + O_2 \rightarrow C_2H_5O_2 \qquad (৫.৪০)$$

$$C_2H_5O_2 + NO \rightarrow C_2H_5O + NO_2 \qquad (৫.৪১)$$

$$C_2H_5O + O_2 \rightarrow CH_3CHO + HO_2 \quad (৫.৪২)$$

$$HO_2 + NO \rightarrow NO_2 + OH \quad (৫.৪৩)$$

বিক্রিয়া (৫.৪১) ও (৫.৪৩) এর মাধ্যমে NO এর NO_2 এ জারণ ঘটে। এতে O_3 খরচ হয় না (৫.৩৭); উপরন্তু, বিক্রিয়া (৫.৩৫) ও (৫.৩৬) এর মাধ্যমে O_3 তৈরি হতে থাকে। উক্ত পরিস্থিতিতে (৫.৪১) ও (৫.৪৩) বিক্রিয়া দুটি যদি NO এর ঘনমাত্রাকে নিম্নমানে পৌঁছে দেয় তখন বিক্রিয়া (৫.৩৭) গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে, O_3 এর ঘনমাত্রা বেড়ে যায়, আলোক-রাসায়নিক স্মগের যা টিপিক্যাল একটি ঘটনা।

৩. কার্বন মনোক্সাইডকে (CO) একসময় বায়ুমণ্ডলে নিষ্ক্রিয় বলে মনে করা হতো; কিন্তু অক্সাইডটি স্মগ সৃষ্টিকে তীব্রতর করে। নিম্নলিখিত বিক্রিয়া-ধারায় CO এর মাধ্যমে NO আলোক-বিভাজনীয় NO_2 এ পরিণত হয়; এতে O_3 কিংবা অন্যকোনো সক্রিয় অন্তর্বর্তী উপাদান খরচ হয় না।

$$OH + CO \rightarrow CO_2 + H \quad (৫.৪৪)$$

$$H + O_2 \rightarrow HO_2 \quad (৫.৪৫)$$

$$HO_2 + NO \rightarrow NO_2 + OH$$

৪. মুক্ত রেডিকেল OH এর উৎপাদন একবার শুরু হলে হাইড্রোকার্বনের জারণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়; OH এর সাথে হাইড্রোকার্বনের নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলো ঘটে:

$$RH + OH + O_2 \rightarrow RO_2 + H_2O \quad (৫.৪৬)$$

(RH = অ্যালিফ্যাটিক / অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন)

$$R = R' + OH + O_2 \rightarrow RO_2 + HC(O)R' \quad (৫.৪৭)$$

$$HC(O)R' + OH + O_2 \rightarrow R'C(O)O_2 + H_2O \quad (৫.৪৮)$$

অ্যালকাইল পারক্সি RO_2 অত্যন্ত সক্রিয় একটি মুক্ত রেডিকেল; NO, NO_2, O_2, O_3 ও হাইড্রোকার্বনের সাথে এটি বিক্রিয়া করতে সক্ষম। তবে অধিকাংশ বিক্রিয়ার খুঁটিনাটি অনেক বিষয় এখনো অজানা।

৫. নাইট্রাস অ্যাসিডও (HNO_2) স্মগ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে। ভোরের দিকে স্মগের তীব্রতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়, HNO_2 এর আলোক-বিভাজন এর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়; HNO_2 -এর ঘনমাত্রা রাতের বেলায় সবচেয়ে বেশি থাকে:

$$HNO_2 + h\nu \rightarrow OH + NO \quad (৫.৪৯)$$

৬. পারক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN) আলোক রাসায়নিক স্মগের প্রধান একটি উপাদান; অ্যাসিটালডিহাইড (৫.৩৯),ইথাইল রেডিকেল (৫.৩৮) ও NO_2 এর মাধ্যমে এটি উৎপন্ন হতে পারে:

$$CH_3CHO + C_2H_5 \rightarrow CH_3CO + C_2H_6 \quad (৫.৫০)$$

$$CH_3CO + O_2 \rightarrow CH_3C(O)O_2 \quad (৫.৫১)$$

$$CH_3C(O)O_2 + NO_2 \rightarrow CH_3C(O)O_2NO_2, (PAN) \quad (৫.৫২)$$

অন্যদিকে, RO এর সাথে NO_2 এর সরল শৃঙ্খল সমাপন (chain termination) বিক্রিয়ায় মিথাইল নাইট্রেট উৎপন্ন হয়:

$$CH_3O + NO_2 + M \rightarrow CH_3ONO_2 + M \quad (৫.৫৩)$$

আলোক-রাসায়নিক স্মগ সৃষ্টি হওয়ার জন্য হাইড্রোকার্বন অত্যাবশ্যক। মিথেন (CH_4) বায়ুমণ্ডলীয় হাইড্রোকার্বনের মুখ্য একটি উপাদান তবে স্মগ সৃষ্টিতে এর কোনো ভূমিকা থাকে না বললে চলে কেননা CH_4 জারক পদার্থের প্রতি অতিশয় নিষ্ক্রিয় একটি যৌগ।

আলোক-রাসায়নিক স্মগের প্রভাব : আলোক-রাসায়নিক স্মগ মানুষের শরীর, উদ্ভিদ ও সম্পদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। স্মগ একদিকে চোখে প্রদাহ সৃষ্টি করে (অ্যালডিহাইডের প্রভাব) অন্যদিকে গাঢ় স্মগের মাঝে দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত হতেও পারে না। স্মগের প্রধান কয়েকটি উপাদান, O_3, NO_2, অ্যালকাইল অক্সিমুক্ত রেডিকেল ও PAN ; উপাদানগুলো এক একটি তীব্র জারক এবং 'আলোক-রাসায়নিক জারক' নামে এরা পরিচিত। জারকগুলো শ্বাসনালীতে প্রদাহ ও শ্বাসগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। ওজোন ও PAN উভয় জারকই উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর; এদের প্রভাবে উদ্ভিদ বেড়ে উঠতে পারে না (সারণি ৫.১১)।

সারণি ৫.১১ : মানুষের স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদের উপর ওজোন ও অন্যান্য আলোক রাসায়নিক জারকের প্রভাব।

জারক	ঘনমাত্রা, ppm	প্রভাব (মানুষ/উদ্ভিদ)
ওজোন, O_3	0.1 – 1.0; একঘণ্টা	শ্বাস কষ্ট
	1.0 – 3.0; দুইঘণ্টা	ভীষণ ক্লান্তি, সমন্বয় বিচ্যুতি, তীব্র কাশি
	> 9.0	ফুসফুসের শোথরোগ (pulmonary edema)
	0.03; আটঘণ্টা	গাছের পাতার উপরে ফুটকি পড়ে, জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে যায় (necrosis), ফ্যাকাশে হয়; 0.24 ppm SO_2 এর উপস্থিতিতে 0.027 ppm O_3 তামাকের পাতা নষ্ট করে।
মোট জারক	0.1 ; সাথে সাথে	চোখের প্রদাহ
	0.05 –0.06; একঘণ্টা	অ্যাজমার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়
	0.03 – 0.3; একঘণ্টা	ক্রীড়াবিদের দক্ষতার অবনতি ঘটে।
PAN	0.01 – 0.05; অল্প কয়েক ঘণ্টা	গাছের পাতার নিম্নতল তামাটে হয়; চারাগাছের বেশি ক্ষতি হয়।

[সূত্র: Air Quality Criteria for Photochemical Oxidants, National Air-Pollution Control Administraiton, AP-63, Washington, D.C. 1970.]

ওজোন সুতিবস্ত্রের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর একটি পদার্থ, সুতির পলিমারে দ্বিবন্ধন যত বেশি থাকে, O_3 এর আক্রমণ তার প্রতি তত তীব্র হয়। ওজোনের আক্রমণে পলিমারের C-শৃঙ্খল ভেঙ্গে যায় এবং আড়াআড়ি শৃঙ্খলের স্থলে সমান্তরাল শৃঙ্খল তৈরি হয়; এতে পলিমারের প্রসারমানতা (tensile strength) হ্রাস পায় এবং পলিমার ভঙ্গুর হয়ে যায়। মাত্র 0.01 – 0.02 ppm ওজোনে টায়ারে ফাটল ধরে।

বায়ুমণ্ডলে আলোক-রাসায়নিক স্মগ নিয়ন্ত্রণ : আলোক-রাসায়নিক স্মগ NO_x ও হাইড্রোকার্বন থেকে সৃষ্টি একটি সেকেন্ডারি দূষক। অতএব, বায়ুমণ্ডলে NO_x ও হাইড্রোকার্বনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হলে স্মগও নিয়ন্ত্রিত হয়। হাইড্রোকার্বন ও NO_x এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৫.৬)।

৫.১৩ ওজোন স্তরের ক্ষয় (depletion of ozone layer)

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে 11–50 km ব্যাপী বায়ুমণ্ডলের যে স্তর তাকে স্ট্রাটোস্ফেয়ার বলে। স্ট্রাটোস্ফেয়ারে প্রাকৃতিকভাবে ওজোন (O_3) উৎপন্ন হয়। ওজোন অতিবেগুনি বিকিরণের দক্ষ একটি শোষক। অতিবেগুনি বিকিরণ জীবের জন্য ক্ষতিকর; এটি জীবকোষে DNA এর বিভাজন ঘটায়। সূর্য থেকে তীব্র অতিবেগুনি বিকিরণ পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, স্ট্রাটোস্ফেয়ারের ওজোন এর প্রায় সবটুকু শোষণ করে নেয়। স্ট্রাটোস্ফেয়ারের ওজোনস্তর অতিবেগুনি বিকিরণের আঘাত থেকে পৃথিবীর জীবকুলকে এভাবে রক্ষা করে।

মানুষ তার কাজের মাধ্যমে পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি করে চলেছে; স্ট্রাটোস্ফেয়ারও তার থেকে রেহাই পায় না। স্ট্রাটোস্ফেয়ারের দূষণ বেশ কিছুদিন যাবৎ এক উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কেননা দূষকের মাঝে এমন কিছু কিছু উপাদানও থাকে যেগুলো ওজোনের বিভাজন ঘটায়। ১৯৮৭ সালে আন্টার্টিকায় স্ট্রাটোস্ফেয়ারের উপর পরিচালিত এক গবেষণার ফলাফল উদ্বেগের বিষয়টিকে আরও ঘনীভূত করেছে। বিজ্ঞানীরা সেখানে ওজোন-স্তর ক্ষয়ের সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছেন; কোনো কোনো স্থানে সে ক্ষয় এত বেশি হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা তাকে 'ওজোন গহ্বর' (Ozone hole) নাম দিয়েছেন। স্ট্রাটোস্ফেয়ারের যেসব দূষক ওজোন-স্তরের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে, তাদের মাঝে NO, CFC ও N_2O এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

নাইট্রিক অক্সাইড (NO) : ওজোন স্তরের জন্য প্রথম উদ্বেগের কারণ হয় নাইট্রিক অক্সাইড। অধিশাব্দিক (supersonic) জেট বিমান যা স্ট্রাটোস্ফেয়ারের নিম্নতর স্তরের ভিতর দিয়ে উড়ে চলে, তার ধোঁয়ার মাধ্যমে NO স্ট্রাটোস্ফেয়ারে স্থান পায়। গ্যাসটি সম্ভবত নিম্নরূপ কৌশলে O_3 এর বিভাজন ঘটায়:

$$O_2 + h\nu \rightarrow 2O; \quad \lambda < 242\text{ nm} \qquad (৫.৫৪)$$

$$O + O_2 + M \rightarrow O_3 + M; \quad (O_3 \text{ সৃষ্টি}) \qquad (৫.৫৫)$$

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2 \qquad (৫.৫৬)$$

$$NO_2 + O \rightarrow NO + O_2 \quad (O_3 \text{ বিভাজন}) \qquad (৫.৫৭)$$

শেষ বিক্রিয়া দুটির (৫.৫৬ , ৫.৫৭) যোগফল:

$$O + O_3 \rightarrow 2O_2 \quad (৫.৫৮)$$

অর্থাৎ, ওজোন বিভাজনে NO একটি অনুঘটক (catalyst) হিসেবে কাজ করে। তবে, NO অনন্তকাল স্থায়ী হয় না; একসময় HNO_3 অ্যাসিডে এর জারণ ঘটে এবং সে অবস্থায় বায়ুমণ্ডল থেকে গ্যাসটি অপসারিত হয়।

ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা ফ্রিয়ন (CFC) : নাইট্রিক অক্সাইডের পর যে গ্যাসটি ওজোন স্তরের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়েছে তা CFC বা ফ্রিয়ন। CFC একটি পদার্থ নয়, এটি এক শ্রেণীর পদার্থ; $CFCl_3$ (ফ্রিয়ন - 11) ও CF_2Cl_2 (ফ্রিয়ন -12) এর প্রধান দুটি যৌগ যা ওজোনের বিভাজন ঘটায়। ক্লেরোফ্লোরোকার্বন শীতলীকরণ (refrigeration) ও অ্যারোসল পাত্র (aerosol can) চালানোর কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। CFC অতিশয় নিষ্ক্রিয় এবং এদের অপসারণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো অপসারকও (sink) ট্রোপোস্ফেয়ারে থাকে না। ট্রোপোস্ফেয়ারে গ্যাসটির স্থিতিকাল তাই দীর্ঘ ৩০-১০০ বছর পর্যন্ত হতে পারে; বিরাট ঐ সময়ের মাঝে স্ট্রাটোস্ফেয়ারে ধীরে ধীরে এর ব্যাপন ঘটে এবং অতিবেগুনি বিকিরণের প্রভাবে সেখানে এটি বিভাজিত হয়। নিম্নলিখিত কৌশলে CFC গ্যাসটি O_3 ক্ষয় করে বলে মনে করা হয়:

$$CFCl_3 + h\nu \rightarrow CFCl_2 + Cl \quad (৫.৫৯)$$

$$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2 \quad (৫.৬০)$$

$$ClO + O \rightarrow Cl + O_2 \quad (৫.৬১)$$

অর্থাৎ, CFC থেকে উৎপন্ন Cl পরমাণু O_3 বিভাজনে, NO এর মতো, অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং একটি Cl স্ট্রাটোস্ফেয়ার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্রায় এক লক্ষ O_3 এর বিভাজন ঘটায়।

নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) : নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসটিকে সাম্প্রতিককালে O_3 স্তরের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয়। রাসায়নিক সার, নাইট্রেট এর বিভাজন বায়ুমণ্ডলে N_2O এর প্রধান একটি উৎস। গ্যাসটি বেশ নিষ্ক্রিয় এবং ট্রোপোস্ফেয়ারে কার্যকরভাবে এর অপসারণ ঘটে না ফলে স্ট্রাটোস্ফেয়ারে গ্যাসটি প্রবেশ করে এবং NO-এ সেখানে তার আলোক-বিভাজন ঘটে:

$$N_2O + h\nu \rightarrow N + NO; \qquad \lambda < 250 \text{ nm} \quad (৫.৬২)$$

বর্তমানে যে বিপুল পরিমাণ নাইট্রেট সার প্রতিবছর কৃষিজমিতে ব্যবহার করা হয় তাতে O_3 স্তরের ক্ষয়সাধনে N_2O গ্যাসটি উদ্বেগের কেন্দ্রে এসে পড়েছে।

ওজোন স্তরের ক্ষয়সাধনে আরও কিছু গ্যাসের ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে করা হয়; গ্যাসগুলো সব Cl -যুক্ত যৌগ এবং CH_3Cl, CCl_4 ও CH_3CCl_3 এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য (সারণি ৫.১২)। মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3Cl) একটি প্রাকৃতিক

গ্যাস; অগভীর সমুদ্রে জৈবিক প্রক্রিয়ায় এটি উৎপন্ন হয়। গ্যাসটি ট্রোপোস্ফেয়ারেই ধ্বংস হতে পারে তবে এর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ (২-৩ বছর) বলে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় 3% পরিমাণ ট্রোপোস্ফেয়ার অতিক্রম করে স্ট্রাটোস্ফেয়ারে পৌঁছে যায় এবং অতিবেগুনি বিকিরণের (200-280 nm) প্রভাবে সেখানে এর বিভাজন ঘটে। উক্ত বিভাজন প্রক্রিয়ায় Cl মুক্ত হয় এবং মুক্ত Cl গ্যাস O_3 এর বিভাজন ঘটায় (CFC দ্রঃ)। ধারণা করা হয়; ল্যাবরেটরিতে Cl গ্যাসের উৎপাদন যখন শুরু হয়নি তখন CH_3Cl গ্যাস ওজোনস্তরের ক্ষয়সাধনে প্রধান ভূমিকা পালন করত এবং CH_3Cl এর প্রভাবে O_3 এর ক্ষয় ও প্রাকৃতিক কৌশলে O_3 এর গঠন এক সাম্যে উপনীত হয়ে স্তরটিকে নিয়ত অবস্থায় (steady state) প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) ও CH_3CCl_3 দুটি যৌগই ল্যাবরেটরিতে সংশ্লেষিত হয় এবং পরিষ্কারক দ্রাবক হিসেবে এদের ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। পদার্থ দুটির স্থিতিকাল ট্রোপোস্ফেয়ারে দীর্ঘ বলে (সারণি ৫.১২) এরাও স্ট্রাটোস্ফেয়ারে বিস্তারলাভ করে এবং সেখানে ওজোন স্তরের ক্ষয়সাধনে ভূমিকা পালন করে। বস্তুত, Cl-যুক্ত উদ্বায়ী জৈব যৌগে H/C অনুপাত যত কম থাকে, ট্রোপোস্ফেয়ারে তা তত বেশি স্থিতিশীল হয় এবং স্ট্রাটোস্ফেয়ারে পৌঁছে তা ওজোন স্তর ধ্বংসের কারণ হতে পারে। জৈব যৌগে কার্বনের সাথে যত বেশি সংখ্যক H যুক্ত থাকে, ট্রোপোস্ফেয়ার অতিক্রম করে স্ট্রাটোস্ফেয়ারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা তার তত হ্রাস পায় কেননা বায়ুমণ্ডলে OH মুক্ত রেডিকেল দ্বারা C-H বন্ধন বিভাজিত হতে পারে এবং কার্বনের সাথে যত বেশি সংখ্যক H যুক্ত থাকে, ট্রোপোস্ফেয়ারে তত দ্রুত তার বিভাজন ঘটে। সারণি ৫.১২ এর তথ্যে উল্লিখিত প্রবণতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়; যেমন, CH_3Cl এর তুলনায় CH_3CCl_3 এবং CH_3CCl_3 এর তুলনায় CCl_4 ও CFC ট্রোপোস্ফেয়ারে অধিকতর স্থিতিশীল।

ঘটনাটি দুঃখজনক, স্ট্রাটোস্ফেয়ারের যে রসায়ন ও আবহতত্ত্ব (metereology) আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়েছে তা মোটেই বিস্তারিত নয়। স্ট্রাটোস্ফেয়ারে O_3 ঘনমাত্রার উপর দূষকের প্রভাব কি হতে পারে সে সম্পর্কে ঐরূপ অপর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহাতীত হতে পারে না। তবে, আন্টার্টিক ওজোন-ক্ষয় (Antarctic ozone depletion: Ozone hole) যে CFC এর দ্বারা ঘটে তা বিস্তারিত গবেষণার মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সারণি ৫.১২: ওজোন স্তর ক্ষয় করতে সক্ষম এমন কিছু Cl-যুক্ত যৌগ।

যৌগ	বিশ্ব বায়ুমণ্ডলে ঘনমাত্রা, ppb	বায়ুমণ্ডলে স্থিতিশীল, বছর	স্ট্রাটোস্ফেয়ারে প্রবিষ্ট % পরিমাণ	স্ট্রাটোস্ফেয়ারে বিভাজন (10^7kg/ বছর)
CH_3Cl	0.62	2-3	≤ 3	6.1
CF_2Cl_2	0.48	> 80	100	3.9

$CFCl_3$	0.28	≈ 83	100	2.7
CCl_4	0.12	50	≤ 100	1.2
CH_3CCl_3	0.12	≈ 9	9	3.8

সূত্র: I.M. Campbell, Energy and the Atmosphere: A Physical-Chemical Approach, 2nd Ed. John Wiley & Sons, England, P-194, 1986.

অ্যান্টার্টিক ওজোন গহবর (Antarctic ozone hole) : অ্যান্টার্টিক ওজোন গহবর ক্ষণস্থায়ী একটি ঘটনা, সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বসন্ত কালেই কেবল এটি দেখা যায়। ব্রিটিশ অ্যান্টার্টিক সার্ভের বিজ্ঞানীদের কাছে ১৯৮৫ সালে ঘটনাটি প্রথম ধরা পড়ে; ১৯৫৭ সালের পূর্বে অ্যান্টার্টিকার স্ট্রাটোস্ফেয়ারে O_3 এর বণ্টন যা ছিল তার সাথে ১৯৮৫ সালের পরের অবস্থা তুলনা করে দেখা যায়, সারা মহাদেশব্যাপী O_3ক্ষয় ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্ষয়ের গড় পরিমাণ হয়ত প্রায় 50%; যদিও 18 km উচ্চতায় 2 km ব্যাপী O_3 এর ঘন একটি স্তর প্রায় সম্পূর্ণরূপেই(> 90%) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে (বেলুন বাহিত যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ)।

অ্যান্টার্টিকায় ওজোন ক্ষয় CFC এর প্রভাবজনিত একটি ঘটনা (কৌশল উপরে দেখানো হয়েছে)। স্ট্রাটোস্ফেয়ারের যে কোনো স্থানে এটি ঘটতে পারে তবে স্ট্রাটোস্ফেয়ারে Cl রসায়নের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ঘটনাটিকে অ্যান্টার্টিকায় গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ওজোন-ক্ষয় সম্পর্কিত ঘটনায় ক্লোরিন যৌগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে; যথা সক্রিয় ক্লোরিন; যেমন, Cl ও ClO এবং ক্লোরিন ভাণ্ডার (reservoir); যেমন, HOCl ও $ClONO_2$। সক্রিয় ক্লোরিন O_3 ক্ষয় করে কিন্তু ভাণ্ডার-Cl দ্বারা O_3 ক্ষয় হয় না।

নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে স্ট্রাটোস্ফেয়ারে ক্লোরিন O_3 স্তরকে ক্ষয় করতে পারে:

১. বায়ুমণ্ডল শান্ত (আলোড়নহীন) হতে হবে;

২. NO_2 এর ঘনমাত্রা নিম্ন থাকবে এবং

৩. ক্লোরিন ভাণ্ডার থেকে সক্রিয় ক্লোরিনে রূপান্তর দ্রুত হতে হবে।

শর্ত তিনটির তাৎপর্য স্পষ্ট – ক. স্ট্রাটোস্ফেয়ারে বায়ুমণ্ডল শান্ত থাকলে O_3 নিম্নতর স্তর থেকে সেখানে প্রবেশ করতে পারে না; এতে O_3 এর ক্ষয় ধরা পড়ে; খ. NO_2 এর সাথে Cl যুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় ভাণ্ডার ক্লোরিনে ($ClONO_2$) পরিণত হয়; NO_2 ঘনমাত্রা নিম্ন হলে সক্রিয় ক্লোরিনের ঘনমাত্রা স্ট্রাটোস্ফেয়ারে বেশি হতে পারে; এতে O_3 এর ক্ষয় তীব্র হয় এবং গ. নিষ্ক্রিয় ভাণ্ডার-ক্লোরিন যত দ্রুত সক্রিয় ক্লোরিনে রূপান্তরিত হয়, O_3 এর ক্ষয়ও তত দ্রুততার সাথে ঘটে।

আন্টার্টিকার স্ট্রাটোস্ফেয়ারীয় বায়ুমণ্ডল বসন্তের শুরুতে উল্লিখিত তিনটি শর্তই পূরণ করে। শীতকালে আন্টার্টিকার স্ট্রাটোস্ফেয়ার অতিশয় শান্ত থাকে এবং তার তাপমাত্রা খুব নিচে নেমে যায় (-82°C)। এ সময় সেখানে এক প্রকার মেঘ জমে (polar stratospheric cloud), NO_2 যাতে HNO_3 অ্যাসিড আকার ঘনীভূত থাকে। ফলে,

মুক্ত NO_2 বায়ুমণ্ডলে থাকে না বললে চলে। শীতকালে অ্যান্টার্টিকায় সূর্যকিরণের অভাবে CFC এর সক্রিয় ক্লোরিনে আলোক বিভাজন ঘটে না; ফলে, O_3 এর ক্ষয় শুরু হতে পারে না। বসন্তের শুরুতে পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ স্ট্রাটোস্ফেয়ারে পড়ে; এতে CFC এর আলোক বিভাজন ও ওজোন স্তরের ক্ষয় শুরু হয়। তবে, এটি বেশিদিন চলতে পারে না কেননা মধ্য অক্টোবরে এসে স্ট্রাটোস্ফেয়ারের মেঘ সূর্যকিরণে উবে যায়; তখন NO_2 বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়ে ক্লোরিনকে নিষ্ক্রিয় ভাণ্ডার-ক্লোরিনে পরিণত করে। তাছাড়া, ঐ সময় বায়ু উচ্চ ঘনমাত্রার O_3 বহন করে নিম্নতর অঞ্চল থেকে স্ট্রাটোস্ফেয়ারে ঢুকে পড়ে; ফলে, O_3 স্তরের ক্ষয় যা হয় তা সে সময় পূরণ হয়ে যায়।

৫.১৪ বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণা (Particulates in Atmosphere)

কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বায়ুমণ্ডলের বিশেষ করে ট্রোপোস্ফেয়ারের, সাধারণ একটি উপাদান; সম্মিলিতভাবে এদের বস্তুকণা বলা হয়। বস্তুকণার ব্যাস $2.0 \times 10^{-4} - 500\ \mu m$ পর্যন্ত হতে পারে তবে অধিকাংশ কণার ব্যাস $0.1 - 1\ \mu m$ এর মাঝে অবস্থান করে। কণার প্রাচুর্য বায়ুমণ্ডলের প্রতি একক ঘন আয়তনে কণার যে সংখ্যা বা ভর তার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়; প্রতি ঘন সেন্টিমিটার (cm^3) আয়তনে পরিচ্ছন্ন বায়ুতে তা কয়েকশত এবং দূষিত বায়ুতে শত সহস্র পর্যন্ত হতে পারে। গ্রাম অপেক্ষা শহরের বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ বেশি থাকে; গ্রামাঞ্চলের বায়ুতে বস্তুকণার সাধারণ প্রাচুর্য যেখানে $10\ \mu g/m^3$, শহরাঞ্চলের স্বাভাবিক বায়ুতে তা সেখানে 60-200 $\mu g/m^3$ এবং অতিমাত্রায় দূষিত বায়ুতে $2000\ \mu g/m^3$ পর্যন্তও হয়।

মাধ্যাকর্ষণ বলে বায়ুমণ্ডল থেকে ভূ-পৃষ্ঠে থিতিয়ে পড়া বস্তুকণার সাধারণ একটি প্রবণতা; কণার আকার, আকৃতি, ঘনত্ব ও বায়ুর আলোড়ন দ্বারা কণার থিতানো হার (settling rate) এবং থিতানো হার দ্বারা বায়ুমণ্ডলে কণার স্থিতিকাল (residence) নির্ধারিত হয়। তত্ত্বীয় হিসাবের সাহায্যে দেখানো যায়, কণার ঘনত্ব যখন $1\text{-}g/cm^3$ তখন শান্ত বায়ুতে (20°C, 760 mm Hg) $0.1\ \mu m$ ব্যাসের একটি কণা 8.7×10^{-7} m/s বেগে থিতায় কিন্তু কণার ব্যাস যখন $100\ \mu m$ তখন তার থিতিয়ে পড়ার বেগ হয় প্রায় 0.25 m / s। অর্থাৎ, কণার ব্যাস বৃদ্ধি পেলে তার থিতিয়ে পড়ার বেগ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে, কণার আকৃতির সাথে তার থিতানো বেগের যে সম্পর্ক তা বেশ জটিল এবং কণার আকৃতির সাথে সে সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তনও ঘটে। যাহোক, অতি ক্ষুদ্র যেসব কণা (ব্যাস $< 2\ \mu m$), বায়ুর আলোড়নের কারণে তারা ভূপৃষ্ঠে থিতাতে পারে না; বায়ুমণ্ডলে স্থায়ীভাবে সেগুলো ভেসে থাকে। যেসব কণার ব্যাস $2 - 40\ \mu m$, ঘনত্ব ভেদে এক এক বেগে তারা সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠে থিতিয়ে পড়ে এবং বায়ুমণ্ডলে তাদের স্থিতিকাল কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে।

বস্তুকণার উপস্থিতিতে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার ভৌত অবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং কণার উৎস, আকৃতি ও প্রকৃতিভেদে অবস্থাগুলোর নামকরণ করা হয়ে থাকে; যেমন,

১. ধূলি (dust) : শিলা ও প্রস্তরখণ্ডের বিভাজন এবং কঠিন বস্তুর চূর্ণিকরণ প্রক্রিয়ায় যে বস্তুকণা উৎপন্ন হয় তা বায়ুমণ্ডলে ধূলি সৃষ্টি করে। ধূলিতে বস্তুকণার ব্যাস থাকে সাধারণত 20 μm, যদিও, উৎসভেদে তা কমবেশি হতে পারে; যেমন কণার ব্যাস চিমনির উড়া ভস্মে (fly-ash) : 3 - 80μm. সিমেন্ট কারখানার ধূলিতে10 - 150 μm, ঢালাই কারখানার ধূলিতে, 1-200 μm। ধূলির কণা মাধ্যাকর্ষণ বলে ভূ-পৃষ্ঠে সহজে থিতিয়ে পড়ে; তবে কণার আকৃতি 5 μm এর কম হলে তা বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকার প্রবণতা দেখায়। বায়ুমণ্ডলে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাদের অধিকাংশগুলোর ক্ষেত্রে ধূলির সূক্ষ্মকণা অনুঘটক (catalyst) হিসেবে কাজ করে।

২. ধোঁয়া (smoke): জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। ধোঁয়ায় কণার ব্যাস সাধারণত 1 μm এর নিচে থাকে; কয়লার ধোঁয়ায় কণার ব্যাস 0.2 – 0.01 μm এবং তেলের ধোঁয়ায় তা 1.0 – 0.03 μm এর মাঝে অবস্থান করে। উৎসভেদে ধোঁয়ার রং ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

৩. ধূম (fume): গলিত পদার্থ বাষ্পীভূত করা হলে বাষ্প বায়ুমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কণায় ঘনীভূত হয়ে সাধারণত ধূম সৃষ্টি হয়; পদার্থ থেকে উত্থিত বাষ্প যদি বায়ুমণ্ডলে বিক্রিয়া করে (সাধারণত, জারণ) তাহলেও ধূম সৃষ্টি হতে পারে। ধূমে কণার ব্যাস 0.1 – 1 μm এর মাঝে অবস্থান করে।

৪. কুয়াশা (mist): তরল পদার্থের ছোট ছোট ফোঁটা বায়ুমণ্ডলে হালকাভাবে ছড়িয়ে থাকলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে কুয়াশা বলে। কুয়াশায় তরল ফোঁটার ব্যাস সাধারণত 10 μmএর নিচে থাকে তবে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যে কুয়াশা সৃষ্টি হয় তাতে জলের ফোঁটা বেশ বড়, 40-500 μm পর্যন্ত হতে পারে।

৫. ঘন-কুয়াশা (fog) : কুয়াশার (mist) ঘনীভূত অবস্থাকে ঘন কুয়াশা বলে। ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি অগ্রসর হতে পারে না। প্রাকৃতিক কুয়াশায় কণার আকৃতি 1.0 – 40 μm হতে পারে।

৬. অ্যারোসল (aerosol) : বায়ুতে ভাসমান কঠিন ও তরল কণার সিস্টেমকে সাধারণভাবে অ্যারোসল বলা হয়। সে অনুসারে উপরে বর্ণিত ধূলি, ধূম, ধোঁয়া ও কুয়াশা, প্রত্যেকটি এক একটি অ্যারোসল। অ্যারোসলে বস্তুকণার ব্যাস 0.1 – 100 μm হতে পারে। অ্যারোসলের উৎস যখন প্রাকৃতিক তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তাতে কণার ব্যাস 0.24 μm এর নিচে থাকে। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ঐরূপ প্রাকৃতিক কণাকে 'এটকেন কণা' বলে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পানির ফোঁটা আকারে যে ঘনীভবন ঘটে, 'এটকেন' তাতে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

সারণি ৫.১৩ : বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার প্রবেশ - বার্ষিক হার (কোটি মেট্রিক টন)।

বস্তুকণা	প্রাকৃতিক উৎস		মানুষের তৈরি উৎস	
প্রাইমারি কণা	সামুদ্রিক পানির ছিটায় লবণ : ধূলি : আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ও দাবানল :	90.8 18.2 0.7 109.7	জ্বালানি দহন, সিমেন্ট কারখানা, কৃষিক্ষেত্রের আগাছা পোড়ান, কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণ প্রভৃতি :	8.4
সেকেন্ডারি কণা: গ্যাস থেকে সৃষ্টি	H_2S থেকে সালফেট : NO_x থেকে নাইট্রেট : অ্যামোনিয়াম লবণ : টারপিন :	18.2 39.0 24.5 18.2 99.9	SO_2 থেকে সালফেট : NO_x থেকে নাইট্রেট : হাইড্রোকার্বন থেকে পেট্রোকেমিক্যাল :	13.3 2.7 2.5 18.5

[সূত্র: E. Robinson and R.C. Robbins, 'Emissions, Concentrations and Fate of particulate Atmospheric Pollutants', (American Petrol. Inst., Washington D.C., Publ. No. 4076), 1971]

প্রতি বছর প্রায় ২৪০ কোটি মেট্রিক টন বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে (সারণি ৫.১৩); এতে প্রাকৃতিক উৎসের অবদান থাকে সবচেয়ে বেশি, প্রায় ২১০ কোটি মেট্রিক টন। আগ্নেয়গিরির উদগীরণ, বায়ু-তাড়িত ধূলি, সামুদ্রিক পানি-ছিটার লবণ ও অন্যান্য কঠিন কণা, ব্যাকটেরিয়া, পরাগরেণু (pollen grains) প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার প্রধান কয়েকটি প্রাকৃতিক উৎস।

মানুষের তৈরি উৎস থেকে বায়ুমণ্ডলে যে বস্তুকণা স্থান পায় তার পরিমাণ ২৫ - ৩০ কোটি মেট্রিক টন; পাওয়ার প্লান্ট, আকরিক প্রক্রিয়াকরণ, খনি খনন ও জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন মানুষের সৃষ্টি বস্তুকণার প্রধান কয়েকটি উৎস। এসব বস্তুকণার প্রায় এক তৃতীয়াংশ আবার উৎপন্ন হয় স্থায়ী চুল্লি থেকে, যেখানে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রধানত (৯২%) কয়লা। কয়লার উড়া ভস্মের (fly ash) মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার অজৈব বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে (সারণি ৫.১৪)

সারণি ৫.১৪: কয়লার উড়া ভস্মের (fly ash) উপাদান।

উপাদান	% উড়া ভস্ম	উপাদান	% উড়া ভস্ম
C	0.37 – 36.2	CO_3^{2-}	0 – 2.6
Fe(Fe_2O_3/Fe_3O_4)	2.0 – 26.8	Si (SiO_2)	17.3 – 63.6
Mg (MgO)	0.06 - 4.77	P (P_2O_5)	0.07 – 47.2
Ca (CaO)	0.12 – 14.73	K (K_2O)	2.8 – 3.0
Al (Al_2O_3)	9.81- 58.4	Na(Na_2O)	0.2 – 0.9
S(SO_2)	0.12 - 24.33	অনির্ণেয়	0.08 - 18.9
Ti (TiO_2)	0 – 2.8	--	--

[সূত্র: US Dept. of Health, Education & Welfare, Air Quality Criteria for Particulate Matter, P-27]

অজৈব বস্তুকণা (inorganic particulates) : বায়ুমণ্ডলে যেসব বস্তুকণা থাকে তাদের মুখ্য উপাদান ধাতু অক্সাইড, সাধারণত জ্বালানির দহন থেকে এগুলো সৃষ্টি হয় (সারণি ৫.১৪); যেমন,পাইরাইট সমৃদ্ধ (FeS_2) কয়লা পোড়ানো হলে লৌহ Fe_2O_3/Fe_3O_3 আকারে উড়া ভস্মের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়:

$$3FeS_2 + 8O_2 \rightarrow Fe_3O_4 + 6SO_2$$

কয়লার সাথে $CaCO_3$ মিশ্রিত থাকে; উচ্চতাপে তা CaO -এ বিভাজিত হয় এবং ভস্মের সাথে অক্সাইডটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে:

$$CaCO_3 + \Delta \rightarrow CaO + CO_2$$

এমনি অসংখ্য ধাতু অক্সাইড কেবল কয়লা পোড়ানোর ফলে সৃষ্টি হয় এবং উড়া ভস্মের সাথে মিশে তা বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণা আকারে অবস্থান করে (সারণি ৫.১৪)। কয়লা পোড়ানোর ফলে আরও কিছু অজৈব বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হতে পারে; যেমন,

১. H_2SO_4 অ্যারোসল: কয়লার সালফার SO_2 গ্যাস আকারে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং সেখানে তা SO_3 এ জারিত হয়; SO_3 জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে H_2SO_4 অ্যারোসল গঠন করে:

$$2SO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2H_2SO_4$$

২. $CaSO_4$, $(NH_4)_2SO_4$ বস্তুকণা: H_2SO_4 অ্যারোসল যখন বায়ুমণ্ডলে NH_3, CaO এর মতো ক্ষারকীয় বস্তুকণার সংস্পর্শে আসে তখন $(NH_4)_2SO_4$ ও $CaSO_4$ এর বস্তুকণা সৃষ্টি হয়:

$$2NH_3(g) + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$$

$$CaO + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O$$

কয়লার মতো, তরল জ্বালানি থেকেও অজৈব বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে; সীসার যৌগ এদের অন্যতম। যানবাহনের ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে যে গ্যাসোলিন ব্যবহার করা হয় তাতে প্রায়ই লেড টেট্রাইথাইল, $Pb(C_2H_5)_4$ এবং 1,2-ডাইক্লোরো ও 1,2 -ডাইব্রোমোইথেন মিশানো থাকে। লেড টেট্রাইথাইল জ্বালানির দহন মন্থর করে ইঞ্জিনের ধাক্কা (knocking) প্রতিরোধ করে এবং নিজে ধাতব সীসায় বিভাজিত হয়। উক্ত সীসা ক্লোরো/ব্রোমোইথেনের সাথে বিক্রিয়া করে 'লেড হ্যালাইড' এ পরিণত হয়, ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সাথে মিশে যা শেষ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়:

$$Pb(C_2H_5)_4 + O_2 + C_2H_4Cl_2 / C_2H_4Br_2 \text{ (scavenger)} \longrightarrow$$
$$PbCl_2 + PB\,Br_2 + PbClBr + CO_2 + H_2O \text{।}$$

জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়া আর যেসব উৎস থেকে অজৈব বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তাদের মাঝে মৃত্তিকা,আগ্নেয়গিরির উদগীরণ,আকরিক প্রক্রিয়াকরণ ও সিমেন্ট কারখানা প্রধান।

বায়ুমণ্ডলে জৈব বস্তুকণা (organic particulates): বায়ুমণ্ডলে যেসব জৈব বস্তুকণা উপস্থিত থাকে তাদের প্রধান উৎস দুটি - উদ্ভিদ ও জ্বালানি। উদ্ভিদের পাতা ও ফুল থেকে কিছু কিছু উদ্বায়ী জৈব পদার্থ সর্বদা নিঃসরিত হতে থাকে; ঐসব পদার্থ বিভাজিত

কিংবা অবিভাজিত অবস্থায় বস্তুকণা আকারে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে। কাঠ কিংবা জীবাশ্ম জ্বালানি যখন পোড়ানো হয় তখন তার একটি অংশ আংশিক দগ্ধ হয়ে ভুসা (soot) আকারে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। কাঠ কিংবা জীবাশ্ম জ্বালানির দহন বলতে উচ্চতাপে O_2 এর সংস্পর্শে জ্বালানির কার্বন CO_2-এ এবং হাইড্রোজেন জলীয় বাষ্পে (H_2O) পরিণত হওয়া বুঝায়। কার্বন ও হাইড্রোজেনের উক্ত বিক্রিয়ায় তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়:

$$C_xH_y \text{ (জ্বালানি)} + (x + y/4)\, O_2 \rightarrow xCO_2 + y/2\, H_2O + \text{ তাপ।}$$

জ্বালানির মাঝে উচ্চতর প্যারাফিন শ্রেণীর যৌগও থাকে। উচ্চতাপে ঐসব যৌগের বিভাজন ঘটে এবং পলিঅ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH) শ্রেণীর যৌগ উৎপন্ন হয়; ভুসা বস্তুত, অতিমাত্রায় ঘনীভূত PAH শ্রেণীর যৌগ:

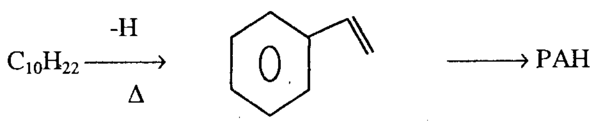

ভুসার মাঝে কিছু পরিমাণ H (1-3%) ও কিছু পরিমাণ O (5-10%) উপস্থিত থাকে। ভূসার পৃষ্ঠ আংশিকভাবে জারিত হয় তাই এতে O এর অনুপ্রবেশ ঘটে।

শহরাঞ্চলের বায়ুতে যেসব বস্তুকণা ভেসে বেড়ায় তার প্রায় 50% ভূসা। ভুসার তল আয়তন তথা পরিশোষণ ক্ষমতা বিশাল; এটি তাই অসংখ্য বিষাক্ত জৈব পদার্থ ও ধাতুকণা (যেমন, Be, Cd, Cr, Mn, Ni, V প্রভৃতি) বহন করে। যে PAH শ্রেণীর যৌগ ভুসার মুখ্য উপাদান তাতে এমন কিছু কিছু পদার্থও থাকে যা ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি করে বলে সন্দেহ করা হয়; বেনজো α-পাইরিন PAH শ্রেণীর এমনি একটি পদার্থ।

বায়ুতে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের বায়ুতে যেসব বস্তুকণা উপস্থিত থাকে তারা অসংখ্য জৈব ও অজৈব উপাদান বহন করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শহরাঞ্চলের আদর্শ একটি বায়ু নমুনা বিশ্লেষণ করে তাতে ১০৫ প্রকার বস্তুকণা শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে যাদের মাঝে NH_4^+, NO_3^-, SO_4^{2-}, Sb, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Ni, Sn, Ti, V, Zn এবং বেনজিনে দ্রবণীয় জৈব বস্তু উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত ছিল।

বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার দূষণ: বস্তুকণার প্রাচুর্য অপেক্ষা তার আয়তন ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বায়ুমণ্ডলে দূষণ সৃষ্টিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাথে সাথে এও দেখা যায়, যেসব বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে দূষণ সৃষ্টি করে, H_2SO_4 অ্যারোসল বাদে তাদের প্রাচুর্য সাধারণত কম থাকে। বস্তুকণার ক্ষতিকর প্রভাব মানুষ, উদ্ভিদ, সম্পদ, সবকিছুর উপর পড়ে; নিচে এমনি কিছু প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. মানুষের উপর বস্তুকণার প্রভাব : বস্তুকণা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে মানুষের দেহে প্রবেশ করে; কণার আয়তন এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কণার ব্যাস 5 μm এর বেশি হলে তা নাক ও শ্বাসনালীতে আটকা পড়ে, ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে না, 0.5 –

5.0 μm ব্যাসের বস্তুকণা ফুসফুসে কিছুদূর পর্যন্ত যেতে পারে তবে কিছুক্ষণের মাঝেই ফুসফুস তা বাইরে বের করে দেয়। কেবল 0.5 μm কিংবা তার কম ব্যাসের যেসব কণা, সেগুলো ফুসফুসে জমা হয়, ঐগুলো সহজে কিংবা সম্পূর্ণরূপে ফুসফুস থেকে অপসারিত হয় না এবং রক্তের সাথেও অনেক সময় মিশে যায়। ঐসব বস্তুকণার বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকার হতে পারে; কোনোটি বিষাক্ত, কোনোটি বিষাক্ত নয় কিন্তু ফুসফুসের বর্জ্য-নিঃসরণে প্রতিবন্ধক, আবার কোনোটি এমন কিছু পদার্থের বাহক যা ফুসফুসের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। শেষোক্ত শ্রেণীর যেসব বস্তুকণা, তাদের মাঝে ভুসা অন্যতম; বায়ুমণ্ডলে ভুসা যেমন বেশি পরিমাণে থাকে তেমনি এর শোষণ ক্ষমতাও বিশাল হয়।

বায়ুমণ্ডলের যেসব বস্তুকণা জনস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়েছে, অ্যাসবেসটোস (asbestos) ও বেরিলিয়াম ধাতুর কণা তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর। অ্যাসবেসটোস খুবই হালকা তাই বায়ুমণ্ডলে বহুসময় ধরে এটি ভেসে থাকে। অ্যাসবেসটোস ফুসফুসের নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি করে বলে ধারণা করা হয়।

বর্তমান যুগে, বেরিলিয়াম অতি প্রয়োজনীয় একটি ধাতু। ক্ষেপণাস্ত্র, নভোযান, নিউক্লিয় রিঅ্যাক্টর প্রভৃতি তৈরিতে ধাতুটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে, ধাতুটির বিষক্রিয় অতিশয় তীব্র; সব ধাতুর মাঝে Be এর TLV নিম্নতম, মাত্র 0.002 mg/m^3; ফুসফুসের জন্য এটি ভীষণ ক্ষতিকর একটি পদার্থ।

২. উদ্ভিদের উপর বস্তুকণার প্রভাব : বস্তুকণা উদ্ভিদের পাতার পরে জমা হয়ে সূর্যালোক থেকে তাকে ঢেকে রাখে এবং CO_2 বিনিময়ে বাধা সৃষ্টি করে; এতে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ ব্যহত হয় এবং পরিণতিতে উদ্ভিদ মারাও যেতে পারে। তাছাড়া, বস্তুকণা এমন কোনো পদার্থ বহনও করতে পারে যা উদ্ভিদের জন্য একটি বিষ।

৩. সম্পদের উপর বস্তুকণার প্রভাব : পাথর, ইট, কাঠ, ধাতু দ্বারা নির্মিত মূল্যবান সব সম্পদ ধূলি, ধোঁয়া, ভুসা প্রভৃতি বস্তুকণার প্রলেপে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা হয়, এটি সবার নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। বস্তুকণা সম্পদকে কেবল অপরিচ্ছন্নই করে না তাকে ক্ষয়ও করে; SO_2, NO_x, H_2SO_4 ও HNO_3 ধাতু, পাথর ও রঙ এর জন্য তীব্র ক্ষয়কর (corrossive) এক একটি পদার্থ; SO_2 ও NO_x দ্বারা যখন বায়ু দূষিত হয় তখন ঐসব পদার্থ তাতে উচ্চ ঘনমাত্রায় উপস্থিত থাকে। বস্তুকণা অক্সাইড/অ্যাসিড বহন করে ধাতু/পাথর নির্মিত সম্পদ কিংবা রঙিন বস্তুতে জমা হয় এবং একটু একটু করে তাকে ক্ষয় করতে থাকে। সারা বিশ্বে বহু অমূল্য ভাস্কর্য ও শিল্পকর্ম এভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে এবং বহু সম্পদ হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বস্তুকণা সুতিবস্ত্রের জন্যও বিশেষ ক্ষতিকর। কিছু কিছু সুতিবস্ত্র আছে, ঘর্ষণের ফলে যাতে চার্জ সৃষ্টি হয়। চার্জ বস্তুকণাকে আকর্ষণ করে; ফলে বস্ত্র খুব দ্রুত ময়লা হয়। তুলা, লিনেন ও রেয়ন নির্মিত বস্ত্র অম্লীয় বস্তুকণায় নষ্ট হয়ে যায়।

বস্তুকণায় সূর্যালোকের শোষণ ও বিচ্ছুরণ ঘটে; এতে বায়ুমণ্ডলের দৃশ্যমানতা (visibility) হ্রাস পায়। বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাতে বায়ুমণ্ডলীয় বস্তুকণারও ভূমিকা থাকতে পারে। বস্তুকণা সূর্যকিরণকে শূন্যে প্রতিফলিত করে। তাই বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার প্রাচুর্য দিনের পর দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে ভূপৃষ্ঠে সূর্যরশ্মির আপতন হ্রাস পেতে পারে এবং পৃথিবীতে তাপীয় ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটতে পারে। তবে, 'গ্রীন হাউজ প্রভাব' যে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে (তাপমাত্রার বৃদ্ধি), বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার ক্রমবর্ধমান প্রাচুর্য (শীতলকরণ প্রভাব) তা প্রশমিত করতে পারে বলেও অনেকে মনে করেন।

বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার দূষণ নিয়ন্ত্রণ : বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার উপায় বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণার প্রবেশ প্রতিহত করা। উক্ত নীতির আলোকে বেশ কিছু পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে; নিচে এমনি কয়েকটি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো।

১. অভিকর্ষ থিতানো কক্ষ (gravity settling chamber)**:** এই পদ্ধতিতে উৎস থেকে নির্গত গ্যাসকে বড় একটি কক্ষে প্রেরণ করা হয়। বড় কক্ষের মাঝে গ্যাসের বেগ হ্রাস পায় এবং বস্তুকণা সেখানে থিতিয়ে পড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়। সাধারণত, 50 μm ব্যাসের বড় কণা এই পদ্ধতির সাহায্যে গ্যাস থেকে অপসারণ করা যেতে পারে; ছোট কণার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি কার্যকর হয় না।

২. ঘূর্ণিবাত্যা সংগ্রাহক (cyclone collector): দৃঢ়ভাবে স্থাপিত চক্রাকারে পেঁচানো একটি নলের ভিতর দিয়ে গ্যাস প্রবাহিত করা হলে গ্যাসের মাঝে ভাসমান যেসব বস্তুকণা থকে তাদের উপর কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) বল কাজ করে; এতে কণাগুলো পেঁচানো নলের অভ্যন্তরীণ দেয়ালে জমা হয়। উক্ত নীতির ভিত্তিতে পদ্ধতিটি কাজ করে এবং 5 - 20 μm ব্যাসের কণা 95% পর্যন্ত এর সাহায্যে অপসারণ করা সম্ভব হয়।

৩. সিক্ত পরিচ্ছন্নকারক (wet scrubber): পানি কিংবা তরল অন্য কোনো পদার্থের সাহায্যে কঠিন তরল কিংবা গ্যাসীয় মিশাল (contaminant) অপসারণ করা 'সিক্ত পরিচ্ছন্নকারক' পদ্ধতির সাধারণ নীতি। তরল দশা ও মিশাল যত বেশি একে অপরের সংস্পর্শে আসে এবং যত বেশি তাদের মাঝে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে, পদ্ধতির দক্ষতা তত বৃদ্ধি পায়। নিম্নলিখিত দুটি ব্যবস্থা এ উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়ে থাকে:

ক. গ্যাস - প্রবাহের উপর তরল পদার্থ স্প্রেকরণ এবং

খ. নিষ্ক্রিয় একটি কঠিন পদার্থের দানা দ্বারা পূর্ণ নলের নিচে থেকে উপরের দিকে গ্যাসের প্রবাহ এবং উপর থেকে নিচের দিকে তরল পদার্থের প্রবাহ প্রেরণ।

৪. স্থির-বৈদ্যুতিক অধঃক্ষেপক (electrostatic precipitator)**:** অতি উচ্চ স্থির-বৈদ্যুতিক পটেনশিয়ালের ভিতর দিয়ে বস্তুকণা প্রেরণ করা হলে কণা চার্জ প্রাপ্ত হয়; ঐরূপ কণাকে বিপরীত চার্জ অঞ্চলে আকৃষ্ট ও জমা করে গ্যাস প্রবাহ থেকে তাকে

পৃথক করা আলোচ্য অধঃক্ষেপক পদ্ধতির নীতি। পদ্ধতিটির বিভিন্ন বিন্যাসের বেশ কিছু যন্ত্র বাজারে প্রচলিত আছে।

৫.১৫ বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয়তার দূষণ

তেজস্ক্রিয়তার দূষণ পরিবেশের সর্বত্র ঘটে। রাসায়নিক বিষের তুলনায় তেজস্ক্রিয় বিষ অনেক বেশি মারাত্মক। কারণ, এক. সাধারণ একটি রাসায়নিক পদার্থের তুলনায় অনেক কম পরিমাণের একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে; দুই. রাসায়নিক বিষের ক্রিয়া সাথে সাথে ঘটে কিন্তু তেজস্ক্রিয় বিষ গোপনে ধীরে ধীরে কাজ করে, আক্রান্ত হওয়ার বহু বছর পরও তার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

মানুষ তেজস্ক্রিয় বিষের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে; মহাশূন্য,মহাসমুদ্র ও ভূগর্ভ থেকে নিক্ষিপ্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দ্বারা সে প্রতিনিয়ত আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে; মানুষ যে খাবার খায়, যে বায়ু সে গ্রহণ করে তাতে তেজস্ক্রিয়তা বিদ্যমান। সর্বোপরি মানব দেহের প্রতিটি কোষে রয়েছে তেজস্ক্রিয় পরমাণু। অথচ, মানুষ আজও বেঁচে আছে; এর কারণ, প্রাকৃতিক ঐসব উৎস থেকে একটি মানুষ সারাজীবনে মোট যে তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয় তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় না। তেজস্ক্রিয়তার বিষক্রিয়া নিয়ে মানুষের আজ যে উদ্বেগ তা তার নিজেরই সৃষ্টি তেজস্ক্রিয়তা। মানুষের সৃষ্টি তেজস্ক্রিয়তাকে 'কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা' (artificial radioactivity) বলে। অতএব, 'তেজস্ক্রিয় বিষ' বলতে কার্যত 'কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা' বুঝায়।

তেজস্ক্রিয়তা প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম, যেমনই হোক, তার কারণ নিউক্লিয়াসের অস্থিতিশীলতা। নিউক্লিয়াসের স্থিতিশীলতার জন্য তাতে n-p এর নির্দিষ্ট একটি অনুপাত থাকার প্রয়োজন হয়, এক এক মৌলের $(Z>20)$ স্থিতিশীলতার জন্য উক্ত অনুপাত এক এক প্রকার $(Z=20$ এর নিচে সব নিউক্লিয়াসে স্থিতিশীলতার n-p অনুপাত $=1)$। স্থিতিশীলতার জন্য যে n-p অনুপাত প্রয়োজন, নিউক্লিয়াসে যখন তা না থাকে (কম কিংবা বেশি) তখন সে নিউক্লিয়াস অস্থিতিশীল হয় এবং সাধারণত α অথবা β কণা বিকিরণের মাধ্যমে স্থিতিশীল নিউক্লিয়াসে তার রূপান্তর ঘটে।

নিউক্লিয়াসের অস্থিতিশীলতার গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিমাপ, তার অর্ধায়ু (half-life); তেজস্ক্রিয় একটি নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে আদি পরিমাণ থেকে তার অর্ধ পরিমাণে নেমে আসতে যে সময় নেয় তাকে তার 'অর্ধায়ু'$(t_{1/2})$ বলে। অর্ধায়ু তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের জন্য একটি ধ্রুবক। তেজস্ক্রিয়তার একক 'কুরি' (Curie, মাদাম কুরির সম্মানার্থে); প্রতি সেকেন্ডে 3.7×10^{10} সংখ্যক পরমাণুর বিভাজন ঘটাকে এক কুরি বলে (প্রতি সেকেন্ডে প্রতি গ্রাম Ra-226 এর বিভাজন 'এক কুরি')।

প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার উৎস দুটি-পৃথিবীতে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিভাজন এবং মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic radiation); শেষোক্ত উৎসের অবদান কম, প্রথমোক্তটির প্রায় এক চতুর্থাংশ। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত

প্রায় এক ডজন তেজস্ক্রিয় মৌলের সন্ধান পাওয়া গেছে যার মাঝে U-238, Th-232 ও K-40 আইসোটোপ প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার প্রধান তিনটি উৎস। আইসোটোপ তিনটি নিম্নরূপে পরিবেশের বিভিন্ন অঙ্গে তেজস্ক্রিয়তার বিস্তার ঘটায়:

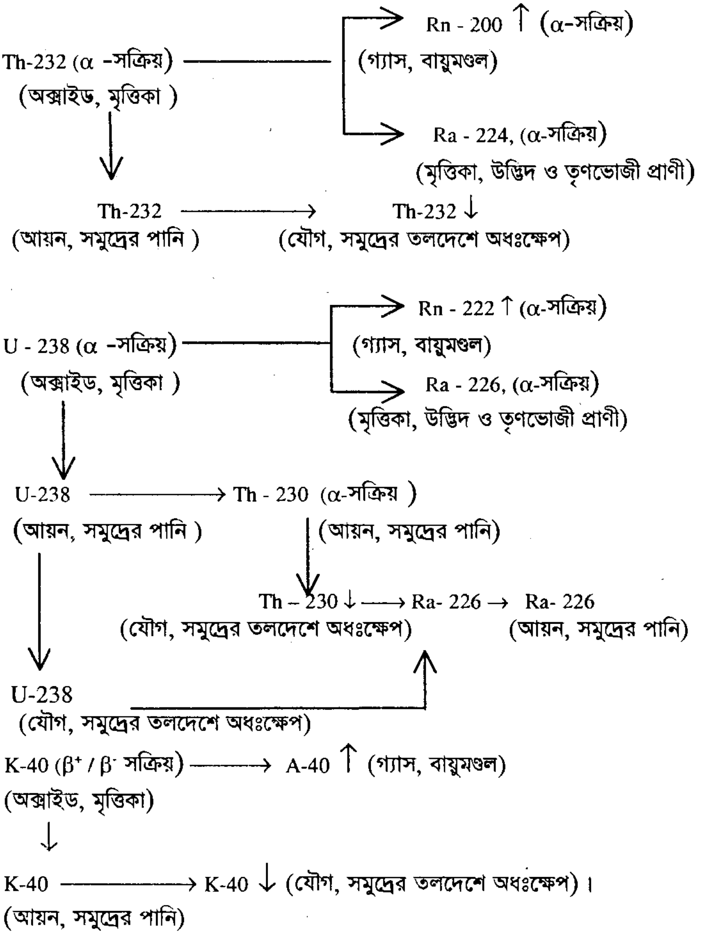

কার্বনের আইসাটোপ, C-14 ও প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক প্রোটন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে N-14 কে আঘাত করে; এতে নিউট্রন উৎপন্ন হয়। উক্ত নিউট্রন N-14 কে আবার আঘাত করে C-14 সৃষ্টি করে; C-14 একটি β-সক্রিয় আইসোটোপ; এর $t_{½}$ =5600 বছর। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, যুক্তরাজ্যের (U.K.) জনসাধারণ প্রতি বছর যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয় তার 50% এর বেশি আসে র‍্যাডন (Rn) থেকে। র‍্যাডন রাসায়নিকভাবে

নিষ্ক্রিয় তেজস্ক্রিয় একটি গ্যাস, শিলামণ্ডলের (lithosphere) শিলায় বিশেষ করে গ্রানাইট শিলায় যে প্রকৃতিক U ও Th বিদ্যমান তার বিভাজন থেকে গ্যাসটি উৎপন্ন হয়:

U-239 বিভাজন ধারা : Rn-222 ($t_{1/2}$ = 3.82 দিন)

Th-232 বিভাজন ধারা : Rn-220 ($t_{1/2}$ = 55.6 সে:)

U-235 বিভাজন ধারা : Rn-219 ($t_{1/2}$ = 3.96 সে:) ।

বাড়ির নিচতলায় (basement) যেখানে বায়ুচলাচল ব্যবস্থা দুর্বল থাকে সেখানেই র‍্যাডন গ্যাসের বেশি ঘনীভবন ঘটে। এসব অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকেও কখনো কখনো গ্যাসটি বাইরে বিস্তার লাভ করে। র‍্যাডন গ্যাসটি যদিও ক্ষণস্থায়ী তবে এর উৎস প্রাকৃতিক বলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে নির্দিষ্ট একটি মাত্রায় গ্যাসটি সর্বদা উপস্থিত থাকে।

পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তার যে দূষণ ঘটে, 'কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা' তার জন্য মুখ্যত দায়ী এবং নিম্নলিখিত উৎসগুলো এতে প্রধান ভূমিকা পালন করে:

ক. নিউক্লিয় রিঅ্যাকটর (reactor),

খ. ভূ-পৃষ্ঠে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ,

গ. পরীক্ষামূলক ত্বরণকারক (accelerators),

ঘ. চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার এবং

ঙ. কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ট্রেসার হিসেবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার ।

প্রকৃতিতে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার প্রথম মারাত্মক যে অনুপ্রবেশ ঘটে,সে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ সালে আগস্টের ছয় তারিখ জাপানের হিরোশিমা শহরে এবং নয় তারিখ নাগাশাকি শহরে পরপর দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে যে বিশাল তাপ ও তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হয় তাতে শহর দুটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, একলাখেরও বেশি লোক কয়েকদিনের মাঝে মারা যায় এবং হাজার হাজার লোক বিভিন্ন মাত্রায় আহত ও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। সে তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব শহর দুটির লোক বংশানুক্রমে এখনও বহন করে চলেছে।

হিরোশিমা-নাগাশাকির ঐ পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের পরও আজ অবধি প্রায় প্রতিবছর প্রকৃতিতে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে; এর প্রধান উৎস দুটি-নিউক্লিয় পরীক্ষা (nuclear testing) ও পারমাণবিক চুল্লির বর্জ্য। কখনো কখনো পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনাও পরিবেশে উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায় (যেমন, ১৯৮৪ সালের 'চেরনোবিল দুর্ঘটনা)। চুল্লির বর্জ্য থেকে পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তার যে অনুপ্রবেশ ঘটে তা নিয়ন্ত্রণীয়। তবে, নিউক্লিয় পরীক্ষার ফলে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তার দূষণ অনেকাংশে

অনিয়ন্ত্রণীয়। নিউক্লিয় পরীক্ষা যখন ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে পরিচালিত হয় তখন বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তিতে তেজস্ক্রিয়তাপূর্ণ বিপুল পরিমাণের ধূলি ঊর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে পড়ে; বিস্ফোরণের শক্তি খুব উচ্চ হলে (200 কিলোটনের বেশি), স্ট্রাটোস্ফেয়ার পর্যন্ত ও (ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে 11-50 km) ধূলির বিস্তার ঘটে। ধূলি স্ট্রাটোস্ফেয়ার থেকে ভূপৃষ্ঠে সহজে নেমে আসতে পারে না, কয়েকমাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত তা সেখানে ভেসে বেড়ায় এবং বহু দূর দূরান্তে ভিন্ন মহাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কমশক্তি সম্পন্ন বিস্ফোরণের (100-200 কিলোটন) ধূলি ট্রপোস্ফেয়ারের মাঝে (ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে 11 km পর্যন্ত) সীমিত থাকে। উক্ত তেজস্ক্রিয় ধূলি প্রধানত বৃষ্টি/তুষারপাতের সাথে এবং কিছুটা বাতাসে ভেসে ভেসে কয়েকমাসের মাঝেই ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে।

একটি নিউক্লিয় বিস্ফোরণে প্রায় নব্বইটির শত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি হয়, যার মাঝে মাত্র দুটি, Sr-90 ও Cs – 137 উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আইসোটোপ দুটির তিনটি বৈশিষ্ট্য এর জন্য দায়ী: ক. এরা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, খ. এদের অর্ধায়ু ($t_{1/2}$) বেশ উচ্চ, যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ বছর এবং গ. মানুষের বিপাক প্রক্রিয়ায় এরা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, যদিও এরা মানবদেহের স্বাভাবিক কোনো উপাদান নয়। আইসোটোপ দীর্ঘস্থায়ী হলে বহু বছর ধরে তা তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায়। তবে, তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা কম থাকে। অন্যদিকে, ক্ষণস্থায়ী আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তা তীব্র কিন্তু এর প্রভাব অল্পক্ষণে শেষ হয়ে যায়। দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী আইসোটোপ তাই জীবের জন্য খুব বেশি ক্ষতির কারণ হয় না। আইসোটোপ যদি জৈবিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে তাহলে দেহে প্রবেশ করার পর অল্পদিনের মাঝেই তা জৈবিক বর্জ্যের সাথে দেহ থেকে অপসারিত হয়। ফলে, এই শ্রেণীর আইসোটোপও জীবের তেমন একটি ক্ষতি করতে পারে না। জীবের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর সেসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যেগুলো মাঝারি মানের স্থিতিশীল এবং জৈবিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়; Sr-90 ও Cs-137 এই শ্রেণীর দুটি আইসোটোপ। আইসোটোপ দুটির কোনোটি জীবদেহের স্বাভাবিক উপাদান নয় তবে এরা জীবদেহের অপরিহার্য দুটি উপাদান, যথাক্রমে Ca ও K এর সমধর্মী। হাড়ের প্রধান একটি উপাদান, Ca; Sr-90 উক্ত Ca এর কিছু পরিমাণ সরিয়ে দিয়ে সেস্থান দখল করে বসে এবং বহু বছর ধরে তেজস্ক্রিয়তার আঘাত হানতে থাকে; এতে লিউকোমিয়া (leucomia)ও হাড়ে ক্যান্সারের মতো মরণ ব্যাধিও সৃষ্টি হতে পারে। অপরদিকে, Cs-137 আইসোটোপটি K-এর মতো জীবদেহের কোমল কলায় ঘনীভূত হয় এবং তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে একে ধ্বংস করে। নিউক্লিয় বিস্ফোরণে উৎপন্ন হয়, এমন আরও কিছু আইসোটোপ, (যেমন, Pu-239, Ra-226, I-131 প্রভৃতি) জীবদেহে স্থান পায়। এদের মাঝে Pu হাড়, যকৃত প্লীহা ও কোমল কলায়, Ra হাড়ে এবং I (আয়োডিন) থাইরয়েড গ্রন্থিতে অবস্থান করে। আয়োডিন-131 আইসোটোপটি ক্ষণস্থায়ী ($t_{1/2}$ = 8.1 দিন); এটি তেমন একটি ক্ষতিকর নয়। তবে, দীর্ঘস্থায়ী Pu-239 ও Ra-226 উভয়ই জীবের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। পরবর্তী

পৃষ্ঠার সারণি ৫.১৫-এ ক্ষতিকর কিছু আইসোটোপের জ্ঞাতব্য কিছু তথ্য প্রদান করা হলো।

সারণি ৫.১৫. ক্ষতিকর কিছু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কয়েকটি তথ্য* ।

আইসোটোপ	অর্ধায়ু	প্রধান বিকিরণ	অনুমোদিত সর্বোচ্চ মাত্রা (মাইক্রোকুরি)		
			দেহে মোট	পানি (প্রতি লিটার)	বায়ু (প্রতি লিটার)
Pu-239	24,400 বছর	আলফা (α)	0.04	1.5×10^{-3}	2×10^{-9}
Ra-226	1,620 বছর	আলফা (α)	0.1	4×10^{-5}	8×10^{-9}
Sr-90	19.9 বছর	বিটা (β)	1	8×10^{-4}	2×10^{-7}
Ca-45	152 দিন	বিটা (β)	13	0.25	6×10^{-6}
C-14	5,600 বছর	বিটা (β)	250	3	1×10^{-3}
P-32	14.3 দিন	বিটা (β)	10	0.2	1×10^{-4}
Fe-59	45.1 দিন	বিটা (β)	11	0.1	1.5×10^{-5}
I-131	8.1 দিন	বিটা (β)	0.3	0.03	3×10^{-6}

* Jack Schubert, Chemistry in the Environment

ইতিহাসের ভয়াবহতম তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনার একটি ইউক্রেনে চেরনোবিল পাওয়া প্লান্টের বিস্ফোরণ; ১৯৮৬ সালের ছাব্বিশে এপ্রিল দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় কণা ও গলিত কঠিন বস্তু আগ্নেয়গিরির ধোঁয়ার আকারে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে আসে। ধারণা করা হয়; দুর্ঘটনায় দুই হাজারের বেশি লোক মারা যায় (যদিও সরকারি তথ্য বিবরণীতে মৃতের সংখ্যা দুই) এবং বহু দূর দূরান্তে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের এক সপ্তাহ পর দক্ষিণ ইংল্যান্ডের বায়ু পরীক্ষা করে তাতে প্রায় দুই ডজনের মতো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ অস্বাভাবিক উচ্চমাত্রায় পাওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের তেজস্ক্রিয়তা বৃষ্টির সাথে একসময় ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে এবং গবাদি পশুর খাবার তথা পশুমাংস ও দুগ্ধে তার সংক্রমণ ঘটে। ইউরোপের বহু দেশ তাই এ সময়ে ঐসব খাবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানীদের অভিমত, চেরনোবিল বিস্ফোরণে দুর্ঘটনা কেন্দ্রের চারপাশে প্রায় ষাট বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে মৃত্তিকা, পানি ও উদ্ভিদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরবর্তী কয়েক দশক ধরে ঐ অঞ্চলে এর ক্ষতিকর প্রভাব চলতে থাকবে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে যেসব বিকিরণ নির্গত হয়, তার মাঝে α (আলফা ^4_2He) ও β (বিটা) কণা জীবের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর তবে α-কণা বাইরে

থেকে জীবদেহের ক্ষতি করতে পারে না। আলফা কণা ভারি বলে তার ভেদকরণ ক্ষমতা (penetrating power) খুব কম, জীবকলার (tissue) ভিতর দিয়ে মাত্র 50 মাইক্রোন পথ তা অগ্রসর হতে পারে; α-কণা তাই চামড়ার মৃত বহিরাবরণে আটকে যায়, জীবিত কোষে পৌঁছাতে পারে না। বিটা কণা কলার ভিতর কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। তবে, অত্যাবশ্যকীয় কোনো অঙ্গে (vital organ) তা পৌঁছাতে পারে না। তেজস্ক্রিয় বিষ তাই যখন খাবার বা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে দেহের ভিতর প্রবেশ করে কিংবা রক্ত প্রবাহে মেশে কেবল তখন তা বিপজ্জনক হয়; ঐ সময় তেজস্ক্রিয় পদার্থ সরাসরি কোষের সংস্পর্শে আসে এবং ভারি α-কণাও চার পাঁচটি কোষ অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর α-কণা তাই বিটা কণার তুলনায় অনেক বেশি ধ্বংসের কারণ হয়। প্রতিটি কোষের নিজেকে মেরামত করার সহজাত একটি ক্ষমতা থাকে তবে তেজস্ক্রিয়তার আঘাত বহুদিন ধরে চলতে থাকলে কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষে পরিণত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে গৃহীত তেজস্ক্রিয় ধূলি ফুসফুসের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর; বড় আকৃতির কণা যদিও ফুসফুসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বাধা পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তবে মাইক্রোন আকৃতির কণা ফুসফুসে পৌঁছে যায় এবং কোষ ধ্বংস করে।

তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য তৎপরতা ও দ্রুততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি শর্ত কেননা দেরি হলে তেজস্ক্রিয়তা কোষের প্রভূত ক্ষতি করে ফেলে এবং পাকস্থলী অথবা রক্ত প্রবাহ থেকে বেরিয়ে হাড় অথবা অন্যান্য কলায় তা স্থায়ী জায়গা দখল করে বসে। গার্হস্থ্য চিকিৎসায়, আক্রান্ত ব্যক্তিকে পালং শাক খাওয়ানো যেতে পারে। পালং শাকে প্রচুর অক্সালেট থাকে যা ভাল একটি অধঃক্ষেপক; পরিপাক যন্ত্রের মাঝে দ্রবীভূত কোনো আইসোটোপ থাকলে অধঃক্ষেপ আকারে অক্সালেট তা দেহ থেকে বের করে দিতে পারে। তাছাড়া, জিরকোনিয়াম (Zr) ও EDTA-এর দ্রবণ একসাথে ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্তে মিশিয়ে দিলেও সুফল পাওয়া যেতে পারে। জিরকোনিয়াম হাড় থেকে কোনো কোনো আইসোটোপকে রক্তে মুক্ত করে আনে এবং EDTA মুক্ত-আইসোটোপের সাথে জটিল আয়ন গঠন করে দেহ থেকে তাকে বের করে দেয়। তবে, যত শীঘ্র সম্ভব অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৫.১৬ গার্হস্থ্য বায়ুদূষণ (Domestic Air Pollution)

ঘরের বাইরে বায়ুমণ্ডলে যেমন দূষণ সৃষ্টি হয়, ঘরের ভিতর বায়ুতেও তেমন দূষণ সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি কখনো কখনো বাইরের তুলনায় তা তীব্রতরও হতে পারে। অথচ বাস্তবতা এই, ঘরের ভিতর বায়ুদূষণ সৃষ্টি হতে পারে, এমন একটা ধারণা আমাদের মাঝে খুব কমই স্থান পায়। ঘরের ভিতর বায়ুর দূষণ বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে; যেমন, ঘরের ভিতর জ্বালানি পোড়ানো, ধূমপান, আর্দ্রতা (স্যাঁতসেঁতে মেঝে), পরাগরেণুর উপস্থিতি (গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত গাছ থেকে), নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাব পত্রের পেইন্ট থেকে ক্ষতিকর বাষ্প নিঃসরণ/ বস্তুকণা স্খলন প্রভৃতি।

সারা বিশ্বে এখনও প্রায় 50% গৃহে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হয় তা ঐতিহ্যগত (traditional) কাঠ, কয়লা ও গোবর। ঐসব জ্বালানির ধোঁয়ায় CO, NO_x, SO_2, হাইড্রোকার্বন, বস্তুকণা (particulates), দুর্গন্ধময় জৈব পদার্থ প্রভৃতি উপস্থিত থাকে; উপাদানগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি বায়ুদূষক। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে কাঠ, কয়লা ও গোবর পোড়ানো ধোঁয়ায় SO_2 ও বস্তুকণার মাত্রা, বায়ুতে এদের গ্রহণযোগ্য যে মাত্রা, তার তুলনায় অনেক বেশি থাকে।

আধুনিক অফিসঘর ও বসতবাড়িতে বায়ুদূষণের সম্ভাবনা আরো বেশি থাকে; কেননা, এসব বাড়ি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে শক্তি সংরক্ষিত (energy conservation) হতে পারে এবং বাইরের ধুলাবালি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অথচ, বায়ুচলাচলের (ventilation) পর্যাপ্ত ব্যবস্থা প্রায়ই এতে থাকে না। তাছাড়া, এসব বাড়ি তৈরিতে ফরমালডিহাইড রেসিনের নির্মাণসামগ্রী (পার্টিকেল বোর্ড, তক্তা প্রভৃতি) ও ইউরিয়া ফরমালডিহাইড ফোম (বিদ্যুৎ অপরিবাহী - insulator) সচরাচর ব্যবহার করা হয়। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ঐসব নির্মাণসামগ্রী থেকে ফরমালডিহাইড বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের বায়ুতে মেশে। ফরমালডিহাইড বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস বা বস্তুকণা এক সাথে মিশে এমন বায়ু দূষণ সৃষ্টি হতে পারে যাতে মাথাধরা, চোখ জ্বালা, শ্বাসনালী ও চর্মের প্রদাহ,বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, এমনকি হৃদযন্ত্রের সমস্যা পর্যন্ত দেখা দেয়।

পুরানো আসবাব পত্রের পেইন্ট কিংবা নুতন আসবাব পত্রে সস্তা দামের যেসব পেইন্ট ব্যবহার করা হয় তাতে সীসা মিশ্রিত থাকতে পারে। উক্ত পেইন্ট আলগা হয়ে যখন খসে পড়ে তখন তা ঘরের বায়ুতে দূষণ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিশুরা এ দূষণের শিকার হয় সবচেয়ে বেশি কেননা পেইন্ট এর আস্তরণও তাদের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ যায় না।

আমরা আমাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় ঘরের মাঝে কাটাই; অতএব, ঘরের মাঝে বায়ুতে যাতে দূষণ সৃষ্টি হতে না পারে সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

৫.১৭. ধূমপানজনিত দূষণ

ধূমপান, বস্তুত, একপ্রকারের দূষিত বায়ু সেবন। তবে, স্বাভাবিক বায়ু সেবন ক্রিয়াটি অবিরাম, ধূমপান সেখানে সবিরাম। সচরাচর যে বায়ু সবাই সেবন করে তা দূষিত যদি হয়, দূষকের মাত্রা তাতে সাধারণত নিম্ন থাকে। পক্ষান্তরে, ধূমপানে যে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে তা প্রায়ই উচ্চমাত্রায় দূষক বহন করে। একটি সিগারেট পোড়ালে যে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় তাতে CO, NO, HCN অ্যালডিহাইড, পলিঅ্যারোমেটিক হাইড্রোকর্বন (PAH: সন্দেহজনক ক্যান্সার সৃষ্টিকারক), সীসা প্রভৃতি একগুচ্ছ দূষক উপস্থিত থাকে; CO ও NO এর পরিমাণ থাকে তাতে সবচেয়ে বেশি। কার্বন মনোক্সাইডের (CO) কথা ধরা যাক। লোকালয়ের বায়ুতে সাধারণ যে দূষণ সৃষ্টি হয়, তাতে ৪-৮ ঘণ্টা সময়ের ব্যাপ্তিতে গ্যাসটির মাত্রা থাকতে পারে (10-30 ppm বা 11 - 34 mg /m^3); পক্ষান্তরে, ৫ মিনিট ব্যাপী সবিরামে 400 ppm (460-mg /m^3) CO গ্রহণ একটি সিগারেট

সেবনের টিপিক্যাল দূষণ মাত্রা। একইভাবে, NO এর তীব্র দূষণযুক্ত লোকালয়ের বায়ুতে এক ঘণ্টায় গ্যাসটির গড় প্রাচুর্য 1.5 ppm (1.8 mg/m^3) অতিক্রম করে না অথচ সিগারেটের ধোঁয়ায় উক্ত গ্যাসের মাত্রা থাকে প্রায় 100 ppm।

রক্তের হিমোগ্লোবিন O_2 বহন করে সারাদেহে তা পৌঁছে দেয়। CO ও NO উভয় গ্যাস হিমোগ্লোবিনের সাথে বন্ধন গঠন করে এবং তার O_2 বহনকরার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। একটি সিগারেটের ধোঁয়া থেকে গ্যাস দুটির যে পরিমাণ ফুসফুসে প্রবেশ করে তাতে 5-6% পর্যন্ত হিমোগ্লোবিন নিষ্ক্রিয় হতে পারে। সিগারেট সেবন, তথা যে কোনো প্রকার ধূমপানে তাই মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, একথা আজ সবার জানা (বিড়ি, সিগারেটের প্যাকেটেই লেখা থাকে); এতে ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী (chronic) ব্যাধি, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে বলে সন্দেহ করা হয়। দূষিত বায়ু সেবনেও ঐরূপ ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে তবে সিগারেটের ধোঁয়ায় দূষকের মাত্রা অনেক বেশি থাকে বলে এর ক্রিয়াও তীব্রতর হয়। ধূমপান ও বায়ুর স্বাভাবিক দূষণ যখন একই সাথে চলে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ক্রিয়া আরো বেশি তীব্র আকার ধারণ করে। তাই, একজন ধূমপায়ী যখন দূষিত বায়ুর পরিবেশে বসবাস করে তখন তার ক্ষতির সম্ভাবনা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যায় এবং এসব ব্যক্তি প্রায়ই ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী জটিল পীড়ায় ভুগতে থাকে। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, ধূমপানের মতো যে কোনো আকারের তামাক সেবনও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তবে ক্রিয়ার কৌশল ভিন্ন হতে পারে।

৫.১৮ কর্মক্ষেত্রে বায়ু দূষণ (Occupational Air-Pollution)

শিল্পকারখানার শ্রমিক নানাবিধ বৃত্তীয় ঝুঁকির (occupational hazard) শিকার হয়। এর মাঝে বায়ু দূষণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পকারখানায় বায়ু দুষণ সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ দুটি - রাসায়নিক পদার্থের বাষ্প ও বস্তুকণা (particulates); কর্মস্থলের চতুষ্পার্শ্বে বায়ুর সাথে এদের মিশ্রণ ঘটে। উক্ত বাষ্প/ বস্তুকণা গাত্রচর্মের সংস্পর্শে আসে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে; কখনো কখনো মুখের ভিতর দিয়ে পাকস্থলীতেও তা স্থান পায়। তবে, ফুসফুসের আক্রমণই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক হয়। যেসব বস্তুকণার ব্যাস 3 μm এর নিচে থাকে, সাধারণত সেগুলো ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং নিউমোকোনিওসিস (Pneumoconiosis) নামক একপ্রকার জটিল ব্যাধির জন্ম দেয়। নিউমোকোনিওসিস ফুসফুসের এক প্রকার ব্যাধি যা আক্রান্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমিয়ে একসময় তাকে পঙ্গু করে ফেলে। যাহোক নিম্নলিখিত ব্যাধিগুলো বৃত্তীয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে গৃহীত বস্তু ধুলার সাথে এরা সম্পর্কযুক্ত:

বস্তু-ধুলা	ব্যাধি
বালু (silica)	সিলিকোসিস
অ্যাসবেসটোস	অ্যাসবেসটোসিস
তুলা	বিস্‌সাইনোসিস (Byssinosis)

কয়লা	অ্যানথ্রাকোসিস
আখ	ব্যাগাসোসিস (Bagassosis)
তামাক	টোব্যাকোসিস
শস্য/খড়	কৃষকের ফুসফুস (Farmer's lung)
লোহা	সিডারোসিস (Siderosis) ।

ব্যাধিগুলোর মাঝে অ্যাসবেসটোসিস সম্ভবত সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। মাত্র মাসখানেক অ্যাসবেসটোস ধুলার সংস্পর্শে থাকলেই তা দেহের মাঝে স্থায়ী হয় এবং টাইম বোমার (time bomb) মতো ২৫ – ৩০, এমনকি ৪০ বছর পরও তার প্রভাব প্রকাশ পায়। অ্যাসবেসটোসিস ফুসফুসের ব্যাধি, এতে বুকে ব্যথা ও কফ সৃষ্টি হয়; এমনকি অ্যাজমা ও ফুসফুসের ক্যান্সার পর্যন্ত এতে হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

প্রশ্নমালা

১. বায়ু-দূষণ বলতে কি বুঝায় ? বায়ু দূষণের মাত্রা প্রকাশ করার ppm ও ভর ঘনআয়তন একক দুটির সংজ্ঞা দাও । এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? দেখাও যে, 1 ppm $SO_2 = 2.62$ mg/m^3 SO_2

২. বায়ু-দূষণের গুরুত্বপূর্ণ আবহ নিয়ামকগুলো কি কি? নিয়ামকগুলোর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতা বলতে কি বুঝায়? বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার বিলোপন হার ও বদ্ধতাপীয় বিলোপান হার কি? বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতায় স্থিতিমাপ দুটির ভূমিকা কি ?

৪. বায়ুমণ্ডলের স্থিতিশীলতা বায়ু দূষণকে কিভাবে প্রভাবিত করে- বিস্তারিত আলোচনা কর।

৫. বায়ুমণ্ডলীয় উল্টাধারা কি? কিভাবে এটি সৃষ্টি হতে পারে। বায়ু দূষণে এর প্রভাব কি?

৬. বায়ু দূষক কি কি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়? প্রত্যেক শ্রেণি বায়ু দূষকের উদাহরণ দাও।

৭. প্রাকৃতিক উৎসের তুলনায় মানুষের সৃষ্টি উৎস বায়ুর দূষণ সৃষ্টিতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে - ব্যাখ্যা কর। মানুষের সৃষ্টি বায়ু দূষকগুলোর প্রধান প্রধান উৎস কি কি?

৮. নিম্নলিখিত গ্যাসগুলোর ক. উৎস খ. বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারিত হবার কৌশল গ. দূষণ ক্রিয়া ও ঘ. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলোচনা কর: CO, NO_x ও SO_2 ।

৯. HC, CO ও NO_x নিয়ন্ত্রণে ক্যাটালিটিক কনভারটর পদ্ধতির নীতি আলোচনা কর।

১০. বায়ুমণ্ডল থেকে SO_2 এর অপসারণে যে কৌশলগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেগুলো আলোচনা কর।

১১. বায়ুমণ্ডলে জৈব সালফারের যে দূষণ ঘটে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? কিভাবে দূষক সৃষ্টি হয়?

১২. অম্ল বৃষ্টি কাকে বলে এবং কিভাবে তা সৃষ্টি হয়? অম্ল বৃষ্টি দূষকের উৎস থেকে হাজার হাজার মাইল দূরেও সৃষ্টি হতে পারে - ব্যাখ্যা কর।

১৩. বায়ুমণ্ডলে HC এর দূষণ ও তার নিয়ন্ত্রণ আলোচনা কর।

১৪. বায়ুমণ্ডলীয় হাইড্রোকার্বনের প্রায় 90% মিথেন অথচ দূষক হিসেবে একে গণ্য করা হয় না কেন?

১৫. স্মগ ও 'আলোক-রাসায়নিক স্মগের' মধ্যে পার্থক্য কি? আলোক-রাসায়নিক স্মগ সৃষ্টিতে কোন কোন পদার্থ ভূমিকা পালন করে?

১৬. আলোক-রাসায়নিক স্মগ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কি কি শর্ত আবশ্যক এবং কি কৌশলে এটি সৃষ্টি হয় বলে মনে করা হয়?

১৭. আলোক-রাসায়নিক স্মগ সৃষ্টিতে যানবাহনের ধোঁয়ার ভূমিকা থাকে প্রায় 80% - ব্যাখ্যা কর। স্মগের প্রভাব আলোচনা কর।

১৮. টিপিক্যাল একটি আলোক-রাসায়নিক স্মগে গুরুত্বপূর্ণ যেসব দূষক উপস্থিত থাকে, প্রতিদিনে সময়ের সাথে বিশেষ একটি ধারায় তাদের ঘনমাত্রা ওঠানাম করে - আলোচনা কর।

১৯. আলোক-রাসায়নিক স্মগ একটি সেকেন্ডারি দূষক - কেন?

২০. PAN কি? কিভাবে এটি স্মগে সৃষ্টি হয় বলে ধারণা করা হয়?

২১. স্ট্রাটোস্ফেয়ারেও দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিশ্ব পরিবেশের জন্য তা বিরাট এক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে - ব্যাখ্যা কর।

২২. ওজোন স্তরের ক্ষয় হচ্ছে বলে ধারণা করা হয় - স্বপক্ষে যুক্তি কি?

২৩. ওজোন গহবর কাকে বলা হয়? আন্টার্টিকায় এটি সৃষ্টি হয় কেন এবং কিভাবে এটি সেখানে সৃষ্টি হয়?

২৪. ওজোন স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে CFC মারাত্মক একটি গ্যাস - কারণ ব্যাখ্যা কর।

২৫. অ্যারোসল কি? কিভাবে এটি বায়ুতে দূষণ সৃষ্টি করে?

২৬. বায়ুমণ্ডলের বস্তুকণা মানুষ, উদ্ভিদ ও সম্পদের ক্ষতি করে - আলোচনা কর। বস্তুকণার দূষণ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ?

২৭. বায়ুদূষণ ঘরের ভিতরও সৃষ্টি হতে পারে এবং বাইরের বায়ুদূষণের মতো তাও সমান উদ্বেগজনক - আলোচনা কর।

BANSDOC Library Dhaka

২৮. ধূমপান বস্তুত তীব্রমাত্রায় দূষিত বায়ুসেবন - ব্যাখ্যা কর। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কেন?

২৯. টিকা লিখ:

ক.বায়ুমণ্ডলীয় উল্টাধারা, খ. বায়ুমণ্ডলে বস্তুকণা ও তার প্রভাব, গ. অম্ল বৃষ্টি, ঘ. ওজোন স্তরের ক্ষয় ও ওজোন গহবর, ঙ. ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ।

গ্রন্থপঞ্জি

1. C.S. Rao, 'Environmental Pollution Control Engineering', Wiley Eastern, India, 1993.

2. S.K. Banerji, 'Environmental Chemistry', 2nd Ed., Prentice Hall, India, 1999.

3. M.N. Rao and H.V.N. Rao. 'Air Pollution', Tata McGraw Hill, New Delhi, India, 1997.

4. R.M. Harrison and S.J. de Mora, Introductory Chemistry for the Environmental Sciences', 2nd Ed., Cambridge Univ. Press, U.K., 1996.

5. S.E. Manahan, ' Environmental Chemistry', 6th Ed., Lewis Publishers, USA, 1994.

6. Carole L. Hamilton (Introduction), 'Chemistry in the Environment' (Collection from Scientific American), Freeman, USA, 1952-73.

7. S.H. Stoker and S.L. Seager, 'Environmental Chemistry: Air and Water Pollution', Scott Foresman, NY, USA, 1976.

8. Noel De Nevers; Air Pollution Control Engineering, 2nd Ed., Mc-Graw Hill, UK. 2000.

ষষ্ঠ অধ্যায়
মৃত্তিকা ও কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা
(Soil and Solid Waste Management)

৬.১ ভূমিকা

ভূ-ত্বকের পাতলা শিথিল যে স্তরে উদ্ভিদের জন্ম ও বিস্তার ঘটে তাকে মৃত্তিকা বলে। কঠিন শিলা দ্বারা ভূত্বক গঠিত। জৈবিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং জলবায়ুর সম্মিলিত প্রভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে শিলা ক্ষয় হয়ে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে। তবে, 'মৃত্তিকার সৃষ্টি' শিলার কেবল বিভাজন নয়; বিভাজন ঘটার পাশাপাশি শিলার সাথে পারিপার্শ্বিক বস্তুর (কঠিন, তরল ও গ্যাস) বিনিময় ঘটে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। সত্যিকার মৃত্তিকা তাই ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরস্পর যুক্ত কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় দশার জটিল এক মিশ্রণ যাতে সিলিকা, সিলিকেট ও ধাতু অক্সাইডের মতো কঠিন অজৈব বস্তু যেমন থাকে তেমনি পানি ও বায়ু এবং বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তুও থাকে। ল্যাবরেটরিতে ছিপি আটা বোতলে সংরক্ষিত মৃত্তিকার একটি 'নমুনা' মৃত্তিকা নয়, মৃত্তিকা ভূত্বকের গতিশীল জটিল এক সিসটেম, জৈবিক, রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়ায় যাতে উপাদানগুলোর সতত পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

৬.২ পরিবেশ দূষণ ও মৃত্তিকা

পৃথিবীকে বলা হয় 'সর্বংসহা' (সবকিছু সহ্যকারিণী)। পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে কথাটির তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। শিল্প-কারখানা, যানবাহন, বাসস্থান, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস থেকে মৃত্তিকা প্রতিনিয়ত বর্জ্য গ্রহণ করে চলেছে। বোঝাই মাত্রাতিরিক্ত না হলে মৃত্তিকা সেসব বর্জ্যকে অতি দক্ষতার সাথে আত্মস্থ করে নেয়। এমনকি কখনো কখনো বর্জ্যকে সম্পদেও রূপান্তরিত করে। তবে, বোঝাই খুব বেশি হলে মৃত্তিকার ধারণকৃত বর্জ্যও পরিবেশ দূষণের কারণ হতে পারে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মৃত্তিকার যে দক্ষতা তাতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে মৃত্তিকায় বসবাসকারী আণুবীক্ষণিক জীব; ঐসব জীব বর্জ্যকে ভেঙে নিরাপদ যৌগে রূপান্তরিত করে এবং প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে জীবগুলো নিজেদের খাবার তুলে নেয়। বস্তুত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আণুবীক্ষণিক জীবের ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে বর্তমানে নতুন কোনো পণ্য উৎপাদন কিংবা বাজারজাত করার আগে প্রথম বিবেচ্য বিষয় থাকে, পণ্যটির জৈবিক বিভাজন ঘটে কিনা এবং ঘটলে তার উৎপাদ পরিবেশের জন্য নিরাপদ কিনা। শস্য ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গ দমনের জন্য যেসব পেস্টিসাইড কৃষিজমিতে ব্যবহৃত হয় তার অধিকাংশগুলো জৈবিক বিভাজনীয়। ঐরূপ না হলে শস্য রক্ষা করতে গিয়ে

পরিবেশের যে ক্ষতি করা হত তার মূল্য শস্যের ক্ষতির তুলনায় হয়ত কম হত না। কীটনাশক DDT এর জৈবিক বিভাজন অতিশয় মন্থর। পদার্থটির ব্যবহার তাই বর্তমানে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে; একই কারণে CFC এর উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বর্জ্যের জৈবিক বিভাজন সবক্ষেত্রে নিরাপদ হয় না; অনেক সময় এতে পরিবেশ দূষণ সৃষ্টিও হতে পারে। যেমন, বায়ুহীন পরিবেশে SO_4^{2-} এর যে জৈবিক বিভাজন ঘটে (বিজারণ) তা থেকে H_2S উৎপন্ন হয়; H_2S একটি বিষাক্ত গ্যাস এবং বায়ু দূষক।

পরিবেশের বহু দূষক আছে যেগুলো মৃত্তিকায় প্রবেশ করে সম্পদে পরিণত হয়; যেমন SO_2, NO_x, CO প্রভৃতি। মৃত্তিকায় SO_2 সালফেটে, NO_x নাইট্রেটে এবং CO কার্বন ডাই-অক্সাইড তথা জৈবিক ভরে রূপান্তরিত হয়।

দূষক অপসারণে মৃত্তিকা যত দক্ষই হোক তার সীমাবদ্ধতাও আছে। যেসব ক্ষতিকর বর্জ্যের জৈবিক বিভাজন ঘটে না সেগুলো মৃত্তিকায় সঞ্চিত হতে থাকে এবং বহু উপকারী জীবাণু ধ্বংস করে চলে। উক্ত মৃত্তিকা থেকে দূষণ ক্রমেক্রমে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষিকাজে সে মৃত্তিকা ব্যবহৃত হলে দূষক মৃত্তিকা থেকে খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। ভারি ধাতুর বর্জ্য মৃত্তিকায় ফেলা হলে তাতে দূষণের ঐরূপ বিস্তার ঘটতে পারে।

৬.৩ মৃত্তিকায় কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা (disposal of solid wastes)

দূষণ উৎসের গুরুত্ব বিচারে পানি ও বায়ুর পর তৃতীয় স্থানে কঠিন বর্জ্য। মানুষের ক্রিয়াকর্মের ফলে কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয় এবং গৃহ, শিল্প-কারখানা, কৃষিকাজ ও খনি খনন এর প্রধান কয়েকটি উৎস। গৃহের বর্জ্য অসমসত্ত্ব তবে অন্য উৎসগুলোর বর্জ্য মোটামুটি সমসত্ত্ব। উপাদান, আর্দ্রতা ও তাপ উৎপাদন মান-এর (heating value) আলোকে কঠিন বর্জ্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা.

১. জঞ্জাল (garbage) : মাংস, শাক-সবজি, ফলমূল প্রভৃতি পচনশীল (putrefactive) বস্তুর প্রস্তুতি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় যে কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় তাকে জঞ্জাল বলে। জঞ্জালের আর্দ্রতা প্রায় 70% এবং এর তাপ উৎপাদন মান প্রায় 6×10^6 J /kg ।

২. আবর্জনা (rubbish) : আবর্জনা পচনশীল নয়, এটি দাহ্য কিংবা অদাহ্য হতে পারে; কাগজ, কাঠ, রাবার, চামড়া, প্রভৃতি দাহ্য এবং ধাতু, কাচ, চিনামাটির বর্জ্য প্রভৃতি অদাহ্য আবর্জনার অন্তর্গত কিছু দ্রব্য। আবর্জনার আর্দ্রতা কম, প্রায় 25% এবং এর তাপ উৎপাদন মান প্রায় 15×10^6 J/kg ।

৩. রোগ সংক্রান্ত বর্জ্য (pathological waste) : মৃত জীবজন্তু ও মানবদেহের বর্জ্য (যেমন, পায়খানা) এই শ্রেণির বর্জ্যঃ এর আর্দ্রতা প্রায় 85%, তাপ উৎপাদন মান প্রায় 2.5×10^6 J/kg এবং এতে দাহ্য উপাদান থাকে প্রায় 5% ।

৪. শিল্প বর্জ্য (industrial waste) : রাসায়নিক দ্রব্য, পেইন্ট, বালু, ধাতু, আকরিক প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট বর্জ্য, উড়া ভস্ম (fly-ash), নর্দমার কর্দম প্রভৃতি শিল্প বর্জ্যের অন্তর্গত এক একটি উপাদান।

৫. কৃষিজাত বর্জ্য (agricultural waste) : শস্যের অবশেষ ও পশু খামারের বর্জ্য কৃষিজাত কঠিন বর্জ্যের উপাদান।

৬. বিপজ্জনক বর্জ্য (hazardous waste) : তেজস্ক্রিয় পদার্থের বর্জ্য এবং উপরে বর্জ্যের যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে তা থেকে কিছু কিছু উপাদানকে পৃথক করে (যেমন, ভারি ধাতুর কর্দম (sludge), পেস্টিসাইড, ওষুধ প্রস্তুতকরণ শিল্পের কিছু বর্জ্য, কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ, এনজাইম, রোগ সৃষ্টিকারী বর্জ্য প্রভৃতি) 'বিপজ্জনক বর্জ্য' নামে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়; এদের ব্যবস্থাপনার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শিল্প-কারখানা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিগত কয়েক দশকে কাগজ, চামড়া, রাবার, প্লাস্টিক, ধাতব ও চিনামাটির সামগ্রী প্রভৃতি বস্তুর উৎপাদন বিপুল মাত্রায় বেড়ে গেছে। এতে উন্নত, অনুন্নত, সব দেশে কঠিন বর্জ্যের পরিমাণও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (USA) বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ বছরে চারশ মেগাটনের বেশি (400×10^9 kg) এবং মাথাপিছু বছরে এর উৎপাদন প্রায় এক টন (প্রতিদিন মাথাপিছু 2.7 kg); উক্ত বর্জ্য সংগ্রহ ও ধ্বংস করার জন্য দেশটিতে বছরে খরচ হয় প্রায় ছয় বিলিয়ন (6×10^9) ডলার। উন্নয়নশীল দেশে বর্জ্যের পরিমাণ যেমন কম তেমনি তার গঠনও ভিন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে কোলকাতা ও ইউরোপের টিপিক্যাল একটি শহরে যে বর্জ্য সৃষ্টি হয় তাদের গঠন তুলনা করা যেতে পারে (% ওজন):

	কাগজ	পচনশীল বস্তু	ধুলা ভস্ম	ধাতু	কাচ	বয়ন	চামড়া, প্লাস্টিক, রাবার	পাথর, কাঠ	ঘনত্ব, kg/m^3
কোলকাতা	0.14	47.2	33.6	0.66	0.24	0.28	1.54	·17	540
ইউরোপীয় শহর	27	30	16	7	11	3	3	3	132

[**সূত্র** : 1. Report of the Committee of Urban Wastes, Govt. of India, Dec. 1975; 2. Management of Solid Wastes in Developing Countries, WHO, 1976.]

৬.৩.১ কঠিন-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য : কঠিন-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য দুটি- জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সম্পদ পুনরুদ্ধার (অর্থনৈতিক)। জনস্বাস্থ্যের উপর কঠিন বর্জ্যের প্রভাব কি তা সরাসরি প্রমাণ করা কঠিন তবে বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সঠিক না হলে পরিবেশে যেমন দূষণ সৃষ্টি হয় তেমনি জনস্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব পড়ে। জনস্বাস্থ্যের

যে ক্ষতি হয় তার প্রধান কারণ মশা, মাছি, ইঁদুর, প্রভৃতি রোগজীবাণু বাহক কীটপতঙ্গ ও প্রাণীর বংশ বিস্তার। আমাদের এই উপ-মহাদেশে আমাশয়, ডায়রিয়া প্রভৃতি যেসব রোগের প্রায়ই প্রাদুর্ভাব ঘটে, এমন কি কখনো কখনো মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে, মাছি সেসব রোগজীবাণুর প্রধান বাহক। মাছি আমাদের খাদ্য ও পানিতে রোগ জীবাণু ছড়ায় এবং সেখান থেকে তা আমাদের দেহে স্থান পায়।

কঠিন বর্জ্যের মাঝে (বিশেষ করে, গার্হস্থ্য বর্জ্যে) এমন বহু উপাদান থাকে যা ইঁদুর ও অন্যান্য তীক্ষ্ণদন্তী ছোট ছোট প্রাণীর (rodent) খাবার; বর্জ্যের স্তূপে তাই এসব প্রাণীর দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং পারিপার্শ্বিক জনবসতিতে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ইঁদুর সম্পদের যেমন ক্ষতি করে তেমনি মানুষকে দংশন করে এবং প্লেগ, টাইফাস (typhus), সালমোনেলোসিস, ট্রাইকিনোসিস (trichinosis) প্রভৃতি রোগের বিস্তার ঘটায়।

বিপজ্জনক (hazardous) বর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এদের কোনো কোনোটির প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক আবার কিছু কিছু উপাদান থাকে যাদের সংস্পর্শে বহুদিন অবস্থান করলে স্বাস্থ্যের মারাত্মক অনুভমুখী ক্ষতি হয়। বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সঠিক না হলে তা শস্য ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় দূষণ ঘটায় এবং জীব ও সম্পদের বিরাট ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধন করে।

কঠিন বর্জ্যের ক্ষতিকর আর একটি দিক, এটি পরিবেশের সৌন্দর্য নষ্ট করে; বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হলে তাতে পরিবেশ যেমন কুৎসিত হয় তেমনি বর্জ্য-ধোয়া পানি জলাশয়ের পানিতে এমনকি ভূগর্ভস্থ পানিতেও দূষণ ঘটায়।

'বর্জ্য' বলতে এমন কিছু বস্তুকে বুঝায় যা অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক বলে ফেলে দেয়া হয় তবে বর্জ্যকে যথোপযুক্ত প্রক্রিয়ায় আবার সম্পদে পরিণতও করা যায়। কঠিন বর্জ্যের জৈবিক বিভাজনীয় (bio-degradable) ভগ্নাংশ থেকে সার উৎপাদন (কমপোস্ট) ও নিম্নভূমি ভরাটকরণে কঠিন বর্জ্যের ব্যবহার, কঠিন বর্জ্যের গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রয়োগ; পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নত, বহুদেশে কঠিন বর্জ্য উক্ত কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, কঠিন বর্জ্যের যেসব উপাদান পচনশীল কিংবা জৈবিক বিভাজনীয় নয় (যেমন, ধাতব পদার্থ, কাচ, কাগজ, রাবার, প্লাস্টিক প্রভৃতি) সেগুলো পৃথক করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবার তাদের সম্পদে ও শক্তির উৎসে পরিণত করা যেতে পারে। জৈবিক অবিভাজনীয় কিংবা অপচনশীল কঠিন বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার উক্ত ব্যবস্থাকে বর্জ্যের রি-সাইক্লিং (recycling) বলে। রি-সাইক্লিং ব্যবস্থাটি ধারণা হিসেবে আকর্ষণীয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি এতই ব্যয়বহুল হয় যে বাস্তবে তা প্রয়োগ করা যায় না (যেমন, টুকরো কাচ থেকে কাচের সামগ্রী তৈরি করার চেয়ে কাঁচামাল থেকে কাচের সামগ্রী তৈরি করার খরচ কম)। তবে, বর্জ্যের প্রাথমিক যে উৎস সেখান থেকেই যদি বিভিন্ন শ্রেণীর বর্জ্যকে পৃথক করে সংগ্রহ করা যায় তাহলে ব্যবস্থাটি অনেকক্ষেত্রে লাভজনক হতে পারে।

৬.৩.২ কঠিন-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি (disposal methods of solid wastes) :কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় তিনটি ধাপ সংশ্লিষ্ট থাকে; যথা, বর্জ্য সংগ্রহকরণ, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বর্জ্যের নিরাপদ স্থাপন। কঠিন বর্জ্যের প্রধান উৎস দুটি মিউনিসিপ্যালিটি (প্রধানত গার্হস্থ্য বর্জ্য ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা) এবং শিল্পকারখানা। উৎস যাই হোক, বর্জ্য সংশ্লিষ্ট স্থানের সন্নিকটে নির্দিষ্ট একটি স্থানে প্রথমে জমা করা হয়। অনুন্নত দেশে এ কাজে সাধারণত কংক্রিট নির্মিত ট্যাংক ব্যবহৃত হয়। জনবসতির ঘনত্বভেদে ট্যাংকগুলো 50-500 মিটার দূরে দূরে স্থাপিত থাকে। ব্যবস্থাটির বেশকিছু দুর্বল দিক আছে; যেমন ট্যাংক থেকে বর্জ্য তুলে নিতে প্রচুর শ্রম ব্যয় হয় এবং এসব কাজে যারা জড়িত থাকে, বর্জ্য থেকে তাদের দেহে রোগজীবাণু সরাসরি সংক্রমিত হতে পারে। স্থায়ী কংক্রিট ট্যাংকের পরিবর্তে ভরক ট্রাক (packered truck) অথবা ধারক ট্রাক (container truck) বর্জ্য সংগ্রহের অনেক বেশি উন্নততর ব্যবস্থা। এসব ট্রাকের ধারণ ক্ষমতা চার/পাঁচ টন এবং বর্জ্য ঘন-বিন্যস্ত করার (compaction) যান্ত্রিক ব্যবস্থা এতে সংযোজিত থাকে। ট্রাক থেকে বর্জ্য যান্ত্রিক উপায়ে ইঞ্জিন চালিত ট্রেলার-এ (trailer: আনুগমিক চাকা লাগানো ভ্যান) স্থানান্তরিত করে ব্যবস্থাপনার স্থানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিটি ট্রেলারের ধারণ ক্ষমতা থাকে প্রায় কুড়ি টন এবং তাতেও বর্জ্য ঘনবিন্যস্ত করার ব্যবস্থা থাকে।

বর্জ্য চূর্ণীকরণ (grinding) : ট্রেলার থেকে বর্জ্য যান্ত্রিক উপায়ে চূর্ণীকরণ যন্ত্রে (crusher) স্থানান্তর করে তাকে গুড়া করা হয়। চূর্ণীকৃত বর্জ্যের যেসব উপাদান ভারি সেগুলো সহজে মাটিতে নেমে যায়। এতে নিম্নভূমি দ্রুত ভরাট হতে পারে। তাছাড়া অচূর্ণ বর্জ্যের সাথে তুলনায় চূর্ণ বর্জ্য অপেক্ষাকৃত কম জায়গা জুড়ে থাকে; ফলে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভূমির সাশ্রয় হয়।

কঠিন-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি : কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চারটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে; যথা: ক. উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য ফেলা, খ.স্বাস্থ্যসম্মত মাটি ভরাটকরণ, গ. কম্পোস্টিং (composting) ও ঘ. বর্জ্য ভস্মকরণ (incineration)। নিম্নে পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো।

ক. মুক্তস্থানে বর্জ্য ফেলা (open-dumping of wastes) : পদ্ধতিটিতে খরচ সবচেয়ে কম এবং এর জন্য কোনো পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়না। বর্জ্য ফেলার জন্য জনবসতি অঞ্চল থেকে সাধারণত দূরে কোথাও একটি নিম্নভূমি বেছে নেয়া হয়। ব্যবস্থাটি অস্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ দূষক; মশা, মাছি, ইঁদুর ও অন্যান্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের বংশবিস্তার ঘটার জন্য এটি বিশেষ অনুকূল। বর্জ্য পচে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং দূষণ সৃষ্টি করে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যতগুলো পদ্ধতি প্রচলিত আছে, জনস্বাস্থ্যের বিচারে এটি নিকৃষ্ট; অনুন্নত দেশে ব্যবস্থাটির প্রচলন ব্যাপক।

খ. স্বাস্থ্যসম্মত ভূমি ভরাটকরণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (sanitary landfill method of waste disposal) : ভূমি ভরাটকরণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি জৈবিক পদ্ধতি। জৈব

বস্তুর জৈবিক বিভাজন ব্যবস্থাটির মূলনীতি, এটি স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশের দৃশ্যত কোনো ক্ষতি এতে ঘটে না। একটি ভূমিখণ্ডের ছোট একটি আয়তনের মাঝে আবর্জনা (refuse) ছড়িয়ে চাপ দিয়ে তাকে পাতলা পাতলা স্তরে সাজানো হয়। স্তরে সজ্জিত আবর্জনার এরূপ এক একটি অংশকে 'কোষ' (cell) বলে । আবর্জনার ঘন-বিন্যাস (compaction) যাতে যথাযথ হতে পারে সেজন্য কোষ দুই মিটারের বেশি পুরু হওয়া উচিত নয়। আবর্জনা কোষের উপর মাটি সুষমভাবে ছড়িয়ে চাপ প্রয়োগে এমন একটি প্রলেপ তৈরি করতে হয় যাতে প্রলেপের পুরুত্ব 20-cm এর কাছাকাছি থাকে। তবে, আবর্জনা খুব অসম হলে মৃত্তিকার প্রলেপ কিছুটা বেশি পুরু এবং আবর্জনা চূর্ণীকৃত ও সুষম হলে প্রলেপ 15 cm এর কম হলেও চলে। এভাবে কোষের উপর সাজানো কোষ যখন চাহিদা মতো উচ্চতায় পৌঁছে তখন তার উপর চাপামাটির প্রায় এক মিটার পুরু আর একটি প্রলেপ দেয়া হয়। সবচেয়ে উপরের প্রলেপটি অত পুরু করার কারণ, ইঁদুরের মতো তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণী (rodent) এতে গর্ত খুঁড়ে আবর্জনা কোষে ঢুকতে পারে না। ভূমি ভরাটকরণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আবর্জনা যেভাবে সাজানো হয়, কোষগুচ্ছের আড়াআড়িভাবে কর্তিত একটি অংশের চিত্র (cross–sectional area view) দ্বারা তা দেখানো হলো (চিত্র ৬.১)।

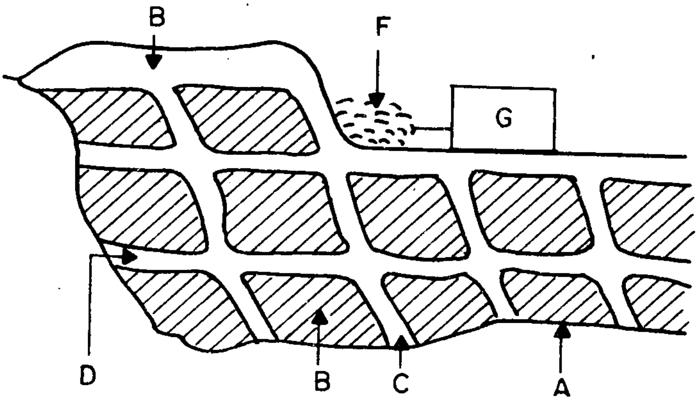

A. মূলভূমি, B. কোষ, C. মৃত্তিকার দৈনিক ঢাকনা, D. মৃত্তিকার অন্তর্বর্তী ঢাকনা, E. মৃত্তিকার সর্বশেষ ঢাকনা, F. চলমান কাজ, G. বুলডোজার

চিত্র ৬.১ : কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্বাস্থ্যসম্মত ভূমি ভরাটকরণ পদ্ধতি।

ভূমি ভরাটকরণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আবর্জনার যে পরিবর্তন ঘটে তা মোটামুটি পাঁচটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় বর্জ্যে যেসব জৈব বস্তু থাকে তাদের বিভাজন (জারণ) ঘটে। এ সময় আবর্জনা কোষে অক্সিজেন শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং ব্যাকটেরিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাতে কোষের

তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এই পর্বে জৈব পদার্থ থেকে বেশ কিছু জৈব অম্ল সৃষ্টি হয় এবং মৃত্তিকায় যেসব ব্যাকটেরিয়া ও ফাঞ্জি (fungi) থাকে তারা ঐসব অম্লকে CO_2 ও পানিতে বিভাজিত করে। দ্বিতীয় পর্বে বায়ুহীন পরিবেশে কোষে CO_2 ও H_2 উৎপন্ন হয়। তৃতীয় পর্বে মিথেন উৎপাদী ব্যাকটেরিয়া (Methano- bacteria) ক্রিয়াশীল হয় এবং CH_4 গ্যাস উৎপন্ন হতে থাকে। চতুর্থ পর্বে মিথেন উৎপাদন প্রক্রিয়া স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং পঞ্চম পর্বে মিথেন উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। পঞ্চম পর্বের শেষে আবর্জনায় জৈব পদার্থ শেষ হয়ে যায় এবং ভরাট ভূমিতে অক্সিজেন প্রবেশ করে তাকে আবার অক্সিজেন সমৃদ্ধ করে তোলে। যাহোক, উপরে যে পর্ব গুলোর কথা বলা হলো, আবর্জনার প্রকৃতি ও বিদ্যমান পরিবেশের আলোকে তাদের প্রত্যেকটির ক্রিয়াকাল ও বর্জ্য বিভাজনের মাত্রা নির্ধারিত হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্বে যেসব গ্যাস উৎপন্ন হয় তার একটি পরিলেখ (profile) নিম্নে দেখানো হলো (চিত্র ৬.২)।

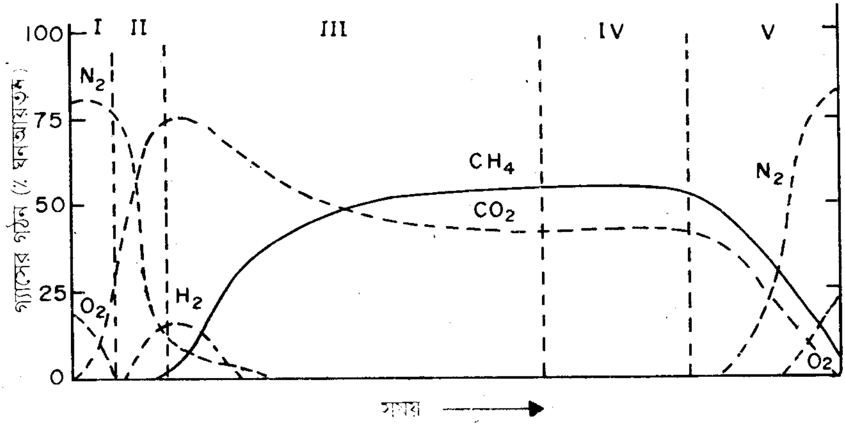

চিত্র ৬.২ : ভূমি ভরাটকরণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উৎপন্ন প্রধান প্রধান গ্যাস।

[সূত্র: A Basic Study of Landfill Microbiology and Biochemistry, Dept. of Energy. ETSU B 1159, UK, 1988.]

তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের যে উৎপাদ তা প্রধানত CO_2 ও CH_4 তবে তার সাথে সামান্য পরিমাণ H_2S, NH_3 ও পানি উৎপন্ন হয়। ভূমি ভরাটকরণ পদ্ধতির প্রথম বছর কোষে N_2 এর পরিমাণ হ্রাস পায় কেননা মৃত্তিকা প্রলেপ ভেদ করে বায়ু কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আবর্জনা কোষ গঠনের প্রায় 200 দিন পর থেকে CH_4 এর উৎপাদন শুরু হয় (৩য় পর্ব) তবে চতুর্থ পর্বে এসে তা কিভাবে চলবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। যাহোক, CH_4 এর পরিমাণ 5% এর বেশি হলে তাতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে তাই মাটি দিয়ে ঢাকা আবর্জনার স্তূপে গ্যাস

নির্গমনের ব্যবস্থা রাখতে হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভূমি ভরাটকরণ পদ্ধতিতে যে CH_4 গ্যাস উৎপন্ন হয় তা শক্তির সমৃদ্ধ একটি উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে; সম্ভাবনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভূমি ভরাটকরণ পদ্ধতি উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য ফেলা (ক) ব্যবস্থার তুলনায় প্রায় সবদিক দিয়ে উন্নততর। তবে এরও কিছু কিছু দুর্বল দিক আছে; যেমন, মূল বর্জ্যে যদি Ca, Mg, Fe, Cd, Pb, Zn প্রভৃতি ধাতু থাকে তাহলে মূল বর্জ্য কিংবা বিভাজিত বর্জ্য থেকে সেসব ধাতু বৃষ্টির পানিতে ধৌত হয়ে জলাশয়ে মিশতে পারে এমনকি মাটির স্তর চুয়ে তা ভূগর্ভস্থ পানিতেও প্রবেশ করতে পারে। এসব ধাতু একদিকে যেমন পানির খরতা বৃদ্ধি করে তেমনি পানিতে ভারি ধাতুর দূষণ ঘটায়। বস্তুত, বর্জ্য দ্বারা ভরাটকৃত ভূমি কৃষি কাজের জন্য ব্যবহার করা যায় না কেননা বর্জ্য থেকে স্থানান্তরিত ধাতু শস্যের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং ধাতু যদি বিষাক্ত হয় (যেমন, Pb, Cd, Cr প্রভৃতি) তাহলে ভোক্তার শরীরে তাতে মারাত্মক বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। বর্জ্য দ্বারা ভরাটকৃত ভূমি তাই সাধারণত পার্ক, খেলার মাঠ, গলফ খেলার প্রান্তর প্রভৃতি তৈরি করার জন্য কেবল ব্যবহৃত হয়।

ভূমি ভরাটকরণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্থান নির্বাচন : (১) জমি সস্তা ও সহজগম্য এবং এর অবস্থান বাণিজ্যিক ও জনবসতি এলাকা থেকে কমপক্ষে 1.5 km দূরে বায়ু প্রবাহের বিপরীতে হতে হবে।

(২) ভূমির আয়তন এমন হতে হবে যেন অন্তত তিন বছর তা ব্যবহার করা যায়;

(৩) স্থানটিতে মাটির প্রবেশ্য-ক্ষমতা (permeability) নিম্ন হতে হবে এবং

(৪) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানি যে স্তরে সাধারণত অবস্থান করে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্থানটি তার থেকে অনেক বেশি উঁচুতে অবস্থিত হতে হবে।

গ.কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কম্পোস্টিং (compositing) **পদ্ধতি** : বায়ুজীবী (aerobic) ও তাপসহ (thermophilic) আণুবীক্ষণিক জীবের ভূমিকায় আবর্জনার (refuse) মাঝে বিদ্যমান জৈব বস্তুর বিভাজন ঘটাকে আবর্জনার কম্পোস্টিং বলে; প্রক্রিয়াটিতে জৈব বস্তু স্থিতিশীল হিউমাস-সদৃশ একটি বস্তুতে রূপান্তরিত হয়।

কম্পোস্ট (compost) মৃত্তিকার রূপান্তর ঘটায়; এর আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা প্রবল। কম্পোস্টিং প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া এবং প্রথম সপ্তাহের পর থেকে ফাঞ্জি জৈবিক বিভাজনে অংশ নেয়; একটিনোমাইসিট এতে সহায়তা প্রদান করে। কম্পোস্টিং দুটি পর্বে ঘটে। প্রথম পর্বে, স্বাভাবিক তাপসহ কিছু বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া আবর্জনার জৈববস্তুকে CO_2-এ জারিত করে। প্রক্রিয়াটি তাপ-উৎপাদী তাই এ সময় আবর্জনার তাপমাত্রা প্রায় 45°C পর্যন্ত উঠে যায়। দ্বিতীয় পর্বে, তাপসহ কিছু ব্যাকটেরিয়া জৈব বস্তুর বিভাজন ঘটায় এবং তাপমাত্রা প্রায় 60°C পর্যন্ত উন্নীত হয়। কম্পোস্টিং এর সময় আবর্জনার স্তূপকে মাঝে মাঝে (সপ্তাহে অন্তত দুবার) ওলট

পালট করে দিতে হয় যাতে আবর্জনা সর্বদা অক্সিজেনের সংস্পর্শে থাকে এবং ব্যাকটেরিয়া পুরাপুরি দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। কম্পোস্ট তৈরি হতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে এবং সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পর আবর্জনার তাপমাত্রা আবার হ্রাস পেতে থাকে। বস্তুত, কম্পোস্টিং প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া কম্পোস্টিং সম্পূর্ণ হওয়ার একটি নির্দেশক। আবর্জনা যখন কম্পোস্টে পরিণত হয় তখন মেটে গন্ধযুক্ত কালো বাদামি রং এর একটি বস্তুতে আবর্জনার রূপান্তর ঘটে।

কম্পোস্ট তৈরির সর্বোত্তম (optimum) **শর্ত** :

১. তাপমাত্রা: 40 - 50°C; তাপমাত্রা 60°C অতিক্রম করলে ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতা লোপ পায়;

২. pH : 4.5 – 9.5; pH 8.5 এর নিচে রাখা ভাল কেননা উচ্চতর pH-এ N-যৌগ NH_3 গ্যাস আকারে উবে যেতে পারে;

৩. আর্দ্রতা: 55% তবে 40 - 70% অনুকূল আর্দ্রতা;

৪. আবর্জনা কণার আকৃতি (size): 0.63 – 2.54 cm ;

৫. বায়ু: 0.5 – 0.8 mg / প্রতিদিন / প্রতি কেজি কম্পোস্ট ;

৬. কার্বন -নাইট্রোজেন অনুপাত: (35 - 50) : 1 ;

৭. কার্বন-ফসফরাস অনুপাত: 100 : 1 ।

কম্পোস্টিং দুইভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে : যথা. প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক (mechanical)। উভয় প্রকার কম্পোস্টিং এর আবার বেশকিছু সংস্করণ প্রচলিত আছে এবং সংস্করণগুলোর একটি অপরটি থেকে কিছুটা ভিন্ন হয় তবে তাদের মৌলিক নীতি প্রায় একই থাকে।

আবর্জনা থেকে কাচ, ধাতব পদার্থ প্রভৃতি পৃথক করে সবজির বর্জ্যকে টুকরা টুকরা করা হয় এবং পরে প্রায় 1.5 মিটার গভীর একটি পরিখার (trench) মাঝে অথবা ভূমির উপরে সবজির টুকরা ও পায়খানা / নর্দমার ময়লা (night soil) একটির পর অপরটি স্তরে স্তরে সাজানো হয়। প্রতিটি স্তর 2-3 ইঞ্চি পুরু থাকে এবং সপ্তাহে দুবার তা ওলট-পালট করে দিতে হয়, যাতে আবর্জনা সর্বদা বায়ুর সংস্পর্শে থাকে। পায়খানা ও ময়লা ব্যাকটেরিয়ার পুষ্টি উপাদান হিসেবে কাজ করে। আবর্জনা এভাবে দুই তিন মাস রেখে দিলে তা কম্পোস্টে পরিণত হয়; পরে স্তূপটি আরও প্রায় একমাস স্থিরভাবে (ওলট পালট না করে) রেখে দিতে হয়। মোট প্রক্রিয়ায় প্রায় চার মাস সময় লাগে।

কম্পোস্ট কৃষি জমির উত্তম একটি সার এবং মৃত্তিকার একটি রূপান্তরকারক (soil conditioner); এর আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা ও CEC উচ্চ। এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বহু ইউরোপীয় দেশে কম্পোস্ট কৃষি জমিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশে বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টির পানি যখন ভূমির উপর দিয়ে প্রবল বেগে নেমে যায় তখন তাতে প্রচুর ভূমি-ক্ষয় হয় এবং কৃষিজমির

হিউমাস ও উদ্ভিদের বহু পুষ্টি উপাদান ধুয়ে যায়; কম্পোস্ট উক্ত ভূমি ক্ষয় ও পুষ্টি উপাদানকে অনেকাংশে পূরণ করে; কম্পোস্ট সহজে ধুয়ে যায় না। হল্যান্ডে কম্পোস্টের ব্যবহার এতই ব্যাপক যে, মিউনিসিপ্যাল বর্জ্যের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তবে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কম্পোস্টের ব্যবহার খুবই কম। কেননা, রাসায়নিক সার সেখানে সস্তা এবং কৃষিজমিও উর্বর। তাছাড়া, জমিতে কম্পোস্ট প্রয়োগ করা, রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার মতো সহজ নয়।

কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনায় কম্পোস্টিং পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ আর একটি সুবিধা, আবর্জনা থেকে জৈবিক অবিভাজনীয় যে ভগ্নাংশ পৃথক করা হয়, রিসাইক্লিং ব্যবস্থায় তাকে সম্পদে রূপান্তরিত করা যেতে পারে অথবা রি-সাইক্লিং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অলাভজনক হলে ভূমি বা অন্যকোথাও অপেক্ষাকৃত কম আয়তনের মাঝে তার ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ঘ. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভস্মকরণ পদ্ধতি (incineration for solid waste disposal): নিয়ন্ত্রিত উচ্চতাপে (750-980°C) পুড়িয়ে কঠিন বর্জ্যকে ধ্বংস করা ভস্মকরণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতি। বর্জ্য পোড়ানোর ফলে জৈব বস্তু ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ ধ্বংস হয় এবং কাচ, ধাতু ও আংশিক দগ্ধ কিছু দাহ্য পদার্থ 'অবশেষ' (residue) হিসেবে থাকে; এভাবে যে 'অবশেষ' উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ কঠিন বর্জ্যের মোট যে পরিমাণ তার প্রায় 25% এ নেমে আসে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভূমি-ভরাটকরণ (land-fill) পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত একটি স্থান গ্রহণযোগ্য দূরত্বের মাঝে খুঁজে পাওয়া না গেলে সাধারণত বর্জ্য ভস্মকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পদ্ধতিটির সুবিধা অসুবিধা দুটি দিকই আছে।

ভস্মকরণ পদ্ধতির সুবিধা: ১. বর্জের আয়তন হ্রাস পায় ফলে 'অবশেষ' এর ব্যবস্থাপনা খরচ কমে যায় এবং অপেক্ষাকৃত কম ভূমি- আয়তনের মাঝে (প্রায় এক তৃতীয়াংশ) তার ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়;

২. পদ্ধতিটি সঠিকভাবে সম্পাদিত হলে পচনশীল বর্জ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং পরিবেশ তার দূষণ থেকে রক্ষা পায়।

ভস্মকরণ পদ্ধতির অসুবিধা : পদ্ধতিটিতে খরচ বেশি; প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পাদিত না হলে, বায়ুদূষণ ঘটতে পারে;তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ ভস্মকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ভস্মকরণ পদ্ধতি যতই আকর্ষণীয় হোক, খরচ বেশি পড়ে বলে ব্যবস্থাটি যথেষ্ট জনপ্রিয় নয়। এটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে টেকসই (viable) হতে হলে যন্ত্রে এমন কিছু ব্যবস্থা যুক্ত থাকতে হবে যাতে উৎপন্ন তাপশক্তিকে পুনরুদ্ধার করে অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়; উক্ত তাপশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, ঘর গরম করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬.৩.৩ বিপজ্জনক বর্জ্য ও তার ব্যবস্থাপনা (hazardous wastes and their disposal) : যে কোনো বর্জ্য যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কিংবা পরিবেশের জন্য ভয়ের কারণ হতে পারে তাই বিপজ্জনক। সংজ্ঞাটির পরিধি এতই বিস্তৃত যে, খুব কম সংখ্যক বর্জ্য এ শ্রেণী থেকে বাদ যেতে পারে। তালিকাটিকে সংকুচিত করার লক্ষ্যে USEPA কর্তৃক বিপজ্জনক বর্জ্যের একটি সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যা এরূপ:

কোনো বর্জ্য বা বর্জ্যের মিশ্রণ বেঠিকভাবে হস্তক্ষেপ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, বর্জন অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনা করার ফলে তা যদি পরিমাণ, ঘনমাত্রা অথবা ভৌত-রাসায়নিক অথবা সংক্রামক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটায় অথবা মৃত্যুহারকে বাড়িয়ে দেয় অথবা মারাত্মক অনুভমুখী অথবা অক্ষমতা সৃষ্টিকারী অনুভমুখী অসুস্থতা সৃষ্টি করে অথবা বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের জন্য মানুষের স্বাস্থ্য অথবা পরিবেশের জন্য বিরাট ভয়ের কারণ হয় তাহলে সে বর্জ্য বা বর্জ্য-মিশ্রণ 'বিপজ্জনক' (hazardous) হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত সংজ্ঞানুসারে, ইলেকট্রোপ্লেটিং শিল্পে বর্জ্য-পানির পরিশোধন ব্যবস্থায় সৃষ্ট কর্দম (sludge), গ্রিজ-অপসারক (degreasing) হিসেবে ব্যবহৃত হ্যালোজেনযুক্ত দ্রাবক (যেমন, ট্রাইক্লোরোইথিলিন, মিথাইলিন ক্লোরাইড প্রভৃতি), ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রাবক (যেমন, জাইলিন, এসিটোন, ইথাইল বেনজিন, ইথাইল ইথার, প্রভৃতি), প্রেট্রোলিয়াম শোধনাগারের কর্দম, কোক চুল্লি ও ব্লাস্ট চুল্লির গ্যাস পরিশোধনে সৃষ্ট কর্দম, তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বর্জ্য 'বিপজ্জনক' শ্রেণীর অন্তর্গত এক একটি বর্জ্য। নিচে কয়েকটি শ্রেণী বিপজ্জনক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. প্রাণ-চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বর্জ্য ও তার ব্যবস্থাপনা (biomedical wastes and their disposal): প্রাণ-চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বর্জ্যের উৎস হাসপাতাল, ক্লিনিক, গবেষণা ও পরীক্ষাগার এবং ওষুধ তৈরির কারখানা। এ জাতীয় বর্জ্যের তালিকা বিরাট; যেমন, রোগ ও শল্যচিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য; পরীক্ষণীয় জন্তু ও তাদের মৃতদেহ; ওষুধ, রাসায়নিক দ্রব্য ও দ্রব্য সংরক্ষণ পাত্রের বর্জ্য; পরিত্যক্ত ব্যান্ডেজ, লিনেন ও অন্যান্য সংক্রামক বর্জ্য; পরিত্যক্ত সিরিঞ্জ, সুচ ও শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি; অকেজো যন্ত্রপাতি; অকেজো যন্ত্র; খাবার ও অন্যান্য বর্জ্য, প্রভৃতি।

প্রাণ-চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বর্জ্য যারা সৃষ্টি করেন তাদেরই দায়িত্ব সেসব বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে USEPA (1985) প্রবর্তিত বিধি অনুসারে প্রাণ-চিকিৎসা বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পাদিত হয়। চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাধারণ পদ্ধতি, দাহ্য কঠিন বর্জ্য, প্রতিষ্ঠান যেখানে অবস্থিত, তার সীমানার মাঝে (on-site) উচ্চতাপ ভস্মকারক যন্ত্রে (incinerator) পুড়িয়ে ফেলা। যন্ত্রে বিশেষ একটি চুল্লি (burner) যুক্ত থাকে যাতে বহির্গামী গ্যাস 700°C তাপ মাত্রায় উত্তপ্ত করা যায়; ঐরূপ তাপে বহির্গামী গ্যাসের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। ভস্মকারক যন্ত্রে যে 'অবশেষ' (residue) পড়ে থাকে তার ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করতে হয়। এ

ব্যাপারে 'স্বাস্থ্যসম্মত ভূমি ভরাটকরণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেসব প্রতিষ্ঠানে ভস্মকারক যন্ত্র নেই, তাদের উচিত ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বর্জ্য লেবেল আটা পাত্রে পৃথক পৃথকভাবে বোঝাই করে যেখানে যন্ত্রের সুযোগ আছে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া। বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক, অনেক অনুন্নত দেশে চিকিৎসা কেন্দ্রে ভস্মকারক যন্ত্র থাকে না এবং বর্জ্য সাধারণত উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয়।

২. বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (hazardous chemical wastes and waste-disposal): বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্যের তালিকা এক এক দেশে এক এক প্রকার কেননা একটি পদার্থকে 'বিপজ্জনক' হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করতে এক এক দেশ এক এক স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে। তবে, 'বিপজনক' হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একটি পদার্থের যেসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয় তাদের মাঝে পদার্থের বিষাক্ততা (toxicity), দাহ্যতা (inflammability), তেজস্ক্রিয়তা (radioactivity) এবং জৈবিক বিভাজনীয়তা (bio-degradability) সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা ও ইউরোপের বহুদেশে 'বিপজ্জনক বর্জ্যের' তালিকায় যেসব পদার্থ অন্তর্ভুক্ত আছে তাদের সংখ্যা বিশাল কিন্তু জাপানে এদের সংখ্যা বেশ কম। জাপানে মাত্র চার শ্রেণীর বর্জ্য 'বিপজনক' হিসেবে বিবেচিত হয়; যথা, কর্দম (sludges), মল (slag), অম্লীয় বর্জ্য এবং ক্ষারীয় বর্জ্য যা As, Cd, Cr (IV), Pb, Hg, CN^-, PCB's ও জৈব ফসফেট, এই বস্তুগুলোর যে কোনোটি গ্রহণযোগ্য মাত্রার ঊর্ধ্বে বহন করে। যাহোক, কঠিন একটি বিপজ্জনক বর্জ্য ও রাসায়নিক বস্তু বিভিন্ন পথে পরিবেশে প্রবেশ করে, যেমন, পার্শ্ববর্তী ভূমিতে চুয়ে যায়, চুয়ে পানি প্রবাহে মেশে , চুয়ে ভু-গর্ভস্থ পানিতে মেশে, বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে, বর্জ্য ভস্মকরণে উৎপন্ন গ্যাস বায়ুতে এবং 'অবশেষ' ভূমিতে মেশে এবং পরিবহণের সময় বর্জ্য বাইরে পড়ে যায় প্রভৃতি।

বিপজ্জনক অজৈব বর্জ্য (hazardous inorganic wastes): অজৈব পদার্থের মাঝে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক Hg, Cd, Pb, ও As এর মতো ভারি ধাতু / ধাতুকল্প; এগুলো ppb মাত্রায়ও জীবের জন্য এক একটি বিষ। পদার্থগুলো মৃত্তিকার জৈব বস্তুতে জমা হয় এবং সেখান থেকে উদ্ভিদ তথা খাদ্য শিকলে (food chain) প্রবেশ করে। এসব পদার্থ শরীরে একবার প্রবেশ করলে সেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসে না ফলে বিভিন্ন অঙ্গ ও কলায় এদের এমন ঘনীভবন ঘটে যে, বিষ-স্তরে পৌঁছে যায়। বিষাক্ত ধাতু জীবাশ্ম জ্বালানির (যেমন, কয়লা, সীসাযুক্ত গ্যাসোলিন) দহন থেকেও বায়ুমণ্ডলে স্থান পায় এবং বায়ুমণ্ডল থেকে বৃষ্টির পানির সাথে মিশে কিংবা খনি ও বর্জ্য দ্বারা ভরাটকৃত মৃত্তিকা থেকে চুয়ে জলাধারে মেশে। তাছাড়া, জমিতে সার হিসেবে অনেক সময় নর্দমার যে কর্দম ব্যবহার করা হয় তা থেকেও মৃত্তিকায় ভারি ধাতুর দূষণ সৃষ্টি হতে পারে। অম্ল বৃষ্টি ও উচ্চ ঘনমাত্রার CO_2 পানির pH কমিয়ে দেয়; এরূপ পরিস্থিতিতে পানি ও মৃত্তিকায় ভারি ধাতু যৌগের দ্রবীভবন ও সঞ্চারণ বৃদ্ধি পায়।

বিপজ্জনক জৈব বর্জ্য (hazardous organic wastes): জৈব পদার্থের মাঝে যেগুলো পরিবেশে বহুদিন টিকে থাকে (বিভাজন মন্থর) এবং চর্বিতে দ্রবণীয় সেগুলো সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক কেননা এসব পদার্থ একসময় খাদ্য-শিকলে ঢুকে পড়ে; পোলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (PCB) ও কিছু কিছু কীটনাশক (যেমন, DDT, ডায়ক্সিন, মিরেকস) এই শ্রেণীর অন্তর্গত পদার্থ। এসব পদার্থ তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী উভয় প্রকার বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ক্যান্সার ও পরিব্যক্তিত্ব (mutagenicity) সৃষ্টি করে বলেও সন্দেহ করা হয়। দুর্বিভাজনীয় এসব পদার্থের কোনো কোনোটি প্রাথমিক অন্য কোনো পদার্থের বিভাজন থেকে অথবা জৈব ক্লোরিন যৌগের দহন থেকেও সৃষ্টি হতে পারে; মিউনিসিপ্যাল কঠিন বর্জ্যের ভস্মকরণ, জৈব যৌগ ও জীবাশ্ম জ্বালানির দহন থেকেও অনেক সময় বিষাক্ত জৈব ক্লোরিন যৌগ উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থের মাঝে বিরাট একটি সংখ্যক থাকে যা ধুলা ও উড়া ভস্মে (fly-ash) পরিশোষিত হয়ে বায়ুমণ্ডলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

ভূ-গর্ভস্থ পানির জন্য বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য (hazardous waste for groundwater): ভূগর্ভস্থ পানিতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চৌদ্দটি (১৪) মিশালকে (contaminant) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মিশালগুলোর মাঝে আটটি ধাতু (যথা, Hg, Cd, Cr, As, Pb, Ba, Se ও Ag), চারটি পেস্টিসাইড (যথা, এনড্রিন, লিনডেন, মেথক্সিক্লোর ও টকসাফিন) এবং দুটি গুল্মনাশক (যথা, 2,4-D ও 2,4,5-TP)। পানীয় পানির জন্য এসব মিশালের সহনীয় যে মাত্রা, ভূগর্ভস্থ পানিতে মিশালগুলোর কোনোটি যখন সে মাত্রার কমপক্ষে একশ গুণের বেশি থাকে তখন ভূপৃষ্ঠের বর্জ্য ভূগর্ভস্থ পানির জন্য 'বিপজ্জনক' বলে গণ্য হয়। ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন বর্জ্য ভূ-গর্ভস্থ পানির জন্য বিপজ্জনক কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য 'নিষ্কাশন প্রণালি বিষাক্ততা পরীক্ষা'(EP) নামে একটি পরীক্ষা প্রচলিত আছে। কমপক্ষে, 100g কঠিন বর্জ্যের মাঝে তার ১৬ গুণ আয়ন-মুক্ত পানি মিশিয়ে এবং মিশ্রণটির pH 5.0-এ নিয়ন্ত্রিত রেখে ২৪ ঘণ্টা যাবৎ সেটি অবিরাম আলোড়িত হয়। উক্ত মিশ্রণের চুয়ে পড়া পানিতে (leachate) উল্লিখিত ১৪ টি পদার্থ নির্ণয় করে যদি তাদের কোনো একটিরও ঘনমাত্রা, পানীয় পানির জন্য পদার্থটির যে সহনীয় মাত্রা, তার কমপক্ষে একশ গুণ বেশি পাওয়া যায় তাহলে ভূপৃষ্ঠের কঠিন বর্জ্য ভূগর্ভস্থ পানির জন্য বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হয়।

বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা (management of hazardous wastes) : বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পর্যায় দুটি – প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্দেশ্য, বর্জ্য থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার ও বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তার পরিমাণ কমানো এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য, অবশিষ্ট বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা যাতে পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি হতে না পারে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

১ .যেসব কারখানায় বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপন্ন হয় সেখানে কারখানার সীমানার মাঝে (on-site) বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য বিরাট ট্যাংক বা বেসিন এবং ক্ষয়কারক পদার্থের জন্য ক্ষয়-প্রতিরোধক ড্রাম থাকবে; কারখানা থেকে বর্জ্য সেসব পাত্রে সংরক্ষণ করতে হয়।

২. লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংরক্ষিত উক্ত বর্জ্য উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্যে (যেমন ট্যাংকার ট্রাক, রেল প্রভৃতি) ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে অথবা বর্জ্য স্থাপনের শেষ কেন্দ্রে নিয়ে যাবে।

বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ (treatment): বর্জ্যের পুন:ব্যবহার কিংবা বর্জ্য থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার অলাভজনক হলে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পর তা নির্ধারিত স্থানে ফেলে দেয়া হয় (যেমন, মাটি ভরাটকরণ)। বর্জ্য কম বিপজ্জনক হলে কোনো কোনো দেশ তা সরাসরি ফেলে দেয়; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কম বিপজ্জনক বর্জ্যের প্রায় ৪0% কারখানার সীমানার মাঝে অগভীর হ্রদে (lagoon) অথবা নিম্নভূমিতে জমা হয়ে থাকে; এতে নিম্নভূমি একদিন ভরাট হয়ে যায়। যাহোক, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য, বিষাক্ত বর্জ্যকে কম বিষাক্ত বা নিরাপদ বর্জ্যে পরিণত করা। প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে; যেমন,

১. ভৌত পদ্ধতি: সেন্ট্রিফিউজকরণ, তলানিফেলা, ফিল্টারকরণ প্রভৃতি; এতে তরল উপাদান কঠিন উপাদান থেকে পৃথক হয়।

২. রাসায়নিক পদ্ধতি:

ক. জারণ; যেমন, সায়ানাইডকে (বিষ) সায়ানেটে রূপান্তরণ;

খ. বিজারণ; যেমন, SO_2 এর মতো একটি বিজারকের সাহায্যে বিষাক্ত Cr (VI) কে নির্বিষ Cr(III)-তে রূপান্তরণ;

গ. অধঃক্ষেপণ; যেমন, বিষাক্ত ভারি ধাতু আয়নকে অদ্রবণীয় সালফাইডে রূপান্তরণ; অদ্রবণীয় অবস্থায় ধাতু সহজে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না, কিংবা উদ্ভিদেও শোষিত হয় না;

ঘ. আয়ন বিনিময়করণ; যেমন, দ্রবীভূত ক্যাটায়ন (ধাতু আয়ন) অ্যানায়ন থেকে পৃথককরণ;

ঙ. pH নিয়ন্ত্রণ ; যেমন, চুন স্লারি (lime slurry) কে অম্ল লিকারযোগে প্রশমিতকরণ এবং

চ. স্থিতকরণ (immobilization); যেমন, চিনামাটি, কাচ, সিমেন্ট অথবা চুন-ভিত্তিক নিষ্ক্রিয় বস্তুতে বিষাক্ত অজৈব কর্দম (sludge) স্থিতকরণ।

৩. জৈবিক প্রক্রিয়া (biological processes): বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আণুবীক্ষণিক জীবের (যেমন ব্যকটেরিয়া, ফাঞ্জি, একটিনোমাইসিট, প্রভৃতি) ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ বর্জ্য, বিশেষ করে জৈব বর্জ্য, আণুবীক্ষণিক জীব এক বিস্ময়কর

দক্ষতার সাথে ধ্বংস করে; এতে বিষাক্ত বর্জ্য নির্বিষ বা কম বিষাক্ত যৌগে পরিণত হয়। কখনো কখনো বিপরীত ঘটনাও ঘটে তবে তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। আণুবীক্ষণিক জীব নিম্নমাত্রায় অবস্থিত বহু বিষাক্ত ভারি ধাতুও অপসারণ করে, ধাতু জীবের দেহে স্থান পায়।

কারখানা এলাকা থেকে দূরে বিপজ্জনক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা (off-site waste disposal): একটি কারখানার বিপজ্জনক বর্জ্য ফেলার জন্য কারখানার সীমানার মাঝে (on-site) যখন কোনো ব্যবস্থা না থাকে এবং বর্জ্যটি যদি মিউনিসিপ্যাল বর্জ্যের সাথে মিশানো না যায় তখন কারখানার সীমানার বাইরে কোথাও তা ফেলা হয়। এজন্য নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতির একটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা: আলোচ্য ব্যবস্থায় জৈব বর্জ্যকে ভস্মীভূত করা হয় অথবা ভৌত / জৈবিক প্রক্রিয়ায় তাকে গ্রহণীয় (নির্বিষ) একটি তরল উৎপাদে পরিণত করে উৎপাদটি কর্দমে ঘনীভূত করা হয়; উক্ত কর্দম ভূমি ভরাটকরণে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্জ্য অজৈব হলে সাধারণত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাকে নির্বিষ একটি তরলে পরিণত করা হয় এবং তাকেও একইভাবে ব্যবহার করা যায়।

২. সহ-ব্যবস্থাপনা (co-disposal): বিপজ্জনক বর্জ্য পরিমাণে কম হলে বিশাল পরিমাণ মিউনিসিপ্যাল বর্জ্যের সাথে মিশিয়ে তা দূর করা যায়। বিশাল মিউনিসিপ্যাল বর্জ্যে তরল অজৈব ও কিছু কিছু জৈব বর্জ্যের শোষণ / পরিশোষণ ঘটে এবং তাদের বিষক্রিয়া হ্রাস পায়।

৩. নিরাপদ ভূমি ভরাটকরণ (secure land –fill): 'নিরাপদ ভূমি ভরাটকরণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' উন্নত প্রযুক্তির একটি পূর্ত পদ্ধতি । পদ্ধতিটির বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব না; এখানে তার একটি পরিলেখ (profile) দেয়া হলো মাত্র। সাধারণভাবে বলা যায়, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার প্রচলিত আর সব পদ্ধতি যখন অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়, 'নিরাপদ ভূমি ভরাটকরণ' পদ্ধতি তখন সেখানে শেষ অবলম্বন - মাটির নিচে তৈরি বিশাল একটি আধারে ঘনীভূত বিপজ্জনক বর্জ্যকে অনির্দিষ্টকাল সম্ভবত অনন্তকাল ধরে রাখা পদ্ধতিটির উদ্দেশ্য।

নিরাপদ ভূমি-ভরাটকরণ ব্যবস্থার জন্য এমন একটি স্থান নির্বাচন করতে হয় যা ঘন লোকবসতি অঞ্চল থেকে কমপক্ষে আট কিলোমিটার দূরে প্রান্তীয় কৃষি সম্ভাবনাময় গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত থাকে। স্থানটির পৃষ্ঠ ঢাল 1-5%, ভরাটকরণীয় ভূমির উপর ও নিচ অপ্রবেশ্য (impermeable) পুরু কাদামাটির স্তর দ্বারা গঠিত এবং ভূমির অবস্থান ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোচ্চ যে স্তর তা থেকে কমপক্ষে 1.5 মিটার উঁচুতে হতে হবে। তাছাড়া, স্থানটিতে পৃষ্ঠ-পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বন্য জন্তুর আবাস, প্লাবনের সম্ভাবনা, যানবাহনের প্রবেশ পথ, প্রধান প্রধান পানি- উৎসের সাথে ও সামাজিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলো আছে কিনা স্থান নির্বাচনে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। মনে রাখতে হবে, বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 'নিরাপদ

ভূমি ভরাটকরণ পদ্ধতি' একমাত্র পদ্ধতি নয়; সমগ্র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের এটি একটি এবং সর্বশেষ অংশ মাত্র।

প্রশ্নমালা

১.মৃত্তিকা কাকে বলে? ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষিত মৃত্তিকার একটি নমুনা 'মৃত্তিকা' নয় - ব্যাখ্যা কর।

২.মৃত্তিকা একটি দক্ষ দূষক অপসারক - ব্যাখ্যা কর।

৩. মৃত্তিকায় ভারি ধাতুর বর্জ্য পরিবেশে দূষকের বিস্তার ঘটাতে পারে - ব্যাখ্যা কর।

৪. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভূমি ভরাটকরণ ও কম্পোস্টিং পদ্ধতি বর্ণনা কর; এদের সুবিধা অসুবিধা আলোচনা কর।

৫. বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য বলতে কি বুঝায়; এটি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

গ্রন্থপঞ্জি

1. F.M. Courtney and S.T. Trudgill, 'The Soil - An Introduction to Soil Study', 2nd Ed., Hodder and Stoughton. London, U.K. 1991.

2. S.E. Manahan, 'Environmental Chemistry', 6th Ed., Lewis Publishers, USA, 1994.

3. S. S. Dara, A Textbook of Environmental Chemistry and Pollution Control, S. Chand & Co., N. Delhi, India, 1995.

4. C. S. Rao, Environmental Pollution Control Engineering, Wiley Eastern, India, 1993.

সপ্তম অধ্যায়

ট্রেস* মৌলের দূষণ

(Trace Element Pollution)

[* 'ট্রেস' একটি ইংরেজি শব্দ; এর আভিধানিক অর্থ 'সামান্য প্রামাণিক সাক্ষ্য'। বাংলা পত্র পত্রিকায় 'ট্রেস' শব্দটি 'ক্ষুদ্র পরিমাণ' অর্থে এখন সচরাচর ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মনে হয় শব্দটি বাংলা ভাষায় আত্তীকৃত হতে চলেছে। এখানেও শব্দটি ব্যবহার করা হলো।]

৭.১ ভূমিকা

নমুনায় একটি মৌল যখন এমন ক্ষুদ্র পরিমাণে থাকে যে, বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৌলটির উপস্থিতি শনাক্ত করা যায় মাত্র, পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না তখন মৌলটিকে আভিধানিক অর্থে নমুনার একটি 'ট্রেস মৌল' বলা হয়। অতীতে বিশ্লেষণের যেসব যন্ত্র/পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সেগুলো তেমন সংবেদনশীল ছিল না। ঐসব যন্ত্র/পদ্ধতির সাহায্যে নমুনার একটি মৌলকে যখন সঠিকভাবে নির্ণয় করা যেত না তখন তাকে 'ট্রেস' হিসেবে গণ্য করা হতো। বর্তমানে অতি উচ্চমাত্রার সংবেদনশীল বহু যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। অতীতের একটি বিশ্লেষণে যে ঘনমাত্রার একটি মৌলকে নমুনার 'ট্রেস মৌল' হিসেবে শনাক্ত করা হতো, আধুনিক ঐসব যন্ত্রের সাহায্যে তার হাজার/লক্ষ গুণ নিম্নতর ঘনমাত্রায়ও মৌলটিকে এখন সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। 'ট্রেস মৌল' অভিধাটির পূর্বের সে ব্যঞ্জনা এখন আর নেই তথাপি অভিধাটি প্রচলিত আছে এবং একটি মৌল (তথা, যেকোনো বিশ্লেষ্য) যখন 0.01% কিংবা তার নিচে নমুনায় উপস্থিত থাকে তখন সাধারণভাবে তাকে 'ট্রেস মৌল' বলা হয়।

'ট্রেস মৌলের দূষণ' বলতে পরিবেশে এমন একশ্রেণি মৌলের দূষণ বুঝানো হয় যারা অতি নিম্ন ঘনমাত্রায় জীবদেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। এসব মৌলের মাঝে এক বিরাট সংখ্যক মৌল রয়েছে জীবের জন্য যেগুলো অপরিহার্য। আবার, কিছু সংখ্যক রয়েছে যেগুলো জীবদেহে পাওয়া যায় তবে তারা জীবের জন্য অপরিহার্য কিনা সে ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এসব মৌল সাধারণভাবে জীবের জন্য এক একটি 'বিষ' হিসেবে পরিচিত। Pb, Cd, Hg, As, Sb ও Se এ শ্রেণির অতি পরিচিত কয়েকটি মৌল। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, মৌল 'অপরিহার্য' কিংবা 'বিষ' যে শ্রেণিরই হোক, তার একটি 'সহনীয় সীমা' (tolerance limit) থাকে। উক্ত সীমা আবার বেশ কিছু নিয়ামক দ্বারা নির্ধারিত হয় যার মাঝে মৌলের রাসায়নিক অবস্থা ও আক্রান্ত

ব্যক্তির দৈহিক পুষ্টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্থিতিমাপ। বস্তুত, যে কোনো মৌল তার সহনীয় মাত্রার উর্ধ্বে দীর্ঘদিন ব্যাপী শরীরে প্রবেশ করতে থাকলে তা বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। যাহোক,সাধারণভাবে 'বিষ' হিসেবে পরিচিত এমন কয়েকটি 'ট্রেসমৌল' সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

৭.২ পারদ (mercury)

ক. ভূমিকা : পারদ একটি বিরল মৌল এবং একমাত্র তরল ধাতু। ভূত্বক যেসব মৌল দ্বারা গঠিত তাদের প্রাচুর্যের তালিকায় নিম্নপ্রান্ত থেকে পারদের স্থান ষোড়শ। ভূত্বকের মোট ভরে পারদের অবদান তিনহাজার কোটি ভাগের একভাগেরও কম। জল, স্থল, বায়ুমণ্ডল, কোথাও মৌলটির প্রাকৃতিক প্রাচুর্য এমন হয় না যা জীবের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। মৃত্তিকার উপর স্তরে (topsoil) এর প্রাচুর্য পিপিএম কিংবা তার এক ভগ্নাংশ, বায়ু ও বারিমণ্ডলে পিপিবি এরও কম। তবে, সামুদ্রিক কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদে পারদের ঘনীভবন ঘটে এবং এতে মৌলটির ঘনমাত্রা সেখানে পানির তুলনায় একশ গুণেরও বেশি হয়।

পারদের যেসব আকরিক পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাত্র একটি, সিনাবার (Cinnabar, HgS)। সিনাবার (সিঁদুর) দেখতে টকটকে লাল। মূলত তরল পারদ ও সিনাবারের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ 'পারদ' ব্যবহার করা শুরু করে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সিনাবার 'রঞ্জক' ও ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মধ্যযুগে আলকেমিয় রসায়নবিদেরা পারদের অক্সাইড, ক্লোরাইড ও আরও কিছু অজৈব যৌগ সংশ্লেষণ করেন এবং তারপর থেকে ওষুধ হিসেবে এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। রেচক (cathartic) হিসেবে মারকিউরাস ক্লোরাইড (Hg_2Cl_2)ও সিফিলিসের মলম তৈরিতে পারদ যৌগের ব্যবহার ছিল এদের মাঝে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারদের বিষক্রিয়া সম্পর্কে সে যুগের চিকিৎসক ও রসায়নবিদেরাও অবগত ছিলেন এবং আত্মহত্যা, মানুষ হত্যার জন্যও নাকি পারদ যৌগ ব্যবহৃত হতো।

পারদের গুণাগুণ ও প্রয়োগ সম্পর্কে যত তথ্যই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষের জানা থাকুক, পারদ যে পরিবেশের একটি দূষক এবং ব্যাপক জনসাধারণের জন্য তা ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হতে পারে তা মাত্র কয়েক দশক আগে মানুষ জানতে পেরেছে। পারদজনিত পরিবেশ দূষণের ঘটনা প্রথম ধরা পড়ে জাপানে। সেখানে মিনেমাটা উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ১৯৫০ এর দশকে মৎসজীবী পরিবারের মাঝে হঠাৎ এক রহস্যময় স্নায়ু রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। একশ-এর বেশি লোক রোগটিতে আক্রান্ত হয় এবং তেতাল্লিশ জন মারা যায়। রোগটি 'মিনেমাটা রোগ' (Minemata disease) নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই রোগে মাংসপেশী, দৃষ্টিশক্তি ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে হতে আক্রান্ত ব্যক্তি একসময় পঙ্গু হয়ে যায় অথবা সংজ্ঞাহীন হয় কিংবা মারা যায়। মানুষের পাশাপাশি গৃহস্থের বিড়াল ও সামুদ্রিক পাখিও অনুরূপ

রোগের শিকার হয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, মিনেমাটা উপসাগরের পানিতে তীব্র পারদদূষণ রোগটির জন্য দায়ী । উপসাগর অঞ্চলে অবস্থিত একটি রাসায়নিক কারখানা থেকে পারদের বর্জ্য উপসাগরের পানিতে ফেলা হতো; সেই পারদ মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাবারের মাধ্যমে মানুষ ও মৎস্যভোজী প্রাণীতে সংক্রমিত হয় এবং দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মিনেমাটা ঘটনার পর পারদ-দূষণ জনিত দ্বিতীয় বড় দুর্ঘটনা ঘটে ইরাকে ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে। প্রায় সাড়ে চারশো লোক এতে প্রাণ হারায়। পারদঘটিত এক ছত্রাকনাশক দ্বারা সংরক্ষিত শস্যের বীজ সেখানে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। কৃষকেরা সে বীজ বপন না করে নিজেদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরে পাকিস্তান ও গুয়াতেমালায়ও ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।

উল্লিখিত ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে মানুষ পারদ-জনিত পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সজাগ ও উদ্বিগ্ন হতে থাকে এবং ১৯৭০ সালে এসে উত্তর আমেরিকায় সে উদ্বেগের মাত্রা এক নাটকীয় তীব্রতায় পৌঁছায়। ঐ সময় নরওয়ের একদল বিজ্ঞানী উত্তর আমেরিকার সেন্ট ক্লেয়ার হ্রদের (Saint Clair Lake) মাছ পরীক্ষা করে তাতে উচ্চমাত্রার পারদ শনাক্ত করেন। তারপরই কানাডা ও আমেরিকা (USA) উভয় দেশের বহু অঞ্চলে মাছ ধরা ও বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হয় এবং হ্রদ ও নদনদীর পানিতে পারদের বর্জ্য ফেলার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

পারদ-দূষণ জনিত যত ঘটনাই ঘটুক, অনেক পরিবেশ বিজ্ঞানী মনে করেন, বিষয়টিতে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কিছু নেই কেননা মৌলটি এতই বিরল যে, বিশ্ব পরিবেশের উপর এর প্রভাব কখনোই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারবে না। তবে বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে অন্যথায় মিনেমাটা কিংবা ইরাকের মতো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই উপলক্ষে পানীয় পানির জন্য পারদের সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (EPA কর্তৃক) 2 μg/L ।

খ. প্রকৃতিতে পারদের উৎস : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতিতে পারদের 'পটভূমি ঘনমাত্রা' (background concentration) খুব কম, বেশকিছু উৎসের পারদ একত্রে মিলিত হয়ে 'পটভূমি ঘনমাত্রা' সৃষ্টি হয়েছে এবং উৎসগুলোর মাঝে ভূত্বকের শিলা, আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ও জীবাশ্ম জ্বালানি বিশেষ করে কয়লার দহন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'পটভূমি পারদ' পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি করে না, পরিবেশের দূষণ ঘটে মানুষের সৃষ্টি উৎস থেকে, পারদ-বর্জ্য যখন পটভূমি পারদের সাথে যুক্ত হয়।

বর্তমানে বিশ্বে পারদের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় সাড়ে এগারো হাজার মেট্রিক টন। আকরিক থেকে পারদ যখন নিষ্কাশন করা হয় তখন তার চারপাশে পরিবেশে পারদ বাষ্প ও পারদ ধূলির ভয়াবহ দূষণ ঘটে। পারদের ব্যবহার বহুবিধ শিল্পকারখানা (বিশেষ করে, Cl_2 -ক্ষার ও ওষুধ শিল্প), কাগজ, পেইন্ট, পেস্টিসাইড, বৈদ্যুতিক

যন্ত্রপাতি, অনুঘটক (catalyst) প্রভৃতি উৎপাদনে এবং বিজ্ঞান গবেষণাগারে প্রচুর পরিমাণ পারদ ব্যবহৃত হয়। একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পারদের বার্ষিক ব্যবহার প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন। যথাযথ সতর্কতা অলবম্বন করা হলেও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু না কিছু পরিমাণ পারদ পরিবেশে মেশে। স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে নিঃসরিত পারদের পরিমাণ হয়ত নগণ্য থাকে কিন্তু সম্মিলিতভাবে এদের পরিমাণ বেশ উদ্বেগজনক মাত্রায় পৌঁছে যায়। তাই, নর্দমার পানিতেও কখনো কখনো পারদের ঘনমাত্রা প্রাকৃতিক পানির তুলনায় অনেক বেশি হয়। জলাধারের তলানিতে পারদ একবার প্রবেশ করলে তা তার ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে এবং বহুদিন যাবৎ পানিতে দূষণ সৃষ্টি করতে থাকে। বস্তুত, পরিবেশ দূষণে বায়ুমণ্ডলের পারদ বাষ্প ও ধূলির তুলনায় পানি অথবা ভূপৃষ্ঠে যে তরল পারদ ও কঠিন পারদ যৌগ থাকে তাদের ভূমিকা অনেক বেশি উদ্বেগজনক।

গ. পারদের বিষক্রিয়া (toxicity): পারদের বিষক্রিয়া ধাতুটির রাসায়নিক অবস্থার উপর গভীরভাবে নির্ভর করে এবং রাসায়নিক অবস্থাকে বিষক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করা যেতে পারে; যথা, অজৈব পারদ, অ্যারাইল মারকিউরাল ও অ্যালকাইল মারকিউরাল।

অজৈব পারদের বিষক্রিয়া : ধাতব পারদ (Hg) এবং পারদের কিছু লবণ, অক্সাইড ও সালফাইড অজৈব পারদ শ্রেণীর অন্তর্গত। সাধারণভাবে অজৈব পারদ দেহের মাঝে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, মলমূত্রের সাথে তা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এটি ফুসফুস, কিডনি, যকৃত ও মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন করে।

পারদ যৌগের তুলনায় ধাতব পারদের সক্রিয়তা ও বিষক্রিয়া নিম্নতর। এমনও তথ্য পাওয়া যায়, তরল পারদ কার্যত নির্বিষ একটি পদার্থ; এক পাউন্ড কিংবা তারও বেশি পরিমাণ তরল পারদ একবারে গিলে ফেললেও তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া শরীরে সৃষ্টি হয় না, মলের সাথে তা বেরিয়ে যায়। তবে, পারদ বাষ্প (পারদের বাষ্পীয় চাপ বেশ উচ্চ, 0.001 mm, 18°C) বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে পারদ বাষ্প ফুসফুসে প্রবেশ করে সরাসরি রক্ত প্রবাহে মেশে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। এতে মস্তিষ্কের বিপাকক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে যার দরুন আক্রান্ত ব্যক্তি অনিদ্রা, মনমরা ভাব, খিটখিটে মেজাজ, লাজুক স্বভাব প্রভৃতি মানসিক ব্যাধির শিকার হয়। পারদ বাষ্পের আক্রমণ খুব তীব্র হলে (প্রতিদিন $1\ mg / m^3$ মাত্র) ফুসফুস কলায় প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং কলা ভেঙ্গে যায়। আক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, কাশি, কাপুনি ও বুকে ব্যথা হয় এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। পারদ নিয়ে কাজ করার সময় তাই এমন একটি স্থান বেছে নেয়া উচিত যেখানে বায়ু মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে। পারদ মেঝেতে পড়লে সাথে সাথে তা তুলে ফেলা উচিত। তরল পারদ পানির মাঝে সংরক্ষণ করা নিরাপদ, এতে বাষ্প বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে না।

মারকিউরাস (Hg_2^{2+}) পারদের লবণ অপেক্ষাকৃত অদ্রবণীয় এবং এর বিষক্রিয়াও নিম্ন। মারকিউরাস ক্লোরাইড (Hg_2Cl_2) পূর্বে রেচক (cathartic) হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং কিছু কিছু ওষুধ তৈরিতে লবণটি এখনও ব্যবহার করা হয়।

সাধারণভাবে, পারদের দ্রবণীয় অজৈব লবণ এক একটি বিষ। মারকিউরিক ক্লোরাইড ($HgCl_2$ – corrosive sublimate) দ্রবণীয় একটি লবণ। লবণটি বেশি পরিমাণে গলাধকরণ করা হলে, অন্ত্রে (intestine) ক্ষত সৃষ্টি হয় (যাতে রক্ত দাস্ত হতে পারে), কিডনির (kidney) ক্ষতি হয়, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মুত্রাশয় বিকল হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যায়। মারকিউরিক (Hg^{2+}) পারদের সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য, সালফারের প্রতি এর আসক্তি প্রবল তাই প্রোটিনের সালফার সম্বলিত অ্যামিনো অ্যাসিড এবং সালফাইড্রিল সম্বলিত (-SH) হিমোগ্লোবিন ও অ্যালবুমিনের সাথে Hg^{2+} দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয় এবং এদের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। তবে, আয়নটি কোষ ঝিল্লি অতিক্রম করে কোষের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

মারকিউরিক পারদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লবণ মারকিউরিক সালফাইড (HgS)। লবণটি অদ্রবণীয় ও নির্বিষ তবে প্রাকৃতিক পানির তলানিতে যৌগটি সঞ্চিত হয় যেখানে জীবাণুর অনুঘটনে তীব্র বিষাক্ত অরগ্যানোমারকিউরালে এর রূপান্তর ঘটে। তলানিতে সঞ্চিত HgS পানি দূষণের দীর্ঘস্থায়ী একটি ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

অ্যারোমেটিক মারকিউরাল : পারদঘটিত যৌগে যখন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন গ্রূপ অন্তর্ভুক্ত থাকে তখন তাকে অ্যারোমেটিক মারকিউরাল বলে। এই শ্রেণীর যৌগ পরিবেশে ও দেহের মাঝে জৈবিক ক্রিয়ায় অজৈব পারদে রূপান্তরিত হয় এবং অজৈব পারদের মতো সেখানে আচরণ করতে থাকে।

অ্যালিফেটিক মারকিউরাল : অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন গ্রুপযুক্ত পারদ যৌগকে অ্যালিফেটিক মারকিউরাল বলে। পারদের যত যৌগ আছে, তাদের মাঝে মিথাইল মারকিউরালের (CH_3Hg^+) বিষক্রিয়া সবচেয়ে বেশি তীব্র। এটি কোষঝিল্লি অতিক্রম করে কোষের মাঝে প্রবেশ করে এবং চর্বিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। মিথাইল মারকিউরালের আক্রমণে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের অনুভমুখী ক্ষতি হয়। পদার্থটি সহজে বিভাজিত হয় না এবং বহুদিন পর্যন্ত কোষে অবস্থান করে। এর জৈবিক বিভাজন অর্ধায়ু প্রায় ৭৪ দিন, যেখানে অজৈব পারদের অর্ধায়ু মাত্র ৫ দিন। মারকিউরালটির মারাত্মক একটি বৈশিষ্ট্য, ডিম্বকবাহী গর্ভপত্র (placenta) অতিক্রম করে এটি ভ্রূণে প্রবেশ করে এবং ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটায়; ফলে, কোষবিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। রক্তে মাত্র 0.5 ppm CH_3Hg^+ প্রবেশ করলেই তাতে উল্লেখিত দুর্ঘটনাগুলো ঘটে যেতে পারে। অ্যালিফেটিক মারকিউরালের আর একটি বিষাক্ত যৌগ ডাইমিথাইল মারকিউরাল, $(CH_3)_2Hg$; যৌগটির বিষক্রিয়া যদিও CH_3Hg^+ এর মতো তীব্র নয় তবে মাধ্যম অম্লীয় হলে সেখানে মিথাইল মারকিউরালে (CH_3Hg^+) এর বিভাজন ঘটে। যাহোক, প্রাকৃতিক

পানি ও মৃত্তিকায় ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে পারদ এক রাসায়নিক অবস্থা থেকে অন্য রাসায়নিক অবস্থায় রূপান্তরিত হয় (চিত্র ৮.১)। পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে তাই পারদের রাসায়নিক অবস্থা বিবেচনা করার চেয়ে সামগ্রিক পারদকে বিবেচনা করা অনেক বেশি যুক্তিসংগত।

ঠিক কি পরিমাণ পারদ শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম, তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কেননা, বিষক্রিয়ার মাত্রা আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ও পারদের রাসায়নিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তবে, FAO / WHO কর্তৃক ধাতুটির সাময়িক একটি সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে অনুসারে একজন ব্যক্তির জন্য প্রতি সপ্তাহে ধাতুটির অনুমোদনীয় মাত্রা 0.3 mg যার মধ্যে CH_3Hg^+ এর পরিমাণ 0.2 mg এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

প্রাণিদেহে পারদের প্রবেশ : পারদের বাষ্প এবং বায়ুতে ধূলিকণা-পৃষ্ঠে পরিশোষিত যে পারদ যৌগ ভাসমান থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তা প্রাণিদেহে প্রবেশ করে। ভূত্বকের পারদ ও বায়ুমণ্ডলের ভাসমান পারদ বৃষ্টির পানিতে ধৌত হয়ে এক সময় প্রাকৃতিক পানিতে স্থান পায় এবং প্রাকৃতিক পানিই পারদ দূষণের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক পানিতে ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে অজৈব পারদ মিথাইল মারকিউরালে (CH_3Hg^+) রূপান্তরিত হয় এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ খাবারের মাধ্যমে তা মানুষ তথা প্রাণিদেহে প্রবেশ করে:

$$Hg^{2+} \xrightarrow{CH_3\text{-কোবাল্যামিন}} CH_3Hg^+ \rightarrow \text{প্লাঙ্কটন (উদ্ভিদ)} \rightarrow \text{মাছ} \rightarrow \text{মানুষ।}$$

[মিথাইল কোবাল্যামিন ভিটামিন B_{12} এর অনুরূপ একটি পদার্থ; প্রাকৃতিক পানির তলদেশে অক্সিজেন অপ্রতুল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া C- যৌগকে CH_4-এ বিজারিত করে। উক্ত প্রক্রিয়ার কোনো এক ধাপে মিথাইল কোবাল্যামিন উৎপন্ন হয় বলে ধারণা করা হয়।]

মিথাইল মারকিউরাল যখন প্লাঙ্কটন থেকে মাছে প্রবেশ করে তখন তাতে Hg হাজার গুণেরও বেশি ঘনীভূত হয়। তবে প্রশম কিংবা ক্ষারীয় পরিবেশে ডাইমিথাইল মারকিউরালের $(CH_3)_2Hg$, উৎপাদন প্রাধান্য পায়। পদার্থটি উদ্বায়ী তাই সহজে এটি বায়ুমণ্ডলে মিশে যেতে পারে।

দূষণহীন পরিবেশেও সুস্থ একজন ব্যক্তির শরীরে পারদ উপস্থিত থাকে। খাদ্য, পানীয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তা দেহে স্থান পায়। স্বাভাবিক খাবারের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি প্রতিদিন প্রায় 20 μg Hg গ্রহণ করে থাকে। দূষণ মুক্ত বায়ু থেকে Hg যে পরিমাণ গৃহীত হয় তা নগণ্য। তবে পানি থেকে প্রায় 1 μg/LHg শরীরে প্রবেশ করে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সুস্থ মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে Hg নির্ণয় করা হয়েছে এবং যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা মোটামুটি এরূপ: দেহ, 0.1- 0.5 ppm; চর্ম, নখ ও চুল:

দেহের তুলনায় বেশি, কিডনি (kidney): 2.7 ppm (সর্বোচ্চ ঘনীভবন); মূত্র 0.1 - 13.3 μg/100 mL (মূত্রে Hg এর মাত্রা 1- 2 μg/mL এর বেশি হলে তা Hg এর দূষণ বলে আশঙ্কা করা হয়); যকৃত (liver) ও ফসুফুস: 0.05 – 0.30 ppm এবং তাজা রক্তে 2 - 9 ng/g।

ঘ. পারদের দূষণ নিয়ন্ত্রণ : পারদ যেহেতু ভূত্বক শিলার একটি উপাদান তাই ধাতুটি সর্বদাই পরিবেশের একটি অংশ হয়ে থাকে। শিল্প কারখানা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও পারদ CH_3Hg^+ আকারে খাদ্যের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করতো। তবে, এর পরিমাণ কম থাকতো এবং স্বাস্থ্যের জন্য তা ক্ষতিকর হতো না। শিল্প কারখানার পারদ-বর্জ্য যখন থেকে প্রাকৃতিক পানিতে মিশতে শুরু করে,পারদজনিত দূষণ তখন থেকে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পারদের দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাই এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে পারদের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং পারদ বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়। কোনো কোনো শিল্প কারখানায় পারদের পরিবর্তে অন্য পদার্থ হয়তো ব্যবহার করা যেতে পারে তবে Cl_2-ক্ষার প্লান্ট, প্রতিপ্রভা ল্যাম্প (fluorescent lamp) শিল্প কিংবা ইলেকট্রনিক শিল্পে পারদ ব্যবহৃত হতে থাকবে বলে মনে হয়। পারদ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অ্যালকাইল মারকিউরাল পেস্টিসাইডের ব্যবহার ইতোমধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পারদ ঘটিত অন্যান্য পেস্টিসাইডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং Cl_2-ক্ষার প্লান্টেও Hg এর স্থলে অন্য ধাতু ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা সে ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

প্রাকৃতিক পনিতে যে Hg-দূষণ ঘটে তার অন্যতম উৎস জলাধারের তলানিতে সঞ্চিত পারদ। নিষ্ক্রিয় কিংবা পরিশোষক (adsorbent) কোনো বস্তু দ্বারা পারদসমৃদ্ধ তলানি ঢেকে দেওয়া সম্ভব হলে পানি দূষণ হ্রাস পেতে পারে; সম্ভাবনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা কিংবা পরিকল্পনা যেমনই হোক, পারদ তথা যে কোনো দূষণ নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম উপায় সম্ভবত পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং সে অনুসারে সংশ্লিষ্ট পদার্থের ব্যবহার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা অবলম্বন করা।

ঙ. পারদজনিত বিষক্রিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা : ১. গলাধকৃত পারদ পাকস্থলী থেকে বের করে দেবার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তিকে দুধ কিংবা কাঁচা ডিম খাইয়ে বমি করানো যেতে পারে। দুধ ও কাঁচা ডিমের মাঝে সালফাইড্রিল সম্বলিত প্রোটিন থাকে যা রাসায়নিক বন্ধনে Hg^{2+}-কে পাকস্থলী থেকে তুলে নেয় এবং বমনের সাথে তখন তা বেরিয়ে আসে।

২. শরীরে পারদের বিষক্রিয়া ঘটেছে বলে সন্দেহ হলে সাথে সাথে ডাই-মারক্যাপরোল, $CH_2(SH)(CH)(SH)CH_2OH$ বা পেনিসিল্যামিন, $CH_3C(CH_3)(SH)$-$CH(NH_2)COOH$, ইনজেকশনের মাধ্যমে পেশীতে প্রবেশ করানো যেতে পারে। দুটি পদার্থই Hg^{2+} এর সাথে স্থিতিশীল কিলেট গঠন করে এবং শরীর থেকে Hg^{2+} এর দ্রুত অপসরণে সহায়তা করে।

৩. পারদের সাথে কিলেট গঠন করে,এমন কোনো পদার্থ পাওয়া না গেলে NaCl এর সম চাপমান (isotonic) একটি দ্রবণ আক্রান্ত ব্যক্তির পেশীতে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করানো যেতে পারে (প্রতিদিন 10 লিটার)। এতে প্রচুর প্রস্রাব হয় বলে মূত্রাশয়ে পারদ ঘনীভূত হতে পারে না।

৭.৩. সীসা (lead, Pb)

ক. ভূমিকা: পরিবেশ দূষকের তালিকায় সীসার স্থান শীর্ষে। অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস, যেসব কারণে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে, সীসার দূষণ তাদের একটি। রোম সাম্রাজ্যের শাসকেরা পানাহারে সীসার পাত্র ব্যবহার করতেন। ধারণা করা হয়, পাত্র থেকে খাদ্য ও পানীয়ে সীসার দূষণ সৃষ্টি হতো এবং ভোক্তার শরীরে তার সংক্রমণ ঘটতো। সীসার দূষণ বায়ু, পানি, মৃত্তিকা, সর্বত্র ঘটে তবে বর্তমানে পানি ও মৃত্তিকার তুলনায় বায়ুতে এর মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সীসা একজন সুস্থ ব্যক্তির শরীরেও উপস্থিত থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে এর পরিমাণ 90-400mg যার বেশিরভাগ ঘনীভূত হয় হাড়ে। শারীরবৃত্তীয় (physiological) কোনো কাজে সীসা অংশগ্রহণ করে কিনা তা জানা যায় না; বিষ হিসেবেই সাধারণভাবে এটি পরিচিত। পানীয় পানির জন্য সীসার সহনীয় মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে (WHO কর্তৃক) 0.05 ppm ।

খ. প্রকৃতিতে সীসার উৎস : সীসা একটি বিরল ধাতু, ভূত্বকে এর গড় প্রাচুর্য $1.6 \times 10^{-3}\%$ (16 ppm) এবং সামুদ্রিক পানিতে 0.004 – 0.005 ppm। সীসার প্রধান আকরিক গ্যালেনা (PbS) এবং প্রতি বছর সীসার ব্যবহার ৩৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।

সীসার বাণিজ্যিক প্রয়োগ বহুবিধ - সীসাযুক্ত গ্যাসোলিন, স্টোরেজ ব্যাটারি, রঞ্জক (pigments), পেইন্ট, বিভিন্ন প্রকার সংকর ধাতু, পাইপ, বন্দুকের গুলি (shots) , ক্ষয়কারক (corrosive) পদার্থ সংরক্ষণের পাত্র, রঞ্জন রশ্মি শোষক ঢাল (shield) প্রভৃতি তৈরিতে সীসা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় [এক সময় পেস্টিসাইড হিসেবে সীসার যৌগ (লেড আর্সেনেট) ব্যবহার করা হতো; বর্তমানে এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে]। ঐসব সামগ্রী ও তাদের নির্মাণ কারখানার বর্জ্য থেকে সীসা পরিবেশে যুক্ত হয়। আকরিক থেকে ধাতুটি নিষ্কাশনের সময় যে ধূম সৃষ্টি হয় তা থেকে এবং কয়লার ধোঁয়া থেকেও বেশকিছু পরিমাণ সীসা বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়। এভাবে মানুষের তৈরি উৎস থেকে সীসা 'পটভূমি' সীসার (ভূত্বক থেকে মুক্ত) সাথে যুক্ত হতে থাকে এবং একসময় তা দূষণ মাত্রায় পৌঁছে যায়।

বর্তমান বিশ্ব-পরিবেশে সীসার যে দূষণ ঘটছে, বায়ুমণ্ডল তার সবচেয়ে বড় শিকার এবং যানবাহনের ধোঁয়া তার অন্যতম উৎস (98%)। অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিনে যে অবাঞ্ছিত ধাক্কা (knocking) সৃষ্টি হয়, জ্বালানি হিসেবে সীসাযুক্ত গ্যাসোলিনের ব্যবহার তা বহুলাংশে প্রশমিত করে। সারা বিশ্বে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে সীসাযুক্ত

গ্যাসোলিনের ব্যবহার তাই ব্যাপক। গ্যাসোলিনে সীসা টেট্রামিথাইল/টেট্রাইথাইল লেড আকারে মেশানো থাকে। তার মাঝে আরও দুটি জৈব হ্যালাইড, 1,2 - ডাই ক্লোরো-ও 1,2-ডাই ব্রোমোইথেন যুক্ত করা হয়। শেষোক্ত যৌগ দুটি সীসার অপসারক (scavenger) হিসেবে কাজ করে। গ্যাসোলিন যখন ইঞ্জিনে দগ্ধ হতে থাকে,সীসা তখন বিভিন্ন প্রকার হ্যালাইড আকারে ধোঁয়ার সাথে ইঞ্জিন থেকে বের হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে:

$$Pb(C_2H_5)_4 + O_2 + Cl_2C_2H_4 + Br_2C_2H_4 \rightarrow CO_2 + H_2O + PbCl_2 + PbBrCl + PbBr_2$$

একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এভাবে যানবাহনের ধোঁয়ার সাথে যে সীসা পরিবেশে স্থান পায় তার পরিমাণ কয়েক লক্ষ মেট্রিক টন। সীসাসমৃদ্ধ যানবাহনের ধোঁয়া শহরাঞ্চলে ও ব্যস্ত সড়কের নিকটবর্তী বায়ুতে সীসার তীব্র দূষণ সৃষ্টি করে। উক্ত সীসা সড়কের দুইপার্শে ভূমিতেও নেমে আসে এবং মৃত্তিকায় তার ঘনমাত্রা কখনো কখনো 1000-4000 ppm পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সীসাজনিত বায়ু দূষণের দিক দিয়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বিপজ্জনক একটি শহর। দিনের ব্যস্ততম সময়ে এর বায়ুতে সীসার মাত্রা EPA কর্তৃক অনুমোদিত যে মাত্রা (1.5 $\mu g/m^3$ তিনমাসের গড়) তার উর্ধ্বে উঠে যায়।

মানুষের শরীরে সীসা শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য ও পানীয়-এর মাধ্যমে প্রবেশ করে। প্রাকৃতিক পানিতে সীসার পরিমাণ 0-55 ppb, যেখানে WHO কর্তৃক নির্ধারিত, পানীয় পানিতে এর সহনীয় মাত্রা 50 ppb। আমরা দৈনন্দিন যে খাবার খাই তার প্রায় প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু পরিমাণ সীসা থাকে। বহু দেশের বিশেষ করে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় দৈনন্দিন যে খাবার তাতে সীসার মাত্রা বিভিন্ন সময়ে নির্ণয় করা হয়েছে এবং যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা মোটামুটি এরূপ: লেটুস: 0.3 - 5.6, বাঁধাকপি: 0.2 - 2.3; গোলআলু: 0.2 - 7.6, শিম: 1 - 12 ও গম 0.5 - 1.0 ppm Pb (শুষ্ক ভিত্তিতে)। স্বাভাবিক দুধে সীসার পরিমাণ 20 - 40 $\mu g/L$ তবে টিনের পাত্রে বাজারজাতকৃত (canned) গুড়া দুধে এর পরিমাণ বহুগুণ বেশি থাকে, গড়ে প্রায় 200 $\mu g/L$। মাংসে সীসার পরিমাণ অঙ্গভেদে ভিন্ন হয়; যেমন, যকৃতে (গরু): 0.2 - 1.9 mg/kg কিন্তু পেশীতে পরিমাণ অনেক কম থাকে, যকৃতের এক দশমাংশ। যাহোক, এভাবে খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি দৈনিক বেশ কিছু পরিমাণ সীসা গ্রহণ করে এবং এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রতিদিন ধাতুটি প্রবেশ করে: ইংল্যান্ডে - 0.32, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে - 0.28 এবং জাপানে 0.24 - 0.32 mg ।

গবেষণায় দেখা গেছে, নিম্নবিত্ত পরিবার যারা পুরানো আমলের ভাঙ্গা-চোরা বাড়িতে বসবাস করে তাদের হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিশুরা সীসা দূষণের শিকার সবচেয়ে বেশি হয়। এজন্য ঐসব শিশুর খাদ্যাভ্যাসকে দায়ী করা হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিশুরা সর্বভুক; পুরানো আসবাবপত্র ও দেয়াল থেকে খসে পড়া পেইন্টের টুকরাও

তাদের খাদ্য তালিকায় স্থান পায়। পেইন্টে অনেক সময় সীসা থাকে; শিশু দিনের পর দিন তা গলাধঃকরণ করে এবং একসময় সীসাজনিত বিষক্রিয়ার শিকার হয়।

গ. সীসার বিষক্রিয়া : মানুষের শরীরে সীসাজনিত যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার প্রাণরাসায়নিক কৌশল বেশ জটিল এবং কৌশলের খুঁটিনাটি অনেক বিষয় এখনো অজানা। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার স্থান এটি নয়, এখানে তার একটি পরিলেখ (outline) দেয়া হলো মাত্র।

সীসাকে প্রোটোপ্লাজম এর একটি বিষ বলে গণ্য করা হয়। ধাতুটি একটু একটু করে দেহে সঞ্চিত হয় এবং ধীরে ও সূক্ষ্মভাবে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। অন্যান্য ভারি ধাতুর মতো সীসারও সালফারের প্রতি আসক্তি প্রবল এবং সালফাইড্রিল (-SH) গ্রুপ সম্বলিত এনজাইমের সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এতে এনজাইমের স্বাভাবিক যে ক্রিয়া তাতে ব্যাঘাত ঘটে। সীসা কার্বোক্সিল ও ফসফোরিল গ্রুপের সাথেও যুক্ত হয়।

সীসার দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় 'হিম' (heme) সংশ্লেষণ।'হিম' প্রোটোপরফিরিনের সাথে যুক্ত লৌহের একটি জটিল যৌগ; এটি গ্লোবিনের (বৃহদাকারের একটি প্রোটিন) সাথে যুক্ত হয়ে হিমোগ্লোবিন গঠন করে। হিমোগ্লোবিন রক্তের লালকণিকা যা O_2 বহন করে দেহের সর্বত্র তা পৌঁছে দেয়। উক্ত O_2 জীবকোষে গ্লুকোজকে দগ্ধ করে এবং জীবের জীবনধারণের জন্য শক্তি যোগান দেয়।

'হিম' সংশ্লেষণে বেশ কয়েকটি ধাপ জড়িত থাকে; এর একটিতে ডেলটা (δ) অ্যামিনোলিভুলিনিক অ্যাসিড (ALA) এর বিপাক (metabolism) এবং শেষ ধাপে লৌহ ও প্রোটোপরফিরিন এর সংযোগে 'হিম' এর গঠন সম্পন্ন হয়। ধাপ দুটির প্রত্যেকটিতে এমন কিছু এনজাইমের ভূমিকা থাকে যাদের কার্যকারিতা মুক্ত -SH গ্রুপের উপর নির্ভরশীল। গ্রুপটির সাথে সীসার যেহেতু দৃঢ় বন্ধন ঘটে তাই সীসা দূষণে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে হিম তথা হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণ ব্যহত হয়। এতে, আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং ক্রমশ তার জীবনীশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। সীসা দূষণজনিত রক্তশূন্যতা উভমুখী একটি ঘটনা, দূষণের উৎস অপসৃত হলে হিম সংশ্লেষণ ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং রক্তশূন্যতাও দূর হয়।

সীসার দূষণ তীব্র হলে, কিডনি (kidney) ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। ঘটনা দুটি কি কৌশলে ঘটে তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। তবে, সীসা দূষণে কিডনি আক্রান্ত হলে তা 'ফ্যানকোনি সিনড্রোম' (Fanconi syndrome) হিসেবে প্রকাশ পায় এবং এরূপ অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক পরিমাণে অ্যামিনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ ও ফসফেট প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যেতে থাকে। কিডনির উপর সীসা দূষণের প্রভাব খুব মারাত্মক হতে পারে তবে রক্ত কোষের উপর প্রভাব যেমন, এটিও তেমন উভমুখী। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র যখন সীসায় আক্রান্ত হয়, তখন সেখানে দুই প্রকার কৌশল কাজ করে বলে মনে করা হয় - মস্তিষ্কের কলা

ফোলে (edema) ও পরিণতিতে তার বিভাজন ঘটে। আবার, কখনো কখনো মস্তিষ্কের কোষ সরাসরি ভেঙ্গে যায়। যাহোক, রক্তে সীসার মাত্রা যখন 0.4 ppm এর কাছাকাছি থাকে তখন বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে, মাত্রা যখন 0.8 ppm অতিক্রম করে, তখন রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং মাত্রা 1.2 ppm এর বেশি হলে মূত্রাশয় ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিকল হতে থাকে।

সীসার বিষক্রিয়া তখন তীব্র আকার ধারণ করে যখন অল্প সময়ের মাঝে বিপুল পরিমাণ সীসা রক্তে জমা হয়। তীব্র বিষক্রিয়াও নিরাময় হয়। তবে, এটি নিরাময় হবার বহু বছর পরও কিংবা মৃদু বিষক্রিয়া বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকলে আক্রান্ত ব্যক্তি একসময় নানাবিধ জটিল রোগের শিকার হতে পারে। নেফ্রাইটিস (কিডনির স্ফীতি) ও প্রান্তীয় স্নায়ুর (peripherial nerve) বৈকল্য এমনি দুটি মারাত্মক ব্যাধি যা সীসার বিষক্রিয়ায় সৃষ্টি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড প্রদেশের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য । ১৯২৯ সালে এক অনুসন্ধানে ধরা পড়ে, কুইন্সল্যান্ডের বহু সংখ্যক শিশু সীসাজনিত তীব্র বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছে এবং এও জানা যায় ঐসব শিশু ঘরের চাল (roof) বেয়ে নেমে আসা বৃষ্টির পানি বহুদিন ধরে পান করতো। চালগুলো কাঠের তক্তা দ্বারা নির্মিত এবং তক্তাগুলো সব সীসা রঞ্জক মিশ্রিত একটি পেইন্ট দ্বারা প্রলেপ করা ছিল। এতে চাল বেয়ে নেমে আসা পানিতে সীসার মিশ্রণ ঘটে এবং শিশুরা তা পান করে বিষক্রিয়ার শিকার হয়। এরপর ১৯৫৪ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, কুইন্সল্যান্ডের ৩৬৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যারা ১৫-৪০ বছর আগে শিশুকালে সীসার বিষে আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের ১৬৫ জন অল্প বয়সে মারা গেছে এবং ৯৪ জন বহুদিন যাবৎ নেফ্রাইটিস রোগে ভুগছে। সীসার বিষক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র একবার আক্রান্ত হলে, দূষণের উৎস অপসৃত হবার পরও বহু বছর ধরে তার প্রভাব চলতে থাকে। এমনকি, আক্রান্ত ব্যক্তিকে মানসিক প্রতিবন্ধী হয়েও সারা জীবন থাকতে হতে পারে।

সীসার বিষক্রিয়া মৌলটির রাসায়নিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। জৈব সীসা (যেমন, টেট্রাইথাইল লেড) চর্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) এর মাধ্যমে এবং অজৈব সীসা প্রধানত পাকাশয়, অন্ত্র (intestine) ও শ্বাসনালীর মাধ্যমে দেহে শোষিত হয়। তবে, 'অজৈব সীসা' শোষিত সীসার প্রধান অংশ হয়ে থাকে। সীসা যে পরিমাণে দেহে প্রবশে করে, সে পরিমাণে তা শোষিত হয় না। গলাধঃকৃত সীসার মাত্র 5-10% পাকাশয় ও অন্ত্রের মাধ্যমে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রবিষ্ট সীসার প্রায় 30% শ্বাসনালীর মাধ্যমে দেহে শোষিত হয়। শোষিত সীসার প্রায় 95% আবার এক সময় দেহ থেকে বের হয়ে যায়। দেহের মাঝে সীসার শোষণ ও সঞ্চয় খাদ্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। ইঁদুরের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, খাবারে Ca, P ও Fe এর পরিমাণ খুব কম থাকলে দেহের সীসা ধারণ ক্ষমতা (retention) বৃদ্ধি পায়। দেহ থেকে সীসার অপসরণ ঘটে দুটি উপায়ে—মল ও প্রস্রাবের সাথে। সুস্থ প্রাপ্ত

বয়স্ক একজন ব্যক্তির মল ও মূত্রের সাথে প্রতিদিন যথাক্রমে 0.32 ও 0.03 mg সীসা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

দেহে প্রবেশের পর সীসার যে ভগ্নাংশ সহজে বের হতে পারেনা, তা রক্ত হয়ে এক সময় প্রধানত হাড়ে সঞ্চিত হতে থাকে। হাড়ের মুখ্য একটি উপাদান Ca^{2+}; আয়নটি রাসায়নিকভাবে Pb^{2+} এর সমধর্মী; Pb^{2+} তাই হাড়ের Ca^{2+} কে অপসারিত করে সে স্থান দখল করে বসে। এভাবে 70 kg ওজনের একটি মানবদেহে 100 - 400 mg পর্যন্ত সীসা জমা হতে পারে। হাড়ে যে সীসা জমা হয় তার অর্ধায়ু ২-৩ বছর। এরূপ সীসার উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে তা চলাচল করতে পারে। বৈশিষ্ট্যটির প্রভাব মারাত্মক কেননা চলাচল করতে করতে সীসা এক সময় কোমল কলার সংস্পর্শে এসে পড়ে যেখানে সে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। হাড়ে সঞ্চিত সীসা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। তাই, রক্ত কিংবা মূত্রের মাঝে ধাতুটি সাধারণত নির্ণয় করা হয় যদিও মূত্রের তুলনায় রক্তের সীসা থেকে ধাতুটির বিষক্রিয়া সম্পর্কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ধারণা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক একজন ব্যক্তির রক্তে সীসার মাত্রা 0.6 - 10 ppm হলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। যানবাহন চলাচলের সড়ক থেকে দূরে গ্রামীণ পরিবেশে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন ব্যক্তির রক্তে সীসার মাত্রা থাকে সাধারণত 0.1 – 0.15 ppm ।

ঘ. সীসার দূষণ নিয়ন্ত্রণ : ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে পরিবেশে সীসার যে দূষণ সৃষ্টি হয় তার মুখ্য কারণ ইঞ্জিনের জ্বালানি, সীসাযুক্ত গ্যাসোলিন। অতএব, সীসার দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে উক্ত জ্বালানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করতে হবে । আশার কথা, শিল্পোন্নত দেশে আজ থেকে প্রায় দুই/তিন দশক আগে এমন এক মডেলের ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে সীসামুক্ত গ্যাসোলিন ব্যবহৃত হয়। উক্ত ইঞ্জিনের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বল্পোন্নত দেশেও তার প্রসার ঘটছে। সীসা দূষণের গুরুত্বপূর্ণ আর দুটি উৎস, শিল্পকারখানার বর্জ্য এবং পুরানো বাড়িঘরের পেইন্ট। সীসা দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে এ দুটি বিষয়ের প্রতিও যত্নবান হতে হবে। বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে সীসা তা থেকে পরিবেশে যুক্ত হতে না পারে এবং পেইন্টের ক্ষেত্রে পুরোনো পেইন্ট তুলে সেখানে সীসামুক্ত প্লাস্টিক পেইন্ট লাগানো যেতে পারে।

অতীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সীসার পাইপ ব্যবহার করা হতো তখন পানিতে সীসা দূষণের এটি ছিল অন্যতম উৎস। বর্তমানে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সীসার পাইপ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও সংযোগ ঝালাইয়ে সীসাঘটিত সংকর ধাতু এখনো অনেক সময় ব্যবহৃত হয়; উক্ত ঝালাই থেকেও সীসা পানীয় পানিতে যুক্ত হতে পারে। যাহোক, সীসার পাইপ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে সীসাজনিত পানি দূষণের ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ঙ. সীসাজনিত বিষক্রিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা: সীসার সাথে স্থিতিশীল কিলেট গঠন করতে পারে এমন একটি পদার্থ ব্যবহার করে দেহ থেকে সীসা অপসারণ করা যেতে পারে এবং এমন তিনটি পদার্থ প্রচলিতও আছে, যথা; Ca-EDTA, Ca-BAL (BAL = British Anti-Lewisite = 2,3ডাই-মারক্যাপটোপ্রোপানল) এবং Ca-penicillamine; এসব পদার্থের জলীয় দ্রবণ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে সীসা (Pb^{2+}) সংশ্লিষ্ট যৌগের সাথে কিলেট গঠন করে দেহ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। তবে, সীসার বিষক্রিয়া ঘটেছে বলে সন্দেহ হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

৭.৪. ক্যাডমিয়াম (Cadmium, Cd)

ক. ভূমিকা : ক্যাডমিয়াম রাসায়নিকভাবে দস্তা (Zn) এর সমধর্মী একটি ধাতু। প্রকৃতিতে এরা একইসাথে অবস্থান করে। তবে, দস্তা যেখানে জীবের জন্য অপরিহার্য একটি মৌল, ক্যাডমিয়াম সেখানে একটি বিষ। প্রধানত খাদ্য, পানীয় ও ধূমপানের সাথে Cd সাধারণ একজন ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে এবং বেশকিছু মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এক পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ প্রতিদিন 50 - 150 μg Cd গ্রহণ করে থাকে। যদিও মলমূত্রের সাথে এর প্রধান একটি ভগ্নাংশ বের হয়ে যায়। রক্তে Cd এর মাত্রা 10 ppb এর নিচে থাকলে তা স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়। পানীয় পানিতে ধাতুটির সহনীয় মাত্রা 5 ppb (WHO কর্তৃক নির্ধারিত) যদিও বহু স্থানের পানিতে Cd উক্ত মাত্রার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। বায়ুমণ্ডলে Cd এর 'পটভূমি' ঘনমাত্রা (মানুষের সৃষ্টি উৎস না থাকলে) $0.001 - 0.048\ \mu g / m^3$ ।

খ. প্রকৃতিতে ক্যাডমিয়াম : ক্যাডমিয়াম একটি বিরল ধাতু। ভূত্বকে এর প্রাচুর্য মাত্র $1.5 \times 10^{-5}\%$ (0.15 ppm) এবং সামুদ্রিক পানিতে মূলত সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝে এটি অবস্থান করে। মৃত্তিকায় Cd এর প্রাচুর্য বেশ উচ্চ, প্রায় 4.5 ppm কেননা পরিবেশ থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝে ধাতুটির ঘনীভবন ঘটে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ মারা যাবার পর এটি আবার মৃত্তিকায় ফিরে আসে। ক্যাডমিয়ামের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আকরিক গ্রীনোকটাইট (Greenoctite, CdS), যদিও দস্তার আকরিকের (যেমন, Sphalerite, ZnS) সাথে ধাতুটি সামান্য পরিমাণে সর্বদা মিশ্রিত থাকে। সারাবিশ্বে Cd এর বার্ষিক উৎপাদন প্রায় দশ হাজার মেট্রিক টন এবং এর প্রায় সমগ্র অংশ সংগ্রহ করা হয় আকরিক থেকে Zn, Cu ও Pb নিষ্কাশন করার সময় প্রক্রিয়ার উপজাত (by- product) হিসেবে। ধাতুটির বাণিজ্যিক প্রয়োগ বহুবিধ এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মোট ধাতুর প্রায় 60% ব্যবহৃত হয় ইলেকট্রোপ্লেটিং শিল্পে; তাছাড়া, ঝালাই করার রাং (solder), প্রমাণ তড়িৎ-রাসায়নিক কোষ, Ni-Cd ব্যাটারি, পারমাণবিক বিদারণ (fission) নিয়ন্ত্রণ, PVC রাবার তৈরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধাতুটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বেশ কিছু ক্যাডমিয়াম যৌগেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। যেমন,

টেলিভিশন শিল্পে স্বতঃদীপক হিসেবে CdSe, রঞ্জক শিল্পে CdS, কাচ ও চিনামাটির শিল্পে CdO, ফটোগ্রাফি, খোদাই ও লেমোগ্রাফিতে $CdBr_2$ / CdI_2 ব্যবহৃত হয়।

মানুষের তৈরি বিভিন্ন উৎস থেকে প্রায় ১০ লক্ষ কিলোগ্রাম Cd প্রতিবছর বায়ুমণ্ডলে স্থান পায়; এর প্রায় 45% উৎপন্ন হয় আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করার সময় এবং Cd প্রক্রিয়াকরণ কারখানা থেকে। পরিবেশে Cd এর অবশিষ্ট যে ভগ্নাংশ তার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, উন্মুক্ত পরিবেশে টায়ার ও প্লাস্টিক পোড়ানো এবং Cd শিল্পের বর্জ্য মুখ্যত দায়ী থাকে। ক্যাডমিয়াম প্রাকৃতিক পানিতে যেসব উৎস থেকে যুক্ত হয়,ইলেকট্রোপ্লেটিং ও Cd-ব্যাটারি শিল্পের বর্জ্য তাদের মধ্যে প্রধান। ক্যাডমিয়াম সম্বলিত রাসায়নিক সার ও ছত্রাক নাশকও পরিবেশে Cd দূষণের উল্লেখযোগ্য দুটি উৎস।

কেবল পরিবেশ থেকে নয়, দৈনন্দিন খাবারের মাধ্যমেও Cd মানুষের দেহে স্থান পায়। আমাদের প্রধান প্রধান যেসব খাবার তাতে ধাতুটির পরিমাণ মোটামুটি এরূপঃ চাল: 29 ppb; ফল, শাক-সবজি : 0.04 – 0.08 ppm; Mg: 0.05 – 0.10 ppm ও দুধ: 0.02 – 0.04 ppm। সামুদ্রিক ঝিনুকের মাঝে Cd এর পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, 3 - 4 ppm। জন্মের সময় মানুষের দেহে Cd উপস্থিত থাকে না। বয়স বাড়ার সাথে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত দেহে এর মাত্রা বাড়তে থাকে এবং দূষণহীন পরিবেশেও প্রাপ্ত বয়স্ক একজন ব্যক্তির শরীরে ধাতুটির পরিমাণ দাঁড়ায় 20-30 mg যার দুই তৃতীয়াংশ সঞ্চিত থাকে কিডনি ও যকৃতে। যে পরিমাণ Cd প্রতিদিন শরীরে প্রবেশ করে, তার ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ কেবল শোষিত হয়, অবশিষ্ট ধাতু প্রধানত প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় এবং সুস্থ একজন ব্যক্তির মূত্রে এর পরিমাণ থাকে 1 - 42 μg/L।

গ. ক্যাডমিয়ামের বিষক্রিয়া : ক্যাডমিয়াম মানুষের শরীরে বেশকিছু মারাত্মক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে; রক্তের চাপ বৃদ্ধি, কিডনি বিকল হওয়া, শুক্রাশয়-কলা ও রক্তের লালকণিকা ভেঙ্গে যাওয়া ঐসব বিষক্রিয়ার মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক। জীবজন্তুর উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, Cd এর বিষক্রিয়ায় বিকলাঙ্গতা ও ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। ধারণা করা হয়, Cd এর যে বিষক্রিয়া তার জন্য Zn এর সাথে Cd এর রাসায়নিক সাদৃশ্য দায়ী। কোনো কোনো এনজাইমের অপরিহার্য একটি অনুষঙ্গ Zn; ক্যাডমিয়াম Zn এর স্থানে প্রতিস্থাপিত হলে এনজাইমের ত্রি-মাত্রিক গঠনে পরিবর্তন ঘটে। এতে এনজাইমটির ক্রিয়া লোপ পায় এবং পরিণতিতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। Cd বিষক্রিয়ার মারাত্মক একটি বৈশিষ্ট্য, Cd দেহে একবার শোষিত হলে সহজে তা অপসারিত হয় না। এ প্রসঙ্গে, জাপানে একসময় 'আউচ-আউচ' (itai-itai) নামে যে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৫০ এর দশকে জাপানের জুনৎসু (Junstsu) নদীর উপকূল অঞ্চল জুড়ে Cd এর ভয়াবহ দূষণ সৃষ্টি হয়। নিকটস্থ এক খনি থেকে Cd বর্জ্য নদীর পানিতে এসে

মিশতো এবং সে পানি সেচ কাজে ব্যবহৃত হতো। ঐ অঞ্চলের প্রধান ফসল ছিল ধান; কৃষিজমি থেকে ধানের মাঝে Cd এর সংক্রমণ ঘটে। এলাকাবাসী বছরের পর বছর দূষিত চাল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং একটু একটু করে Cd জনিত তীব্র বিষক্রিয়ার শিকার হয়। এর পরিণতিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কিডনির বৈকল্য, রক্তের সিরামে ফসফেট ঘাটতি, হাড়ের ব্যথা ও ভঙ্গুরতা প্রভৃতি জটিল ব্যাধিতে ভুগতে থাকে এবং প্রায় একশ লোকের প্রাণহানি ঘটে। দূষিত ঐ চাল পরীক্ষা করে তার মাঝে 0.6-1 μg/g এবং বিষক্রিয়ায় মৃত ব্যক্তিদের দেহে 500 - 600 mg Cd পাওয়া যায়। ক্যাডমিয়াম দূষণ-জনিত জাপানের ঐ রহস্যময় রোগটি ইতিহাসে 'আউচ-আউচ' রোগ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

ক্যাডমিয়ামের বিষক্রিয়া মাছ ও উদ্ভিদেও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। জলাশয়ে Cd এর মাত্রা 2 ppm এর কাছাকাছি উপনীত হলে মাছ দশ দিনের মাঝে এবং মাত্রা 10 ppm কিংবা তারও বেশি হলে এক দিনের মাঝেই মারা যেতে পারে। তবে, পানির খরতা ও লবণাক্ততা দ্বারা Cd এর বিষক্রিয়া প্রভাবিত হয়; উচ্চ খরতা ও লবণাক্ততায় বিষক্রিয়া হ্রাস পায়।

পরিবেশে Cd এর দূষণ সৃষ্টি হলে গাছের পাতা ফ্যাকাসে হয় এবং গাছের প্রবৃদ্ধি থেমে যায়। মৃত্তিকায় Cd দূষণ সৃষ্টি হয় প্রধানত জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, নর্দমার কাদা ও আবর্জনা থেকে। ক্যাডমিয়াম দূষিত মৃত্তিকায় যে ফসল ফলে তাদের এক এক ফসলের এক এক অংশে ধাতুটি বেশি ঘনীভূত হয়। তামাকের কাণ্ড ও পাতায় Cd এর ঘনীভবন ঘটে সবচেয়ে বেশি, প্রায় 1 ppm; ধূমপায়ী ব্যক্তির দেহকলায়, তাই, অধূমপায়ীদের তুলনায় Cd এর ঘনমাত্রা বেশি থাকে। প্রতিটি সিগারেট থেকে একজন ধূমপায়ীর শরীরে 0.1 - 0.2 μg Cd প্রবেশ করে।

যেসব 'ট্রেস মৌল' জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক এক একটি 'বিষ' হিসেবে সাধারণভাবে পরিচিত, ক্যাডমিয়াম তাদের একটি। অতএব, পরিবেশে Cd -জনিত দূষণ যাতে সৃষ্টি হতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। মানুষের তৈরি যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে ধাতুটি পরিবেশে যুক্ত হয় তার মাঝে কোনো কোনোটি নিয়ন্ত্রণ করা বাস্তবে হয়ত অসম্ভব তবে কিছু উৎস থাকে সেগুলো সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কারখানার বর্জ্য এমনি একটি উৎস এবং এটির ব্যবস্থাপনায় কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হলে পরিবেশে Cd -দূষণ এর সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

৭.৫ আর্সেনিক (Arsenic, As)

ক. ভূমিকা : 'বিষ' হিসেবে পরিচিত অনেক পদার্থই আছে তবে বিষ হিসেবে 'প্রচার' আর্সেনিক যতখানি পেয়েছে, অন্য কোনো পদার্থ সম্ভবত তা পায়নি। এদিক দিয়ে বলা যায়, আর্সেনিক 'খ্যাতিমান একটি বিষ' [ধন্যবাদ, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, 'শার্লক হোম' স্রষ্টা !]

আর্সেনিক একটি ধাতুকল্প (metalloid)। মানবদেহের কলায় মৌলটি উপস্থিত থাকে তবে শারীরবৃত্তীয় (physiological) কোনো ভূমিকা মৌলটি পালন করে কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না; যদিও পশুশাবকের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, আর্সেনিকমুক্ত কৃত্রিম পরিবেশে শাবক যখন বেড়ে ওঠে তখন তাদের গায়ের চামড়া খসখসে হয় এবং বেঁড়ে ওঠার হার প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনায় কমে যায়। মানুষের শরীরে আর্সেনিকের প্রাচুর্য এক এক কলায় এক এক প্রকার। যেমন, দেহকলায়: 0.04 – 0.09 (শুষ্ক ভিত্তিতে), তাজারক্তে: 0.18 – 0.22, চুলে: 0.03 - 74 (গড় 0.81), চর্মে: 0.12 (গড়) এবং নখে: 0.36 ppm। চর্ম, নখ ও চুলে As সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত হয় এবং কোনো কোনো গবেষক মনে করেন চুলে মৌলটির পরিমাণ 3 ppm এর বেশি হলে তা আর্সেনিকের দূষণজনিত বলে সন্দেহ করা উচিত। যাহোক, পানীয় পানির জন্য আর্সেনিকের সহনীয় (tolerance) ও অনুমোদিত মাত্রা (recommended limit) যথাক্রমে 0.05 ও 0.01 ppm (WHO কর্তৃক নির্ধারিত)। তবে, ভারতবর্ষে পানীয় পানির জন্য মৌলটির সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে 0.02 ppm; বাংলাদেশের স্টান্ডার্ড WHO এর অনুরূপ। আর্সেনিক নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের 0.5 mg /m^3 এর বেশি আর্সেনিক বাষ্পের (মৌল অথবা যৌগ) সংস্পর্শে থাকা উচিত নয় (TLV 0.5 mg/m^3)।

খ. প্রকৃতিতে আর্সেনিক : আর্সেনিক জল, স্থল, বায়ু ও জীবমণ্ডল সর্বত্র বিদ্যমান; ভূত্বকে এর প্রাচুর্য 5×10^{-4}% (5 ppm) এবং সামুদ্রিক পানিতে 0.03 – 0.024 ppm তবে প্রাকৃতিক পানিতে মৌলটির মাত্রা প্রায়ই বেশি থাকে। প্রকৃতিতে আর্সেনিক মৌল আকারে এবং আকরিকে বিভিন্ন প্রকার সালফাইড, অক্সাইড, সেলেনাইড ও ভারি ধাতুর আর্সেনেট আকারে অবস্থান করে। সাধারণত FeAsS অথবা $FeAsS_2$ থেকে নির্বাত পাতন প্রক্রিয়ায় মৌলটি নিষ্কাশন করা হয়।

আর্সেনিক বেশ কিছু শিল্পে ব্যবহৃত হয়; এদের মাঝে কাঠ সংরক্ষণ এবং সংকরধাতু, পিতল (bronze) ও আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি (shots) তৈরিতে মৌলটির ব্যবহার ব্যাপক; As গুলিকে শক্ত করে। বর্তমানে ট্রানজিস্টরের ডোপিং এজেন্ট (doping agent) হিসেবে As এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিকের বেশকিছু যৌগও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ও শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত হয়। যৌগগুলোর মাঝে As_2O_3 (সাদা As), As_2O_5, As_2S_3 (অরপিমেন্ট - রঞ্জক), As_2S_5, AsH_3, $KAsO_2$, $FeAsO_4$ ও $AsCl_3$ উল্লেখযোগ্য।

আর্সেনিক বিভিন্ন উৎস থেকে পরিবেশে স্থান পায়; উৎসগুলোর মাঝে ভূত্বকের ক্ষয়, শিল্প কারখানার বর্জ্য ও জীবাশ্ম জ্বালানি বিশেষ করে কয়লার দহন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জীবাশ্ম জ্বালানির মাঝে সামান্য পরিমাণ As বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থায় উপস্থিত থাকে। জ্বালানি যখন পোড়ানো হয় তখন ধোঁয়ার সাথে As বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং পরে সেখান থেকে প্রাকৃতিক জলাধারে তা যুক্ত হয়। তামা, সোনা ও সীসা

পরিশোধনের সময়ও উপজাত (by-product) হিসেবে কিছু পরিমাণ As বেরিয়ে আসে এবং পরিবেশে প্রবেশ করে। পূর্বে আর্সেনিকের বেশ কিছু যৌগ, যেমন, প্যারিস গ্রীন [$3Cu(AsO_2)_2$, $Cu(C_2H_3O_2)_2$], ক্যালসিয়াম ও লেড আর্সেনেট কীটনাশক ও বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরিবেশ দূষণে আর্সেনিকের ভূমিকার বিষয় বিবেচনা করে পদার্থগুলোর ব্যবহার বর্তমানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানুষের তৈরি As এর যেসব উৎস তা থেকে প্রতি বছর প্রায় 2.4×10^5 মেট্রিক টন আর্সেনিক পরিবেশে স্থান পায় এবং 'পটভূমি' আর্সেনিক-এর (মানুষের তৈরি উৎস না থাকলে) সাথে যুক্ত হয়ে কোথাও কোথাও তা পরিবেশ দূষণের কারণ হয়।

আর্সেনিক শ্বাস-প্রশ্বাস (বায়ু) ও পানির মাধ্যমে যেমন, দৈনন্দিন খাবারের সাথেও তেমন মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। মানুষের খাদ্য বস্তুর অধিকাংশগুলোর মাঝে আর্সেনিক থাকে। ইংরেজদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার বেশকিছু খাবার বিশ্লেষণ করে তাতে মৌলটির পরিমাণ পাওয়া গেছে: গম, বার্লি , রাই দ্বারা প্রস্তুত খাবার (cereals): 0.18 ± 0.05, চর্বি: 0.05 ± 0.01, মূল (root) সবজী: 0.08 ± 0.01, ফল: 0.07 ± 0.01, দুধ: 0.05 ± 0.01, মাংস: 0.10 ± 0.05 এবং মাছ: 2.0 ± 0.8 μg/g (তাজা ভিত্তিতে)। অন্যান্য খাবারের তুলনায় সামুদ্রিক খাবারে As এর পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। যেমন মাছ: 2 - 8, ঝিনুক (oyster): 3 - 10, মাসল (mussel: শামুকজাতীয় প্রাণী): 120 ppm As: কোনো কোনো স্থানের সামুদ্রিক চিংড়িমাছে (prawn) 174 ppm পর্যন্ত As পাওয়া যায়। সাধারণ খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় 0.4 mg As একজন লোকের শরীরে প্রবেশ করে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এর পরিমাণ আরও বেশি, দৈনিক প্রায় 0.9 mg ।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক : গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার বেশ কয়েকটি জেলায় আজ কয়েক বছর যাবৎ ভূগর্ভস্থ পানিতে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে, কোথাও কোথাও মাত্রা 2 ppm ও অতিক্রম করে (যেখানে পানীয় পানিতে মৌলটির সহনীয় মাত্রা 0.05 ppm)। অঞ্চলটি গ্রাম প্রধান এবং গ্রামের লোকের পানীয় ও সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানিই প্রধান অবলম্বন। উচ্চমাত্রার আর্সেনিকযুক্ত পানি বছরের পর বছর নিয়মিত পান করার ফলে এই অঞ্চলের এক বিরাট সংখ্যক লোক আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং আক্রান্তদের ভিতর থেকে কিছু সংখ্যক ইতোমধ্যে মারাও গেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, সমস্যাটি ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো কোনো পরিবেশ বিজ্ঞানী মনে করেন, ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, ভয়াবহতার দিক দিয়ে তা ভূপাল কিংবা চেরনোবিল ট্রাজেডির সাথে তুলনীয় এবং সমস্যাটির প্রতিকারে সত্বর কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটার ও নানাবিধ জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত

হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি (NGO) ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চেষ্টা চলছে এবং আশাব্যঞ্জক কিছু ফলাফল ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে।

ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উৎস : গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে বিরাট এলাকা জুড়ে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের যে দূষণ সৃষ্টি হয়েছে তার সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে দুটি তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। ব্যাখ্যা দুটির ভিত্তি 'জারণ' ও 'বিজারণ', বিপরীতধর্মী দুটি মডেল এবং উভয় মডেলে ধরে নেয়া হয়েছে, ভূগর্ভস্থ শিলা উক্ত আর্সেনিকের উৎস।

১. জারণ মডেল : ভূ-গর্ভের যে স্তর থেকে পানি তোলা হয় সেখানে আর্সেনিক কঠিন পাইরাইট (FeS_2) এর মাঝে আবদ্ধ। বদ্বীপ অঞ্চলের মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ও সেচকাজের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির উপর কার্যত নির্ভরশীল এবং কোনো কোনো মৌসুমে এতে বেশি পরিমাণ পানি ভূগর্ভ থেকে তোলা হয় যে, পানির স্তর নেমে যায়। ঐসময় পানির উপর শিলার যে স্তর ফাঁকা হয়ে যায় সেখানে পাইরাইট এর জারণ ঘটে এবং আর্সেনিক তখন পাইরাইট থেকে মুক্ত হয়। পরে যখন ফাঁকা স্তর পানি দ্বারা আবার পূর্ণ হয়, আর্সেনিক তখন পানিতে দ্রবীভূত হয়ে তাতে দূষণ সৃষ্টি করে।

মডেলটির দুটি দিক বাস্তবের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ; যেমন, এক. ধারণা করা হয়েছে, পানির উপর ফাঁকা শিলাস্তরে পাইরাইট এর জারণ ঘটে অথচ ভূগর্ভস্থ পরিবেশ সাধারণভাবে বিজারণধর্মী। দুই. ভূগর্ভস্থ পানি যখন তোলা হয় তখন বাস্তবে লৌহ তাতে বিজারিত অবস্থায় (ফেরাস-Fe^{2+}) থাকে; জারিত লৌহ (ফেরিক, Fe^{3+}) তাতে থাকে না বললে চলে।

২.বিজারণ মডেল: গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ শিলা পাললিক (sedimentary)। হাজার হাজার বছর আগে শিলাস্তর যখন গঠিত হয় তখন আর্সেনিক $Fe(OH)_3/Fe_2O_3$ এর সাথে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ অথবা কঠিন অক্সাইড পৃষ্ঠে পরিশোষিত অবস্থায় শিলাস্তরে প্রবেশ করে। ভূগর্ভের পরিবেশ বিজারণধর্মী; শিলাস্তরে ফেরিক লৌহের, তাই ফেরাসে ক্রমশ বিজারণ ঘটে চলেছে। ফেরাস লৌহ পানিতে দ্রবণীয় বলে আর্সেনিকসহ তা ভূগর্ভস্থ পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং পানিতে দূষণ সৃষ্টি করে। জারণ মডেলের যেসব অসঙ্গতি তা বিজারণ মডেলে নেই; মডেলটি তাই অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

ঘ. আর্সেনিকের বিষক্রিয়া: আর্সেনিক যদিও সাধারণভাবে বিষ হিসেবে পরিচিত একটি মৌল তবে মৌলের রাসায়নিক অবস্থা, জীবকলায় তার দ্রবণীয়তা, গৃহীত পরিমাণ, আক্রমণের প্রকোপ (rate of exposure) প্রভৃতি নিয়ামকভেদে মৌলটির বিষক্রিয়ায় বিরাট পার্থক্য ঘটে। যেমন, জৈব আর্সেনিকের তুলনায় অজৈব আর্সেনিক এবং অজৈব আর্সেনিকে পাঁচযোজী আর্সেনিকের তুলনায় (যেমন, As_2O_5, AsO_4^{3-}

প্রভৃতি) তিনযোজী আর্সেনিক (যেমন AsH_3, As_2,O_3, AsO_2^- প্রভৃতি) সাধারণত অনেক বেশি বিষাক্ত। আর্সাইন (AsH_3) গ্যাস অতি তীব্র একটি বিষ, এর খুব সামান্য পরিমাণও যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করে, তাতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে [আর্সেনিক নির্ণয় করার সময় তাকে উদ্বায়ী AsH_3 গ্যাসে পরিণত করা হয়; অতএব, বিশ্লেষকের কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত]। বস্তুত, আর্সনিকের যে বিষক্রিয়া তার জন্য এর তিনযোজী অজৈব আর্সেনিক (As^{3+}) প্রধানত দায়ী থাকে। আর্সেনিক যখন পরিবেশে প্রবেশ করে তখন সাধারণত তা অজৈব আকারে থাকে; ভূপৃষ্ঠে অথবা জলাশয়ে বিজারণধর্মী পরিবেশে জৈবিক প্রক্রিয়ায় অজৈব আর্সেনিক জৈব আর্সেনিকে পরিণত হয়। যেমন,

$$H_3AsO_4 + 2H^+ + 2e \rightarrow H_3\ AsO_3 + H_2O$$

$$H_3AsO_3 \xrightarrow{\text{মিথাইল কোবাল্যামিন}} CH_3AsO(OH)_2$$ মিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড

$$CH_3AsO(OH)_2 \xrightarrow{\text{মিথাইল কোবাল্যামিন}} (CH_3)_2AsO(OH)$$ ডাইমিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড

$$(CH_3)_2AsO(OH) + 4H^+ + 4e \rightarrow (CH_3)_2AsH + 2H_2O$$ ।

আর্সেনিককে সাধারণভাবে প্রোটোপ্লাজম এর বিষ হিসেবে গণ্য করা হয়; এটি কোষ ও কলার শ্বসন ক্রিয়া (respiration) বন্ধ করে দেয়। আর্সেনিক সঞ্চয়ী একটি বিষ; দেহের মাঝে এটি একটু একটু করে জমে এবং বহুদিন পর্যন্ত তার বিষক্রিয়া চলতে থাকে। প্রধানত নিম্নলিখিত প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো বিষক্রিয়া সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে:

১. সহ-এনজাইমের (co-enzyme) সাথে As এর বিক্রিয়া;

২. ATP সংশ্লেষণের সাথে সংশ্লিষ্ট ফসফোরিলেশন বিক্রিয়ায় As এর প্রতিবন্ধকতা এবং

৩. As এর প্রভাবে প্রোটিনের ঘনীভবন।

বেশ কিছু এনজাইম আছে, যারা মুক্ত সালফিড্রিল গ্রুপ (-SH) বহন করে; গ্রুপগুলোর মধ্যস্থতায় কোষের বিপাকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আসের্নিক (III) 'মুক্ত -SH' এর সাথে রাসায়নিক বন্ধনে যুক্ত হয় এবং পরিণতিতে এনজাইম এর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়:

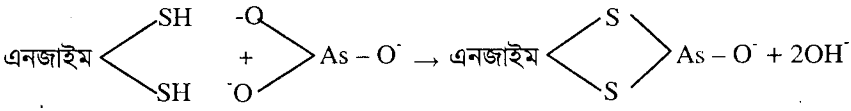

আর্সেনিক ও ফসফরাস রাসায়নিকভাবে সমধর্মী দুটি মৌল; তাই, যেসব প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ায় P সংশ্লিষ্ট থাকে, As (III) এর উপস্থিতিতে তাতে

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। জীবকোষের শক্তি সঞ্চালনে এডিনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে; কোষে As (III) উপস্থিত থাকলে ATP এর জৈবিক সংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটে। ATP সংশ্লেষণের অন্তর্বর্তী এক ধাপে গ্লিসারালডিহাইড -3-ফসফেট থেকে 1,3 -ডাইফসফোগ্লিসারেট উৎপন্ন হয়। তবে, As (III) এর উপস্থিতিতে সেখানে 1-আর্সেনো-3-ফসফোগ্লিসারেট ও আর্সেনেট উৎপন্ন হতে থাকে এবং পরে প্রথমোক্ত যৌগটি আবার ফসফোগ্লিসারেট ও আর্সেনেটে ভেঙ্গে যায়। ATP সংশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য ফসফোরিলেশন বিক্রিয়া তাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

কোষে As(III) উচ্চমাত্রায় উপস্থিত থাকলে প্রোটিন জমাট বাঁধে এবং এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। প্রোটিনের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি গঠন সালফারের মাধ্যমে সম্ভবত সৃষ্টি হয়; As(III) উক্ত সালফারের সাথে বিক্রিয়া করে বলে হয়ত প্রোটিন জমাট বেঁধে যায়।

আর্সেনিক খাদ্য, পানীয় ও শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করে প্রধানত যকৃত, ফুসফুস, হাড় ও চর্মে জমা হয় এবং পরে প্রস্রাব ও মলের সাথে তা বেরিয়ে যায়। শরীরে আর্সেনিকের শোষণ ও ধারণ এবং শরীর থেকে তার অপসারণ মৌলটির রাসায়নিক অবস্থা ও মাত্রার উপর নির্ভর করে। খাদ্যবস্তুর মাঝে As সাধারণত যে আকারে থাকে সে আকারেই শরীরে তার শোষণ ঘটে এবং প্রধানত প্রস্রাবের সাথে তা দ্রুত শরীর থেকে অপসারিত হয়। আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইডও (As_2O_3) শরীরে শোষিত হয় কিন্তু এর বেশিরভাগ কলায় থেকে যায়। প্রস্রাবে আর্সেনিকের পরিমাণ মৌলটির গৃহীত পরিমাণের উপর নির্ভর করে; তাই, কোনো ব্যক্তি আর্সেনিক দূষণের শিকার হয়েছে কিনা তা তার প্রস্রাব পরীক্ষা করে জানা যায়। যারা আর্সেনিক নিয়ে কাজ করেন, দিনের পর দিন তাদের আর্সেনিক বাষ্পের সংস্পর্শে থাকতে হয়; এরূপ একজন ব্যক্তির প্রস্রাবে, বিষক্রিয়ার কোনো লক্ষণ ছাড়াই, গড়ে 70 μg/L As উপস্থিত থাকে এবং কখনো কখনো তা 5 mg/L পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। প্রস্রাবের সাথে যে আর্সেনিক শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তা প্রধানত 'মিথাইল' গ্রুপ যুক্ত (methylated) অবস্থায় থাকে।

আর্সেনিকের তীব্র বিষক্রিয়ায় (acute poisoning : একবারে 100 mg এর বেশি As) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়; এতে হৃদসংবহন তন্ত্রের (cardiovascular system) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ে এবং দুই/এক ঘণ্টার মাঝে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটতে পারে। আর্সেনিক উচ্চমাত্রায় গ্রহণ করার সাথে সাথে তীব্র পেটব্যথা ও বমি শুরু হয় এবং সাথে মাথাঘোরা, মাথাধরা, ভীষণ দুর্বলতা, পাতলা পায়খানা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। যারা কিছুদিন বেঁচে থাকে তাদের গায়ের চর্ম উঠে যায় ও প্রান্তীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা সৃষ্টি হয়।

আর্সেনিকের মৃদু বিষক্রিয়া যখন বহুদিন যাবৎ চলতে থাকে (chronic poisoning) তখন সূক্ষ্মভাবে তা কাজ করে এবং ধীরে ধীরে পাকাশয় ও অন্ত্রের নালী

(gastrointestinal tract), স্নায়ুতন্ত্র, কিডনি ও যকৃত আক্রান্ত হয়। এসময় আক্রান্ত ব্যক্তির হাত পা জ্বালা করে ও অবশ হতে থাকে; কিডনি ও যকৃত বিকল হতে থাকে; এমন কি, যকৃত কঠিন হয়ে যায় (cirrhosis) এবং তাতে পচন ধরে (necrosis)। আর্সেনিকের দীর্ঘস্থায়ী মৃদু বিষক্রিয়ায় একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে তার ওজন হারাতে থাকে, পাকাশয় ও অন্ত্রের ব্যাধিতে ভোগে, পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও ডায়ারিয়ার শিকার হয়, তার ক্ষুধা কমে যায়, বমিভাব লাগে, চর্মে কালো কালো দাগ পড়ে ও স্ফোটক ওঠে; এমনকি এক পর্যায়ে তার চুলও উঠে যায়। বিষক্রিয়া খুব বেশিদিন চলতে থাকলে চর্মে ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গে ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। তাইওয়ানের একটি অঞ্চলে পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ অত্যধিক; সে অঞ্চলে চর্ম ক্যান্সারের ঘটনা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি ঘটে।

আর্সেনিকের বিষক্রিয়া মা থেকে সন্তানে প্রবেশ করে বলেও মনে হয়; জীবজন্তুর উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়,আর্সেনিক ডিম্বকবাহী গর্ভপত্রের ঝিল্লি (placental membrane) অতিক্রম করে ভ্রূণে প্রবেশ করে; এতে শাবক বিকলাঙ্গতার শিকার পর্যন্ত হয়।

আর্সেনিকের বিষক্রিয়া জনিত বড় বড় দুর্ঘটনা এ পর্যন্ত যতগুলো ঘটেছে, তার মাঝে জাপানে গুড়া দুধে আর্সেনিক দূষণ সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এক সময় জাপানে শিশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত গুড়া দুধের ফর্মুলায় আর্সেনিকের মিশ্রণ ঘটে; এতে প্রায় বার হাজার শিশু আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় যার মধ্য থেকে ১৩০ টি শিশু মারা যায় এবং যারা বেঁচে ছিল তারা দৈহিক খর্বতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয়।

আর্সেনিক বিষক্রিয়ার প্রভাব এমন মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও এখনো ইউরোপে কোনো কোনো উপজাতির মাঝে উচ্চমাত্রার As_2O_3 সেবন প্রচলিত আছে; এসব উপজাতীয়দের বিশ্বাস, এতে তাদের সহ্যশক্তি বাড়ে। সম্ভবত, বংশানুক্রমে অভ্যস্থ হওয়ার ফলে আর্সেনিকে তাদের শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় না; অনভ্যস্ত একজন ব্যক্তি ঐরূপ মাত্রার As_2O_3 সেবন করলে তার শরীরে তীব্র বিষক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

ঙ. আর্সেনিকের দূষণ নিয়ন্ত্রণ : বর্তমানে পরিবেশে As দূষণ সৃষ্টি হতে পারে সাধারণত দুটি উৎস থেকে-আর্সেনিকের বর্জ্য এবং আর্সেনিকসংশ্লিষ্ট কাজের পরিবেশে পদার্থটির বাষ্প। দুটি উৎসই নিয়ন্ত্রণযোগ্য; বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ও কর্মস্থলের পরিবেশ রক্ষায় সতর্কতা অবলম্বন করা হলে উক্ত দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার বিরাট জনগোষ্ঠী যে আর্সেনিক দূষণের শিকার হয়েছে, তার উৎস প্রাকৃতিক, ভূত্বকের শিলা থেকে পানিতে এর মিশ্রণ ঘটেছে। এ জাতীয় প্রাকৃতিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য বলে মনে হয় এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় দুটি - পানির উৎস বর্জন করা অথবা পানি থেকে মৌলটি অপসারণ করা। ভূগর্ভস্থ যে স্তরের পানিতে আর্সেনিক বিদ্যমান সে স্তর বাদ দিয়ে অন্য স্তর থেকে পানি তোলা হলে, আর্সেনিকমুক্ত পানি পাওয়া যেতে পারে কেননা স্তরভেদে শিলার

গঠন ভিন্ন হয়। বাংলাদেশে সম্ভাবনাটি যাচাই করে দেখা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া গেছে। পানি থেকে আর্সেনিক অপসারণের উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা প্রকল্পভিত্তিতে কাজ করে চলেছে এবং সাধারণের ব্যবহারোপযোগী কিছু ফিল্টার পদ্ধতির সাহায্যে পানীয় পানি আর্সেনিকমুক্ত করে তা তারা পরিবারে সরবরাহ করেছে। এসব পদ্ধতির সাধারণ নীতি, ফেরিক ক্লোরাইড অথবা ফটকিরির $[K_2SO_4, Al_2(SO_4)_3 . 2H_2O]$ সাহায্যে পানির আর্সেনিক Fe/Al হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপে আবদ্ধ করা এবং পরে বালুস্তরের সাহায্যে ফিল্টার করে পানি থেকে তা অপসারিত করা। বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য আর একটি অবদান, প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের মাঝেও তারা পানির আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে চলেছে।

চ.আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা : ডাইমারক্যাপ্রোল, $[HSCH_2CH(SH)CH_2OH]$ (BAL= British Anti-Lewsite) আর্সেনিকজনিত তীব্র বিষক্রিয়ার কার্যকর একটি প্রতিষেধক; পদার্থটির একটি জলীয় দ্রবণ আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে আর্সেনিক পদার্থটির সাথে স্থিতিশীল একটি যৌগ গঠন করে এবং সে অবস্থায় দ্রুত শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তবে, সেই সাথে ব্যবস্থা নিতে হয় যাতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে পানি ও ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি সৃষ্টি হতে না পারে।

৭.৬ ক্রোমিয়াম (Chromium, Cr)

ক. **ভূমিকা** : ক্রোমিয়াম একটি ধাতু; ভূত্বকে এর প্রাচুর্য 0.037%; সামুদ্রিক পানিতে ধাতুটি সাধারণত সামুদ্রিক জীবের দেহে অবস্থান করে। প্রকৃতিতে ক্রোমিয়াম +3 ও +5 জারণ অবস্থায় স্থিতিশীল। মাত্র কয়েক দশক আগেও ধাতুটিকে বিষ হিসেবে গণ্য করা হতো; পরে প্রমাণিত হয়েছে, শারীরবৃত্তীয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও এটি পালন করে। গ্লুকোজের বিপাকক্রিয়ায় Cr (III) অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির গ্লুকোজ সহ্য করার ক্ষমতা এটি বাড়িয়ে দেয়। আয়নটি অত্যধিক মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করলে বিষক্রিয়া হয়ত সৃষ্টি হতে পারে তবে এর বিষক্রিয়া এতই কম যে, Cr(III) সাধারণত যে মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করে থাকে এবং যে মাত্রার ঊর্ধ্বে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়, এই দুয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য থাকে। ক্রোমিয়ামের বিষক্রিয়া বলতে কার্যত Cr(VI) এর বিষক্রিয়া বুঝায়; ক্রোমেট ধূলির সংস্পর্শে বহুদিন যাবৎ অবস্থান করলে ফুসফুসে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। খাবারের সাথে মিশ্রিত ক্রোমেটও ভীষণ ক্ষতিকর; জীবজন্তুকে প্রতিদিন 50 ppm ক্রোমেট মিশ্রিত খাবার খাইয়ে দেখা গেছে এতে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি কমে যায় এবং যকৃত ও কিডনি বিকল হয়ে পড়ে। ক্রোমেটের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত একজন ব্যক্তি চর্মরোগ, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির প্রদাহ, পাকস্থলীর ঘা, ব্রোঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগের শিকার হতে পারে; এমনকি তার ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। তবে, কিছুটা স্বস্তির বিষয়, Cr(VI) পাকস্থলীর অম্লীয় পরিবেশে কার্যত নির্বিষ Cr (III) তে পরিণত হয়।

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্রোমিয়াম ছড়িয়ে থাকে তবে কোনো অঙ্গে বিশেষ উচ্চ কোনো মাত্রায় এর ঘনীভবন ঘটে না এবং বয়স বাড়ার সাথে দেহে Cr এর মাত্রাও কমতে থাকে। মানুষের রক্ত, মূত্র ও চুলে ধাতুটি বিভিন্ন সময়ে নির্ণয় করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া গেছে: রক্ত সিরাম: 1.58 – 7 ng/mL, মূত্র: 8.4 ± 5.2 μg/day; চুল: 900 ppb (সদ্যজাত শিশু), 440 ppb (2-3 বছর বয়সী শিশু)। শরীর থেকে প্রতিদিন যে পরিমাণ Cr বেরিয়ে যায় তা পূরণ করার জন্য ধাতুটি কি পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত সে ব্যাপারে মতভেদ আছে তবে তত্ত্বীয় এক হিসাবের সাহায্যে দেখানো হয়েছে, প্রতিদিন যদি 5 μg Cr প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে বের হয় তাহলে তা পূরণ করতে খাদ্যের মাধ্যমে ধাতুটির রাসায়নিক অবস্থাভেদে 20 - 500 μg পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত। প্রতিদিন আমরা যে খাবারই খাই তাতে বিভিন্ন মাত্রার Cr থাকে; এমনি কিছু খাবারে Cr এর পরিমাণ: গম 0.36, ডিমের কুসুম - 1.83, চিনি - 0.02, গুড় - 0.26 μg/g । যাহোক, Cr (VI) এর বিষক্রিয়া তীব্র বলে এর ভিত্তিতে পানীয় পানির জন্য ধাতুটির সহনীয় সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (EPA কর্তৃক) 0.05 ppm ।

খ. পরিবেশে ক্রোমিয়াম : ক্রোমিয়ামের প্রধান আকরিক ক্রোমাইট, $FeCr_2O_4$ । সারাবিশ্বে ধাতুটির পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি মেট্রিক টন এবং এর প্রয়োগ বহুবিধ। ক্রোমিয়ামের সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ সম্ভবত ক্রোমাইট হিসেবে। ক্রোমাইটের গলনাঙ্ক উচ্চ, তাপীয় প্রসারণ মাঝারি এবং এর স্ফটিকের গঠন স্থিতিশীল। এজন্য ওপেন হার্থ ও অন্যান্য চুল্লিতে দুর্গল (refractory) প্রলেপ হিসেবে পদার্থটি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া, স্টিল শক্ত করতে, স্টেইনলেস স্টিল ও অন্যান্য সংকর ধাতু তৈরি করতেও প্রচুর পরিমাণ ক্রোমিয়াম ব্যবহৃত হয়। ক্রোমিয়ামের বেশকিছু যৌগ আছে, বিভিন্ন প্রকার শিল্পে যেগুলোর প্রয়োগ ব্যাপক; এদের মাঝে ইলেকট্রোপ্লেটিং শিল্পে $Cr_2(SO_4)_3$, চামড়া পাকাকরণ (tanning), সুতিবস্ত্র ছাপানো (calico printing) ও রঞ্জকশিল্পে পরিষ্কারকারক/ আঠা (mordant) হিসেবে K_2SO_4, $Cr_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ (ক্রোম অ্যালাম), জারক হিসেবে ও চামড়া পাকাকরণ শিল্পে $K_2Cr_2O_7$ এবং রঞ্জক হিসেবে (pigment) Cr_2O_3, (ক্রোমগ্রীন), $BaCrO_4$(লেমন ইত্তলো) ও $PbCrO_4$(ক্রোম ইত্তলো) উল্লেখযোগ্য।

পরিবেশে ক্রোমিয়ামের যে দূষণ সৃষ্টি হয় তার উৎস প্রধানত দুটি - ক্রোমিয়াম সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানার বর্জ্য ও জীবাশ্ম জ্বালানির দহন। জীবাশ্ম জ্বালানি বিশেষ করে কয়লার ধোঁয়ার সাথে প্রতিবছর প্রায় দেড় হাজার মেট্রিক টন ক্রোমিয়াম বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

ক্রোমিয়াম, বিশেষ করে Cr (VI), মানুষের জন্য যেমন, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্যও তেমন একটি বিষ তবে Cd, Hg কিংবা Pb এর তুলনায় ক্রোমিয়ামের বিষক্রিয়া অকেক্ষাকৃত কম তীব্র। পানিতে Cr এর মাত্রা 10 ppm এর বেশি হলে বিভিন্ন শ্রেণী

শৈবালের জন্য তা ক্ষতির কারণ হয়; জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনায় মাছ Cr দূষণের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল।

প্রশ্নমালা

১. ট্রেস মৌল বলতে কি বুঝায়? যেসব ট্রেস মৌল পরিবেশ দূষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২. নিম্নলিখিত মৌলগুলোর পরিবেশের উৎস, বিষক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলোচনা কর।

ক. পারদ, খ. সীসা গ. আর্সেনিক ঘ. ক্যাডমিয়াম ও ঙ. ক্রোমিয়াম

গ্রন্থপঞ্জি

1. Eric. J. Underwood, "Trace Elements in Human and Animal Nutrition', 4th Ed., Academic Press, NY. 1977.

2. S.E. Manahan, 'Environmental 'Chemistry', 6th Ed. Lewis Publishers, USA, 1994.

3. Carole L. Hamilton (Introduction); Chemistry in the Environment' (Collection from Scientific American); Freeman, USA, 1952-73.

4. S.S. Dara; 'A Textbook of Environmental Chemistry and Pollution Control', S-Chand, N. Delhi, 1995.

অষ্টম অধ্যায়

পরিবেশ দূষণ বিশ্লেষণ

(Analysis of Environmental Pollution)

৮.১ ভূমিকা

পরিবেশের যে কোনো অঙ্গে একটি মিশাল (contaminant) উপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু তা ক্ষতিকর নাও হতে পারে। একটি মিশাল দূষক (pollutant) হিসেবে গণ্য হয় তখন, যখন তা জীবন ও সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন মাত্রায় উপস্থিত থাকে। বেশকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক (যেমন, USEPA, WHO প্রভৃতি) বিভিন্ন মিশালের দূষণ-মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; পরিশিষ্ট - ২, ৩, ও ৪-এ এ-সম্পর্কিত কিছু স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করা হলো।

পরিবেশে দূষকের প্রধান দুটি ধারক ও বাহক বায়ু ও পানি। বর্তমান অধ্যায়টি তাই, বায়ু ও পনির দূষণ বিশ্লেষণে সীমিত রাখা হয়েছে। পরিবেশের দূষণ বিশ্লেষণ সাধারণত তিনটি কারণে প্রয়োজন হয়; যথা,

১. বিশ্লেষণীয় উৎস (বায়ু/পানি) জীবন ও সম্পদের জন্য ক্ষতিকর কিনা তা নির্ধারণ করা; প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ডের সাথে বিশ্লেষণের ফলাফল তুলনা করে (স্ট্যান্ডার্ড, পরিশিষ্ট ২ ও ৩ দ্রঃ) বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়।

২. উৎস দূষিত হলে, দূষণ অপসারণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং

৩. দূষণ অপসারণের লক্ষ্যে পূর্বে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান এ অধ্যায়টি তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে, যথা-

ক. সাধারণ আলোচনা,

খ. বায়ুর দূষক বিশ্লেষণ এবং

গ. পানির দূষক বিশ্লেষণ।

৮.ক সাধারণ আলোচনা (General Discussion)

পরিবেশ একটি জটিল সিস্টেম; এতে যে বস্তু-দূষণ সৃষ্টি হয়, রসায়নের পাশাপাশি রসায়ন বহির্ভূত বেশ কিছু বিষয়ের তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বস্তু-দূষণ বিশ্লেষণ

করার কাজটি, তাই, অর্থবহ হতে পারে তখন যখন বিশ্লেষক যুগপৎ একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী ও রসায়ন বিজ্ঞানী হন। পরিবেশের অধিকাংশ দূষক একদিকে যেমন অতি ক্ষুদ্রমাত্রায় এতে উপস্থিত থাকে অন্যদিকে তেমনি পরিবেশের সাথে প্রায়ই তা সাম্যাবস্থায় থাকে না। উক্ত দুই বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশের একটি নমুনা সংগ্রহণ (sampling), সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ (processing) ও নির্ণয়, সকল ক্ষেত্রে এমন সব অনিশ্চয়তা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়,সাধারণ একটি নমুনার বিশ্লেষণে যা হয় না। পরিবেশ-বিশ্লেষণে তাই সাধারণ একটি বিশ্লেষণের তুলনায় অতিরিক্ত কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। নিচে বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হলো।

৮.ক.১ ট্রেস বিশ্লেষণ (trace analysis) : পরিবেশে দূষণ-সৃষ্টির জন্য দায়ী পদার্থগুলো সাধারণত নিম্নঘনমাত্রায় পরিবেশে অবস্থান করে। পরিবেশের দূষণ-বিশ্লেষণকে তাই, সাধারণভাবে 'ট্রেস-বিশ্লেষণ' এর অন্তর্গত একটি বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। নমুনায় একটি বিশ্লেষ্য (analyte) যখন 0.01% কিংবা তারও কম পরিমাণে উপস্থিত থাকে তখন তাকে 'ট্রেস পরিমাণ' (trace amount) এবং ঐরূপ পরিমাণ একটি বিশ্লেষ্যের বিশ্লেষণকে ট্রেস বিশ্লেষণ (trace analysis) বলা হয়ে থাকে। বিশ্লেষণের সময় নমুনা থেকে বিশ্লেষ্যের কিছু না কিছু পরিমাণ সর্বদা হারিয়ে যায় এবং বাহির থেকে কিছু পরিমাণ বিশ্লেষ্য নমুনায় অনেক সময় যুক্তও হয়। নমুনা গাঢ় হলে, এ জাতীয় ঘটনা বিশ্লেষণ-ফলাফলের উপর কার্যত কোনো প্রভাব ফেলে না কিন্তু ট্রেস বিশ্লেষণে এতে ভুলের পরিমাণ অনেক সময় অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছে যায়। ট্রেস বিশ্লেষণে নির্ভরযোগ্য ফলাফলের জন্য তাই সর্বদা বিশেষ কিছু ব্যবস্থা ও সতর্কতা প্রয়োজন হয়, সাধারণ একটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন হয় না। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, গাঢ় নমুনার বিশ্লেষণে যে নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতা (accuracy and precision) পাওয়া যায়, বিশেষ সতর্কতা যতই অবলম্বন করা হোক, ট্রেস বিশ্লেষণে তা কখনও প্রত্যাশা করা যায় না। বস্তুত, ট্রেস বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভুলতার চেয়ে নির্ভুলতার মূল্যায়ন অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়।

৮.ক.২ ট্রেস বিশ্লেষণে গ্রহণীয় বিশেষ ব্যবস্থা : ল্যাবরেটরি - সাধারণ একটি ল্যাবরেটরিতে যে পরিবেশ থাকে, ট্রেস বিশ্লেষণের জন্য তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। ট্রেস বিশ্লেষণের ল্যাবরেটরি ধূলিমুক্ত ও যেকোনো প্রকার মিশাল-এর উৎস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে হয়। নমুনার বিশ্লেষ্য ধাতু হলে তার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ধাতুর বাষ্প; উক্ত বাষ্প ধাতব নির্মাণ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস থেকে ল্যাবরেটরির বায়ুতে মেশে এবং নমুনায় প্রবেশ করে। এভাবে যে পরিমাণ ধাতু একটি নমুনায় মিশতে পারে, সাধারণ একটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহে অতি নগণ্য কিন্তু ট্রেস বিশ্লেষণে ঐ পরিমাণ অপদ্রবের মিশ্রণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভুলের কারণ হতে পারে। ট্রেস বিশ্লেষণের উপযোগী একটি ল্যাবরেটরি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাই নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করা উচিত:

১. ল্যাবরেটরিতে ধাতব নির্মাণ সামগ্রী যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে;
২. ধাতব সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্য হলে ধাতুর উপর এপক্সি পেইন্টের প্রলেপ দিতে হবে;
৩. মেঝে, দেয়াল ও ছাদে এমন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে যাতে ধুলা কম জমে এবং সহজে তা পরিষ্কার করা যায় এবং
৪. ল্যাবরেটরির জন্য একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (vaccum cleaner) ব্যবহার করতে হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ট্রেস বিশ্লেষণের আদর্শ একটি ল্যাবরেটরি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ব্যয়বহুল তবে সাধারণ ল্যাবরেটরির মাঝে পৃথক একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করে তা ট্রেস বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকোষ্ঠটিতে এমন একটি ব্যবস্থা সংযোজন করতে হয় যাতে বাইরের বায়ু ফিল্টার হয়েই কেবল তাতে প্রবেশ করে। উল্লেখ্য, ল্যাবরেটরি যেমনই হোক, যন্ত্র ও সিক্ত রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যবস্থা কখনো একই কক্ষে রাখা উচিত নয়; রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ করে অম্লের ধোঁয়ায় অপটিক্যাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

নমুনা সংগ্রহকরণ : সমগ্র বস্তুর ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ যা ভৌত ও রাসায়নিক গঠনে সমগ্র বস্তুকে প্রতিনিধিত্ব করে, তাকে সমগ্র বস্তুর একটি নমুনা বলে। বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ নমুনা সংগ্রহকরণ; এই ধাপ সঠিক না হলে, বিশ্লেষণ যত নির্ভুলই হোক, তার ফলাফলের কোনো তাৎপর্য থাকে না। নমুনা সংগ্রহ করার কাজটি বেশ কঠিন বিশেষ করে বস্তু যদি অসমসত্ত্ব হয়। পরিবেশের একটি নমুনা যে কোনো বস্তু হতে পারে; যেমন- পানি, বায়ু, মৃত্তিকা, জলাশয়ের তলানি, শিলাখণ্ড, উদ্ভিদ, বর্জ্য প্রভৃতি। অধিকাংশ নমুনার উৎস অসমসত্ত্ব এবং সময় ও আবহাওয়ার সাথে উৎসের পরিবর্তনও ঘটে। যেসব উৎস সমসত্ত্ব বলে মনে হয়,পরিবেশবিষয়ক তথ্যের সাপেক্ষে সেগুলোও অনেক সময় সমসত্ত্ব থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, শান্ত জলাশয়ের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের (O_2) কথা ধরা যাক। জলাশয়ের পানি সমসত্ত্ব বলে মনে হয় অথচ গভীরতা ও তাপমাত্রাভেদে তাতে অক্সিজেন কম বেশি থাকে। বস্তুত, পরিবেশের একটি নমুনার আপাত সমসত্ত্ব যে কোনো অবস্থা উৎস, উদ্দেশ্য অথবা কালের সাপেক্ষে অসমসত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়। নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাই সংগ্রহের পন্থা নির্ধারণ করতে হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের 'নমুনা সংগ্রহ' বিষয়ক আলোচনায় বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

নমুনা সংরক্ষণের পাত্র (sample container): দ্রবণ সংরক্ষণের জন্য যেসব পাত্র সাধারণত ব্যবহৃত হয় তা থেকে অপদ্রব বিশেষ করে ধাতু দ্রবণে যুক্ত কিংবা দ্রবণ থেকে পাত্রে অপসৃত হতে পারে। পাত্রের নির্মাণ বস্তুতে (construction material) ধাতব অপদ্রব মিশ্রিত থাকে (সারণি ৮.১)। সংরক্ষিত দ্রবণ ধাতু আয়নের হলে সে ধাতুর সাথে পাত্রের নির্মাণ বস্তুতে বিদ্যমান ধাতুর বিনিময় ঘটে; এতে একদিকে যেমন

বিশ্লেষ্য ধাতুর একটি ভগ্নাংশ দ্রবণ থেকে হারিয়ে যায় অন্যদিকে তেমনি দ্রবণে ধাতব অপদ্রবের প্রবেশ ঘটে। যদিও, এভাবে বিশ্লেষ্য ধাতুর যে পরিমাণ দ্রবণ থেকে হারায় কিংবা ধাতব অপদ্রব যে পরিমাণে দ্রবণে যুক্ত হয় তা নগণ্য তবে ট্রেস বিশ্লেষণে উক্ত নগণ্য পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভুলের কারণ হতে পারে। পাত্র থেকে ধাতুর স্খলন ও দ্রবণ থেকে পাত্রে ধাতুর শোষণ দ্রবণে ধাতুর রাসায়নিক অবস্থা, দ্রবণের pH, পাত্রের নির্মাণ-বস্তু, নির্মাণ বস্তুর পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি শর্তের উপর নির্ভর করে।

সারণি ৮.১. দ্রবণ সংরক্ষণ পাত্রের নির্মাণ বস্তুতে ট্রেস ধাতু (ppb)।

নির্মাণ বস্তু	Se	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	Zn	Ag	Sb	Pb
পলিথিলিন										
উচ্চ ঘনত্ব	-	15 - 300	<10	600-2100	5	4	90	20	<5	200
নিম্ন ঘনত্ব	-	180 - 1500	-	-	10 - 370	-	300	<10	<10	-
টেফলন	<0.004	<30	-	35	1.7	22	9.3	<0.3	0.4	-
বোরো সিলিকেট কাচ	106	-	-	2.8×10^5	81	-	730	<0.01	2900	-

তাই, ট্রেস বিশ্লেষণে নমুনা বা প্রমাণ দ্রবণ সংরক্ষণের জন্য কোন বস্তুর পাত্র সবচেয়ে বেশি উপযোগী, গবেষক মহলে সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ গবেষক এক্ষেত্রে প্লাস্টিক পাত্র ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। তবে, প্লাস্টিক পাত্রের একটি ক্রটি, এতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। দ্রবণ বহুদিন যাবৎ এতে সংরক্ষণ করা হলে ছিদ্রপথে নমুনার একটি ভগ্নাংশ বাষ্পাকারে উবে যেতে পারে। কোনো কোনো গবেষকের পর্যবেক্ষণ, উচ্চ ঘনত্ব রৈখিক পলিথিন (high density linear polythene) দ্বারা নির্মিত পাত্র দ্রবণ সংরক্ষণের জন্য সর্বোত্তম; যদিও পারদ দ্রবণ সংরক্ষণের জন্য বোরোসিলিকেট কাচের পাত্র সবচেয়ে বেশি উপযোগী। অনেকে আবার টেফলন (TEFLON) পাত্র উত্তম বলে মনে করেন, যদিও টেফলনের মাঝে Mn, Zn, Al, Fe ও Cu ধাতুর উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে। বস্তুত, নির্মাণ বস্তু যেমনই হোক, প্রস্তুত-পদ্ধতির মাধ্যমে তাতে বিভিন্ন প্রকার ধাতু মিশ্রিত হতে পারে। ট্রেস বিশ্লেষণে দ্রবণ সংরক্ষণের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষকদের মাঝে যতই মতবিরোধ থাক, নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করেন:

১. ট্রেস বিশ্লেষণে দ্রবণ সংরক্ষণের জন্য লাইম সোডা কাচের পাত্র মোটেই উপযোগী নয় এবং

২. ধাতু-আয়নের দ্রবণ অম্লীয় অবস্থায় নিম্ন তাপমাত্রায় (4°C) সংরক্ষণ করা সবচেয়ে নিরাপদ।

দ্রবণ সংরক্ষণের পাত্র পরিষ্কারকরণ : ১. উচ্চ ঘনত্ব রৈখিক পলিথিন পাত্র- পাত্র ডিটারজেন্ট দ্রবণ দ্বারা ধুয়ে 1:1 HNO_3 দ্রবণে 2-3 দিন ডুবিয়ে রাখার পর বিশুদ্ধ পানির সাহায্যে ধুয়ে নিতে হয়।

২. কাচ পাত্র - (ক্রোমিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যাবে না)। বেশ কয়েকদিন অম্লরাজের মাঝে (aqua regia 3:1 HNO_3-HCl) ডুবিয়ে রেখে বিশুদ্ধ পানি দ্বারা পাত্র ধুয়ে ফেলতে হয়।

৩. টেফলন পাত্র - ডিটারজেন্ট দ্বারা ধুয়ে অম্লরাজের মাঝে 50°C তাপমাত্রায় বেশ কয়েকঘন্টা রেখে দেয়ার পর বিশুদ্ধ পানি দ্বারা ধুয়ে নিতে হয়। জৈব ময়লা অপসারণের জন্য পাত্র 1% $KMnO_4$ দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে HCl দ্বারা ধুয়ে নিতে হয়।

বিশুদ্ধ পানি : ট্রেস বিশ্লেষণে দ্রবণ প্রস্তুত ও পাত্র ধৌতকরার জন্য সর্বদা 'বিশুদ্ধ পানি' ব্যবহার করা উচিত। 'পানির বিশুদ্ধতা' তার বৈদ্যুতিক রোধ ও উপস্থিত মোট কঠিন বস্তুর (দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত) সাপেক্ষে নির্ধারিত হয়। পিপিবি (মাইক্রোগ্রাম/ লিটার) স্তরের ট্রেস বিশ্লেষণে পানির বৈদ্যুতিক রোধ 10 মেগাওহম এর বেশি এবং কঠিন বস্তুর উপস্থিতি 1 μg/mL (1 ppm) এর কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাতন কিংবা আয়নমুক্তকরণ কিংবা পদ্ধতি দুটির যৌথ প্রয়োগে ঐরূপ বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যেতে পারে। পানি পাতনের জন্য বোরোসিলিকেট কাচের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে, ধাতু নির্মিত কোনো যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা যাবে না। পানিতে জৈব মিশাল (contaminant) উপস্থিত থাকলে, ক্ষারীয় পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে পানি পাতিত করতে হয়; এতে জৈব বস্তুর CO_2-এ জারণ ঘটে। পানির জন্য সর্বোচ্চ মাত্রার বিশুদ্ধতা প্রয়োজন হলে স্ফুটনাঙ্কের নিম্নতর তাপমাত্রায় পানির পাতন সম্পন্ন করা উচিত (<1 L / দিন)। বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণ করাও একটি সমস্যা; প্লাস্টিক কিংবা কাচপাত্রে এটি বহুদিন যাবৎ সংরক্ষণ করা হলে, পাত্র থেকে ধাতু পানিতে যুক্ত হতে পারে। পানি বিশুদ্ধ করার পরপরই তাই তা ব্যবহার করা উচিত।

বিকারক (reagent): ট্রেস বিশ্লেষণের বিকারক উচ্চমাত্রায় বিশুদ্ধ হতে হয়। বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে এ জাতীয় বিকারক পাওয়া যায়; যেমন, ফিশার সার্টিফায়েড এসিএস (Fisher Certified ACS), ফিশার সার্টিফায়েড, ফিশার রিএজেন্ট গ্রেড (Fisher Reagent Grade), বিডিএইচ (BDH), কেমিক্যালস (Chemicals), সুপ্রাপুর (Suprapur), এরিস্টার (Aristar) প্রভৃতি। 'চুল্লী - পারমাণবিক - বিশ্লেষণ' (Electrothermal atomization) পদ্ধতির মতো ক্ষেত্রে বিকারকে যে স্তরের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন হয় রিএজেন্ট গ্রেড'(Reagent Grade) এর বিকারক তা পূরণ করতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে BDH, Suprapur, Aristar প্রভৃতি গ্রেডের বিকারক ব্যবহার করা উচিত। বিকারক যে গ্রেডেরই হোক, বহুদিন সংরক্ষণ করা হলে, তাতে মানের অবনতি ঘটে। ফলে, বিকারক পুরাতন হলে তা ফেলে দিয়ে নতুন বিকারক সংগ্রহ করা উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিকারক যত বেশি বিশুদ্ধ হয়, তত তার দাম বাড়ে (দশ/বিশ গুণ পর্যন্ত)।

ট্রেস বিশ্লেষণে এক বা একাধিক ফাঁকা বিশ্লেষণ (blank determination) প্রয়োজন হয়; বিকারক এরিস্টার গ্রেডের মতো সর্বোচ্চ মাত্রার বিশুদ্ধ হলেও ফাঁকা বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। ফাঁকা বিশ্লেষণ বিকারকের অপদ্রবজনিত ভুল এবং বিশ্লেষণের যে কোনো মিশালজনিত ভুল সংশোধন করার একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। ফাঁকা বিশ্লেষণের প্রমাণবিচ্যুতি দ্বারা নমুনা বিশ্লেষণের মাপন সীমা (detection limit) নির্ধারিত হয়:

$$\text{মাপনসীমা} \cong 3\sigma_b,$$

যখন, σ_b: ফাঁকা বিশ্লেষণের প্রমাণ বিচ্যুতি

প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতকরণ : ট্রেস বিশ্লেষণে প্রমাণ দ্রবণের ঘনমাত্রাও নিম্ন থাকে। দ্রবণ ধাতু আয়নের হলে তা যত লঘু হয় তত তার স্থিতিশীলতা ও ঘনমাত্রা হ্রাস পায়। ধাতু আয়নের রাসায়নিক পরিবর্তন এবং সংরক্ষণ-পাত্রে ধাতুর শোষণ ঘনমাত্রার অবনতি ঘটায়। তাছাড়া লঘু প্রমাণ দ্রবণ তৈরিতে ঘনমাত্রায় ভুলের আপেক্ষিক পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেননা ওজনকৃত পদার্থের পরিমাণ যত কম হয়, ওজনে ভুলের আপেক্ষিক পরিমাণ তত বাড়ে। ট্রেস বিশ্লেষণের প্রমাণ দ্রবণ তাই একটি মজুদ (stock) গাঢ় প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে তৈরি করা উচিত। মজুত দ্রবণের ঘনমাত্রা 1000 - 10,000 পিপিএম (μg/mL) ও পরিমাণ 100 – 1000 mL হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ একটি দ্রবণ প্রস্তুত করতে বিকারক মানের (reagent grade) একটি রাসায়নিক পদার্থও ব্যবহার করা যেতে পারে (পরিশিষ্ট -৭ দ্রঃ)

ধাতু আয়নের দ্রবণ অম্লীয় অবস্থায় স্থিতিশীল; অম্লত্ব যত নিম্ন হয়, ধাতু আয়নের তত বেশি জলাম্বয়ন ঘটে। প্রায় 1000 ppm ঘনমাত্রার একটি ধাতু আয়নের দ্রবণে শক্তিশালী অম্ল 1% কিংবা তারও বেশি পরিমাণ উপস্থিত থাকলে দ্রবণটি বছরাধিক কালও স্থিতিশীল হতে পারে।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি : রাসায়নিক বিশ্লেষণের অতি জনপ্রিয় দুটি পদ্ধতি, টাইট্রিমিতি ও ভরমিতি, ট্রেস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপযোগী নয় কেননা এদের মাপনসীমা (detection limit) ট্রেস বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বতম যে সীমা তারও ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। নমুনা ঘনীভূত করে পদ্ধতি দুটি ব্যবহার করা যেতে পারে তবে নমুনা ঘনীভূত করার সময় তার অপচয় ঘটতে পারে; এতে ফলাফলের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে যেসব পদ্ধতি ট্রেস বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তাদের মাঝে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান:

১. পরমাণু বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS)-শিখা (flame) ও তড়িৎ-তাপীয় পরমাণুকরণ (electrothermal atomization)

২. পরমাণু নির্গমন বর্ণালি বিশ্লেষণ (Atomic Emission Spectroscopy, AES);

৩. নিউট্রন সক্রিয়ণ বিশ্লেষণ (Neutron Activation Analysis, NAA);

৪. অ্যানোডিয় স্খলন ভোলটামিতি (Anodic Stripping Volta-metry, ASV),

৫. প্রতিপ্রভা বর্ণালি বিশ্লেষণ (Spectrofluorometry);

৬. ভর বর্ণালিমিতি (Mass Spectrometry, MS) ও

৭. অতিবেগুনি আণবিক বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (UV Molecular Absorption Spectroscopy) ।

সারণি ৮.২ : ট্রেস বিশ্লেষণে ব্যবহারোপযোগী কিছু পদ্ধতির মাপনসীমা (D) / সংবেদনশীলতা (S), ppb একক।

মৌল	AAS-Flame (D)	AAS-ET(D)	AES-ICP(D)	NAA(S)	ASV(D)	AFS(S)
Cr	2	0.4	2	300	-	4
Cu	2	0.4	2	2	0.5	1
Se	100	0.1	30	10	-	8
Sn	1000	0.4	3	30	0.2	50
V	20	0.5	2	2	-	70
Zn	0.6	0.2	1	100	0.4	0.02
As	100	0.2	20	50	-	100
Ba	200	0.06	5	20	-	-
Be	20	0.001	3	-	-	-
Bi	50	0.3	50	-	0.05	-
Cd	1	0.003	1	5	0.005	0.01
Hg	2200	0.5	5	3	1	20
Pb	10	0.05	20	500	0.01	10
Sb	30	0.2	200	7	0.1	-
Tl	300	0.07	200	-	0.01	-

[AAS: Atomic Absorption Spectroscopy

AAS-ET: Electrothermal Atomization AAS

AES-ICP: Atomic Emission Spectroscopy – Inductively coupled Plasma atomization

NAA: Neutron Activation Analysis

ASV: Anodic Stripping Volta-metry

AFS: Atomic Fluorescence Spectroscopy]

সূত্র : G.H. Morrison, Critical Reviews, Anal. Chem., 8, 287(1979)] .

এছাড়া গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির সাথে শিখা আয়নায়ন (flame ionisation), তাপীয় পরিবাহিতা (thermal conductivity), ইলেকট্রন অধিগ্রহণ (electron capture) প্রভৃতি ডিটেক্টর সংযুক্ত করে ট্রেস বিশ্লেষণে তা ব্যবহার করা যায়। যাহোক, ট্রেস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় এমন কিছু পদ্ধতির মাপনসীমা / সংবেদনশীলতা (detection limit / sensitivity) ৮.২ সারণিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, নমুনা সংগ্রহ করা থেকে ফলাফল প্রস্তুতকরা পর্যন্ত আটটি ধাপ একটি বিশ্লেষণে জড়িত থাকতে পারে; এর মাঝে 'বিশ্লেষণ পদ্ধতি নির্বাচন' মাত্র একটি ধাপ। তাই কেবল বিশ্লেষণ পদ্ধতি উত্তম হলেই ফলাফল নির্ভুল হয় না। বস্তুত, বিশ্লেষণে যেসব ভুল সচরাচর ঘটে, মাত্রার ভিত্তিতে তাদের ক্রম নমুনা সংগ্রহকরণ > নমুনা প্রস্তুতকরণ > বিশ্লেষ্য নির্ণয়করণ। অতএব, নমুনা সংগ্রহকরণ ও নমুনার মাপন-পূর্ব প্রস্তুতিতে ত্রুটি ঘটলে, যন্ত্র ও পদ্ধতি যতই উন্নতমানের হোক, ফলাফল নির্ভুল হতে পারে না।

৮.ক.৩ **মৌলের রাসায়নিক অবস্থা নির্ণয়করণ** (Speciation) : পরিবেশ তথা যে কোনো সিস্টেমে একই মৌল প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন জারণ অবস্থায় এবং অজৈব, জৈব, জৈব-ধাতব প্রভৃতি যৌগ আকারে অবস্থান করে। পরিবেশ রসায়নে একটি মৌলের সাধারণ যে পরিচয় তার পাশাপাশি এর রাসায়নিক অবস্থাও জানার প্রয়োজন হয় কেননা একই মৌল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক অবস্থায় জীব ও সম্পদের উপর প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করে। একই মৌল এক রাসায়নিক অবস্থায় বিষ কিন্তু ভিন্ন অবস্থায় তা নির্বিষ এবং জীবের জন্য অপরিহার্যও হয়। মৌলের রাসায়নিক অবস্থা জানা, তাই পরিবেশ রসায়নে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

মৌলের রাসায়নিক অবস্থা নির্ধারণ করার তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে; যথা, ক. মৌলের সরল একটি সিস্টেম পরীক্ষাগারে পর্যবেক্ষণ খ. মৌলের বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থার যে গঠন ধ্রুবক (k_f) তার ভিত্তিতে,একটি গাণিতিক মডেলের আলোকে, সিস্টেমের সাম্যাবস্থায় স্বতন্ত্র উপাদানের প্রাচুর্য নির্ণয়করণ এবং গ. প্রকৃত নমুনার বিশ্লেষণ। প্রত্যেকটি পদ্ধতির শক্তি ও দুর্বলতা উভয় দিকই আছে তবে সাম্প্রতিককালে GC ও HPLC এর মতো দক্ষ পৃথককরণ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্রকার সংবেদনশীল মাপন যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার পর প্রকৃত নমুনার বিশ্লেষণ পদ্ধতি (গ) সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। পরিবেশের দূষক হিসেবে সাধারণভাবে পরিচিত, এমন কয়েকটি মৌলের বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থার বিবরণ নিচে প্রদান করা হলো।

সীসা (lead, Pb): সীসা এক এক প্রকার পানিতে এক এক অবস্থায় থাকে। সামুদ্রিক পানিতে প্রধানত কলয়েডীয় কণার সাথে, টাটকা পানিতে pH 6 এ সম্ভবত অকলয়েডীয় $Pb_2(OH)_2CO_3$ আকারে এবং উচ্চতর pH এ প্রধানত হাইড্রোক্সাইড/ হাইড্রাস অক্সাইড আকারে ধাতুটি অবস্থান করে। হ্রদের পানির তলানিতে সীসা জৈব-সীসা, $(CH_3)_4Pb$ আকারেও শনাক্ত করা হয়েছে।

বায়ুতে সীসার যেসব যৌগ পাওয়া যায় তা বাষ্পীয় ও কঠিন, উভয় শ্রেণীর। যেসব সড়কে ইঞ্জিনচালিত যানবাহন চলাচল করে, তার পার্শ্ববর্তী বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে সীসা থাকে। $PbSO_4$, $(NH_4)_2SO_4$, $PbBrCl$, $2NH_4Cl$, $PbBrCl.(NH_4)_2BrCl$ প্রভৃতি যৌগ আকারে উক্ত সীসা অবস্থান করে; ইঞ্জিনের সীসাযুক্ত গ্যাসোলিন দগ্ধ হয়ে ঐসব যৌগ সৃষ্টি হয় এবং ধোঁয়ার সাথে বায়ুতে স্থান পায়। বায়ুমণ্ডল থেকে সীসা মাধ্যাকর্ষণ বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অথবা বৃষ্টির পানিতে ধৌত হয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে এবং ব্যস্ত সড়কের পাশে ধুলায় ও মৃত্তিকায় তা জমা হয়। সেখানে যে সীসা পাওয়া যায় তা প্রধানত $PbSO_4$, Pb_3O_4, PbO ও PbS আকারে থাকে। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু অজৈব সীসার মিথাইলেশন ঘটে বলেও জানা যায় এবং ট্রেটাঅ্যালকাইল লেড পরিবেশে ধারাবাহিকভাবে বিভাজিত হতে থাকে:

$$R_4Pb \rightarrow R_3Pb^+ \rightarrow R_2Pb^{2+} \rightarrow RPb^{3+} \rightarrow Pb^{4+}$$ ।

আয়নিক অ্যালকাইললেড স্তন্যপায়ী জীবের শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সীসার রাসায়নিক অবস্থা যেমনই হোক, গলাধঃকৃত সীসার তুলনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গৃহীত সীসার বিষক্রিয়া অনেক বেশি তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

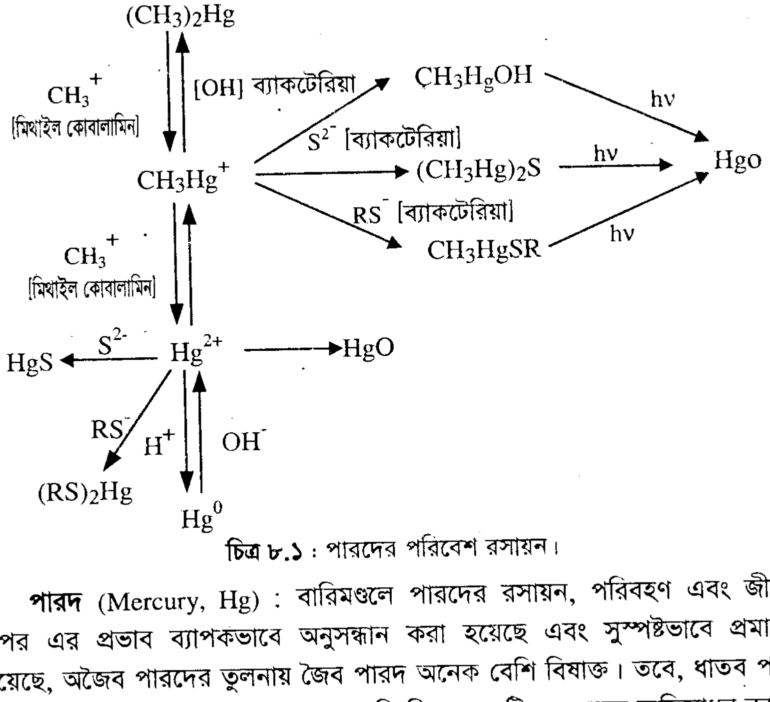

চিত্র ৮.১ : পারদের পরিবেশ রসায়ন।

পারদ (Mercury, Hg) : বারিমণ্ডলে পারদের রসায়ন, পরিবহণ এবং জীবের উপর এর প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, অজৈব পারদের তুলনায় জৈব পারদ অনেক বেশি বিষাক্ত। তবে, ধাতব পারদ কিংবা অজৈব পারদ যৌগের বাষ্প কমবেশি বিষাক্ত, এটি ফুসফুসের ক্ষতিসাধন করে।

'বিষ' হিসেবে পারদের যে পরিচিতি তার জন্য দায়ী মূলত মিথাইল পারদ, CH_3Hg^+ ও $(CH_3)_2Hg$ এবং পারদ-দূষণজনিত যেসব দুর্ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটেছে, তার প্রত্যেকটির পিছনে প্রকৃত ভূমিকা ছিল এ দুটি যৌগের। বিভিন্ন উৎস থেকে পারদ-বর্জ্য জলাধারে মেশে এবং তলানিতে জমা হয়; সেখানে অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে এর মিথাইলেশন ঘটে। মিথাইল মারকিউরাল চর্বিতে দ্রবণীয়; জলাধারে মাছ যে খাবার খায়, তার সাথে মিশে মিথাইল মারকিউরাল মাছের দেহে প্রবেশ করে এবং চর্বিতে সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে মাছের দেহে পারদের বিশাল ঘনীভবন ঘটে এবং এক সময় তা মাছের মাধ্যমেই মানুষ ও মাছভোজী জীবের দেহে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া ঘটায়। ডাইমিথাইল মারকিউরাল, $[(CH_3)_2Hg]$ একটি গ্যাস; জলাধার থেকে এর একটি ভগ্নাংশ বায়ুমণ্ডলেও স্থান পায়। পরিবেশে পারদের যেসব রূপান্তর ঘটে তা চিত্র ৮.১-এ দেখানো হলো।

আর্সেনিক (Arsenic, As): আর্সেনিক সাধারণভাবে 'বিষ' হিসেবে পরিচিত একটি মৌল তবে মৌলটি সকল রাসায়নিক অবস্থায় সমান বিষাক্ত নয়। এমন কি এর কোনো কোনো যৌগ পশুপাখির ক্রমবৃদ্ধিতে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর্সানিলিক অ্যাসিড, 4-নাইট্রোফেনাইল-আর্সোনিক অ্যাসিড, 3-নাইট্রো-4-হাইড্রোক্সিফেনাইল আর্সোনিক অ্যাসিড ও ফেনাইল আর্সেনোক্সাইড এমনি কয়েকটি যৌগ; যৌগগুলো নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় শূকর ও হাঁস-মুরগির খাবারের সাথে মিশিয়ে দেখা গেছে, এরা প্রাণীগুলোর ক্রমবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করে। আর্সেনিকের যে বিষক্রিয়া তার জন্য দায়ী প্রধানত আর্সেনাস যৌগ (As^{3+}), আর্সাইন (AsH_3) ও মিথাইল আর্সেনিকল। আর্সেনিক (V) আর্সেনিকের গুরুত্বপূর্ণ ও স্থিতিশীল এক রাসায়নিক অবস্থা, উক্ত অবস্থায় মৌলটি বিষাক্ত নয় বললে চলে। তবে, অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে বায়ুহীন পরিবেশে As(V) এর বিজারণ ঘটে এবং তা থেকে বিষাক্ত যৌগ, মিথাইল আর্সেনিকল উৎপন্ন হতে পারে। পরিবেশে কীটনাশক, আর্সেনিকল ও আর্সেনিকের কিছু বর্জ্য উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল মাপন যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে মৌলটির সেখানে যেসব রূপান্তর ঘটে, তার একটি পরিলেখ প্রদান করা হয়েছে। রূপান্তরটি ৮.২ চিত্রে দেখানো হলো ।

ক্রোমিয়াম (Chromium, Cr) : ক্রোমিয়াম প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য অপরিহার্য একটি মৌল তবে এটি শরীরে বিষক্রিয়াও সৃষ্টি করে। দেহের মাঝে প্রতি গ্রাম দেহ ওজনে 0.1 mg এর বেশি Cr থাকলে, প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে। বিষক্রিয়া Cr(III) এর তুলনায় Cr(VI) এর অনেক বেশি তীব্র ; Cr(VI) ক্যান্সার সৃষ্টি করে বলেও মনে করা হয়।

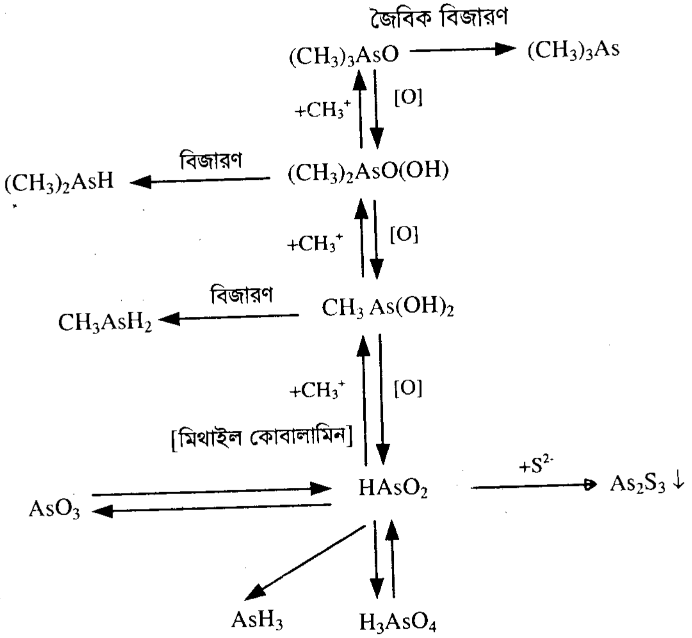

চিত্র ৮.২ : পরিবেশে As রসায়ন ।

পরিবেশে ক্রোমিয়াম বিভিন্ন উৎস থেকে প্রবেশ করে এবং ক্রোমিয়াম (III) প্রধানত Cr^{3+}, $Cr(OH)^{2+}$, $Cr(OH)_3$ ও $Cr(OH)_4^-$ আকারে অম্লীয় পানিতে (pH ≅ 3.5) অবস্থান করে। বিভিন্ন প্রকার অ্যানায়ন (যেমন OH^-, SO_4^{2-}, CN^-, SCN^-, F^- প্রভৃতি) এবং প্রাকৃতিক ও সংশ্লেষিত ক্ষারকের সাথে Cr এর আয়নগুলো কমপ্লেক্স গঠন করে। জারণধর্মী পরিবেশে Cr(III) যৌগ Cr(VI) এ জারিত হয় এবং $HCrO_4^-$ (pH 4-6) অথবা CrO_4^{2-} (pH 8-10) আকারে অবস্থান করে।

প্রাকৃতিক জলীয় পরিবেশে Cr (III) এর পরিচলন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; কেননা, প্রশম থেকে মৃদু ক্ষারীয় পরিবেশে আয়নটি হাইড্রোক্সাইড আকারে অধঃক্ষেপ পড়ে এবং মৃদু অম্লীয় পরিবেশে বস্তুকণা পৃষ্ঠে পরিশোষিত অবস্থায় আয়নটি অবস্থান করে। তবে, pH 5.0 এর নিচে Cr(III) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং চলাচল করে। ক্রোমিয়াম (III) প্রাকৃতিক কিছু জৈব পদার্থের সাথে (যেমন, হিউমিক অ্যাসিড) কমপ্লেক্স গঠন করেও দ্রবীভূত থাকতে পারে এবং কণাপৃষ্ঠে পরিশোষিত আয়নও কখানো কখনো MnO_2 এর সংস্পর্শে এসে Cr(VI) এ জারিত ও কণাপৃষ্ঠ থেকে পানিতে মুক্ত হয়।

প্রাকৃতিক জলাধার ও মৃত্তিকা থেকে Cr(VI) প্রধানত দুটি কৌশলে অপসারিত হয়; যথা,

এক. Cr(VI) এর Cr(III) অবস্থায় বিজারণ ঘটে এবং পরে Cr (III) হাইড্রোক্সাইড আকারে অধঃক্ষেপ পড়ে অথবা বস্তুকণা পৃষ্ঠে পরিশোষিত হয়। পরিবেশে Fe(II) কিংবা দ্রবীভূত জৈববস্তু প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকলে Cr(VI) এর ঐরূপ অপসরণ খুব সহজে ঘটে; ফলে, আয়নটির তেমন একটা পরিচলন ঘটে না এবং পানীয় পানিতে এর প্রাচুর্য সাধারণত অনুমোদিত মাত্রার মাঝে (0.05 ppm) অবস্থান করে।

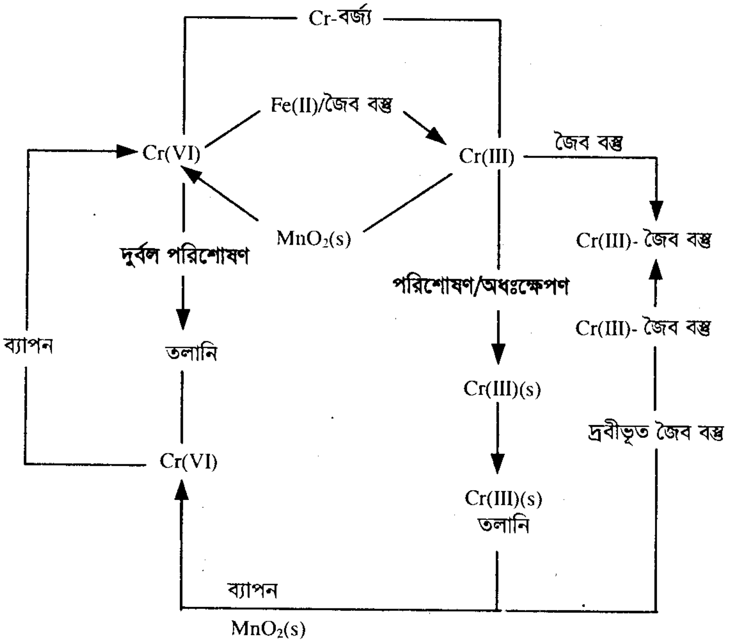

চিত্র ৮.৩ : পরিবেশে Cr এর রসায়ন ও পরিচলন।

দুই. Fe ও Mn অক্সাইডসমৃদ্ধ মৃত্তিকায় অথবা কাদামাটিতে (clay) অম্লীয় কিংবা জারণধর্মী পরিবেশে বস্তুকণা পৃষ্ঠে Cr(VI) এর দৃঢ় পরিশোষণ (adsorption) ঘটে এবং তাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। তবে, পরিবেশে প্রতিযোগী অ্যানায়ন প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকলে, কঠিন কণাপৃষ্ঠে Cr(VI) এর পরিশোষণ হ্রাস পায় এবং মুক্ত Cr(VI) এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করে। পরিবেশ ক্ষারীয় হলেও Cr(VI)-এর পরিশোষিত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায় এবং এর গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। পরিবেশে Cr এর পরিচলন ও রাসায়নিক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো (চিত্র ৮.৩)।

৮খ. বায়ুর দূষক-বিশ্লেষণ (air pollution analysis)

৮খ-১. বায়ুর নমুনা সংগ্রহকরণ

নমুনা সংগ্রহণের শর্ত :

১. নমুনা সংশ্লিষ্ট সময় ও অঞ্চলের আবহমণ্ডলে যে বায়ু বিদ্যমান তাকে প্রতিনিধিত্ব করবে।

২. আবহমণ্ডলের বায়ুতে দূষকের পরিমাণ সাধারণত নিম্ন থাকে (প্রতি ঘনমিটারে এক মিলিগ্রামেরও কম); নমুনার পরিমাণ তাই এমন হতে হবে যাতে বিশ্লেষণে আপেক্ষিক ভুলের পরিমাণ কম হয়।

৩. নমুনা সংগ্রহণের হার এমন হতে হবে যাতে প্রকল্পিত সময়ের মাঝে পর্যাপ্ত নমুনা সংগ্রহ করা যায়।

৪. আবহমণ্ডলের বায়ুতে দূষকের পরিমাণ সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়; নমুনা সংগ্রহণ সময়ের ব্যাপ্তি তাই এমন হতে হবে যাতে দূষকের পরিবর্তন নমুনায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় এবং

৫. নমুনা সংগ্রহণ সময়ের মাঝে নির্ণেয় উপাদানের কোনো প্রকার রূপান্তর ঘটতে পারবে না; শর্তটি পূরণের জন্য 'অবিরাম স্বয়ংক্রিয় নমুনা সংগ্রাহক ও বিশ্লেষক যন্ত্র' সবচেয়ে উপযোগী ও আদর্শ একটি ব্যবস্থা। বায়ুর কোনো কোনো দূষকের জন্য এরূপ যন্ত্র ইতিমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং ব্যবহৃতও হচ্ছে।

নমুনা সংগ্রহণের স্থান (spot) **নির্বাচন :** নমুনা সংগ্রহণের যে উদ্দেশ্য থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে স্থান নির্বাচন করতে হয়। যেমন, উদ্দেশ্য যদি হয় স্বাস্থ্যের উপর কোনো দূষকের প্রভাব অনুসন্ধান করা, তাহলে নমুনার জন্য এমন একটি স্থান বেছে নিতে হয়, যে স্থানের বায়ু পরীক্ষণাধীন জনসাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসে সর্বদা গ্রহণ করে । দূষণ ব্যাপ্তির সঠিক চিত্র পাওয়ার জন্য স্থান নির্বাচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, স্থানের সংখ্যাও (No. of spot) তেমন গুরুত্বপূর্ণ। স্থান-সংখ্যা বিভিন্ন স্থিতিমাপ দ্বারা নির্ধারিত হয়; যেমন, পরীক্ষণাধীন অঞ্চলের বিস্তৃতি, দূষক উৎসের দূরত্ব, জলবায়ু, ভূসংস্থান (topography) প্রভৃতি। মোট কতকগুলো স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হলে পরীক্ষণাধীন অঞ্চলের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে তা নির্ধারণ করার জন্য প্রাথমিক একটি জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে, যার উদ্দেশ্য হবে: ক. দূষকের প্রকৃতি ও প্রাচুর্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা, খ. সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে কম দূষণ আক্রান্ত অঞ্চলে দূষকের মাত্রা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং গ. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহগত তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া।

নমুনা সংগ্রহণ সময়ের ব্যাপ্তি : বায়ুর নমুনা দুভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে, যথা, স্বল্পকালব্যাপী বা 'স্পট' (spot) নমুনা সংগ্রহণ ও অবিরাম (continuous) নমুনা সংগ্রহণ। 'স্পট' সংগ্রহণ ৩০ মিনিট থেকে কয়েকঘন্টা ব্যাপী চলে। নমুনা সংগ্রহণ সময়ের ব্যাপ্তি বিভিন্ন বিষয়ের সাপেক্ষে নির্ধারিত হয়; যেমন, অনুসন্ধেয় দূষকের

প্রকৃতি, বায়ুমণ্ডলে তার স্থিতিশীলতা, বিশ্লেষণ পদ্ধতির সূক্ষ্মতা, নির্ভুলতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি। সাধারণত পরীক্ষণাধীন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দূষকের প্রকৃতি ও প্রাচুর্য এলোমেলোভাবে জানার জন্য 'স্পট' সংগ্রহণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়; যদিও এরূপ তথ্যের উপযোগিতা খুবই সীমিত। কেননা, জলবায়ু, আবহাওয়া, ভূসংস্থান ও দূষক উৎসের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সময়ের সাথে দূষণ মাত্রার বিরাট ওঠানামা ঘটে। তাই, দূষণের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে 'স্পট' সংগ্রহণ পদ্ধতি পর্যাপ্ত ধারণা প্রদান করতে পারে না। তবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী ঐভাবে সংগৃহীত বেশ কিছু সংখ্যক নমুনা বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সময়ে পরীক্ষণাধীন অঞ্চলে দূষকের সর্বোচ্চ ও গড় যে প্রাচুর্য থাকে, তার স্থূল একটি ধারণা পাওয়া যায়।

অবিরাম নমুনা সংগ্রহণ (continuous sampling) বায়ু দূষণের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সুসম্বন্ধভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি ব্যবস্থা । এভাবে সংগৃহীত একটি নমুনার উপাত্ত থেকেই যথাযথভাবে জানা সম্ভব, বিদ্যমান দূষণ মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও সম্পদের উপর কিরূপ ও কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে।

বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করার পদ্ধতি : বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করার জন্য যেসব যন্ত্র সাধারণত ব্যবহার করা হয় তাতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো ধারাবহিকভাবে যুক্ত থাকে:

বায়ু প্রবেশের সিস্টেম → কঠিন কণার ফিল্টার → গ্যাস সংগ্রাহক/সেন্সর → পাম্প → গ্যাস মিটার ।

গ্যাস প্রবেশের সিস্টেমটি বিশ্লেষ্যের প্রতি নিষ্ক্রিয় হতে হয়; সাধারণত টেফ্লন, কাচ অথবা স্টেইনলেস স্টিল দ্বারা এটি নির্মিত থাকে। প্রতিনিধিত্বকারী একটি নমুনা পেতে হলে সিস্টেমটিকে কঠিন যে কোনো বস্তুর আড়াল থেকে দূরে মুক্ত বায়ুতে স্থাপন করতে হয়। নমুনা সংগ্রহণ যন্ত্রে 'ফিল্টার' এর কাজ দুটি - 'বিশ্লেষ্য' গ্যাসীয় উপাদান হলে বায়ুর ভাসমান কঠিন কণা থেকে তা পৃথক করা এবং 'বিশ্লেষ্য' বায়ুর ভাসমান কঠিন কণা হলে ফিল্টারের উপর তা সংগ্রহ করা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'ফিল্টার' কণা সংগ্রহ করার জন্য অতিশয় দক্ষ, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং ফিল্টারের নির্মাণ বস্তুতে বিশ্লেষ্যের উপস্থিতি নগণ্য হতে হবে। যেসব বস্তু উক্ত শর্তাবলি বহুলাংশে পূরণ করে, তাদের মাঝে কাচ-তন্তু, সেলুলোজ ঈস্টার ও টেফলন ঝিল্লি (membrane) প্রধান। ঝিল্লি ফিল্টারে রন্ধ্রের (pore) টিপিক্যাল আকৃতি 0.5 μm-এর কাছাকাছি থাকে তবে ন্যানোমিটার (10^{-9}m) ব্যাসের ছোট কণাও এটি অতি দক্ষতার সাথে সংগ্রহ করতে পারে।

নমুনার 'বিশ্লেষ্য' গ্যাসীয় উপাদান হলে, 'ফিল্টার' এর পরে যন্ত্রে একটি গ্যাস-সংগ্রাহক অথবা একটি গ্যাস সেন্সর সংযোজিত থাকে। গ্যাস-সংগ্রাহক ওয়াশ বোতল (wash bottle) এর অনুরূপ একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে গ্যাস-শোষক, একটি তরল পদার্থ

অথবা গ্যাস পরিশোষক, সরন্ধ্র একটি পলিমার ধারণ করা থাকে। যেমন, বিশ্লেষ্য SO_2 গ্যাস হলে সংগ্রাহক পাত্রে লঘু H_2O_2 দ্রবণের মধ্যে গ্যাসটি সংগ্রহ করা হয়। দ্রবণে SO_2 গ্যাস H_2SO_4 অ্যাসিডে পরিণত হয়; দ্রবণের পরিবাহিতা, অম্লত্ব অথবা সালফেট (SO_4^{2-}) পরিমাপ করে তখন SO_2 এর পরিমাণ পাওয়া যায়:

$$SO_2 + H_2O_2 \rightarrow H_2SO_4$$

বায়ু 'ফিল্টার-সংগ্রাহক' সিস্টেমের ভিতর দিয়ে সর্বদা টেনে নিতে হয় (suck) এবং এজন্য একটি পাম্প ব্যবহার করা হয়। বায়ু প্রবাহের হার কমবেশি হতে পারে। তবে 'নিম্ন ঘনআয়তন' (low volume) নমুনার ক্ষেত্রে উক্ত হার 0.5 - 20 L/min এবং উচ্চ ঘনআয়তন (high volume) নমুনার ক্ষেত্রে 1-2 m^3 / min এর মাঝে অবস্থান করে। প্রবাহ হার মাপার জন্য যন্ত্রে একটি গ্যাস মিটার যুক্ত করা থাকে। বায়ুতে নির্ণেয় বস্তুর মাত্রা জানার জন্য প্রবাহিত গ্যাসের মোট ঘনআয়তন জানতে হয়। গ্যাস প্রবাহের হারকে নমুনা সংগ্রহণের মোট সময় দ্বারা গুণ করে প্রবাহিত গ্যাসের মোট পরিমাণ পাওয়া যায়। যাহোক, বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করার জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হয়, এমনি কয়েকটি পদ্ধতি নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. বায়ুর নমুনা সংগ্রহকরণ - নির্ণেয় উপাদান গ্যাস:

ক. বায়ু আঁকড়ানো পদ্ধতি (grab sampling) : বায়ুশূন্য পাত্রে অথবা বেলুনের মতো ফোলানো যায় এমন একটি ব্যাগে পরীক্ষণীয় বায়ু সংগ্রহ করা 'আঁকড়ানো নমুনা সংগ্রহণ' পদ্ধতির নীতি। বায়ু ধরার কিংবা বিশ্লেষণের পূর্ব পর্যন্ত নমুনা সংরক্ষণের জন্য এক্ষেত্রে সাধারণত একটি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। তবে, এতে ব্যাগের অভ্যন্তরীণ দেয়ালে আর্দ্রতা জমতে পারে কিংবা দেয়ালের ভিতর দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কিছুটা নমুনা খোয়া যেতে পারে। নমুনা সংগ্রহ করার পরপরই তা বিশ্লেষণ করা হলে নমুনার ক্ষতি হ্রাস পায়।

নমুনা আঁকড়ানোর জন্য কাচ অথবা স্টিল পাত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে। পাত্রটি প্রথমে বায়ুশূন্য করে পরে পরীক্ষণীয় বায়ু দ্বারা তা পূর্ণ করা হয় অথবা পানিভর্তি একটি পাত্র থেকে পানি নিচের একটি পথে নিষ্কাষিত করে উপরের একটি পথ দিয়ে তা পরীক্ষণীয় বায়ু দ্বারা পূর্ণ করা যায়।

খ. শোষক দ্রবণ পদ্ধতি (absorber-solution method) : বায়ুর গ্যাসীয় দূষক সংগ্রহ করার জন্য পদ্ধতিটির ব্যবহার সম্ভবত সবচেয়ে ব্যাপক। গ্যাসীয় উপাদান বায়ু থেকে দ্রবণে দ্রবীভূত অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়। বায়ু থেকে SO_2, SO_3, NO_x, H_2S, HF প্রভৃতি গ্যাস এভাবে সংগ্রহ করা যায়। গ্যাস শোষণের জন্য দ্রবণ কি হবে তা গ্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে (দ্র: গ্যাসের বিশ্লেষণ ৮.৫)।

দ্রবণে গ্যাস সংগ্রহ করার বিভিন্ন প্রকার সংগ্রাহক যন্ত্র (collector equipment) প্রচলিত আছে (চিত্র ৮.৪)। যন্ত্র যেমনই হোক, তাতে এমন একটি ব্যবস্থা সংযোজিত থাকে যা বায়ুকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদবুদ আকারে দ্রবণের সংস্পর্শে আনে; এতে গ্যাসীয়

বিশ্লেষ্যের শোষণে শোষক দ্রবণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত গ্লাস ফ্রিট (glass frit) অথবা সংঘর্ষণ চাকতি (impinger) এর সাহায্যে বুদবুদের আকার ছোট করা হয়। ফ্রিটে রন্ধ্রের আকৃতি 50 μm এর কাছাকাছি অবস্থান করে। বায়ুতে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কণা থাকে তারা রন্ধ্র বন্ধ করে দিতে পারে; এতে ফ্রিটের ভিতর দিয়ে বায়ুর প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায় এবং সিস্টেমটি অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ অকেজো একটি ফ্রিট পরিষ্কার করা বেশ কঠিন; বায়ু ফ্রিটের ভিতর দিয়ে টেনে আনার পূর্বে উপযুক্ত ফিল্টারের সাহায্যে তাই তাকে কঠিন কণা থেকে মুক্ত করে নিতে হয়।

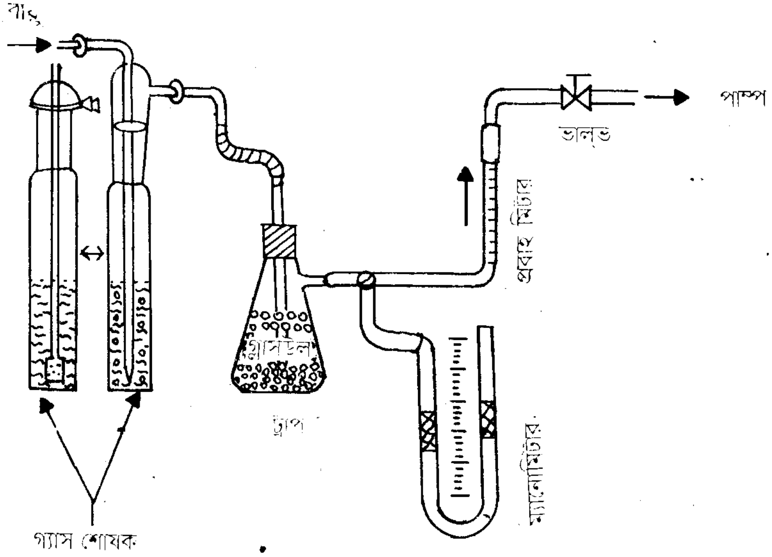

চিত্র ৮.৪ : গ্যাসীয় নমুনা সংগ্রহণের যন্ত্র।

বুদবুদের আকার ছোট করার সংঘর্ষণ-চাকতি পদ্ধতি ফ্রিট-পদ্ধতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল ও সুবিধাজনক। এতে বায়ুপ্রবাহ শোষক দ্রবণে নিমজ্জিত মসৃণ একটি চাকতির উপর তীব্র বেগে আছড়ে পড়ে; চাকতিটি সংগ্রাহক পাত্রের তলদেশ কিংবা বিশেষভাবে তৈরি একটি পাতও হতে পারে। তীব্র বেগে আছড়ে পড়ার ফলে বায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত এবং বুদবুদের আকার ছোট হয়। চাকতি ব্যবহার ও পরিষ্কার করা সহজ। একই বায়ু থেকে একাধিক উপাদানও যুগপৎ সংগ্রহ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সংগ্রাহক পাত্রে পৃথক পৃথক শোষক দ্রবণ ধারণ করে ধারাবহিক ভাবে তাদের যুক্ত করতে হয়।

গ. কঠিন বস্তুর পৃষ্ঠে গ্যাস পরিশোষণ: সক্রিয়নকৃত কাঠ কয়লা (charcoal), সিলিকা জেল কিংবা অন্য কোনো সরন্ধ্র পলিমার চূর্ণ দ্বারা পূর্ণ একটি স্তম্ভের (column)

ভিতর দিয়ে বায়ু প্রেরণ করা হলে বহু গ্যাসীয় দূষক ঐসব বস্তুর পৃষ্ঠে পরিশোষিত হয়। উচ্চতাপ প্রয়োগ করে অথবা দ্রাবকের সাহায্যে ধৌত করে পরিশোষকের পৃষ্ঠ থেকে গ্যাসকে পরে পৃথক করে নেয়া হয়। পদ্ধতিটির প্রধান একটি দুর্বলতা, পরিশোষিত গ্যাসকে কঠিন বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা বেশ কষ্টসাধ্য। যাহোক, ওজোন ও হালকা হাইড্রোকার্বন বায়ু থেকে সংগ্রহ করার জন্য পদ্ধতিটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২. বায়ুর নমুনা সংগ্রহকরণ-নির্ণেয় উপাদান 'বায়ুতে বিদ্যমান কঠিন কণা' (particulates)

বায়ুতে যে কঠিন বস্তুকণা উপস্থিত থাকে, তা দুই শ্রেণীর-মাধ্যাকর্ষণ বলে থিতাতে পারে এমন কণা এবং অ্যারোসলের ন্যায় বায়ুতে ভেসে থাকে, এমন কণা। প্রথমোক্ত শ্রেণির কণা আকৃতিতে বড় (ব্যাস > 10μm); থিতানো প্রক্রিয়ায় (sedimentation) এদের সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির কণা আকৃতিতে ছোট, ফিল্টারকরণ, সংঘর্ষণ (impingement), স্থিরতাড়িত (electrostatic) সংগ্রহণ প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে এদের সংগ্রহ করা যায়। উভয় শ্রেণির কণা সংগ্রহ করার পর ওজন মেপে তাদের পরিমাণ তথা বায়ুতে তাদের প্রাচুর্য নির্ণয় করা হয়। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, বায়ুতে মোট যে কণা থাকে, থিতানোযোগ্য বড় কণা তার ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ মাত্র। অধিকাংশ কণা বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে জীবের দেহে প্রবেশ করে। অতএব, জীবের জন্য ক্ষতিকর বস্তুকণা বলতে, থিতানো-অযোগ্য ভাসমান ঐ বস্তুকণা শ্রেণিকে কার্যত বুঝায় তবে আবহগত কোনো কোনো বিষয় থিতানোযোগ্য কণার প্রাচুর্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বায়ুর বস্তুকণা নির্ণয় করার জন্য তাই উভয় শ্রেণি বস্তুকণা সংগ্রহ করা লাগে।

ক. বায়ুর থিতানোযোগ্য বস্তুকণা সংগ্রহকরণ ধূলিপতন পাত্র পদ্ধতি (dustfall jar method) : বায়ুর বড় আকৃতির (ব্যাস > 10μm) ভারি বস্তুকণা সংগ্রহকরার জন্য 'ধূলিপতন পাত্র' পদ্ধতি সবচেয়ে সরল ও সহজ একটি ব্যবস্থা; সাধারণত লোকালয়ের বায়ুতে ঐরূপ কণা নির্ণয় করার জন্য পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়। 'সংগ্রাহক' (collector) পাত্র পলিথিন, কাচ অথবা স্টেইনলেস স্টিল দ্বারা নির্মিত বড় মুখওয়ালা একটি বালতি হতে পারে (উচ্চতা তলদেশের ব্যাস অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ) । পাত্রের আকৃতি ঐরূপ হওয়াতে ধৃত বস্তুকণা বায়ুপ্রবাহ অথবা বৃষ্টির ঝাপটায় পাত্র থেকে বের হয়ে যেতে পারে না। সাধারণত উচ্চতা 20 - 32 cm, তলদেশের ব্যাস 10 - 15 cm এবং উপর থেকে নিচের দিকে ক্রমশ কিছুটা সরু, এরূপ সাইজের একটি প্লাস্টিক বালতি সংগ্রাহক পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে (চিত্র ৮.৫)। নমুনা একমাস ব্যাপী সংগ্রহকরার পর অনুসন্ধানের ফলাফল প্রতি একক আয়তনে প্রতি ৩০ দিনে 'মোট', 'দ্রবণীয়' ও 'অদ্রবণীয়' বস্তুকণা হিসেবে ($mg/cm^2/30$-d) প্রকাশ করা হয়। সমগ্র একটি লোকালয়

ব্যাপী বায়ুতে ধূলির প্রাচুর্য জানতে হলে প্রতি ২৬০০ হেক্টর আয়তনে অন্তত একটি সংগ্রাহক পাত্র স্থাপন করা উচিত। তবে শিল্পাঞ্চলের বায়ুতে ধূলির প্রাচুর্য নির্ণয় করার জন্য শিল্প স্থাপনার কয়েকশত মিটার দূরে সংগ্রাহক পাত্র বসাতে হয়।

ধূলি সংগ্রহণের স্থান (spot) নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ:

১. স্থানটি এমন হতে হবে, যাতে তার উপরে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে এবং বর্জ্য পোড়ানোর স্থান কিংবা চিমনি থেকে তা দূরে অবস্থিত হয়।

২. ধূলি সংগ্রাহক পাত্রের মুখের ব্যাস 2.5 cm এর কম এবং পাত্রের অবস্থান ভূমি থেকে 16-m এর ঊর্ধ্বে যেন না হয়; ভূমি থেকে 6-m ঊর্ধ্বে পাত্রের অবস্থান একটি প্রমাণ উচ্চতা।

৩. শহরাঞ্চলের বায়ুতে ধূলির প্রাচুর্য নির্ণয় করতে হলে নমুনা সংগ্রহণের স্থানটি এমনভাবে নির্বাচন করতে হয় যাতে চালু কোনো চিমনি থেকে চিমনিটির উচ্চতার কমপক্ষে দশগুণ দূরত্বে তা অবস্থিত হয় ও কাছে কোনো উঁচু দেয়াল থাকলে, সংগ্রাহক পাত্র দেয়ালের শীর্ষ থেকে 30° কোণে অবস্থান করে।

'ধূলিপতন পাত্র' পদ্ধতির সুবিধা :

১. পদ্ধতিটি সহজ, সরল ও কম-খরচ;

২. 1-5 গ্রাম নমুনা সংগৃহীত হয়; বেশকিছু সংখ্যক রাসায়নিক ও যান্ত্রিক বিশ্লেষণ সম্পাদনের জন্য উক্ত পরিমাণ পর্যাপ্ত।

৩. শিল্প-কারখানা কিংবা লোকালয়ের বায়ুতে ধূলির প্রাচুর্য পদ্ধতিটির সাহায্যে সহজে জানা যায়।

পদ্ধতির দুর্বলতা :

১. পদ্ধতিটির সূক্ষ্মতা (precision) কম এবং সংগ্রহণ সময়ের মাঝে (৩০ দিন) কখনো বায়ুতে ধূলির পরিমাণ বেশি কিংবা কম হয় তা জানা যায় না।

২. সংগৃহীত ধূলি পিণ্ডাকারে পাত্রে অবস্থান করে; ফলে, বায়ুতে অবস্থানরত অবস্থায় তার আকার ও আকৃতি কিরূপ ছিল তা জানা যায় না।

খ.বায়ুর ভাসমান বস্তুকণা সংগ্রহকরণ : বায়ুর ভারি বস্তুকণা অভিকর্ষ বলে থিতাতে পারে বলে 'ধূলিপতন পাত্র' পদ্ধতির মতো সরল একটি ব্যবস্থায় (উপরে বর্ণিত) এদের সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু যেসব কণা হালকা ও ক্ষুদ্র (ব্যাস $< 10\ \mu m$) তারা থিতাতে পারে না, বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় সর্বদা অবস্থান করে। এ শ্রেণির কণা সংগ্রহ করার জন্য জটিল ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি প্রয়োজন হয়। নিচে এমন দুটি পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

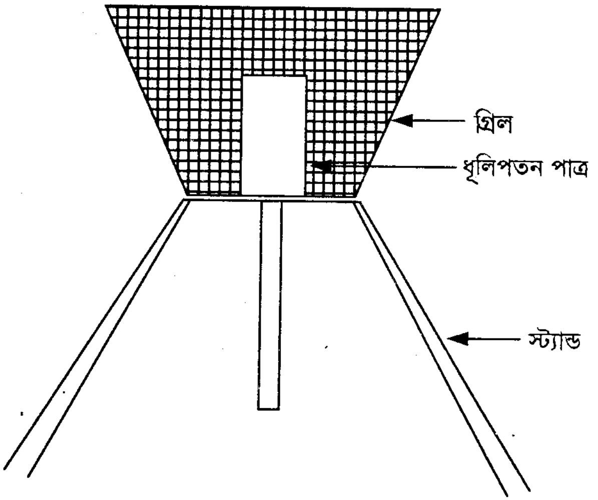

চিত্র ৮.৫: ধূলিপতন পাত্র (Dustfall Jar)।

বায়ু ফিল্টার করার 'হাই-ভল' (Hi vol) পদ্ধতি : বায়ুর ভাসমান বস্তুকণা সংগ্রহকরার জন্য 'উচ্চ ঘনআয়তন ফিল্টারকরণ' (high volume filtration) অতি জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি; হাই-ভল (Hi-vol) নামে পদ্ধতিটি সুপরিচিত।

'হাই-ভল' নমুনা সংগ্রহণ যন্ত্র 'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার' (vaccum cleaner) এর অনুরূপ একটি শক্তিশালী মোটর যা নিদিষ্ট ভরের একটি ফিল্টার আস্তরণের ভিতর দিয়ে বায়ুকে টেনে আনে, এতে বায়ুর ভাসমান বস্তুকণা ফিল্টারে আটকা পড়ে; ফিল্টার আস্তরণটির ভর মেপে তখন সঞ্চিত বস্তুকণার পরিমাণ পাওয়া যায়। ফিল্টার আস্তরণের উপর কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্পও সঞ্চিত হতে পারে যা বস্তুকণার পরিমাণে ধনাত্মক ভুল সৃষ্টি করে। ঐরূপ ভুল যাতে ঘটতে না পারে সেজন্য ফিল্টার আস্তরণটি ব্যবহার করার পূর্বে ও পরে ডেসিকেটরের মাঝে নির্দিষ্ট একটি আর্দ্রতায় ২৪ ঘণ্টা শুষ্ক করার পর তার ভর মাপতে হয়।

মোটামুটি শান্ত বায়ু থেকে নমুনা সংগ্রহ করার সময় 'হাই-ভল' যন্ত্রটি একটি ছাউনির নিচে স্থাপন করতে হয় (চিত্র ৮.৬); এতে একদিকে যেমন থিতানোযোগ্য ভারি কণা ছাউনিতে আটকা পড়ে অন্যদিকে আবার বৃষ্টি বা শিশিরপাত থেকে ফিল্টার আস্তরণ রক্ষা পায়। ফলে, কেবল ভাসমান বস্তুকণা ফিল্টারে সঞ্চিত হতে পারে।

'হাই-ভল' নমুনা সংগ্রহণ যন্ত্রের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির 'ফিল্টার আস্তরণ' প্রচলিত আছে; বাণিজ্যিক নামে সাধারণত এগুলো বিক্রি হয় (পরিশিষ্ট ৫ দ্র:)। তন্তুময় (fibrous) অথবা দানাদার (granular) বস্তু দ্বারা (যেমন, সেলুলোজ, কাচতন্তু, সংশ্লেষিত জৈব পলিমার প্রভৃতি) ফিল্টার আস্তরণ তৈরি থাকে। প্রচলিত ফিল্টার আস্তরণগুলোর মাঝে 'হোয়াটম্যান-41 বৈশ্লেষিক ফিল্টার পেপার' সম্ভবত সবচেয়ে কম

দাম। তবে, এর কিছু দুর্বল বৈশিষ্ট্য আছে; যেমন, এতে রন্ধ্রের আয়তন ছোট বড় থাকে এবং ঘনত্বও এক এক স্থানে এক এক রকম হয়। এরূপ ফিল্টার পেপার 0.3 মাইক্রোনের চেয়ে ক্ষুদ্রতর কণা স্বল্প সময়ের ব্যাপ্তিতে সংগ্রহ করার জন্য অদক্ষ তবে দীর্ঘ সময় ব্যাপী (যেমন, ২৪ ঘণ্টা) নমুনা সংগ্রহ করা হলে রন্ধ্র কিছুটা বন্ধ হয়ে যায় তাতে এর দক্ষতা বাড়ে। ফিল্টার পেপারের উল্লেখযোগ্য আর একটি দুর্বলতা, এর আর্দ্রতা শোষণ করার প্রবণতা প্রবল।

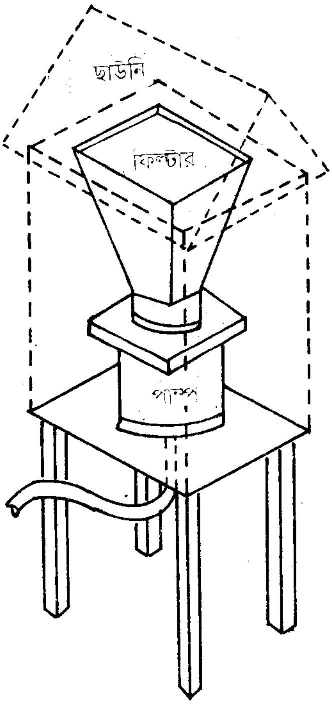

চিত্র ৮.৬: বায়ুর নমুনা সংগ্রহকরার 'হাই-ভল' ফিল্টার।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বেশ কিছু সংখ্যক 'জৈব ঝিল্লি ফিল্টার'এর প্রচলন ঘটেছে; এদের মাঝে সেলুলোজ অ্যাসিটেট/নাইট্রোসেলুলোজ নির্মিত মিলিপোর (Millipore), নিউক্লিওপোর (Nucleopore), পলফ্লেক্স (Pallflex) ও অ্যাক্রাপোর (Acrapor) এবং টেফ্লন নির্মিত ফ্লেরোপোর (Fluoropor) ও মাইলার (Miller) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।'সেলুলোজ ঝিল্লি ফিল্টার' কিছুটা ভঙ্গুর। তবে সরাসরি ফিল্টার আস্তরণের উপর বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা যখন সম্ভব হয় তখন এ শ্রেণির ফিল্টার সর্বোত্তম; অধিকাংশ

সাধারণ জৈব দ্রাবকে এরা দ্রবণীয় তাই সঞ্চিত বস্তুকণা এদের থেকে সহজে পৃথক করা যায়। মিলিপোর ফিল্টার কিছুটা পানিগ্রাহী (hygroscopic) তবে এতে অজৈব অপদ্রব সাধারণত নিম্ন থাকে। মিলিপোর ফিল্টার নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় সাম্যাবস্থায় এনে তারপর এর ওজন নেয়া উচিত। পলফ্লেক্স ও অ্যাক্রাপোর-এ অপদ্রবের পরিমাণ বেশ উচ্চ থাকে। টেফ্লন ফিল্টার অম্ল ও জৈব দ্রাবকে নিষ্ক্রিয় এবং একই ফিল্টার বহুবার ব্যবহার করা যায়।

বায়ুর ভাসমান কণা সংগ্রহ করার জন্য কাচতন্তু ফিল্টারের ব্যবহার সবচেয়ে ব্যাপক। বিশাল পরিমাণ বায়ু ফিল্টার করার জন্য এটি বিশেষভাবে উপযোগী। তাছাড়া কাচতন্তু ফিল্টার অম্ল (HF বাদে) ও জৈব দ্রাবকে নিষ্ক্রিয়। সঞ্চিত কণার ওজন নির্ভুলভাবে নিতে ফিল্টারটি নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় সাম্যাবস্থায় আনতে হয়। তবে, কাচতন্তু ফিল্টারে বহু সংখ্যক ধাতব অপদ্রব (যেমন Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn ও Pb) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত থাকে তাই এ শ্রেণির ফিল্টার ব্যবহার করা হলে সংগৃহীত নমুনার পরিমাণ বেশি হতে হয় তখন ফলাফলে অপদ্রবের ভূমিকা নগণ্য হয়ে যায়।

ফিল্টার যেমনই হোক, তার আয়তন সাধারণত 20×25 cm থাকে। ঐরূপ আয়তনের একটি ফিল্টারে 18 - 28 L/s হারে অবিরাম চব্বিশ ঘণ্টা নমুনা সংগ্রহ করা হলে 1250 - 2100 m^3 বায়ু ফিল্টারের ভিতর দিয়ে প্রেরিত হয় এবং প্রায় 0.5 গ্রাম পরিমাণ কণা তাতে জমা পড়ে; বেশকিছু সংখ্যক বিশ্লেষণের জন্য এটি পর্যাপ্ত একটি পরিমাণ। পরিবেশগত স্বাস্থ্যসমস্যা পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে অনেক সময় কর্মস্থলের বায়ুতে বস্তুকণা নির্ণয় করার প্রয়োজন হয় তখন ব্যাটারি চালিত হালকা পাম্প ছোট আয়তনের কাচতন্তু ফিল্টার (3.7×3.7 cm) ব্যবহার করে 2 L/min হারে প্রায় আট ঘণ্টাব্যাপী নমুনা সংগ্রহ করা হলে পর্যাপ্ত বস্তুকণা পাওয়া যায়।

বায়ুর নমুনা সংগ্রহকরার স্থিরতাড়িত পদ্ধতি (electrostatic sampler): অতি ক্ষুদ্র আকৃতির ভাসমান বস্তুকণা (0.1 μm পর্যন্ত) সংগ্রহ করার জন্য পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকর। সংগ্রাহক যন্ত্রে প্রবেশের পর বায়ু দুটি ইলেকট্রোডের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়। ইলেকট্রোড দুটির মাঝে 12 - 30 kV পটেনশিয়াল পার্থক্য প্রয়োগ করা থাকে। এতে যে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ (electrical discharge) ঘটে তা বস্তুকণাকে চার্জিত করে। চার্জ বহনকারী বস্তুকণা তখন বিপরীত চার্জের ইলেকট্রোড কর্তৃক আকর্ষিত হয়ে তার উপর জমা হয়। পদ্ধতিটির বস্তুকণা সঞ্চয়নের দক্ষতা প্রায় 100%।

৮খ-২. ফলাফল প্রকাশের রীতি : বায়ুর নমুনা সংগ্রহণ বিষয়ক তথ্য ও বিশ্লেষণ ফলাফল প্রকাশ করতে প্রায়ই এক এক গবেষক এক এক পদ্ধতির একক ব্যবহার করে থাকেন। এতে বিভিন্ন গবেষকের বিশ্লেষণ-ফলাফল তুলনামূলকভাবে মূল্যায়ন করতে

জটিলতা সৃষ্টি হয়। উক্ত জটিলতা নিরসন করার লক্ষ্যে বর্তমানে এক্ষেত্রে কেবল CGS পদ্ধতির একক ব্যবহার করার রীতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই রীতি অনুসারে বায়ু দূষকের ঘনমাত্রা বর্তমানে প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় (760 mg Hg ও 0°C) mg/m^3 অথবা $\mu g/m^3$ এককে প্রকাশ করা হয় (উদাহরণ ১ দ্রঃ)। বিশ্লেষণ ফলাফল সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য নমুনা সংগ্রহণ সময়ের আবহগত কিছু কিছু তথ্যও জানার প্রয়োজন হয়; তাই গবেষকের উচিত, নমুনা সংগ্রহণ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও বিশ্লেষণ ফলাফল নির্দিষ্ট একটি 'ছক' এ লিপিবদ্ধ করে তা সংরক্ষণ করা। নিচে এমন একটি 'ছক' প্রদান করা হলো।

ছক : বায়ুর নমুনা সংগ্রহণ সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত - 'হাই-ভল' পদ্ধতি (field data for high volume air sample):

জায়গার নাম (station name) : .... জায়গার অবস্থান (location) ....

টেকনিশিয়ান (technician) : ....

ফিল্টার অভিজ্ঞান নং (filter identification No.):...........................

শুরুর তারিখ (start date) :....................... সময় (time): ....

শেষের তারিখ (finish date) :............................ সময় (time): ....

ব্যয়িত সময় : (elapsed time)

শেষ (final) :...........ঘণ্টা (hrs) :..................... মিনিট (min) :.................

শুরু (initial) :......................... ঘণ্টা (hrs) :...... মিনিট (min) :................

মোট সময় (total time) :............ঘণ্টা (hrs) :........... মিনিট (min) :.. ....

আবহগত পর্যবেক্ষণ (metereological observations)

চাপ (pressure) :

শুরু (initial) : ....mm Hg

শেষ (final) : ....mm Hg

গড় (average) : ....mm Hg

তাপমাত্রা (°C) :....................(প্রতি ঘণ্টায়, hourly)

নমুনা সংগ্রহণের হার (sampling rate) :

শুরু (initial) :...... m^3/min : পরিষ্কার আকাশ (clear sky) : হ্যাঁ/না/আংশিক yes/no/partial)

শেষ (final) :......................m^3/min: মেঘাচ্ছন্ন (cloudy) : হ্যাঁ/না/আংশিক

গড় (average): ....m^3/min : বৃষ্টি (rain) : হতে .... ঘণ্টা

স্বাক্ষর

উদাহরণ ১ : 'হাই-ভল ফিল্টারকরণ' পদ্ধতিতে বায়ুর ভাসমান বস্তুকণা সংগ্রহণে পরিষ্কার ও বস্তুকণাসহ ফিল্টার খণ্ডের ওজন যথাক্রমে 4.1256 ও 4.6173 g। নমুনা সংগ্রহণে মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত নিচে দেওয়া হলো (ছক থেকে)। উক্ত উপাত্তের আলোকে বায়ুর প্রমাণ অবস্থায় তাতে ভাসমান বস্তুকণার প্রাচুর্য হিসাব কর।

নমুনা সংগ্রহণ স্থানে 24 ঘণ্টায় গড় চাপ = 713.5 mm Hg

গড় তাপমাত্রা = 24°C বা 297 K

নমুনা সংগ্রহণে ব্যয়িত সময় = 24 hrs = 1440 min

নমুনা সংগ্রহণের হার: শুরুতে - 1.6 m^3 / min

শেষে - 1.5 m^3 / min

গড় - 1.55 m^3 / min

নমুনা হিসেবে গৃহীত বায়ুর পরিমাণ = নমুনা - সংগ্রহণের গড় হার × ব্যয়িত সময়

$\ll$ 1.55 m^3/min × 1440 min = 2232 m^3

চাপ ও তাপমাত্রার সংশোধন : $PV/T = P_1V_1/T_1$

$$\frac{760 \times V}{273} = \frac{713.5 \times 2232}{297}$$

∴ চাপ ও তাপমাত্রা সংশোধিত V = 1926.11 m^3

বস্তুকণার ওজন (ফিল্টার একই আর্দ্রতায় 24 ঘন্টা রাখার পর):

পরিষ্কার ফিল্টার এর ওজন = 4.1256 g

বস্তুকণাসহ ফিল্টার এর ওজন = 4.6173 g

বস্তুকণার ওজন = 0.4917 g

$$\text{বস্তুকণার প্রাচুর্য} = \frac{\text{বস্তুকণার ওজন } (\mu g)}{\text{নমুনা হিসেবে বায়ুর সংশোধিত পরিমাণ } (m^3)}$$

$= 4.917 \times 10^5 \mu g / 1926.11\ m^3$

$= 255.28\ \mu g/m^3$]

৮খ-৩. কার্বন মনোক্সাইড (CO) নির্ণয়করণ :

১. অবিচ্ছুরণীয় অবলোহিত বর্ণালি বিশ্লেষণ (Non-dispersive IR Spectrophotometry, NDIR): বায়ুর 0.1 – 100 ppm CO নির্ণয়করার জন্য NDIR একটি প্রমাণ পদ্ধতি। অবিরাম বিশ্লেষণের জন্য পদ্ধতিটি উপযোগী। এতে 100 cm দীর্ঘ একটি কোষের এক প্রান্তে নমুনা প্রবেশ করে অন্য প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসে; CO গ্যাস 4.6 μm IR বিকিরণ শোষণ করে। নমুনা কোষের পাশাপাশি একই প্রকার একটি রেফারেন্স কোষ থাকে যা IR বিকিরণ শোষণ করে না, এমন একটি গ্যাস (যেমন N_2) দ্বারা পূর্ণ থাকে। একই ক্ষমতার (power) IR বিকিরণ উভয় কোষের ভেতর দিয়ে প্রেরিত হয় এবং কোষ থেকে বিকিরণ 'ডিটেক্টরে' প্রবেশ করে। রেফারেন্স কোষের তুলনায় নমুনা-কোষ থেকে নির্গত বিকিরণের ক্ষমতা নিম্নতর থাকে কেননা নমুনার CO বিকিরণের একটি ভগ্নাংশ শোষণ করে নেয়। দুটি কোষ থেকে যে বিকিরণ নির্গত হয় তাদের ক্ষমতার পার্থক্য CO এর ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে এবং উক্ত পার্থক্য অনুসারে ডিটেক্টরের বার্তা (signal) গঠিত হয়।

জলীয় বাষ্প পদ্ধতিটির জন্য একটি প্রতিবন্ধক, কোষে বায়ুর নমুনা প্রেরণের পূর্বে উপযুক্ত শুষ্ককারক কলামের ভেতর দিয়ে তাই একে প্রেরণ করতে হয়। পদ্ধতিটির সুবিধা, এর বার্তাগঠন দ্রুত এবং ঘনমাত্রার বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তিতে সংবেদনশীলতা সন্তোষজনক তবে NDIR-বার্তার স্থিতিশীলতা কম।

২.গ্যাস-ক্রোমাটোগ্রাফী (GC): গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফীতে শিখা আয়নায়ন ডিটেক্টর (flame ionisation detector) ব্যবহার করে বায়ুর 0.05 – 10.0 ppm CO নির্ণয় করা সম্ভব। পদ্ধতিটির জন্য CH_4 একটি প্রতিবন্ধক কেননা CO কে CH_4-এ বিজারিত করে সে CH_4 পরিমাপ করা পদ্ধতিটির নীতি। তাই, নমুনা থেকে প্রথমে CH_4 পৃথক করে CO কে CH_4 এ বিজারিত এবং পরে CH_4 হিসেবে CO নির্ণয় করা হয়:

$$\text{নমুনা } (CO + CH_4) \xrightarrow{-CH_4} CO \xrightarrow[360°C]{H_2(Ni)} CH_4 \text{ (নির্ণেয়)}$$

$$CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$$

পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল এবং শিখা তৈরি ও CO বিজারণের নিমিত্তে এতে H_2 গ্যাস প্রয়োজন হয়।

৮খ-৪. নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x) নির্ণয়করণ:

১. দৃশ্যমান বর্ণালি বিশ্লেষণ (Jacob – Hockheiser method):

নীতি : বায়ুর নমুনা 0.1M NaOH দ্রবণের মাঝে সংগ্রহ করা হলে NO_x গ্যাস NO_2^- আয়নে পরিণত হয়; উক্ত দ্রবণে সালফানিলামাইড ও N-(1-ন্যাপথাইল) ইথিলিন ডাই-

অ্যামিন যোগ করা হলে NO_2^- তীব্র রঙ-এর একটি অ্যাজো রঞ্জক তৈরি করে যার λ_{max} 550 ± 5 nm। উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দ্রবণটির অ্যাবসরবেন্স (A) মেপে নমুনায় NO_x এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করা পদ্ধতিটির নীতি ।

প্রতি মিলিলিটার বায়ুতে 0.01 – 1.5 μg NO_2 পদ্ধতিটির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। পদ্ধতিটির জন্য SO_2 একটি প্রতিবন্ধক; H_2O_2 এর সাহায্যে উক্ত প্রতিবন্ধক অপসারিত হতে পারে; H_2O_2 দ্রবণ SO_2 কে H_2SO_4 অ্যাসিডে জারিত করে।

বিশ্লেষণ প্রণালি :

ক.50 mL 0.1 M NaOH দ্রবণের ভিতর দিয়ে প্রতি মিনিটে 200 mL বায়ু অবিরাম 24 ঘণ্টা বুদবুদ আকারে প্রেরণ কর (নমুনা সংগ্রহকরণের শোষক দ্রবণ পদ্ধতি, ৮.৪ দ্রঃ)।

খ.নমুনার 10.0 mL এলিকোট পিপেটের সাহায্যে ছোট একটি বিকারে স্থানান্তরিত করে তার মাঝে 1-mL H_2O_2 (0.2 mL 30% H_2O_2 + পানি = 250 mL), 10 mL সালফানিলামাইড (20-g সালফানিলামাইড + 700 mL পানি + 50 mL 85% H_3PO_4 + পানি = 1L) ও 1.4 mL N-(1-ন্যাপথাইল) ইথিলিনডাইঅ্যামিন ডাই-হাইড্রোক্লোরাইড (0.5-g ডাইহাইড্রোক্লোরাইড লবণ + 500 mL পানি) যোগ কর এবং ভালোভাবে নেড়ে মিশ্রণটি সমসত্ত্ব কর। দ্রবণটি একঘণ্টা শান্তভাবে রেখে দাও; এ সময় অ্যাজো রঞ্জকের সংশ্লেষণ সম্পূর্ণ হবে।

গ.একটি ফাঁকা দ্রবণের (blank) সাপেক্ষে 550± 5 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে অ্যাজো রঞ্জক দ্রবণের অ্যাবসরবেন্স মাপ এবং প্রমাণ NO_2^- দ্রবণের সাহায্যে অঙ্কিত ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নমুনায় NO_2 এর ঘনমাত্রা নির্ণয় কর।

২.রাসায়নিক প্রোজ্জ্বল পদ্ধতি (chemiluminescent method) : NO_x অবিরাম নির্ণয়করণের বেশ কিছু পদ্ধতি প্রচলিত আছে; তাদের মাঝে রাসায়নিক প্রোজ্জ্বল পদ্ধতির ব্যবহার সবচেয়ে ব্যাপক। পদ্ধতিটির সুবিধা, এতে খরচ কম, পদ্ধতির নির্ভুলতা, সংবেদনশীলতা (প্রায় 10^{-3} ppm NO) ও বাছাইকরণ ক্ষমতা (specificity) উচ্চ এবং NO- ঘনমাত্রার বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তিতে (0.004 - 1000 ppm) এটি কাজ করে।

নীতি : ওজোনের সাথে বিক্রিয়ায় NO গ্যাস NO_2-এ পরিণত হয় যার প্রায় 7% উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। উত্তেজিত NO^*_2 ভিত্তি অবস্থায় ফিরে আসার সময় যে বিকিরণ নির্গত হয় তার ক্ষমতা (power) নমুনায় বিদ্যমান NO ঘনমাত্রার সমানুপাতিক।

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2^* + O_2$$

$$NO_2^* \rightarrow NO_2 + h\nu$$

একটি ফটোমাল্টিপ্লায়ার-এর সাহায্যে নির্গত বিকিরণের ক্ষমতা মেপে নমুনায় NO এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করা রাসায়নিক প্রোজ্জ্বল পদ্ধতির নীতি।

নমুনায় NO_2 উপস্থিত থাকলে, বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠে প্রেরণের পূর্বে নমুনার NO_2 কে NO-এ বিজারিত করতে হয়। যন্ত্রের সাথে স্টেইনলেস স্টিল কুণ্ডলীর একটি তাপীয় কনভার্টর (thermal convertor) সংযোজিত থাকে; উক্ত কনভার্টর NO_2 কে NO এ বিজারিত করে। নমুনা একবার কনভার্টর বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠ এবং অন্যবার সরাসরি বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রেরণ করে পরিমাপ করা হয়। প্রথম পরীক্ষার ফলাফল থেকে দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলাফল বাদ দিয়ে NO_2-এর ঘনমাত্রা পাওয়া যায়।

বেশ কিছুদিন পূর্বে NO_2 নির্ণয় করার প্রোব (probe) উদ্ভাবিত হয়েছে যা পটেনশিও-মিতি পদ্ধতির নীতিতে কাজ করে। এর সাহায্যে NO_2 সরাসরি নির্ণয় করা যায়।

৮খ-৫. সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) নির্ণয়করণ :

ক. দৃশ্যমান বর্ণালি বিশ্লেষণ (রূপান্তরিত West-Gaeke পদ্ধতি) : রূপান্তরিত West-Gaeke পদ্ধতি বায়ুর SO_2 নির্ণয় করার জনপ্রিয় একটি দৃশ্যমান বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতি; 0.002 - 5 ppm SO_2 পদ্ধতিটির সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব।

নীতি : বায়ু পটাশিয়াম টেট্রাক্লোরোমারকিউরেট ($HgCl_4^{2-}$: $HgCl_2$ + KCl) দ্রবণের ভিতর দিয়ে প্রেরণ করা হলে বিকারকটির সাথে বিক্রিয়া করে SO_2 গ্যাস অনুদ্বায়ী ডাইক্লোরোসালফিটোমারকিউরেট আকারে দ্রবণে শোষিত হয়:

$$HgCl_4^{2-} + SO_2 + H_2O \rightarrow HgCl_2.SO_3^{2-} + 2H^+ + 2Cl^-$$

উক্ত দ্রবণে HCHO ও p-রোজানিলিন হাইড্রোক্লোরাইড যোগ করে টকটকে লাল রঙ এর (magenta color) p -রোজানিলিনসালফোনিক অ্যাসিড পাওয়া যায় যার λmax 560 nm। উক্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দ্রবণটির অ্যাবসরবেন্স মেপে বায়ুতে SO_2 এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করা পদ্ধতিটির নীতি।

লৌহ ও অন্যান্য কিছু ভারি ধাতু পদ্ধতিটির প্রতিবন্ধক তবে দ্রবণে EDTA যোগ করে ভারি ধাতুর প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়, ভারি ধাতু EDTA এর সাথে স্থিতিশীল জটিল আয়ন গঠন করে। বায়ুর NO_2ও পদ্ধতিটিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; দ্রবণে সামান্য পরিমাণ সালফামিক অ্যাসিড যোগ করা হলে NO_2এর প্রতিবন্ধকতা দূর হয়; সালফামিক অ্যাসিড NO_3^- কে ধ্বংস করে।

West-Gaeke পদ্ধতির অসুবিধা, $HgCl_2$ এর দাম বেশি এবং পদার্থটি বিষাক্ত। টেট্রাক্লেরোমারকিউরেট দ্রবণের পরিবর্তে SO_2এর শোষক হিসেবে পটাশিয়াম হাইড্রোজেনথ্যালেট দ্রবণ (204 mg KHP + পানি = 1L) দ্বারা বাফারকৃত (pH 4.2) HCHO দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্যাসটি দ্রবণে শোষিত হওয়ার পর তাতে NaOH (4.5 M) দ্রবণ যোগ করা হলে SO_3^{2-} মুক্ত হয়, যা p- রোজানিলিন হাইড্রোক্লোরাইডের সাথে একইভাবে বিক্রিয়া করে p-রোজানিলিনসালফোনিক অ্যাসিড

রঞ্জক উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে Mn(II) ছাড়া অন্য কোনো ভারি ধাতু বা NO_2 পদ্ধতিটিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণীয় $\lambda_{max} = 580$ nm। [P.K. Dasgupta, D. Decesare & J.C. Ullrey; Anal. Chem., 52, 1912-22, 1980].

বিশ্লেষণ প্রণালিতে বিকারক :

K_2HgCl_2 : 13.6 g $HgCl_2$ + 7.5 g KCl + পানি = 1L,
p-রোজানিলিন : 1-g p-রোজানিলিন + 6 mL গাঢ় HCl + পানি = 100 mL,
0.2% HCHO : 5-mL 40% HCHO + পানি = 1L,
Na_2SO_3 দ্রবণ : আয়োডোমিতি পদ্ধতির সাহায্যে প্রমিত।

২. **বায়ুতে SO_2 নির্ণয়করণের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি :** SO_2 নির্ণয় করার বেশকিছু স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রচলিত আছে; এদের মাঝে পরিবহণমিতি (conductometry) ও কুলোমিতি (coulometry) প্রধান; পদ্ধতি দুটির নীতি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক. পরিবহনমিতি পদ্ধতি : বায়ু H_2O_2 দ্রবণের ভিতর দিয়ে প্রেরণ করা হলে SO_2 গ্যাস H_2SO_4 অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং দ্রবণের পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়:

$$SO_2 + H_2O_2 \rightarrow H_2SO_4$$

দ্রবণে পরিবাহিতার যে বৃদ্ধি ঘটে তা বায়ুতে বিদ্যমান SO_2 এর ঘনমাত্রার সাথে সমানুপাতি সম্পর্ক অনুসরণ করে। উক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পরিবহণমিতি পদ্ধতির সাহায্যে বায়ুতে SO_2 এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয়। পদ্ধতিটির সাহায্যে 0.01 ppm পর্যন্ত SO_2 নির্ণয় করা যেতে পারে।

বায়ুতে অম্লীয় (যেমন, HCl) কিংবা ক্ষারকীয় (যেমন, NH_3) কোনো উপাদান উপস্থিত থাকলে তা পদ্ধতিটিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; অম্লীয় অপদ্রবের জন্য ফলাফলে ধনাত্মক (+) ভুল এবং ক্ষারকীয় অপদ্রবের জন্য ঋণাত্মক (-) ভুল সৃষ্টি হয়।

খ. কুলোমিতি (coulometry) : কুলোমিতি কোষে অম্লীয় (H_2SO_4) ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করা হলে নির্দেশক - রেফারেন্স (indicator-reference) ইলেকট্রোডের মাঝে নির্দিষ্ট একটি মানের পটেনশিয়াল পার্থক্য সৃষ্টি হয়। SO_2 গ্যাস বহনকারী বায়ু উক্ত দ্রবণের ভিতর দিয়ে অবিরাম প্রেরণ করতে থাকলে SO_2 এর সাথে বিক্রিয়ায় Br_2 এর ঘনমাত্রার ক্রমশ অবনতি ঘটে যার দরুন নির্দেশক-রেফারেন্স ইলেকট্রোডের মাঝে পটেনশিয়াল পার্থক্য পরিবর্তিত হতে থাকে:

$$SO_2 + Br_2 + H_2O \rightarrow 2Br^- + SO_4^{2-} + 4H^+$$

সিস্টেমটি যান্ত্রিক উপায়ে স্থির পটেনশিয়ালে স্থাপিত থাকে তাই পটেনশিয়াল পার্থক্যের পরিবর্তন ঘটলে তার প্রতিরোধে যন্ত্র সচেষ্ট হয় এবং একজোড়া উৎপাদক সহায়ক (generator-auxiliary) ইলেকট্রোডের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Br^- কে Br_2 এ জারিত করে দ্রবণে Br_2 এর ঘনমাত্রা তথা পটেনশিয়াল পার্থক্যকে আদি মানে ফিরিয়ে আনে:

$$2Br^- - 2e = Br_2$$

BANSDOC Library Dhaka

এভাবে SO_2 কর্তৃক Br_2-এর বিজারণ এবং উৎপাদক ইলেকট্রোডে Br^- এর Br_2 এ জারণ যুগপৎ চলতে থাকে; Br^- এর উক্ত জারণে যে চার্জ (কুলম্ব) প্রয়োজন হয় তার ভিত্তিতে নমুনায় SO_2এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করা আলোচ্য কুলোমিতি পদ্ধতির নীতি। পদ্ধতিটির সাহায্যে 0.1-10 ppm SO_2 নির্ণয় করা যায়।

পটেনশিওমিতি পদ্ধতির নীতিতে কাজ করে এমন একটি প্রোবও SO_2 নির্ণয়করার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে; প্রোবটির সাহায্যে SO_2 সরাসরি নির্ণয় করা যায়।

৮খ-৬. জারক ও ওজোন নির্ণয় করণ : বায়ুতে যেসব জারক সচরাচর উপস্থিত থাকে তাদের মাঝে ওজোন, ওজোনাইডস, হাইড্রোকার্বনের পার-অক্সাইড ও পারক্সিঅ্যাসাইল নাইট্রেট উল্লেখযোগ্য। নিচে জারক নির্ণয় করণের প্রচলিত দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

১. বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতি : ফসফেট দ্বারা বাফারকৃত প্রশম 1% KI দ্রবণের ভিতর দিয়ে বায়ু প্রেরণ করা হলে, I^- এর সাথে বায়ুতে বিদ্যমান জারকের বিক্রিয়া ঘটে এবং দ্রবণে I_2 মুক্ত হয়:

$$2KI + O_3 + H_2O \rightarrow O_2 + 2KOH + I_2 \;;$$

I_2 দ্রবণের λmax 352 nm; উক্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে দ্রবণটির অ্যাবসর্বেন্স (A) মেপে, প্রমাণ I_2 - দ্রবণের সাহায্যে অঙ্কিত একটি ক্রমাঙ্কন রেখার (calibration curve) ভিত্তিতে বায়ুতে জারকের পরিমাণ নির্ণয় করা আলোচ্য বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতির নীতি। বায়ুতে জারকের পরিমাণ তুল্যপরিমাণ O_3 হিসেবে প্রকাশ করা হয়। পদ্ধতিটির সহায্যে 0.01 – 10 ppm জারক (O_3 হিসেবে) নির্ণয় করা যেতে পারে।

আলোচ্য পদ্ধতিটি 'অবিরাম প্রবাহ বর্ণালি বিশ্লেষণ যন্ত্র' ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে KI দ্রবণের ঘনমাত্রা উচ্চ রাখা হয় (10-20%), যাতে জারকের সাথে অবিরাম বিক্রিয়ায় I^- এর ঘাটতি সৃষ্টি হতে না পারে। পদ্ধতিটির জন্য SO_2 একটি প্রতিবন্ধক। নমুনা সংগ্রহণ ব্যবস্থায় ক্রোমিক অ্যাসিড দ্বারা সিক্ত কাচ তন্তু ফিল্টার ব্যবহার করা হলে SO_2 এর প্রতিবন্ধকতা দূর হয়; ক্রোমিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে SO_2 গ্যাসের SO_4^{2-} এ জারণ ঘটে। তবে, ক্রোমিক অ্যাসিড বায়ুতে বিদ্যমান NO কে NO_2 এ জারিত করে। NO_2 একটি জারক বলে এটিও বিশ্লেষণ পদ্ধতির জন্য একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বায়ুতে, তাই, SO_2 এর মাত্রা যখন NO মাত্রার 20% এরও কম থাকে তখন ক্রোমিক অ্যাসিড ব্যবহার করা উচিত নয়।

২. স্বয়ংক্রিয় কুলোমিতি পদ্ধতি : কুলোমিতি কোষে KI দ্রবণের একটি পাতলা স্তরের ভিতর দিয়ে বায়ু প্রেরণ করে I_2 উৎপাদন করা হয়; ক্যাথোডে উক্ত I_2 এর বিজারণ ঘটে এবং কোষের ভিতর দিয়ে বিদুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হতে থাকে। একটি মাইক্রোঅ্যামিটার এর সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ (চার্জ) পরিমাপ করে I_2 তথা জারকের

পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। পদ্ধতিটি 0.01 - 0.20 ppm জারকের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম কাজ করে। বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতির মতো (উপরে ১.) এক্ষেত্রেও SO_2 ও NO প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৮খ-৭.বায়ুতে হাইড্রোকার্বন (HC) নির্ণয়করণ :

১.আবহমণ্ডলের বায়ুতে হাইড্রোকার্বন : হাইড্রোকার্বন 'মোট হাইড্রোকার্বন' অথবা 'স্বতন্ত্র হাইড্রোকার্বন' হিসেবে নির্ণয় করা হয়। বায়ুতে যে হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়, মিথেনের পরিমাণ তাতে সবচেয়ে বেশি থাকে। মিথেন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় তাই মিথেন বাদে অন্য সব হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ 'মোট হাইড্রোকার্বন' হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

বায়ুতে হাইড্রোকার্বন নির্ণয় করার জন্য গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফী বিশেষভাবে উপযোগী একটি পদ্ধতি। গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফীর সাথে শিখা আয়নায়ন ডিটেক্টর (flame ionisation detector, FID) অথবা ভর বর্ণালি যন্ত্র যুক্ত করে (GC/MS) অতি নিম্ন ঘনমাত্রার হাইড্রোকার্বন স্বতন্ত্রভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। FID পদ্ধতিতে NO_x, SO_2, H_2O কিংবা কার্বনের জারিত যৌগ (যা সচরাচর বায়ুতে উপস্থিত থাকে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

বায়ুতে হাইড্রোকার্বন নির্ণয় করার জন্য নমুনা সাধারণত ঘনীভূত করার প্রয়োজন হয় কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে HC এর পরিমাণ বায়ুতে এতো কম থাকে যে, অতি সংবেদনশীল পদ্ধতির সাহায্যেও তা সরাসরি নির্ণয় করা যায় না। তরল পদার্থে শোষণ, কঠিন বস্তুর পৃষ্ঠে পরিশোষণ অথবা শীতলীকরণ (freezing) পদ্ধতির সাহায্যে বায়ুর HC ঘনীভূত করা যেতে পারে।

পেট্রোলিয়াম যখন পাতিত করা হয় তখন 'স্ট্র'(straw) নামে উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক একটি তেল পৃথক হয়। উক্ত তেল বায়ু থেকে কেবল HC শোষণ করে নেয়। 'স্ট্র' তেলের ভিতর দিয়ে বায়ু প্রেরণ করা হলে, তেলের মাঝে HC এর ঘনীভবন ঘটে।

পরিশোষণ পদ্ধতিতে পরিশোষক হিসেবে স্টাইরিন ডাইভিনাইল বেনজিন পলিমার ব্যবহার করা যেতে পারে; পলিমারটির রন্ধ্রের মাঝে HC পরিশোষিত হয়। পলিমারপূর্ণ একটি কলামের ভিতর দিয়ে বায়ু ধীরে ধীরে (4 mL / min) প্রেরণ করা হলে 5-7 মিনিটের মাঝে পর্যাপ্ত HC এর তাতে পরিশোষণ ঘটে। পরে জৈব দ্রাবক দ্বারা কলামটি ধৌত করে অথবা পলিমার কণা উত্তপ্ত করে পরিশোষিত HC মুক্ত করা হয়।

শীতলীকরণ পদ্ধতির নীতি, ক্রমান্বয়ে নিম্নতর তাপমাত্রায় স্থাপিত পরস্পর সংযুক্ত একগুচ্ছ পাত্রের ভিতর দিয়ে বায়ু প্রেরণ করা। এতে এক একটি গ্যাসীয় মিশাল (contaminant) স্ফুটানাঙ্ক/গলনাঙ্কের ভিত্তিতে তরল/কঠিন অবস্থায় এক একটি পাত্রে

জমা হয়। পাত্র শীতলকরার জন্য নিম্নলিখিত 'কোল্ড ট্রাপ' (cold trap) ব্যবহার করা হয়ে থাকে:

কোল্ড ট্রাপ	প্রাপ্ত তাপমাত্রা °C
বরফ পানি	0
বরফ লবণ (NaCl)	–21
শুষ্ক বরফ (CO_2) এসিটোন	–79
তরল বায়ু	–147
তরল অক্সিজেন	–183
তরল নাইট্রোজেন	–193

বায়ু থেকে হাইড্রোকার্বন পৃথক করার জন্য 'শীতলীকরণ' প্রক্রিয়া দক্ষ একটি পদ্ধতি। তবে, এর একটি দুর্বল দিক, HC এর সাথে কিছু জলীয় বাষ্পও (H_2O) পাত্রে জমা হয়। যদিও পানি-শোষক (desiccant) দ্বারা পূর্ণ কলামের ভিতর দিয়ে বায়ু প্রেরণ করে বায়ুর জলীয় বাষ্প অপসারণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, নমুনায় যদি সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প উপস্থিত থাকেও তাতে FID পদ্ধতিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না। বায়ুর সর্বনিম্ন 0.1 $\mu g/m^3$ পরিমাণ হাইড্রোকার্বন FID পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব।

২. যানবাহনের ধোঁয়ায় অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (HC) **নির্ণয়করণঃ** নমুনা সংগ্রহকরণ: নিচের চিত্রে (চিত্র ৮.৭) যেমন দেখানো হয়েছে ঐরূপ একটি ব্যবস্থার সাহায্যে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ার একটি নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। নল-1 এর ট্যাপ উন্মুক্ত করে নল -2 এর ভিতর দিয়ে বায়ু জোরের সাথে বোতলে প্রেরণ করা হলে ব্যাগ থেকে বায়ু বেরিয়ে যায়। তখন ট্যাপ বন্ধ করে নল-1, যানবাহনের যে নল থেকে ধোঁয়া বাইরে নির্গত হয়, তার সাথে যুক্ত করার পর ট্যাপ উন্মুক্ত করা হলে ব্যাগ নিমেষেই যানবাহনের ধোঁয়ায় পূর্ণ হয়। তবে, নির্গত গ্যাসের চাপ খুব কম হলে গ্যাস সহজে পূর্ণ হতে চায় না; সেক্ষেত্রে, নল-2 এর মাধ্যমে বোতলের বায়ু জোরের সাথে টেনে নিলে ব্যাগ পূর্ণ করা সহজ হয়।

যানবাহন থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হয় তার প্রতি ঘনমিটারে কয়েকশত মিলিগ্রাম অদগ্ধ / আংশিকদগ্ধ অ্যারোমেটিক যৌগ উপস্থিত থাকে। গ্যাস তরল ক্রোমাট্রোগ্রাফীতে (GLC) পলিইথিলিন গ্লাইকল স্থির দশা (90°C তাপমাত্রায় স্থাপিত) এবং N_2 গ্যাস চলমান দশা (mobile phase) হিসেবে ব্যবহার করে শিখা আয়নায়ন ডিটেক্টরের (FID) সাহায্যে ধোঁয়ার অ্যারোমেটিক উপাদান পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে CS_2-এর মাঝে হাইড্রোকার্বনের 1% (v/v) দ্রবণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

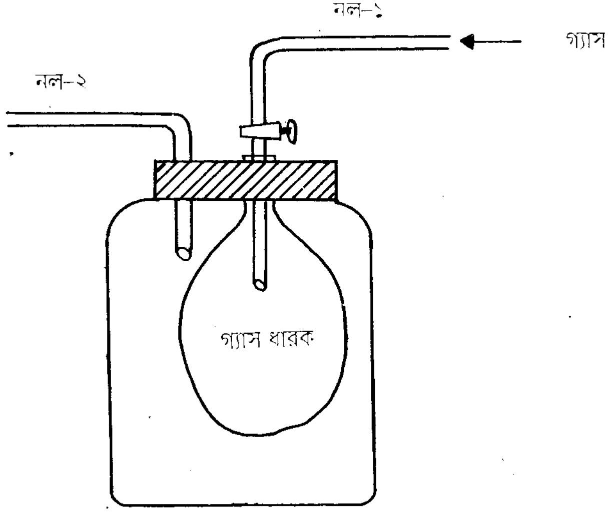

চিত্র ৮.৭ : যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ার নমুনা সংগ্রহকরণ।

৮খ-৮.বায়ুতে বস্তুকণা (particulates) **নির্ণয়করণ** : বায়ু থেকে বস্তুকণা সংগ্রহকরার পদ্ধতি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে (দ্র: ৮.৪)। পরিবেশের উপর বস্তুকণার প্রভাব বস্তুকণার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়; যেমন, বায়ুতে বস্তুকণার প্রাচুর্য, বস্তুকণার গঠনপ্রকৃতি (morphology), আকার, আকৃতি, মৌলিক গঠন (elemental composition) প্রভৃতি। স্থিতিমাপগুলো (parameters) বস্তুকণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করতে হয়; যেমন, সংগৃহীত বস্তুকণার ভর থেকে বায়ুতে এর প্রাচুর্য, দৃশ্যমান ও ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুকণার আকার, আকৃতি ও গঠন প্রকৃতি এবং ভৌত রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বস্তুকণার মৌলিক গঠন (উপাদান) জানা যায়।

অধিকাংশ বস্তুকণার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ধাতু ও ধাতুকল্প (metalloid)। বর্তমানে বহু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলোর সাহায্যে 'ট্রেস পরিমাণ' ধাতু ও ধাতুকল্প উচ্চ মাত্রার নির্ভুলতায় নির্ণয় করা সম্ভব।

পারমাণবিক বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS) ঐরূপ একটি পদ্ধতি। পদ্ধতিটির সাহায্যে এক ধাতুর উপস্থিতিতে অন্য ধাতু কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া, ppm স্তরেও নির্ণয় করা যায়। বস্তুকণা, তথা পরিবেশের যে কোনো নমুনার গঠন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিশয় জটিল হয়। একই নমুনায় প্রায়ই বহু সংখ্যক ধাতু/ধাতুকল্প উপস্থিত থাকে। পরিবেশের নমুনা নির্ণয় করার জন্য AAS পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপক। বস্তুকণার ধাতু/ধাতুকল্প নির্ণয় করার জন্য পদ্ধতিটির প্রয়োগ প্রণালি নিচে আলোচনা করা হলো।

১.কাচতন্তু ফিল্টার-এ সংগৃহীত বস্তুকণা ('হাইভল ফিল্ট্রেশন) : বস্তুকণা যে ফিল্টার আস্তরণের উপর সংগৃহীত হয় তার অর্ধাংশ কেটে টুকরা টুকরা করে একটি 150 mL বিকারে লও এবং এতে 0.5 g $KClO_3$ লবণ ও পরে 100 mL 20% (v/v) HNO_3 যোগ কর। বিকারের মুখ একটি 'ওয়াচ গ্লাস' দ্বারা ঢেকে হটপ্লেটের (hot plate) উপর মিশ্রণটি 15 মিনিট মৃদু ফুটন্ত অবস্থায় (simmer) রাখ। তাপ কমিয়ে মিশ্রণটি ঈষৎ ঠাণ্ডা কর এবং সারারাত ওভাবে রেখে একেবারে শুষ্ক অবস্থায় নিয়ে আস। 'অবশেষসহ' বিকার ঠাণ্ডা করে অবশেষের মাঝে 20 mL গাঢ় HCl যোগ কর এবং 80°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে মিশ্রণে 80 mL 4% EDTA দ্রবণ যোগ কর। মিশ্রণটি 30 মিনিট শান্তভাবে রেখে দেয়ার পর একটি কাচদণ্ডের সাহায্যে নেড়ে ভালোভাবে মিশাও। বস্তুকণার ধাতু/ধাতুকল্প নির্ণয় করার জন্য উক্ত দ্রবণ পারমাণবিক বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ যন্ত্রে (Atomic Absorption Spectrophotometer) সরাসরি ব্যবহার করতে হয়।

একই আয়তনের একখণ্ড ফিল্টার আস্তরণ নিয়ে একইভাবে একটি ফাঁকা দ্রবণ (blank) প্রস্তুত কর এবং নমুনা দ্রবণের পাশাপাশি ফাঁকা দ্রবণ মেপে ফাঁকা দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স (A) নমুনা দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স থেকে বাদ দাও। এরপর বিশ্লেষ্য ধাতুর একগুচ্ছ প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে একটি A বনাম C ক্রমাঙ্কন রেখা আঁক এবং নমুনার সংশোধিত A উক্ত রেখায় বসিয়ে দ্রবণে ধাতুর ঘনমাত্রা তথা বায়ুতে এর প্রাচুর্য হিসাব কর।

পারমাণবিক বর্ণালি বিশ্লেষণে পরমাণুকরণ (atomization) পদ্ধতি দুই প্রকার- শিখা (flame) ও গ্রাফাইট চুল্লি (graphite furnace); চুল্লি পদ্ধতির মাপনসীমা (detection limit) শিখা পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম; কোনো কোনো মৌলের ক্ষেত্রে তা শত সহস্রগুণ পর্যন্ত কমও হয়। শিখা বিভিন্ন জারক ও জ্বালানির মিশ্রণে তৈরি হয় এবং মিশ্রণভেদে শিখার তাপমাত্রা কমবেশি হয়ে থাকে (1700 - 3000°C) । শিখা পদ্ধতির সাহায্যে Cd, Cu, Pb ও Zn নির্ণয় করার জন্য অ্যাসিটিলিন-বায়ু শিখা (2100-2400°C) এবং As নির্ণয় করার জন্য H_2 -বায়ু শিখা (2000-2100°C) ব্যবহার করতে হয়। সচরাচর নির্ণয় করা হয়, এমন কিছু ধাতুর বৈশ্লেষিক λ পরিশিষ্টে প্রদান করা হলো (পরিশিষ্ট - ৬)।

২.হোয়াটম্যান ফিল্টার পেপার [সেলুলোজ]-এর উপর সংগৃহীত বস্তুকণায় ধাতু/ধাতুকল্প নির্ণয়করণ : প্রায় 10 cm^2 আয়তনের ফিল্টার পেপার বস্তুকণাসহ একটি বিকারে 7.5 mL ফুটন্ত গাঢ় HNO_3 অ্যাসিডের মাঝে লও এবং পরে এতে 5 mL $HClO_4$ অ্যাসিড যোগ করে ততক্ষণ তাপ দিতে থাক যতক্ষণ বর্ণহীন স্বচ্ছ একটি দ্রবণ তৈরি না হয়। দ্রবণটি ফুটিয়ে অতিরিক্ত অ্যাসিড তাড়িয়ে দাও এবং 'অবশেষ' বস্তুতে আবার 2.5 mL HNO_3 অ্যাসিড যোগ করে মৃদু তাপ দিয়ে তা দ্রবীভূত কর। দ্রবণটি ঠাণ্ডা করে একটি আয়তনমিতি ফ্লাস্কে লও এবং পানি দ্বারা 50 mLপর্যন্ত লঘু

কর। বস্তুকণায় ধাতুর পরিমাণ নিম্ন হলে দ্রবণ কম পরিমাণে লঘু করতে হবে। একই আয়তনের একটি পরিষ্কার ফিল্টার পেপার নিয়ে একই প্রক্রিয়ায় একটি ফাঁকা দ্রবণ (blank) প্রস্তুত কর এবং নমুনা দ্রবণের পাশাপাশি ফাঁকা দ্রবণ একইভাবে স্পেকট্রোফটোমিটারে মাপ। ফাঁকা দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স (A) নমুনা দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স (A) থেকে বাদ দাও। বিশ্লেষ্য ধাতুর একগুচছ প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে একটি 'A - C' ক্রমাঙ্কন রেখা আঁক এবং উক্ত রেখায় নমুনা দ্রবণের সংশোধিত 'A' বসিয়ে দ্রবণে বিশ্লেষ্য ধাতুর ঘনমাত্রা, তথা বায়ুতে এর প্রাচুর্য হিসাব করো।

[AAS সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত বই এর সাহায্য নেয়া যেতে পারে:

1. Principles of Instrumental Analysis; D.A. Skoog, 4th Ed, Saunders College Publishing, USA.
2. Instrumental Methods of Analysis; Willard, Merritt, Dean & Settle; 6th Ed., D. Van Nostrand, USA]

৩. বায়ুতে বস্তুকণার প্রাচুর্য নির্ণয় করার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি: পিয়াজো বিদ্যুৎপ্রবাহের (piezoelectricity) ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে, এমন একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুতে বস্তুকণার প্রাচুর্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ণয় করা যায়। কেন্দ্রীয় অপ্রতিসম কিছু কিছু স্ফটিক আছে (যেমন, কোয়ার্টজ) যাতে যান্ত্রিক চাপ (mechanical pressure) প্রয়োগ করা হলে, পটেনশিয়াল পার্থক্যের উদ্ভব ঘটে। ঐরূপ স্ফটিককে পিয়াজো বৈদ্যুতিক স্ফটিক (piezoelectric crystal) বলে; a. c. বর্তনীর মাঝে ঐরূপ স্ফটিক স্থাপন করা হলে পর্যায়ক্রমে এতে সংকোচন ও প্রসারণ ঘটতে থাকে। আলোচ্য পরিমাপন পদ্ধতিতে বায়ুর বস্তুকণা স্থিরতাড়িত (electrostatic) প্রভাবে একটি কম্পমান কোয়ার্টজ এর উপর সঞ্চিত হয়। স্ফটিকের অনুরণন সংখ্যা (resonance frequency) সঞ্চিত বস্তুকণার ভরের সাথে রৈখিকভাবে হ্রাস পায়। কম্পনসংখ্যার উক্ত অবনতি যন্ত্র শনাক্ত করে বস্তুকণার ভরের সমানুপাতিক একটি বার্তা (signal) গঠন করে। বাণিজ্যিকভাবে যেসব কোয়ার্টজ স্ফটিক পাওয়া যায় তাতে প্রতি মাইক্রোগ্রাম (μg) বস্তুকণার জন্য কম্পনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে 2000 Hz। চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় বস্তুকণার পরিমাণ পিয়াজো বৈদ্যুতিক যন্ত্রে সরাসরি নির্ণয় করা যায় না কেননা উক্ত ধোঁয়ায় বস্তুকণার পরিমাণ এতো বেশি থাকে যে, স্ফটিক অকেজো হয়ে পড়ে।

৮গ. পানির দূষণ বিশ্লেষণ (water pollution analysis)

৮গ-১. ভূমিকা

বায়ুর মতো পানিও পরিবেশ দূষকের অন্যতম একটি ধারক ও বাহক। পানির একটি মিশাল (contaminant) দূষক (pollutant) হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা তা নির্ভর করে পানির প্রয়োগক্ষেত্র ও পানিতে বিদ্যমান মিশাল-এর প্রাচুর্যের উপর। বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য পানির যে বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হয় তা বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে; USPHS (United States Public Health Service) ও WHO (World Health Organisation) এমনি দুটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আমাদের

দেশেও বেশ কিছুদিন হলো (1991) একটি স্টান্ডার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। পানীয় ও সেচের পানির কয়েকটি স্টান্ডার্ড, পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট-২) লিপিবদ্ধ করা হলো। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, জনস্বাস্থ্যের উপর কোনো একটি বস্তুর যে প্রভাব সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যতখানি জানা যায় তার উপর ভিত্তি করে 'স্টান্ডার্ড' নির্ধারিত হয়েছে। বস্তুটির প্রভাব সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য জনা গেলে স্টান্ডার্ড পরিবর্তিতও হতে পারে।

প্রয়োগক্ষেত্র যেমনই হোক, ব্যবহার করার পূর্বে পানির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ। যথাযথ বিশ্লেষণ ছাড়া পানি ব্যবহার করা হলে তা বড় রকম ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমাদের দেশে ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, উল্লিখিত সম্ভাবনা তার প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ। বিশুদ্ধ পানীয় পানি পাওয়ার লক্ষ্যে বিগত সত্তর দশক থেকে আমাদের দেশে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র যখন বহু সংখ্যক নলকূপ খনন করা হতে থাকে তখনই যদি প্রত্যেকটি নলকূপের পানি পরীক্ষা করা হতো তাহলে যে সমস্যার সম্মুখীন আজ আমরা হয়েছি তা হয়তো এড়ানো যেতো।

৮গ-২. পানির নমুনা সংগ্রহকরণ (sampling): পানির নমুনা দুই প্রকার হতে পারে, স্থানিক নমুনা (spot sample) ও যৌগিক নমুনা (composite sample)। বিভিন্ন সময়ে একই স্থান থেকে অথবা একই সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে যে নমুনা সংগ্রহ করা হয় তাকে স্থানিক নমুনা বলে। উভয় ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক নমুনা থাকে এবং প্রত্যেকটি নমুনা পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। সময় বা স্থানের সাথে পানির বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তন ঘটে, স্থানিক নমুনায় তার প্রতিফলন ঘটে।

একগুচ্ছ স্থানিক নমুনা একত্রিত করে একটি যৌগিক নমুনা গঠন করা হয়। যৌগিক নমুনা সমগ্র পানি রাশির গড় বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। যৌগিক নমুনা বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে পানি পরিশোধনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পানিতে মিশ্রিত বর্জ্যের গঠন যখন সময় ও পানি প্রবাহের সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে, যৌগিক নমুনা তখন স্থানিক নমুনার তুলনায় অধিকতর অর্থবহ তথ্য প্রদান করে। যৌগিক নমুনা স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও সংগ্রহ করা যায়। দিনব্যাপী নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বহুসংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করে তার সাহায্যে যখন একটি যৌগিক নমুনা গঠন করা হয়, বিশেষ করে তখন স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা কাজটিকে সহজতর করে। বড় আকারের একটি যৌগিক নমুনার পরিবর্তে ছোট আকারের বহুসংখ্যক স্থানিক নমুনা (স্থান ও কাল, উভয়) বিশ্লেষণ করে পানির অণু-বৈশিষ্ট্য (micro-characteristics) সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত ভালো ধারণা পাওয়া যায়। নমুনার প্রকার যাই হোক, নমুনা সংগ্রহণের স্থান, সময় ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ, ফলাফলের সাথে প্রকাশ করতে হয়।

বিশ্লেষণীয় স্থিতিমাপের প্রকৃতি, সংখ্যা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর নমুনার আবশ্যকীয় পরিমাণ নির্ভর করে। স্থানিক নমুনার ক্ষেত্রে উক্ত পরিমাণ 1-2 লিটার এবং যৌগিক নমুনার ক্ষেত্রে তা 2-4 লিটার হওয়া উচিত। নমুনা প্রায়ই সংরক্ষণ করার

প্রয়োজন হয়। কিন্তু, পানির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, নমুনা সংরক্ষণ করার ফলে যেগুলোর পরিবর্তন ঘটে; পানির D.O. ও pH এমনি সাধারণ দুটি বৈশিষ্ট্য। পানিতে জারণীয় কোনো পদার্থ উপস্থিত থাকলেও একই ঘটনা ঘটে; যেমন, নমুনার Fe (II) ও Mn(II) বায়ুর সংস্পর্শে এসে Fe(III) ও Mn(IV) এ জারিত হয় যা একসময় হাইড্রোক্সাইড/হাইড্রাস অক্সাইড আকারে অধঃক্ষেপ পড়ে। তাছাড়া জৈবিক ক্রিয়ায় পানির COD ও ফেনল মান হ্রাস পায় এবং NO_3^- - NO_2^- - NH_3 বা SO_4^{2-} - SO_3^{2-} - S^{2-} এর আপেক্ষিক মাত্রার পরিবর্তন ঘটে। সংরক্ষণ পাত্রের দেয়াল থেকেও নমুনায় Na, SiO_2, B প্রভৃতি পদার্থ যুক্ত হতে পারে। নমুনা বহুদিন সংরক্ষণ করা হলে তার বর্ণ, গন্ধ ও পঙ্কিলতার পরিবর্তন ঘটে। উল্লেখ্য, পানির তাপমাত্রা, pH ও D.O. নমুনা সংগ্রহণের সময় নির্ণয় করতে হয়। যেসব স্থিতিমাপ নমুনা সংগ্রহ করার সময় নির্ণয় করা যায় না, তাদের জন্য এমন ব্যবস্থায় নমুনা সংরক্ষণ করতে হয় যাতে ঐসব স্থিতিমাপের কার্যত কোনো পবিবর্তন না ঘটে। বিভিন্ন স্থিতিমাপের জন্য নমুনার সংরক্ষণ ব্যবস্থা সারণি ৮.৩-এ লিপিবদ্ধ করা হলো।

সারণি ৮.৩ : পানির নমুনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

স্থিতিমাপ	সংরক্ষণ পাত্র	বিশেষ ব্যবস্থা	সর্বোচ্চ সংরক্ষণ সময়
pH	পলিথিন	-	৪ ঘণ্টা
DO	পলিথিন	-	৪ ঘণ্টা
COD	পলিথিন	2mL H_2SO_4/L	৭ দিন
বর্ণ	পলিথিন	4°C	২৪ ঘণ্টা
গন্ধ	পলিথিন	4°C	৭ দিন
CN^-	পলিথিন	NaOH, pH>10	২৪ ঘণ্টা
NH_3	পলিথিন	0.8 mL H_2SO_4/L	যতশীঘ্র সম্ভব
NO_3^- +NO_2^-	পলিথিন	40 mg H_gCl_2/L; 4°C	৭ দিন
F^-	পলিথিন	-	৭ দিন
S^{2-}	পলিথিন	2mL 1M $Zn(CH_3COO)_2$/L; 4°C	৭ দিন
ফসফরাস	পলিথিন/কাচ	40 mg H_gCl_2/L, 4°C	৭ দিন
ফেনল	পলিথিন	1g $CuSO_4$/L+ H_3PO_4, pH < 4, 4°C	২৪ ঘণ্টা
ট্যানিন/লিগনিন	পলিথিন	-	৪ ঘণ্টা
ধাতু / ধাতুকল্প	পলিথিন	5 mL HNO_3/L, 4°C	৬ মাস
ই.কোলাই/ ব্যাকটেরিয়া	কাচ	অটোক্লেভ : 121°C এবং 15 lb /in^2 চাপে 15 মিনিট ধরে নির্বীজকৃত (sterilized) পাত্রে 4°C-এ সংরক্ষণ।	৩৬ ঘণ্টা

৮.গ.৩ পানির নমুনা প্রাক-ঘনকরণ (preconcentration) : নমুনায় বিশ্লেষ্যের (analyte) ঘনমাত্রা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতো নিম্ন থাকে যে, নমুনা সরাসরি বিশ্লেষণ করে বিশ্লেষ্য নির্ণয় করা যায় না। সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণের পূর্বে নমুনা গাঢ় করার প্রয়োজন হয়। পানির নমুনা গাঢ় করার প্রচলিত কয়েকটি পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. কার্বন গুড়ায় বিশ্লেষ্য পরিশোষণ (adsorption) : সক্রিয়নকৃত কার্বন জৈব পদার্থের দক্ষ একটি পরিশোষক; কার্বনের উক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পদার্থটির সাহায্যে পানি নমুনার জৈব মিশাল (contaminant) পানি থেকে পৃথক ও গাঢ় করা হয়ে থাকে। পানির নমুনা (ধরা যাক, 1000 গ্যালন) সক্রিয়নকৃত কার্বন গুড়া দ্বারা পূর্ণ একটি কলামের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রেরণ করা হলে নমুনার জৈব মিশাল কার্বনে পরিশোষিত হয়ে আটকা পড়ে। উক্ত কার্বন (C) শুষ্ক করার পর প্রথমে ক্লোরোফর্ম (C′) ও পরে অ্যালকোহল (A) দ্বারা ধৌত করা হলে পরিশোষিত এক এক শ্রেণির জৈব পদার্থ এক এক দ্রাবকে নিষ্কাশিত (E) হয়। পরে নিষ্কর্ষ দুটি (CC′E ও CAE) থেকে বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ায় দ্রাবক পৃথক পৃথকভাবে অপসারিত করে নমুনা গাঢ় করা হয়। ক্লোরোফর্ম নিষ্কর্ষ (CC′E) এর মাঝে ফেনল, জৈব তেল প্রভৃতি স্বাদ ও গন্ধ সৃষ্টিকারী পদার্থ এবং অ্যালকোহল নিষ্কর্ষ (CAE) এর মাঝে সাধারণত গন্ধহীন পদার্থ চলে আসে। কার্বন পরিশোষণ পদ্ধতির সাহায্যে পানির বিভিন্ন প্রকার জৈব মিশাল, যেমন, কার্বোক্সাইলক অ্যাসিড, ফেনল, সালফোনিক অ্যাসিড, ফালভিক অ্যাসিড, পেস্টিসাইড, পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH) প্রভৃতি পৃথক ও ঘনীভূত করা সম্ভব।

কাবর্ন পরিশোষণ পদ্ধতির কিছু দুর্বল দিক আছে ; যেমন, (ক) কার্বন পৃষ্ঠে কোনো কোনো জৈব পদার্থের জারণ ত্বরান্বিত হয় ; (খ) পরিশোষিত পদার্থসহ কার্বন যখন শুষ্ক করা হয় তখন কোনো কোনো পদার্থ উবে যেতে পারে ; (গ) কোনো কোনো পদার্থ কার্বন থেকে দ্রাবকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয় না এবং (ঘ) নিষ্কর্ষ ঘনীভূত করার সময় দ্রাবকের সাথে দ্রবও কিছুটা উবে যায়।

ঐরূপ দুর্বলতা সত্ত্বেও পদ্ধতিটির সরলতা, দক্ষতা ও দ্রুতগতির জন্য পানির জৈব মিশাল পৃথক ও ঘনীভূত করার জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. হিম ঘনকরণ পদ্ধতি (freeze concentrating) : নমুনার পরিমাণ যখন কম থাকে তখন পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যেতে পারে। পানির নমুনা হিমায়িত হলে পানি বিশুদ্ধ কঠিন বরফে পরিণত হয় এবং মিশাল ক্ষুদ্র আয়তনের তরল দশায় অবস্থান করে ; কঠিন বরফ থেকে তরল দশা পৃথক করে তখন মিশাল–ঘনীভূত নমুনা পাওয়া যায়। পদ্ধতিটির সবচেয়ে ভালো দিক, বাষ্পায়নজনিত দ্রব্যের অপচয় এতে ঘটে না।

৩. দ্রাবক নিষ্কাশন (solvent extraction) : দুটি অমিশ্রণীয় তরল দশার মাঝে একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বন্টন এবং পরে দ্রাবক দুটি পৃথক করে দ্রব পৃথক করা

দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতির নীতি। উক্ত নীতির ভিত্তিতে পানি নমুনার অ-আয়নিক ও জৈব মিশাল দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতির সাহায্যে পানি থেকে পৃথক ও জৈব দ্রাবকে ঘনীভূত করা যায়। অপোলার জৈব দ্রাবক (যেমন, CCl_4, CH_2Cl_2, $CHCl_3$ প্রভৃতি) পানিতে অমিশ্রণীয় এবং জৈব/অ-আয়নিক পদার্থ পানির তুলনায় জৈব দ্রাবকে সাধারণত বেশি দ্রবণীয়। পানি নমুনার মাঝে একটি অমিশ্রণীয় জৈব দ্রাবক যোগ করে ভালোভাবে ঝাঁকালে নমুনায় যেসব জৈব/অ-আয়নিক মিশাল থাকে, জৈব দ্রাবকে সেগুলোর তাই স্থানান্তর ঘটে। প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েকবার সম্পন্ন করা হলে মিশাল একসময় পানি থেকে জৈব দ্রাবকে কার্যত সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়। মিশালের দ্রাব্যতা পানির তুলনায় জৈব দ্রাবকে যত বেশি হয় তত কম পরিমাণ জৈব দ্রাবকে মিশাল সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা যায় এবং তত তার ঘনীভবন ঘটে। দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতির বিশেষ গুরুরত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য, বেশি পরিমাণ দ্রাবক দ্বারা একবার নিষ্কাশন করার পরিবর্তে প্রতিবার কম পরিমাণ দ্রাবক দ্বারা কয়েকবার নিষ্কাশন করা হলে নিষ্কাশনের দক্ষতা বহুগুণ বেড়ে যায়।

দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য একটি প্রয়োগ, পানির নমুনা থেকে ক্লোরিনযুক্ত পেস্টিসাইড জৈব দ্রাবকে পৃথক ও ঘনীভূত করা। ধাতু আয়নও পদ্ধতিটির সাহায্যে পৃথক করা যায়; এক্ষেত্রে নমুনা ও নিষ্কাশক দ্রাবকের মিশ্রণে এমন একটি বিকারক যোগ করতে হয় যা ধাতু আয়নের সাথে একটি স্থিতিশীল প্রশম কিলেট গঠন করে। প্রশম কিলেট জৈব দ্রাবকে নিষ্কাশিত হয়। পানি নমুনার সাথে অমিশ্রণীয় দ্রাবক, মিথাইল আইসোবিউটাইলকিটোন এবং বিকারক (কিলেটিং এজেন্ট),অ্যামোনিয়াম পাইরালিডিনডাইথাইওকার্বামেট (APDC) যোগ করে নমুনার পিপিবি মাত্রার($\mu g/L$) Co(II), Fe(III), Pb(II), Ni(II) ও Zn(II) ধাতু আয়ন জৈব দ্রাবকে পৃথক করা যেতে পারে। জৈব দ্রাবকে ধাতু কিলেটের উক্ত দ্রবণ পারমাণবিক বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (AAS) পদ্ধতির সাহায্যে সরাসরি বিশ্লেষণ করে ধাতু আয়ন নির্ণয় করা সম্ভব।

৪. আয়ন-বিনিময় পদ্ধতি (ion-exchange methods): আয়নের অতিশয় লঘু একটি দ্রবণকে গাঢ় করার জন্য আয়ন-বিনিময় পদ্ধতি দক্ষ একটি ব্যবস্থা। নমুনার বিশ্লেষ্য আয়নকে প্রতিবন্ধক আয়ন কিংবা প্রশম অণু থেকে পৃথক করার জন্যও পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যথাযথ আয়ন-বিনিময় রেসিন (ক্যাটায়ন অথবা অ্যানায়ন বিনিময় রেসিন) দ্বারা পূর্ণ একটি কলামের ভিতর দিয়ে নমুনা ধীরে ধীরে প্রেরণ করা হলে নমুনার আয়নের (M^{n+}/x^{n-}) সাথে রেসিনের বিনিময়যোগ্য আয়নের বিনিময় ঘটে; যেমন,

ক্যাটায়ন বিনিময়: $nRes^-H^+(s) + M^{n+}(aq) \rightleftharpoons (Res^-)_nM^{n+}(s) + nH^+(aq)$

অ্যানায়ন বিনিময়: $nRes^+OH^-(s) + x^{n-}(aq) \rightleftharpoons (Res^+)_n X^{n-}(s) + nOH^-(aq)$ ।

নমুনার আয়ন (M^{n+}/x^{n-}) রেসিনে আবদ্ধ হওয়ার পর ক্ষুদ্র আয়তনের ভিন্ন একটি আয়নিক দ্রবণ (ইলুয়েন্ট) দ্বারা রেসিন ধৌত করে আবদ্ধ আয়নকে রেসিন থেকে মুক্ত

ও ইলুয়েন্ট এর সাথে কলামের নিম্ন প্রান্ত থেকে একটি পাত্রে সংগ্রহ করা হয়; যেমন, নমুনার আয়ন M^{n+} এর ক্ষেত্রে -

$(Res^-)_n M^{n+}(s) + nH^+$ (ইলুয়েট) $\rightleftharpoons n\ Res^-H^+(s) + M^{n+}$ (soln + ইলুয়েন্ট)।

৮.গ.৪ পানির pH নির্ণয়করণ : সাধারণত নিম্নরূপ একটি তড়িৎ রাসায়নিক কোষে গ্লাস-ক্যালোমেল ইলেকট্রোডের সাহায্যে পটেনশিওমিতি পদ্ধতিতে পানির pH নির্ণয় করা হয়ে থাকে:

কোষ: SEC | বাফার দ্রবণ / পানির নমুনা | গ্লাস ইলেকট্রোড।

পদ্ধতিটিতে pH এর ব্যবহারিক সংজ্ঞা (operational definition):

$$pH = pHs - \frac{(E - Es)}{0.0591}$$

যখন, pH = নির্ণেয় নমুনার pH
E = নির্ণেয় নমুনাসহ কোষের পটেনশিয়াল
pHs = প্রমাণ বাফার দ্রবণের pH
Es = প্রমাণ বাফার দ্রবণসহ কোষের পটেনশিয়াল।

pH মাপার জন্য আজকাল সাধারণত pH মিটার ব্যবহার করা হয়; উক্ত যন্ত্র সরাসরি pH প্রদান করে, পৃথকভাবে E কিংবা Es জানার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে নির্ণেয় দ্রবণের সম্ভাব্য যে pH তার থেকে কিছুটা কম এবং কিছুটা বেশি pH মানের দুটি প্রমাণ বাফার দ্রবণের সাহায্যে ইলেকট্রোড প্রমিত করে তারপর নির্ণেয় নমুনার pH একইভাবে পরিমাপ করা হয়।

গ্লাস ইলেকট্রোড ব্যবহারের সতর্কতা: (ক) গ্লাস ইলেকট্রোড ভঙ্গুর তাই এটি ব্যবহার করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। (খ) গ্লাস ইলেকট্রোড শুষ্ক হলে এর সংবেদন লোপ পায়; তাই ব্যবহার করার পূর্বে অন্তত এক ঘণ্টা এটি পানি কিংবা লঘু HCl এর মাঝে নিমজ্জিত রাখতে হয়। (গ) নমুনায় ইলেকট্রোড নিমজ্জিত করার পর এক মিনিট অপেক্ষা করে পাঠ নিতে হয়।

বেশ কয়েক বছর হলো সেমিকন্ডাক্টরভিত্তিক এক প্রকার pH প্রোব (Ion Sensitive Field Effect Transistor, ISFET) উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রোবটির সুবিধা, এটি ভঙ্গুর নয়, শুষ্ক হলেও এর সংবেদন লোপ পায় না, কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই নির্ণেয় দ্রবণের pH পাওয়া যায় এবং উচ্চতাপমাত্রায় কিংবা ঘোলা কর্দমাক্ত নমুনার মাঝেও এটি সঠিকভাবে কাজ করে। প্রোবটির আকার একটি বলপেনের মতো; সহজে একটি বহন করা যায়। নমুনা সংগ্রহকরার পরপরই তার pH পরিমাপ করা উচিত। সংরক্ষিত নমুনায় বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক ও জৈবিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে; এতে নমুনায় pH এর পরিবর্তন ঘটে। পানিতে pH এর সূক্ষ্মতা ± 0.1 একক হলেই তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৮.গ.৫ পানির আপেক্ষিক পরিবাহিতা নির্ণয়করণ (specific conductance): পানির আপেক্ষিক পরিবাহিতা পানির বিশুদ্ধতার একটি পরিমাপ; পরিবাহিতা যত নিম্ন, পানিতে আয়নিক মিশাল এর পরিমাণ তত কম হয়। বিভিন্ন প্রকার কঠিন পদার্থ প্রাকৃতিক পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং পানির আপেক্ষিক পরিবাহিতার সাথে তাদের মোট প্রাচুর্য প্রায়ই একটি স্থূল সম্পর্ক অনুসরণ করে; যেমন,

$1\ mg/L \equiv 1.56\ \mu S/cm$;
[সম্পর্কটি $100 - 5000\ \mu S/cm$ এর মাঝে প্রযোজ্য হয়]।

আপেক্ষিক পরিবাহিতা, $k\ (S/cm) = 1/R\ .\ (l/A)$

যখন S = সাইমেন = ওহম$^{-1}$ (Ω^{-1});

R = বৈদ্যুতিক রোধ, ওহম (Ω);

A = ইলেকট্রোডের ক্ষেত্রফল, cm^2;

l = দুটি ইলেকট্রোডের মাঝে দূরত্ব, cm।

একটি কোষে ইলেকট্রোড যখন প্রোথিত থাকে (fixed) সেক্ষেত্রে (l/A) একটি ধ্রুবক এবং একে কোষ ধ্রুবক (cell constant) বলা হয়।

নমুনার পরিবাহিতা মাপার জন্য কোষ জানা-আপেক্ষিক-পরিবাহিতার (k) একটি দ্রবণের (সাধারণত KCl দ্রবণ) সাহায্যে প্রমিত করতে হয়। pH এর মতো পানির পরিবাহিতাও নমুনা সংগ্রহ করার পরপরই পরিমাপ করা উচিত।

KCl দ্রবণের আপেক্ষিক পরিবাহিতা।

g-KCl/kg দ্রবণ	k (S/cm)	
	18°C	25°C
71.1352	0.09784	0.11134
7.4191	0.01117	0.01286
0.7453*	0.001221	0.001409
* কার্যত 0.0100 M		

৮.গ.৬ পানির ক্ষারত্ব (alkalinity) **নির্ণয়করণ:** পানির ক্ষারত্ব প্রধানত বাইকার্বোনেট (HCO_3^-), কার্বোনেট (CO_3^{2-}) ও হাইড্রোক্সাইড (OH^-) দ্বারা নির্ধারিত হয়; এদের মাঝে আবার HCO_3^- এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। মৃত্তিকায় Ca, Mg, Na, K প্রভৃতি ধাতুর যেসব লবণ থাকে তাদের সাথে বায়ুর CO_2 এর বিক্রিয়ায় HCO_3^- ও CO_3^{2-} উৎপন্ন হয় এবং বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত হয়ে তা জলাধারে মেশে। দুর্বল অম্লের লবণ (যেমন, ফসফেট) এবং অ্যামোনিয়াও পানিতে কিছু ক্ষার যুক্ত করে। পানির ক্ষারত্ব দুভাবে প্রকাশ করা হয়; যথা, ফেনলথেলিন ক্ষারত্ব ($CO_3^{2-} + OH^-$) ও মিথাইল অরেঞ্জ বা মোট ক্ষারত্ব ($CO_3^{2-} + HCO_3^- + OH^- + NH_3$)। শক্তিশালী একটি

অম্লের (যেমন, H_2SO_4 অ্যাসিড) প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেশন করে ক্ষারত্ব নির্ণয় করা হয়। পানিতে CO_3^{2-} ও / কিংবা OH^- উপস্থিত থাকলে (pH > 8.8), ফেনলথেলিন তাতে লাল রঙ সৃষ্টি করে; ফেনলথেলিন (রঙ পরিবর্তনের pH: 8.3-10) নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে ঐরূপ একটি পানির নমুনা টাইট্রেশন করা হলে যে বিন্দুতে রঙ এর পরিবর্তন ঘটে (লাল⟶বর্ণহীন) তা ফেনলথেলিন ক্ষারত্ব প্রদান করে; উক্ত বিন্দুতে CO_3^{2-} ও OH^- এর সাথে অম্লের নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে:

$$CO_3^{2-} + H^+ = HCO_3^-$$

$$OH^- + H^+ = H_2O$$ ।

অপরদিকে নির্দেশক, মিথাইল অরেঞ্জ (রঙ পরিবর্তনের pH: 3.1. – 4.4) হলে, টাইট্রেশানের শেষবিন্দুতে (কমলা ⟶ লাল) মোট ক্ষার প্রশমিত হয় এবং প্রধানত নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলো তাতে ঘটে:

$$CO_3^{2-} + 2H^+ = H_2CO_3$$

$$HCO_3^- + H^+ = H_2CO_3$$

$$OH^- + H^+ = H_2O$$

ক্ষারত্ব যে প্রকারই হোক তা $CaCO_3$ হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে (রীতি):

$$1\ mL\ 1M\ H_2SO_4 \equiv 100.0\ mg\ CaCO_3$$ ।

পানির ক্ষারত্ব বেশকিছু উদ্দেশ্যে জানার প্রয়োজন হতে পারে; যেমন, পানি মৃদু-করণ, পানি - পরিশোধন, পানিতে ধাতুর নিয়ন্ত্রণ, NH_3 দূরীকরণ প্রভৃতি।

৮.গ.৭ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (D.O.) নির্ণয়করণ: বায়ুমণ্ডলের (760 mg Hg) সাথে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত বিশুদ্ধ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের (D.O.) পরিমাণ:

তাপমাত্রা °C	0	10	20	30
D.O. (mg/L)	14.63	11.28	9.08	7.57

প্রাকৃতিক পানির DO পানির বিশুদ্ধতার একটি নির্দেশক। পানিতে জারণীয় বস্তু উপস্থিত থাকলে, DO হ্রাস পায় কেননা জারণীয় বস্তু দ্রবীভূত O_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে। জৈব বস্তুর উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক পানিতে যেসব পরিবর্তন ঘটে, DO হ্রাস পাওয়া তার প্রথম ও অন্যতম একটি প্রকাশ। পানির DO নির্ণয় করার দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে; যথা, রাসায়নিক পদ্ধতি (উইনকলার পদ্ধতি) ও অ্যামপেয়রোমিতি পদ্ধতি। নিচে পদ্ধতি দুটির নীতি আলোচনা করা হলো।

১. উইনকলার (Winkler) পদ্ধতি : পানি নমুনায় Mn(II) যোগ করা হলে দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা তা $MnO_2(s)$ -এ জারিত হয়:

$$Mn^{2+} + O_2 \rightarrow MnO_2(s)$$

মিশ্রণটিতে I^- যোগ করা হলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের (DO) তুল্যপরিমাণ I_2 দ্রবণে মুক্ত হয়:

$$MnO_2(s) + 2I^- + 4H^+ \rightarrow Mn^{2+} + I_2 + 2H_2O \ ;$$

উক্ত I_2 প্রমাণ $Na_2S_2O_3$ দ্রবণের সাহায্যে টাইট্রেশান করে পানির DO নির্ণয় করা উইনকলার পদ্ধতির নীতি:

$$2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^- \ ।$$

পদ্ধতিটিতে Fe (II), NO_2^- ও SO_3^{2-} প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তবে নমুনায় F^- ও NaN_3 যোগ করে যথাক্রমে Fe(II) ও NO_2^-/ SO_3^{2-} এর প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়; F^- আয়ন Fe(II) এর সাথে স্থিতিশীল ফ্লোরো-জটিল আয়ন গঠন করে এবং N_3^- আয়ন NO_2^-/ SO_3^{2-} কে জারিত করে।

বিশ্লেষণ প্রণালি : একটি বোতলের মাঝে 100 mL পানি-নমুনা নিয়ে তাতে 2 mL 40% KF, 2-mL 36% $MnSO_4$ ও 2-mL ক্ষারীয় I^- - N_3^- দ্রবণ (50 g NaOH + 13.5 g NaI + 1.0 g NaN_3 + পানি = 1L) যোগ কর এবং বোতলের মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ করে মিশ্রণটি উত্তমরূপে ঝাঁকাও। অধঃক্ষেপ থিতিয়ে গেলে মিশ্রণে 6 mL 12 M H_2SO_4 যোগ করে মিশাও। এসময় অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত এবং দ্রবণে I_2 মুক্ত হবে; 0.025 M $Na_2S_2O_3$ দ্রবণ (প্রমিত) দ্বারা উক্ত I_2 টাইট্রেশন করে (নির্দেশক স্টার্চ) নমুনার DO নির্ণয় কর।

$$5 \text{ mL } 0.025 \text{ M } Na_2S_2O_3 \equiv 1 \text{ mg DO} \ ।$$

২.অ্যামপেয়ারোমিতি পদ্ধতি – অক্সিজেন প্রোব (probe) : পানি-বিকর্ষী (hydrophobic) O_2-প্রবেশ্য (permeable) একটি ঝিল্লি (membrane) দ্বারা ঢাকা একটি নলের মাঝে অভিজাত (noble) ধাতু (সাধারণত,স্বর্ণ) দ্বারা নির্মিত এক জোড়া ইলেকট্রোড স্থাপন করে প্রোবটি তৈরি করা হয়; ইলেকট্রোড ইলেকট্রোলাইট (সাধারণত KCl) দ্রবণে নিমজ্জিত থাকে। প্রোবটি যখন পানির মাঝে স্থাপন করা হয় তখন পানির দ্রবীভূত O_2 ঝিল্লির ভিতর দিয়ে ইলেকট্রোডে পৌঁছে। ইলেকট্রোড দুটির মাঝে এমন মাত্রার এক পটেনশিয়াল পার্থক্য প্রয়োগ করা থাকে (প্রায় 0.8 V) যাতে যে হারে O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ক্যাথোডে পৌঁছে, সে হারে সেখানে তার বিজারণ ঘটে। উক্ত শর্তে প্রোবে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ (i) সৃষ্টি হয় তা নমুনার DO এর সাথে সমানুপাতিক সম্পর্ক অনুসরণ করে। অক্সিজেনের প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে অঙ্কিত একটি i বনাম O_2-ঘনমাত্রা ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে তখন নমুনার DO নির্ণয় করা হয়। O_2 এর প্রমাণ দ্রবণ নির্ণয় করার জন্য উপরে বর্ণিত উইনকলার পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যাহোক, হ্যালোজেন, SO_2 ও H_2S গ্যাস O_2 প্রোব পদ্ধতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৮.গ.৮ পানির BOD ও COD নির্ণয়করণ: [BOD = Biological Oxygen Demand (প্রাণরাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা); COD = Chemical Oxygen Demand (রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা)]। প্রাকৃতিক পানিতে সর্বদা কিছু পরিমাণ জৈব ও অজৈব

মিশাল (contaminant) উপস্থিত থাকে। ঐসব জৈব ও কিছু কিছু অজৈব মিশাল পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের (DO) সাথে বিক্রিয়া করে পানিতে O_2 এর ঘাটতি সৃষ্টি করে এবং পানির মানের অবনতি ঘটায়। মিশালের সাথে DO এর বিক্রিয়া দুভাবে ঘটতে পারে – রাসায়নিক ও প্রাণরাসায়নিক (জীবাণুর অনুঘটনে বিক্রিয়া)। মিশালের রাসায়নিক ও প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে পরিমাণ O_2 পানি থেকে অপসারিত হতে পারে তাদেরকে যথাক্রমে পানির COD ও BOD বলে। COD সাধারণত BOD এর তুলনায় উচ্চতর হয় কেননা জারণীয় জৈব ও অজৈব, যে কোনো পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভাজন ঘটে অথচ জারণীয় কোনো কোনো পদার্থ থাকে, প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ায় যেগুলো বিভাজিত হয় না। প্রাকৃতিক পানির দ্রবীভূত O_2 অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, এমন কয়েকটি বিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হলো :

$$\text{জৈব বস্তু } [CH_2O] + O_2 \xrightarrow{\text{রাসায়নিক / প্রাণরাসায়নিক}} CO_2 + H_2O$$

$$\text{অজৈব বস্তু: } 4Fe^{2} + O_2 + 4H^+ \xrightarrow{\text{রাসায়নিক / প্রাণরাসায়নিক}} 4Fe^{3+} + 2H_2O$$

$$NH_4^+ + 2O_2 \xrightarrow{\text{রাসায়নিক / প্রাণরাসায়নিক}} NO_3^- + 2H^+ + H_2O$$

১. পানির BOD নির্ণয়করণ : প্রাকৃতিক ও বর্জ্য পানিতে জৈবিক বিভাজনীয় (bio-degradable) যে মিশাল থাকে, BOD তার জনপ্রিয় ও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত একটি পরিমাপ; প্রচলিত রীতি অনুসারে 20°C তাপমাত্রায় পাঁচ দিনের ব্যবধানে পানির BOD নির্ণয় করা হয়। নিচে BOD নির্ণয় করার প্রণালি বর্ণনা করা হলো।

ক. দুটি 300 mL বোতল পানির নমুনা দ্বারা পূর্ণ করে একটি বোতলের পানিতে DO সাথে সাথে নির্ণয় করা হয় (দ্রঃ DO নির্ণয়করণ) এবং অপর বোতল ছিপিবদ্ধ করে 20°C তাপমাত্রায় 5 দিন রেখে দেয়া হয় (incubation)।

খ. পাঁচদিন পর দ্বিতীয় বোতলের পানিতে DO এর যে পার্থক্য হয় তা নমুনার BOD প্রদান করে। এরূপে যে BOD পাওয়া যায়, তা BOD_5 প্রতীক দ্বারা এবং ফলাফল mg O_2/L এককে প্রকাশ করা হয়ে থাকে:

$$BOD_5 = (DO_{t=0} - DO_{t=5}) \text{ mg } O_2/L \text{ ।}$$

অনেক সময় বিশেষ করে নমুনা বর্জ্য পানির হলে উপরের প্রণালিটি সরাসরি প্রযোজ্য হয় না কেননা ঐরূপ নমুনায় জৈবিক বিভাজনীয় বস্তুর পরিমাণ প্রায়শ এতই বেশি থাকে যে, পানির দ্রবীভূত O_2 সম্পূর্ণ খরচ হয়ে যাওয়ার পরও বিভাজনীয় বস্তুর একটি ভগ্নাংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। এরূপ নমুনা বিশুদ্ধ পানি দ্বারা নির্দিষ্ট মাত্রায় লঘু করে তার BOD নির্ণয় করতে হয়। তবে, নমুনা লঘু করার ফলে তাতে জীবাণু ও পুষ্টির মাত্রা হ্রাস পায় বলে লঘু নমুনায় জীবাণুর কিছু বীজ (seed : সাধারণত তলানি পড়া গার্হস্থ্য নর্দমার পানি) ও অতিরিক্ত কিছু পুষ্টি ও বাফার যোগ করা লাগে। বীজ হিসেবে

যে পানি ব্যবহৃত হয়, তারও একটা BOD থাকে তাই একটা ফাঁকা নমুনার সাহায্যে (পানির নমুনা ব্যতিরেকে কেবল বীজ হিসেবে ব্যবহৃত পানি, বাফার ও পুষ্টি দ্বারা গঠিত নমুনা) বীজের BOD নির্ণয় করে লঘু পানি-নমুনার BOD থেকে তা বাদ দিতে হয় অর্থাৎ,

$$BOD_5 = D^* [\underbrace{(DO_{t=o} - DO_{t=5})}_{\text{লঘু নমুনা}} - \underbrace{(DO_{t=o} - DO_{t=5})}_{\text{ফাঁকা দ্রবণ}}],\ mg\ O_2/L$$

যখন D^* = নমুনা লঘুকরণ গুণনীয়ক (dilution factor) ।

BOD_5 নির্ণয়করণের কিছু দুর্বল দিক আছে; যেমন, (ক) বিশ্লেষণীয় পানিতে DO পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও জৈবিক বিভাজনীয় বস্তুর বিভাজন পাঁচদিনে সম্পূর্ণ হয় না; সম্পূর্ণ বিভাজন ঘটতে প্রায় 20 দিন সময় লাগে। ফলে,পানির প্রকৃত BOD পদ্ধতিটির সাহায্যে পাওয়া যায় না। (খ) যে পরিবেশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়, গবেষণাগারে সেরূপ পরিবেশ কখনো সৃষ্টি করা যায় না। গবেষণাগারে পানির যে BOD পাওয়া যায় তা প্রাকৃতিক অবস্থায় বিদ্যমান পানির BOD থেকে ভিন্ন হওয়ার তাই প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। (গ) বর্জ্য পানিতে অনেক সময় বিষাক্ত উপাদান মিশ্রিত থাকে যা জীবাণুকে ধ্বংস করে; এরূপ অবস্থায় নির্ণীত BOD মানের কোনো তাৎপর্য থাকে না।

ঐসকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অক্সিজেন অপ্রতুল পানিপ্রবাহে দূষকের প্রকৃতি ও প্রাচুর্য নির্ণয় করার জন্য BOD_5 পরীক্ষা বহুদিন থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তবে আজকাল গবেষণা ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজনে BOD_5 এর পরিবর্তে COD নির্ণয়করণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

২.পানির COD নির্ণয়করণ: পানির জারণীয় মিশাল যে পরিমাণ DO অপসারণ করতে সক্ষম তাকে পানির COD বলে। BOD এর মতো CODও '$mg\ O_2/L$' এককে প্রকাশ করা হয়। বর্জ্য পানি পরিশোধনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাতে BOD-COD অনুপাত নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে। অনুপাতটি 0.8 এর উর্ধ্বে হলে মিশাল দূর করার জন্য জৈবিক প্রক্রিয়া উপযোগী হয়, অনুপাতটি ক্ষুদ্রতর হলে পানির জৈবিক ব্যবস্থাপনা উপযোগী হয় না।

BOD এর তুলনায় COD নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ; মূলত, অম্লীয় দ্রবণে নমুনাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত $Cr_2O_7^{2-}$ এর সাহায্যে জারিত করে COD নির্ণয় করা হয়। জারণীয় সমগ্র মিশাল জারিত হওয়ার পরও মিশ্রণে কিছু পরিমাণ $Cr_2O_7^{2-}$ অবশিষ্ট থাকে; উক্ত $Cr_2O_7^{2-}$ একটি প্রমাণ বিজারক দ্রবণ (যেমন, Fe^{2+} দ্রবণ) দ্বারা টাইট্রেশন করে ব্যয়িত $Cr_2O_7^{2-}$ তথা জারিত মিশালের পরিমাণ পাওয়া যায়:

$$3[CH_2O] + 16H^+ + 2Cr_2O_7^{2-}\text{(অতিরিক্ত)} \rightarrow 3CO_2 + 4Cr^{3+} + 11H_2O + Cr_2O_7^{2-}\text{(অবশিষ্ট)}$$

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

$$1mmol\ Cr_2O_7^{2-} \equiv (3/2)\ mmol\ [CH_2O] \equiv (3/2)\ mmol\ O_2 = 48\ mg\ O_2$$

মিশালের মাঝে জারণীয় অজৈব পদার্থও যদি উপস্থিত থাকে (যেমন NO_2^-, Cl^- প্রভৃতি) তাহলে উক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে যে COD পাওয়া যায় তাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভুল হতে পারে।

COD নির্ণয় করার প্রণালি : একটি গোলতলা ফ্লাস্কে 5 - 50 mL পানি-নমুনা নিয়ে তাতে 10 - 20 mL 0.04 M $K_2Cr_2O_7$, 1-g Ag_2SO_4, 1-g $HgSO_4$ ও পর্যাপ্ত H_2SO_4 যোগ কর যাতে মিশ্রণে H_2SO_4 এর পরিমাণ প্রায় 50% হয়। মিশ্রণটি 6 ঘণ্টা যাবৎ রিফ্লাক্স করার পর ঠাণ্ডা করে অবশিষ্ট $Cr_2O_7^{2-}$ মোর লবণের [$FeSO_4$, $(NH_4)_2SO_4$, $6H_2O$] 0.100 M দ্রবণের সাহায্যে (4M H_2SO_4 এর মাঝে প্রস্তুতকৃত) টাইট্রেশন কর (নির্দেশক: ফেরোইন 8-10 ফোঁটা)।

COD হিসাবকরণ:

নমুনার পরিমাণ = V mL,

নমুনায় যোগকৃত 0.04 M $K_2Cr_2O_7 = V_1$ mL,

অতএব, নমুনায় যোগকৃত $K_2Cr_2O_7$ এর পরিমাণ = $0.04V_1$ mmol.

অবশিষ্ট $K_2Cr_2O_7$ টাইট্রেশন:

টাইট্রেশনের শেষবিন্দুতে 0.100 M $Fe^{2+} = V_2$ mL,

অতএব, অবশিষ্ট $K_2Cr_2O_7$ টাইট্রেশনে Fe^{2+} এর পরিমাণ = 0.100 V_2 mmol

∴ অবশিষ্ট $K_2Cr_2O_7$ এর পরিমাণ = (1/6) 0.100 V_2 mmol

∴ জারণীয় মিশাল কর্তৃক গৃহীত $K_2Cr_2O_7$ এর পরিমাণ = [$0.04V_1$ – (1/6) 0.100 V_2]mmol

1 mmol $K_2Cr_2O_7 \equiv 48$ mg O_2

∴ পানির নির্ণেয় COD = (48/6) ($0.24V_1$ – 0.100 V_2) × (1000/V) mg O_2 /L
= (8000/V) ($0.24V_1$ – $0.100V_2$), mg O_2 /L

টীকা: ক. Ag_2SO_4 এর উপস্থিতিতে জৈব পদার্থের জারণ ত্বরান্বিত হয়।
খ. Hg^{2+} আয়ন Cl^- এর প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

৮.গ.৯ পানির খরতা (hardness) **নির্ণয়করণ :** যে পানিতে সাবান ঘষলে ফেনা সৃষ্টি না হয়ে পানির উপর একপ্রকার গাঁজলা (scum) সৃষ্টি হয় তাকে খর পানি (hardwater) বলে। পানির খরতার জন্য দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম লবণ প্রধানত দায়ী থাকে। সাবানের মৌলিক একটি উপাদান দীর্ঘ শিকল স্নেহ অম্লের (long chain fatty acids, যেমন, স্টিয়ারিক অ্যাসিড, $C_{17}H_{33}COOH$) সোডিয়াম লবণ; উক্ত লবণ দ্রবীভূত Ca^{2+} / Mg^{2+} এর সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় লবণ গঠন করে; ফলে, পানিতে গাঁজলা সৃষ্টি হয়:

$$2C_{17}H_{33}COO^{-}Na^{+} + Ca^{2+} \rightarrow Ca(C_{17}H_{33}COO)_2(s) + 2Na^{+}$$

পানির খরতাকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা, অস্থায়ী (temporary) ও স্থায়ী (permanent) খরতা। 'অস্থায়ী খরতা' Ca / Mg এর বাইকার্বোনেট (HCO_3^-) লবণের জন্য এবং স্থায়ী খরতা ধাতু দুটির অন্যান্য দ্রবীভূত লবণের জন্য (যেমন, SO_4^{2-}, Cl^-). সৃষ্টি হয়। পানি ফুটালে বাইকার্বোনেট লবণ $CaCO_3(s)$ আকারে অধঃক্ষেপ পড়ে বলে 'বাইকার্বোনেট' খরতাকে 'অস্থায়ী খরতা' বলা হয়ে থাকে:

$$Ca^{2+} + 2HCO_3^-(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + CO_2 + H_2O$$ ।

পানির খরতা সাধারণত EDTA টাইট্রেশন পদ্ধতির সাহায্যে (কমপ্লেক্সমিতি টাইট্রেশন) নির্ণয় করে ফলাফল ppm–$CaCO_3$ আকারে প্রকাশ করা হয়। খরতার মাত্রাভেদে প্রাকৃতিক পানিকে নিম্নলিখিত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে:

খরতা, ppm $CaCO_3$	প্রাকৃতিক পানির শ্রেণী
0 – 75	মৃদু (soft)
75 – 150	মাঝারি মাত্রায় খর
150 – 300	খর
300 এর বেশি	অতিমাত্রায় খর।

খরতা নির্ণয় করার প্রণালি :

বিকারক:

ক. EDTA এর প্রমাণ দ্রবণ- প্রায় 4-g অ্যানালার গ্রেড EDTA (Na_2H_2Y, $2H_2O$; MW = 372.24) 80°C তাপমাত্রায় শুষ্ক করার পর একটি ডেসিকেটরে ঠাণ্ডা কর; এথেকে প্রায় 3.8 g লবণ মিলিগ্রামের দশমাংশ সূক্ষ্মতায় নির্ভুলভাবে মেপে একটি 1-L আয়তনমিতি ফ্লাস্কে লও এবং 500 -800 mL পাতিত পানি (বহুযোজী ধাতু মুক্ত) দ্বারা দ্রবীভূত কর (লবণ দ্রবীভূত হতে 15 মিনিট বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে)। একই পানি দ্বারা ফ্লাস্কটি আয়তনসূচক চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ কর এবং ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে দ্রবণটি সমসত্ত্ব কর। দ্রবণটির মোলারিটি হিসাব করতে লবণের ওজন থেকে তার 0.3% বাদ দিতে হয় কেননা 80°C তাপমাত্রায় শুষ্ককৃত লবণে 0.3% আর্দ্রতা থাকে।

খ. বাফার দ্রবণ (pH = 10.0): 57 mL গাঢ় NH_3 + 7gNH_4Cl + পানি = 100 mL

গ. EBT নির্দেশক: 100 mg EBT + 15 mL ইথানোল্যামিন + 5 mL নির্জল ইথানল।

টাইট্রেশন : একটি কনিক্যাল ফ্লাস্কে 100 mL নমুনা নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা গাঢ় HCl যোগ কর এবং কয়েক মিনিট যাবৎ মৃদুভাবে ফুটাও। নমুনা ঠাণ্ডা করে মিথাইল রেড এর সাপেক্ষে (3 - 4 ফোঁটা মিথাইল রেড যোগ করতে হবে) 0.1 M NaOH দ্রবণ দ্বারা তা প্রশমিত কর। পরে দ্রবণে 2 mL বাফার ও 3 - 4 ফোঁটা EBT

নির্দেশক যোগ করে EDTA-প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা এটি টাইট্রেশন কর। শেষবিন্দুতে দ্রবণের রঙ লাল থেকে নীল হবে:

$$1\text{-mL } 1\text{M EDTA} \equiv 100 \text{ mg } CaCO_3$$ ।

খরতা হিসাবকরণ:

নমুনার পরিমাণ $= V$ mL

EDTA এর ঘনমাত্রা $= C$, M

শেষবিন্দুতে EDTA এর ঘনআয়তন $= V_1$ mL

∴ শেষবিন্দুতে EDTA এর পরিমাণ $= CV_1$ mmol

∴ পানির খরতা $= (100\ CV_1 / V) \times 1000$ ppm $CaCO_3$

টীকা :

ক. নমুনায় পর্যাপ্ত Mg^{2+} উপস্থিত না থাকলে শেষবিন্দু তীক্ষ্ণ হয় না; এক্ষেত্রে নমুনায় 2-mL 0.1M MgY^{2-} যোগ করে (নির্দেশক যোগ করার আগে) নমুনা টাইট্রেশন করতে হয়।

খ. নমুনা বর্জ্য-পানির হলে তাতে জৈব পদার্থ উপস্থিত থাকতে পারে; ঐরূপ ক্ষেত্রে, নমুনায় 2 - 4 ফোঁটা 30% H_2O_2 যোগ করে pH 8-10 এর মাঝে রেখে নমুনা 15 মিনিট যাবৎ ফুটাতে হয় এবং পরে ঠাণ্ডা করে তা টাইট্রেশন করতে হয়।

গ. নমুনায় প্রতিবন্ধক আয়ন (যেমন, Fe^{3+}, Zn^{2+}, Cd^{2+} প্রভৃতি) উপস্থিত থাকলে নির্দেশক যোগ করার পূর্বে নমুনায় 4 mL বাফার, 30 mg হাইড্রোক্সিল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও পরে 50 mg KCN (বিষ) যোগ করতে হবে।

ঘ. 'নির্দেশক' দ্রবণ আকারে ব্যবহার না করে কঠিন KNO_3 এর মাঝে নির্দেশকের 1% মিশ্রণ ব্যবহার করা হলে শেষবিন্দু বেশি তীক্ষ্ণ হয়।

ঙ. EDTA দ্রবণ সংরক্ষণের জন্য পলিথিন বোতল ব্যবহার করা উচিত।

৮.গ.১০ পানিতে নাইট্রোজেন নির্ণয়করণ : বর্জ্য পানিতে বিভিন্ন প্রকার N-যৌগ উপস্থিত থাকে; যৌগগুলোর মাঝে NH_3, জৈব N-যৌগ (যেমন, অ্যামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন প্রভৃতি) NO_2^- ও NO_3^- প্রধান। অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার অনুঘটনে NO_3^- এর বিজারণ, জৈব N-যৌগের অ্যামিন বিয়োজন (deamination), ইউরিয়ার জলান্বয়ন (hydrolysis) প্রভৃতি বিক্রিয়ায় NH_3 উৎপন্ন হয়; পানিতে তা মুক্ত NH_3 অথবা NH_4^+ আকারে অবস্থান করে। NH_3, NH_4^+ ও জৈব-N জেলডল পদ্ধতির (Kjeldahl method) সাহায্যে একসাথে নির্ণয় করা যায়; এদেরকে তাই সম্মিলিতভাবে 'জেলডল নাইট্রোজেন' বলা হয়ে থাকে।

পানির মাঝে NH_3/NH_4^+ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে NO_3^- এ জারিত হয়; NO_2^- উক্ত প্রক্রিয়ার অন্তর্বর্তী একটি উৎপাদ; NO_3^- এর জৈবিক বিজারণেও এটি পানিতে উৎপন্ন হতে পারে। NO_3^- ও NO_2^- উভয় উপাদান জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর; পানীয় পানির জন্য এদের সহনীয় মাত্রা যথাক্রমে 10 ও 0.1 ppm। নাইট্রেট (NO_3^-) পানীয় পানিতে 50 ppm এর ঊর্ধ্বে উপস্থিত থাকলে ছয়মাসের কম বয়সী শিশুদের জন্য তা বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়। যাহোক, গার্হস্থ্য বর্জ্য পানিতে যে N থাকে তার প্রায় 50% NH_3 / NH_4^+, 50% জৈব N এবং 0 - 5% (NO_3^- + NO_2^-) আকারে অবস্থান করে। নিচে বিভিন্ন প্রকার N-যৌগ নির্ণয় করার প্রচলিত কিছু পদ্ধতি প্রদান করা হলো।

১.পানির NH_3 নির্ণয়করণ :

(ক) **নেসলার পদ্ধতি** (Nessler Method): নিম্ন ঘনমাত্রার NH_3-দ্রবণে টেট্রাআয়োডোমারকারি(II) এর দ্রবণ যোগ করা হলে কমলা বাদামি রঙ এর একটি কলয়েড উৎপন্ন হয় যা 400-500 nm এর মাঝে বিকিরণ শোষণ করে; উক্ত কলয়েডের অ্যাবসর্বেন্স মেপে নমুনায় NH_3 নির্ণয় করা নেসলর পদ্ধতির নীতি:

$$2NH_3 + 2K_2HgI_4 \rightarrow \underset{\text{কমলা বাদামি}}{NH_2Hg_2I_3(s)} + 4KI + NH_4I$$ ।

নমুনায় NH_3 এর ঘনমাত্রা উচ্চ হলে পদ্ধতিটি কাজ করে না কেননা তখন $NH_2Hg_2I_3$ অধঃক্ষেপ পড়ে, কলয়েড সৃষ্টি হতে পারে না।

নেসলার দ্রবণ : 100 mL পানিতে 35 g KI দ্রবীভূত করে তাতে 4% $HgCl_2$ দ্রবণ একটু একটু করে যোগ কর এবং মিশ্রণটি নাড়তে থাক; এভাবে একটি স্থায়ী লাল অধঃক্ষেপ যখন দ্রবণে প্রথম দৃশ্যমান হয়, $HgCl_2$ তখন যোগ করা বন্ধ কর (প্রায় 325 mL $HgCl_2$ দ্রবণ যোগ করা লাগে) । মিশ্রণটিতে 250 mL 12 M MaOH দ্রবণ যোগ কর এবং পানি দ্বারা এটি 1L পর্যন্ত লঘু কর। পরে আরও কিছু পরিমাণ $HgCl_2$ দ্রবণ মিশ্রণটিতে যোগ কর, যে পর্যন্ত তাতে স্থায়ী একটি পঙ্কিলতা (turbidity) সৃষ্টি না হয়। মিশ্রণটি একদিন শান্তভাবে রেখে দাও এবং পরে তলানির উপর থেকে স্বচ্ছ দ্রবণ ঢেলে নিয়ে কালো রঙ এর একটি বোতলে ছিপি এঁটে তা সংরক্ষণ কর। উক্ত দ্রবণকে নেসলার দ্রবণ বলে। বস্তুত, ক্ষারীয় মাধ্যমে K_2HgI_4 এর দ্রবণ 'নেসলার দ্রবণ' হিসেবে পরিচিত।

NH_3 নির্ণয় করার প্রণালি:

অ. একটি 1-L গোলতলা ফ্লাস্কে 500 mL পানি-নমুনা নিয়ে তাতে লঘু NaOH দ্রবণ যোগ কর এবং সাথে সাথে নমুনার পাতন শুরু কর। পতিত পানির মাঝে NH_3 দ্রবীভূত থাকবে। পাতিত পানি কনডেনসার (condenser) এর শেষপ্রান্তে 100 mL 0.1 M HCl অ্যাসিডের মাঝে সংগ্রহ কর। কনডেনসারের অ্যাডপ্টার (adopter)- প্রান্ত অম্লের মাঝে নিমজ্জিত থাকবে। এভাবে প্রায় 100 mLপাতিত পানি অম্লের মাঝে সংগৃহীত হলে (A′) পাতন বন্ধ কর।

আ. একটি 250 mL আয়তনমিতি ফ্লাস্কে দ্রবণ (A′) স্থানান্তরিত করে পানি দ্বারা তা আয়তনসূচক চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ কর এবং ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে দ্রবণটি সমসত্ত্ব কর (B)।

ই. দ্রবণ–B থেকে 5 - 10 mL এর একটি এলিকোট পিপেটের সাহায্যে ছোট একটি বিকারে স্থানান্তরিত করে 0.1 M NaOH দ্রবণ দ্বারা তার অম্ল প্রশমিত কর (pH 4.5)। এতে 2 mL নেসলার দ্রবণ যোগ কর এবং ভালোভাবে নেড়ে বিকারক মিশাও; মিশ্রণটির (C) ঘনআয়তন মাপ।

ঈ. মিশ্রণটির (C) λmax নির্ধারণ করে সেখানে তার অ্যাবসর্বেন্স (A) মাপ।

উ. প্রমাণ NH_4^+ দ্রবণের (শুষ্ক NH_4Cl দ্বারা প্রস্তুত করা যেতে পারে) সাহায্যে একইভাবে একটি C_{NH_3} বনাম A ক্রমাঙ্কন রেখা আঁক এবং তাতে নমুনার A(ঈ) বসিয়ে নমুনায় NH_3 এর ঘনমাত্রা হিসাব কর।

নমুনায় NH_3 এর ঘনমাত্রা হিসাবকরণ:

নমুনার পরিমাণ = 500 mL

দ্রবণ C এর পরিমাণ = V mL

দ্রবণ C-তৈরিতে দ্রবণ -B এর পরিমাণ = V_1 mL

ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নির্ণীত দ্রবণ C -তে NH_3 এর ঘনমাত্রা = p ppm

∴ নমুনায় NH_3 এর ঘনমাত্রা = $(250/500)\,(pV/V_1)$ ppm।
= $(pV/2V_1)$ ppm।

খ. **পানিতে NH_3 /NH_4^+ নির্ণয়করণ-টাইট্রেশন পদ্ধতি :** উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে NH_3-যুক্ত পাতিত পানি যে HCl দ্রবণের মাঝে (100 mL 0.1M HCL) সংগ্রহ করা হয়েছে তার অবশিষ্ট HCl টাইট্রেশনের মাধ্যমে নির্ণয় করে নমুনার NH_3/NH_4^+ নির্ণয় করা বর্তমান পদ্ধতির নীতি। মিথাইল রেড* নির্দেশকের উপস্থিতিতে 0.1 M প্রমাণ NaOH দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেশন করে অবশিষ্ট HCl নির্ণয় করা হয়।

1 mmol HCl ≡ 17 mg NH_3

নমুনায় NH_3 / NH_4^+ এর ঘনমাত্রা হিসাবকরণ (সাধারণ হিসাব):

নমুনার পরিমাণ = V mL

HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা = C_H M

HCl দ্রবণের পরিমাণ = V_H mL

NaOH দ্রবণের ঘনমাত্রা = C_{OH} M

টাইট্রেশনের শেষবিন্দুতে NaOH দ্রবণের পরিমাণ = V_{OH} mL

অতএব, নমুনায় NH_3 এর ঘনমাত্রা = $17{,}000\,(C_HV_H - C_{OH}V_{OH})/V$ ppm।

* মিথাইল রেড এর পরিবর্তে 'মিথাইল রেড-ব্রোমোক্রেসোল গ্রীন' নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা হলে শেষবিন্দু অপেক্ষাকৃত বেশি তীক্ষ্ণ হয়। ইথানলে 0.2% মিথাইল রেড ও 0.1% ব্রোমোক্রেসোল গ্রীন দ্রবণ 1: 3 অনুপাতে মিশিয়ে নির্দেশকটি প্রস্তুত করা হয়।

উল্লেখ্য, পটেনশিওমিতি পদ্ধতির নীতিতে কাজ করে এমন একটি NH_3 - প্রোব উদ্ভাবিত হয়েছে; প্রোবটির সাহায্যে নমুনার NH_3 সরাসরি নির্ণয় করা যায়।

২. পানিতে জেলডল নাইট্রোজেন (NH_4^+ + জৈব-N) **নির্ণয়করণ :** জৈব ও অজৈব উভয় শ্রেণীর বহু N-যৌগ আছে যেগুলো প্রভাবকের উপস্থিতিতে (CuO, $CuSO_4$, Hg, HgO, Se প্রভৃতি প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়) গাঢ় H_2SO_4 অ্যাসিডের মাঝে উচ্চতাপে ফুটানো হলে N-যৌগ ভেঙ্গে NH_3 উৎপন্ন হয়, অম্লের মাঝে যা NH_4^+ আকারে অবস্থান করে। মিশ্রণটি শক্তিশালী একটি ক্ষারের সাহায্যে (যেমন, NaOH), ক্ষারীয় করা হলে NH_4^+ থেকে NH_3 আবার মুক্ত হয়; পাতন প্রক্রিয়ায় উক্ত NH_3 পৃথক করে নেসলার অথবা টাইট্রেশন পদ্ধতির সাহায্যে (দ্র:ক/খ–উপরে) তা নির্ণয় করা জেলডল পদ্ধতির নীতি।

সালফিউরিক অ্যাসিড ডাইজসশনে N-যৌগ থেকে কিভাবে NH_3 উৎপন্ন হয় সে কৌশল বহুলাংশে অজানা। তবে ধারণা করা হয়, H_2SO_4 যখন যৌগের C –অংশকে ধীরে ধীরে CO_2 এ জারিত করে তখন অ্যাসিড নিজে SO_2 এ বিজারিত হয়; SO_2 একটি শক্তিশালী বিজারক, উচ্চ জারণ অবস্থার যত N-যৌগ ডাইজেসশনের সময় সৃষ্টি হয়, SO_2 তাদের সবগুলোকে NH_3 তে বিজারিত করে। যাহোক,এভাবে অ্যামিন ও অ্যামাইড -N সম্পূর্ণরূপে NH_3-তে পরিণত হয় তবে নাইট্রো, অ্যাজো ও অ্যাজোক্সি গ্রুপ নমুনায় উপস্থিত থাকলে, তারা মৌল N অথবা N-অক্সাইডে পরিণত হতে এবং বিক্রিয়া পাত্র থেকে উবে যেতে পারে। নমুনা ডাইজেস্ট করার পূর্বে উপযুক্ত বিজারকের সাহায্যে (যেমন, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, $Na_2S_2O_3$, Zn প্রভৃতি) গ্রুপগুলো বিজারিত করা হলে N এর ঐরূপ অপসরণ প্রতিহত হয়।

পানি নমুনার জেলডল - N ডাইজেস্টকরণ : 500 mL নমুনা একটি জেলডল ফ্লাস্কে নিয়ে তাতে 1-2 mL গাঢ় H_2SO_4 যোগ কর এবং মৃদু তাপে নমুনাটি প্রায় শুষ্ক অবস্থায় (5-6 mL) ঘনীভূত কর। নমুনা ঠাণ্ডা করে তার মাঝে 25-mL গাঢ় H_2SO_4, 10 g K_2SO_4*, দুই / এক দানা প্রভাবক ($CuSO_4$, HgO প্রভৃতির যে কোনোটি) যোগ কর এবং উচ্চতাপে ডাইজেস্ট কর। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ব্যাপী নমুনা ডাইজেস্ট করার পর মিশ্রণটি ঠাণ্ডা কর এবং অতি সতর্কতার সাথে তাতে 50 mL 50% (w/v) NaOH যোগ করে মুক্ত NH_3-কে পাতন প্রক্রিয়ায় 100 mL 0.1 M HCl দ্রবণের মাঝে সংগ্রহ কর। সংগৃহীত NH_3 নির্ণয় করার পদ্ধতি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে (নেসলার অথবা টাইট্রেশন পদ্ধতি)।

* K_2SO_4 লবণ H_2SO_4 অ্যাসিডের স্ফুটনাঙ্ক (b.p) বাড়িয়ে দেয়।

৩. **পানির নাইট্রাইট** (NO_2^-) **নির্ণয়করণ:** অম্লীয় নমুনায় সালফাঅ্যানিলামাইড যোগ করা হলে NO_2^- সালফাঅ্যানিলামাইডের ডায়াজোটাইজেশন (diazotization) ঘটায়;N-(1-ন্যাপথাইল)-ইথিলিনডাইঅ্যামিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইডের সাথে উৎপাদটির বিক্রিয়ায় বেগুনি রঙ এর একটি অ্যাজো রঞ্জক উৎপন্ন হয়, যার λmax 550 ± 5 nm। উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দ্রবণটির অ্যাবসরবেন্স (A) মেপে প্রমাণ NO_2^- দ্রবণের সাহায্যে অঙ্কিত A বনাম $C_{NO_2^-}$ ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নমুনায় NO_2^- এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

বিকারক:

অ. সালফাঅ্যানিলামাইড: 100 mL 20% (v/v) HCl + 0.5 g সালফাঅ্যানিলামাইড

আ. N-(1-ন্যাপথাইল)-ইথিলিনডাইঅ্যামিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড:100mL1% (v/v) HCl এর মাঝে 0.3 g ডাইহাইড্রোক্লোরাইড লবণ।

বিশ্লেষণ প্রণালি : 100 mL নমুনায় ($NO_2^- < 0.4$ mg) দ্রবণ (অ) এর 2.0 mL যোগ করে 5 মিনিট অপেক্ষা করার পর দ্রবণ (আ) এর 2 mL যোগ কর। এ সময় মিশ্রণটির pH প্রায় 1.5 হতে হবে। একটা ফাঁকা দ্রবণের (blank) বিপরীতে রঞ্জক দ্রবণটির অ্যাবসর্বেন্স (A) 550 ±5 nm (λmax) তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মাপ এবং প্রমাণ NO_2^- দ্রবণের সাহায্যে অঙ্কিত A বনাম C_{NO_2}ক্রমাঙ্কন রেখায় নমুনার A বসিয়ে নমুনায় NO_2^- এর ঘনমাত্রা নির্ণয় কর।

NO_2^- এর ঘনমাত্রা হিসাবকরণ (সাধারণ পদ্ধতি):

নমুনার পরিমাণ = VmL

প্রস্তুতকৃত নমুনার পরিমাণ = V_1 mL

ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে NO_2^- এর ঘনমাত্রা = p ppm

অতএব, নমুনায় NO_2^- এর ঘনমাত্রা = (pV_1/V) ppm.

৪.পানিতে নাইট্রেট (NO_3^-) **নির্ণয়করণ-বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতি:** নাইট্রেট (NO_3^-) এর সাথে ফেনলডাইসালফোনিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় নমুনা দ্রবণে হলুদ রঙের একটি যৌগ উৎপন্ন হয়, যার λ_{max} 410 nm। উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দ্রবণটির অ্যাবসর্বেন্স (A) মেপে একটি ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নুমনায় NO_3^- এর ঘনামাত্রা নির্ণয় করা আলোচ্য পদ্ধতির নীতি। ক্লোরাইড আয়ন পদ্ধতিটির একটি প্রতিবন্ধক। নমুনায় NO_2^- এর ঘনমাত্রা 0.2 ppm এর বেশি হলে, তাও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তবে NO_2^- প্রাকৃতিক পানিতে খুব কমই ঐরূপ ঘনমাত্রায় উপস্থিত থাকে।

বিকারক:

ক. 1M NaOH: 40 g NaOH + 1L পানি

খ. ফেনলডাইসালফোনিক অ্যাসিড: 25 g ফেনল +150 mL গাঢ় H_2SO_4 (ফেনল দ্রবীভূত হওয়ার পর) + 75 mL ধূমায়িত H_2SO_4 (15% মুক্ত SO_3) একটি পানি বাথ (water bath) এর উপর দুই ঘণ্টা তাপ দিতে হবে এবং নাড়তে হবে।

গ. Ag_2SO_4 দ্রবণ: 4.4 g Ag_2SO_4 (নাইট্রেট মুক্ত) + 1L পানি; দ্রবণটির 1 mL ≡ 1 mg Cl^-;

ঘ. EDTA দ্রবণ: 50 g $Na_2EDTA. 2H_2O$ + 20 mL পানি (একটা পেস্ট তৈরি হবে) + 60 mL গাঢ় NH_3 (পেস্ট দ্রবীভূত হবে);

ঙ. নাইট্রেট এর মজুত প্রমাণ দ্রবণ (400 ppm): 0.652 নির্জলা (anhydrous) KNO_3 + পানি = 1L।

বিশ্লেষণ প্রণালি : ক্লোরাইড অপসারণ - নমুনায় Cl^- এর ঘনমাত্রা 10 ppm এর বেশি হলে, তা অপসারিত করতে হয়। Cl^- এর ঘনমাত্রা $Hg(NO_3)_2$ এর প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা নমুনা টাইট্রেশন করে (নির্দেশক: ডাইফেনাইকার্বাজেন) অথবা $AgNO_3$ দ্বারা AgCl আকারে Cl^- অধঃক্ষেপ ফেলে নির্ণয় করা যেতে পারে। যাহোক, Cl^- অপসারণের প্রয়োজন হলে 100 mL নমুনার মাঝে তুল্যপরিমাণ Ag_2SO_4 দ্রবণ যোগ করে AgCl এর অধঃক্ষেপ ফেলতে হবে এবং ফিল্টার অথবা সেন্ট্রিফিউজ করে নমুনা থেকে তা অপসারণ করতে হবে।

নাইট্রেট নির্ণয়করণ : নাইট্রেট নমুনা সংগ্রহকরার পরপরই নির্ণয় করা উচিত; সম্ভব না হলে নমুনায় 0.8 mL H_2SO_4/L অথবা 40 mg $HgCl_2$/L যোগ করে 4°C তাপমাত্রায় তা সংরক্ষণ করতে হয় অন্যথায় জৈবিক ক্রিয়ায় নমুনায় NO_3^- এর বিভাজন ঘটে। ক্লোরাইডমুক্ত নমুনায় লঘু NaOH যোগ করে তা pH 7 -এ নিয়ে আস এবং দ্রবণটি প্রায় শুষ্ক অবস্থায় বাষ্পীভূত কর। অবশেষ এর (residue) মাঝে 2.0 mL ফেনলডাইসালফোনিক অ্যাসিড যোগ করে ভালোভাবে নাড়। অবশেষ দ্রবীভূত করার জন্য মিশ্রণটি পানি বাথ এর উপর উত্তপ্ত করা যেতে পারে। দ্রবণটিতে 20 mL পানি এবং পরে 6-7 mL NH_3 যোগ করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত রঙ সর্বোচ্চ তীব্রতায় উপনীত না হয়। এ সময় যদি হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপ এসে যায় তাহলে ফোঁটায় ফোঁটায় EDTA যোগ করে এবং দ্রবণ নেড়ে তা দ্রবীভূত কর (দ্রবণ ফিল্টার করেও অধঃক্ষেপ অপসারিত করা যেতে পারে)। স্বচ্ছ দ্রবণ 50 mL আয়তনমিতি ফ্লাস্কে স্থানান্তরিত করে পানি দ্বারা ফ্লাস্ক আয়তন-সূচক চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ কর। দ্রবণটির অ্যাবসর্বেন্স 410 nm-এ মাপ।

ক্রমাঙ্কন রেখা তৈরিকরণ : 100 ppm মজুত NO_3^- দ্রবণ থেকে 250 mL10 ppm দ্রবণ তৈরি কর এবং তা থেকে 10, 25 ও 50 mL এর তিনটি এলিকোট নিয়ে নমুনা দ্রবণ প্রস্তুত করার মতো একইভাবে তিনটি দ্রবণ প্রস্তুত কর; সাথে একটি ফাঁকা

দ্রবণও (NO_3^- দ্রবণ বাদে) প্রস্তুত কর। সবগুলো দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স 410 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মেপে mg (NO_3^-) বনাম A একটি ক্রমাঙ্কন রেখা আঁক এবং তাতে নমুনার A বসিয়ে নমুনায় NO_3^- এর ঘনমাত্রা (mg/L) নির্ণয় কর।

পদ্ধতিটির সাহায্যে প্রায় 1μg পর্যন্ত নাইট্রেট-N নির্ণয় করা সম্ভব। পানীয় পানিতে NO_3^- এর পরিমাণ সাধারণত 10 mg/L এর নিচে থাকে; ঘনমাত্রা বেশি হলে নমুনার পরিমাণ কম নিয়ে কিংবা নমুনা 50 mL এর পরিবর্তে 100 mL ঘনআয়তনে লঘু করে NO_3^- নির্ণয় করা যেতে পারে।

নাইট্রেট এর ঘনমাত্রা হিসাবকরণ (সাধারণ হিসাব)

নমুনার পরিমাণ = V mL

ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নির্ণীত NO_3^- এর পরিমাণ = w mg

∴ নমুনায় NO_3^- এর ঘনমাত্রা = $[(w/V) \times 1000]$ mg/L

৮.গ.১১ পানিতে ফসফরাস নির্ণয়করণ : প্রাকৃতিক ও বর্জ্য পানিতে তিন শ্রেণীর ফসফরাস থাকতে পারে; যথা, অর্থোফসফেট, পোলিফসফেট ও জৈব ফসফরাস। সকল শ্রেণীর ফসফরাস একই অর্থোফসফেট আকারে নির্ণয় করার প্রচলিত যে পদ্ধতি তা নিচে আলোচনা করা হলো।

১.পানিতে অর্থোফসফেট নির্ণয়করণ: অর্থোফসফেট নির্ণয় করার জন্য দৃশ্যমান বর্ণালি বিশ্লেষণ নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। অর্থোফসফেটের অম্লীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়াম মোলিবডেট যোগ করা হলে ফসফোমোলিবডিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। বিশেষ বিশেষ কিছু বিজারকের সাহায্যে উক্ত অ্যাসিড বিজারিত করে 'মোলিবডিনাম ব্লু' নামে অজানা ফর্মুলার নীল রং এর একটি পদার্থ (দ্রবণীয়) পাওয়া যায়, যার λmax = 825 ± 5 nm। উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স (A) মেপে ক্রমাঙ্কন পদ্ধতির ভিত্তিতে নমুনায় অর্থোফসফেট নির্ণয় করা হয়।

বিকারক:

(ক) মোলিবডেট দ্রবণ: 12.5 g A.R. সোডিয়াম মোলিবডেট ($Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$) + 5 M H_2SO_4 (লবণ দ্রবীভূত হওয়ার পর) + 5M H_2SO_4 = 500 mL

(খ) হাইড্রাজিনিয়াম সালফেট দ্রবণ: 15-g A.R. হাইড্রাজিনিয়াম সালফেট + আয়নমুক্ত পানি (লবণ দ্রবীভূত হওয়ার পর) + পানি = 1L

(গ) প্রমাণ অর্থোফসফেট দ্রবণ: আয়তনমিতি ফ্লাস্কে 0.2197-g A.R. KH_2PO_4 + আয়নমুক্ত পানি (লবণ দ্রবীভূত হওয়ার পর) + পানি = 1L ; দ্রবণটির 1 mL ≡ 0.05 mg P ।

বিশ্লেষণ প্রণালি : [নমুনার প্রতি 25 mL এর মাঝে P এর পরিমাণ 0.1 mg এর নিচে থাকবে এবং নমুনা প্রশম হতে হবে]। নমুনার একটি 25.0 mLএলিকোট পিপেটের সাহায্যে একটি 50 mL পাইরেক্স (pyrex) আয়তনমিতি ফ্লাস্কে লও; এতে 5.0 mL মোলিবডেট দ্রবণ (ক) ও পরে 2.0 mL হাইড্রাজিন সালফেট দ্রবণ (খ) মিশিয়ে ফ্লাস্কটি পাতিত পানি দ্বারা আয়তনসূচক চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ কর এবং ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে দ্রবণ সমসত্ত্ব কর। ফুটন্ত পানির মাঝে ফ্লাস্কটি 10 মিনিট রাখ এবং পরে তা ঠাণ্ডা কর। প্রয়োজনে পানি যোগ করে দ্রবণের আয়তন পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আন এবং ঝাঁকিয়ে তা সমসত্ত্ব কর। দ্রবণটির অ্যাবসর্বেন্স (A) 825 ± 5 nm-এ মাপ। প্রমাণ অর্থোফসফেট দ্রবণের সাহায্যে উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি Cp বনাম A ক্রমাঙ্কন রেখা আঁক এবং উক্ত রেখার ভিত্তিতে নমুনায় ফসফেট নির্ণয় কর।

সিলিকেট, আর্সেনেট, Pb, Sb ও Cu পদ্ধতিটির এক একটি প্রতিবন্ধক। সিলিকেট ধূমায়িত $HClO_4$ অ্যাসিডে সিলিসিক অ্যাসিডে বিভাজিত হয়। সিলিসিক অ্যাসিড অদ্রবণীয়, ফিল্টার করে তা নমুনা থেকে অপসারণ করা যেতে পারে। নমুনা HBr-H_2SO_4 মিশ্রণে উত্তপ্ত করা হলে আর্সেনেট উদ্বায়ী $AsBr_3$ আকারে উড়ে যায়। ধাতু আয়নের প্রতিবন্ধকতা ক্যাটায়ন বিনিময় রেসিনের সাহায্যে দূর করা যেতে পারে।

২.পানিতে সমগ্র ফসফরাস (P) **নির্ণয়করণ:** সমগ্র ফসফরাস বলতে অর্থোফসফেট, পোলিফসফেট ও জৈব P এর মোট পরিমাণ বুঝায়। নমুনা HNO_3 ও H_2SO_4 অ্যাসিডের মিশ্রণে ডাইজেস্ট করা হলে পোলিফসফেট ও জৈব ফসফরাস অর্থোফসফেটে পরিণত হয়। পরে উপরে বর্ণিত প্রণালি অনুসারে বিশ্লেষণ করে, অর্থোফসফেট আকারে মোট ফসফরাস পাওয়া যায়।

বিশ্লেষণ প্রণালি :

ক. একটি বিকারে 1 mL গাঢ় H_2SO_4 ও 5 mL গাঢ় HNO_3 অ্যাসিডের মিশ্রণে 100 mL নমুনা নিয়ে (নমুনায় P: 50-1000 μg) ডাইজেস্ট কর এবং প্রায় শুষ্ক অবস্থায় তা বাষ্পীভূত কর; অবশেষটি একইভাবে আরও একবার ডাইজেস্ট ও বাষ্পীভূত কর।

খ. অবশেষটি 25 mL 0.5 M H_2SO_4 অ্যাসিডের সাহায্যে একটি 50 mL পাইরেক্স আয়তনমিতি ফ্লাস্কে স্থানান্তরিত করে তাতে 5.0 mL মোলিবডেট ও পরে 2.0 mL হাইড্রাজিন সালফেট দ্রবণ (দ্র : ১.খ বিকারক) যোগ কর এবং পাতিত পানি দ্বারা ফ্লাস্কটি আয়তনসূচক চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ কর। দ্রবণটি ঝাঁকিয়ে সমসত্ত্ব কর।

গ. 'অর্থোফসফেট নির্ণয়করণ'(উপরে দ্র:১) প্রণালি অনুসারে উক্ত দ্রবণে P নির্ণয় কর।

1 mL 1M অর্থোফসফেট ≡ 31-mg P ।

৮.গ.১২ পানিতে সালফাইড (S^{2-}) নির্ণয়করণ: সালফাইড ভূগর্ভস্থ পানিতে, বিশেষ করে, উষ্ণ প্রস্রবণের (hot spring) পানিতে প্রায়ই উপস্থিত থাকে। তাছাড়া, জৈব বস্তুর বিভাজন, শিল্পকারখানার বর্জ্য, সালফেটের জৈবিক বিজারণ প্রভৃতি উৎস থেকেও সালফাইড প্রাকৃতিক পানিতে যুক্ত হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড, H_2S (অম্লীয় পনিতে সালফাইড) দুর্গন্ধযুক্ত তীব্র একটি বিষ; গ্যাসটি ধাতু ও কংক্রিট ক্ষয় করে।

বিশ্লেষণ প্রণালি : [নমুনা সংগ্রহ করার পর পরই তার প্রতি লিটারে 2 mL1M $Zn(CH_3COO)_2$ ও 2 mL 1M NaOH মেশাতে হয়]

ক. 500 mL নমুনায় 20 mL 9M H_2SO_4 যোগ করে সাথে সাথে তার পাতন শুরু কর এবং পাতিত পানি (H_2S-দ্রবীভূত) 200 mL 2.2% $Zn(CH_3COO)_2$ দ্রবণে সংগ্রহ কর।

খ. সংগ্রাহক ফ্লাস্ক কনডেনসার (condenser) থেকে পৃথক করে দ্রবণে নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত 0.05 M I_2 দ্রবণ* (10 mLপর্যাপ্ত) যোগ কর এবং মিশ্রণটি H_3PO_4 দ্রবণের সাহায্যে (250 mL H_3PO_4/L) অম্লীয় কর। এ অবস্থায় মিশ্রণটি প্রায় 20 মিনিট যাবৎ শান্তভাবে রেখে দাও। আয়োডিন S^{2-} এর সাথে বিক্রিয়া করবে এবং কিছু I_2 অবশিষ্ট থাকবে:

$$I_2 + H_2S = 2I^- + 2H^+ + S(s)$$ ।

গ. অবশিষ্ট I_2 প্রমাণ 0.05 M $Na_2S_2O_3$ দ্রবণ দ্বারা, স্টার্চ নির্দেশকের উপস্থিতিতে টাইট্রেশন কর। শেষবিন্দুতে দ্রবণ নীল থেকে বর্ণহীন হবে:

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

$$1\ mL\ 1M\ I_2 \equiv 32\ mg\ S^{2-}$$

নমুনায় S^{2-} এর ঘনমাত্রা হিসাবকরণ (সাধারণ পদ্ধতি):

নমুনার পরিমাণ	= V mL
আয়োডিন দ্রবণের ঘনমাত্রা	= C_1 M
পাতিত দ্রবণে যোগকৃত I_2 দ্রবণ	= V_1 mL
$Na_2S_2O_3$ দ্রবণের ঘনমাত্রা	= C_2 M
শেষবিন্দুতে $Na_2S_2O_3$ এর পরিমাণ	= V_2 mL

অতএব, নমুনায় S^{2-} এর ঘনমাত্রা = $16000\ (2C_1V_1 - C_2V_2)\ /V$ ppm

*I_2 দ্রবণ KI এর মাঝে তৈরি করে $Na_2S_2O_3$ দ্বারা প্রমিত করার পর তা ব্যবহার করা উচিত।

উল্লেখ্য, পটেনশিওমিতি পদ্ধতির নীতিতে কাজ করে, এমন একটি সালফাইড প্রোব বেশ কিছু দিন হলো উদ্ভাবিত হয়েছে; প্রোবটির সাহায্যে S^{2-} কে H_2S আকারে নির্ণয় করা হয়।

৮.গ.১৩ পানিতে সালফেট (SO_4^{2-}) **নির্ণয়করণ :** প্রাকৃতিক পানিতে সালফেট কয়েক পিপিএম থেকে কয়েক হাজার পিপিএম পর্যন্ত থাকতে পারে। খনি ধোঁয়া পানিতে এর প্রাচুর্য আরও বেশি হয়। পানীয় পানির জন্য সালফেটের সহনীয় মাত্রা 200-250 ppm; অতি উচ্চ মাত্রার সালফেট রেচক হিসেবে কাজ করে।

পানিতে সালফেট নির্ণয় করার প্রমাণ পদ্ধতি টারবিডিমিতি (turbidimetry); পদ্ধতিটির প্রয়োগ সীমিত তাই অধিকাংশ বিশ্লেষণ-ল্যাবে 'টার্বিডোমিটার' যন্ত্র লভ্য হয় না। নিচে সালফেট নির্ণয় করার প্রচলিত একটি দৃশ্যমান বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

বেরিয়াম ক্লোরোএনিলেট পদ্ধতি-বর্ণালি বিশ্লেষণ : বেরিয়াম ক্লোরোএনিলেট, $BaC_6Cl_2O_4$ একটি স্বল্প দ্রবণীয় লবণ; অম্ল দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরোএনিলেট SO_4^{2-} এর সাথে বিক্রিয়া করে অধিকতর অদ্রবণীয় $BaSO_4(s)$ গঠন করে:

$$SO_4^{2-} + BaC_6Cl_2O_4(s) + H^+ \rightarrow BaSO_4(s) + HC_6Cl_2O_4^-;$$

এ সময় $HC_6Cl_2O_4^-$ এর পরিমাণ SO_4^{2-} এর পরিমাণের সমানুপাতিক হয়। দ্রবণের pH 4-এ $HC_6Cl_2O_4^-$ আয়নটি 530 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি প্রশস্ত ব্যান্ড প্রদান করে। উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স (A) মেপে নমুনায় SO_4^{2-} নির্ণয় করা বর্তমান পদ্ধতির নীতি। পদ্ধতিটির সাহায্যে 2 - 400 ppm সালফেট নির্ণয় করা যায়। ক্লোরোএনিলেট আয়ন 332 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও তীব্রতর একটি ব্যান্ড দেয়; এটি ব্যবহার করে সালফেট 0.06 ppm পর্যন্ত নির্ণয় করা যেতে পারে।

অধিকাংশ ধাতু পদ্ধতিটির জন্য প্রতিবন্ধক কেননা অধিকাংশ ধাতুর সাথে ক্লোরোএনিলেট স্বল্প দ্রবণীয় লবণ গঠন করে। সালফেট নির্ণয় করার জন্য তাই নমুনা থেকে ধাতু আয়ন আগেই অপসারণ করতে হয় । সাধারণ কিছু অ্যানায়ন, যেমন, Cl^-, NO_3^-, HCO_3^-, PO_4^{3-} ও $C_2O_4^{2-}$ 100 ppm পর্যন্ত পদ্ধতিটিতে প্রতিবন্ধক হয় না।

বেরিয়াম ক্লোরোএনিলেট : লবণটি সরাসরি ক্রয় করা যায়; ক্লোরোএনিলিক অ্যাসিড ও বেরিয়াম নাইট্রেটের সাহায্যে এটি ল্যাবে তৈরি করাও যেতে পারে। লবণটি তৈরি করার পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো।

ক্লোরোএনিলিক অ্যাসিডের (2,5-ডাইক্লোরো-3,6-ডাইহাইড্রোক্সি-p-বেনজো-কুইনোন) অ্যালকোহলীয় দ্রবণ 50°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে তাতে 5% $Ba(NO_3)_2$ দ্রবণ (2% HNO_3 অ্যাসিডের মাঝে প্রস্তুত) ফোঁটায় ফোঁটায় যোগ কর এবং অনবরত নাড়তে থাক। অধঃক্ষেপ পড়া শেষ হলে পাত্র কাত করে অধঃক্ষেপের উপর থেকে দ্রবণ ফেলে দাও এবং ইথানলের সাহায্যে একইভাবে অধঃক্ষেপ ধৌত করে বায়ুশূন্য ডেসিকেটরে তা শুষ্ক কর।

বিশ্লেষণ প্রণালি :

ক. নির্দিষ্ট পরিমাণ নমুনা (2 - 400 ppm SO_4^{2-}) ক্যাটায়ন বিনিময় রেসিন (যেমন, $Res^- H^+$) দ্বারা পূর্ণ কলামের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রেরণ করে নমুনা ধাতু আয়ন মুক্ত কর এবং তাতে লঘু HCl অথবা NH_3 ফোঁটায় ফোঁটায় যোগ করে pH 4-এ স্থির কর। ঐ সময় নমুনার ঘনআয়তন আবার মাপ (অ)।

খ. দ্রবণ (অ) থেকে 25.00 mL এর একটি এলিকোট (SO_4^{2-}: 0.2 - 40 mg) পিপেটের সাহায্যে একটি 100 mL আয়তনমিতি ফ্লাস্কে লও এবং তাতে 10 mL বাফার (0.05 M A.R. KHP) ও 50 mL 95% ইথাইল অ্যালকোহল যোগ কর। মিশ্রণটি পাতিত পানির সাহায্যে 100 mL চিহ্ন পর্যন্ত লঘু কর এবং তাতে 0.3 g বোরিয়াম ক্লোরোএনিলেট যোগ করে ফ্লাস্কটি 10 মিনিট যাবৎ উত্তমরূপে ঝাঁকাও (আ).

গ. মিশ্রণ (আ) থেকে একটি অংশ নিয়ে ফিল্টার অথবা সেন্ট্রিফিউজ কর এবং 530 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ফিল্ট্রেট এর অ্যাবসর্বেন্স (A) মাপ।

ঘ. K_2SO_4 এর প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে একটি C_{SO_4} বনাম A ক্রমাঙ্কন রেখা অঙ্কন কর এবং তাতে নমুনার A বসিয়ে নমুনায় SO_4^{2-} এর ঘনমাত্রা নির্ণয় কর।

নমুনায় SO_4^{2-} এর ঘনমাত্রা হিসাবকরণ (সাধারণ পদ্ধতি):

নমুনার পরিমাণ	$= V_0$ mL
ধাতু-মুক্ত নমুনার পরিমাণ	$= V_1$ mL
ধাতু-মুক্ত নমুনা থেকে গৃহীত এলিকোট	$= V_2$ mL
অধঃক্ষেপ ফেলার পর এলিকোটের ঘনআয়তন	$= V_3$ mL

ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে V_3 mL এর মাঝে SO_4^{2-} এর ঘনমাত্রা = p ppm

$$\therefore \text{নমুনায়, } SO_4^{2-} \text{ এর ঘনমাত্রা} = p.\ \frac{V_1V_3}{V_0V_2} \text{ ppm}$$

৮.গ.১৪ পানিতে ফ্লোরাইড (F^-) **নির্ণয়করণ :** খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় পানির মাধ্যমে আমরা ফ্লোরিন গ্রহণ করে থাকি। উচ্চমাত্রার ফ্লোরিন আমাদের শরীরে ফ্লুরিসিস এর মতো মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে। আবার, ফ্লোরিনের অভাবে দাঁত ও হাড়ের ক্ষয়রোগ দেখা দিতে পারে। পানীয় পানিতে F^- এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করা জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য তাই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। উন্নত বিশ্বে দাঁতের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পানীয় পানিতে NaF অথবা ফ্লোরোসিলিকেট আকারে 0.8-1.2 ppm F^- যুক্ত করে পানি গৃহে গৃহে সরবরাহ করা হয়।

পানিতে ফ্লোরাইড নিম্নরূপ একটি কোষ ব্যবহার করে পটেনশিওমিতি পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণত নির্ণয় করা হয়:

SCE || প্রমাণ F^- দ্রবণ / নমুনা | F^- সংবেদী ISE;

কোষটির $E_{cell} = L - 0.0591 \log [F^-]$

$= L + 0.0591\, pF$ ।

বিকারক :

ক. TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffer): বাফারটি সরাসরি ক্রয় করা যায় অথবা ল্যাবে প্রস্তুতও করা যায়। নিচে বাফারটির প্রস্তুত প্রণালি প্রদান করা হলো :

57mLগাঢ় CH_3COOH অ্যাসিড (glacial) + 58g NaCl + 4-g CDTA (সাইক্লোহেক্সাইলিনডাইনাইট্রাইলোটেট্রোঅ্যাসেটিক অ্যাসিড) + 500 mLপানি (মিশ্রণটির pH মান 5 M NaOH দ্রবণের সাহায্যে 5.0 – 5.5 এর মাঝে স্থির করার পর) + পানি = 1L; (প্লাস্টিক বোতলে বাফারটি সংরক্ষণ করতে হবে)।

খ. প্রমাণ F^- দ্রবণ (100 ppm): কিছু পরিমাণ NaF লবণ 110°C তাপমাত্রায় 2 ঘণ্টা যাবৎ শুষ্ক করার পর একটি ডেসিকেটরের মধ্যে তা ঠাণ্ডা কর। ঐ লবণ থেকে 0.220-g পরিমাণ নির্ভুলভাবে মেপে একটি 1-L আয়তনমিতি ফ্লাস্কে লও (F^- অতিশয় বিষাক্ত, দেহ বা পোশাকের পরে কোথাও লবণটি পড়লে প্রচুর পানি দ্বারা তা সাথে সাথে ধুয়ে ফেলতে হবে)। পানি দ্বারা লবণটি দ্রবীভূত কর এবং ফ্লাস্কের আয়তনসূচক চিহ্ন পর্যন্ত পানি দ্বারা পূর্ণ করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে দ্রবণটি সমসত্ত্ব কর। দ্রবণটি একটি প্লাস্টিক বোতলে সংরক্ষণ কর।

বিশ্লেষণ প্রণালি :

ক. একটি 100 mL আয়তনমিতি ফ্লাস্কে 50 mL নমুনা নিয়ে TISAB দ্বারা ফ্লাস্কটি আয়তনসূচক চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ কর এবং ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে দ্রবণটি সমসত্ত্ব কর।

খ. মজুত 100 ppm F^- থেকে 250 mL 5 ppm প্রমাণ দ্রবণ তৈরি কর এবং তা থেকে 5.00, 10.00, 25.00 ও 50.00 mL এলিকোট পৃথক পৃথকভাবে চারটি 100 mL আয়তনমিতি ফ্লাস্কে লও (পিপেট মুখ দ্বারা টানা যাবে না)। প্রত্যেকটি ফ্লাস্কে 50 mL TISAB যোগ করে পানি দ্বারা আয়তনসূচক চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ কর এবং ঝাঁকিয়ে দ্রবণ সমসত্ত্ব কর। এতে 0.5, 1.0, 2.5 ও 5.0 ppm F^- প্রমাণ দ্রবণ তৈরি হবে।

গ. প্রমাণ দ্রবণগুলোর সাহায্যে pF বনাম E` ক্রমাঙ্কন রেখা অঙ্কন কর এবং একইভাবে নমুনার E মেপে ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নমুনায় F^- নির্ণয় কর।

টীকা : TISAB প্রমাণ ও নমুনা দ্রবণের মাঝে আয়নিক শক্তির যে পার্থক্য থাকে তা দূর করে, বাফার হিসেবে কাজ করে (pH 5-6) এবং বিভিন্ন ধাতুর সাথে (যেমন, Si^{4+}, Al^{3+}, Fe^{3+} প্রভৃতি) স্থিতিশীল জটিল আয়ন গঠন করে তাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

ফ্লোরাইডের জন্য একটি প্রোবও উদ্ভাবিত হয়েছে; পটেনশিওমিতি নীতিতে অম্লীয় দ্রবণে HF হিসেবে প্রোবটি F^- প্রদান করে।

৮.গ.১৫ পানিতে আর্সেনিক নির্ণয়করণ- সিলভার ডাইইথাইলডাইথাইওকার্বামেট পদ্ধতি: প্রাকৃতিক পানিতে আর্সেনিক বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থায় উপস্থিত থাকে; যেমন, আর্সেনেট [As(V)],আর্সেনাইট[As(III)],মনোমিথাইল-, মনোইথাইল- ও ট্রাইমিথাইল আর্সাইন, মনোমিথাইল আর্সোনিক অ্যাসিড, ডাইমিথাইল আর্সিনিক অ্যাসিড, ট্রাইমিথাইল আর্সাইন অক্সাইড প্রভৃতি। অন্য যে কোনো পদার্থের মতো আর্সেনিকেরও রাসায়নিক অবস্থাভেদে তার বিষাক্ততার মাত্রা ভিন্ন হয়। সাধারণভাবে, As(III) এর বিষক্রিয়া তীব্র এবং As(V) মোটামুটি সহনীয়। পানীয় পানির জন্য আর্সেনিকের সহনীয় ও অনুমোদনীয় মাত্রা (WHO স্টান্ডার্ড) যথাক্রমে 0.05 ও 0.01 ppm ।

আর্সেনিক নির্ণয় করার নির্ভরযোগ্য একটি পদ্ধতি পরমাণু বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (AAS= Atomic Absorption Spectroscopy); GLC কিংবা HPLC এর সাথে AAS যুক্ত করে বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থার আর্সেনিক পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করাও সম্ভব। তবে, এজাতীয় যন্ত্রের দাম অনেক বেশি বলে অধিকাংশ বিশ্লেষণ ল্যাবের পক্ষে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। আণবিক বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (Molecular Absorption Spectroscopy), সিলভার ডাইইথাইলডাইথাইওকার্বামেট পদ্ধতিও, বিশেষ করে, অজৈব আর্সেনিক নির্ণয় করার বহু পরীক্ষিত নির্ভরযোগ্য একটি পদ্ধতি। পদ্ধতিটির মাপনসীমা (detection limit) পরমাণু বর্ণালি বিশ্লেষণ (শিখা) পদ্ধতির অনুরূপ তবে এতে সময় কিছুটা বেশি লাগে। নিচে পদ্ধতিটি আলোচনা করা হলো।

আণবিক বর্ণালি বিশ্লেষণ-সিলভার ডাইইথাইলডাইথাইওকার্বামেট পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণত অজৈব আর্সেনিক [As(V)+As(III)] নির্ণয় করা হয়। জায়মান হাইড্রোজেনের সাহায্যে As(III) কে AsH_3 গ্যাসে পরিণত করে Ag-ডাইইথাইলডাইথাইওকার্বামেট দ্রবণের মাঝে (দ্রাবক পিরিডিন অথবা ক্লোরোফর্ম - এফিড্রিন) প্রেরণ করা হলে দ্রবণে লাল রঙের দ্রবণীয় একটি Ag-কমপ্লেক্স উৎপন্ন হয়, যা 535 ± 5 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি শোষণ ব্যান্ড প্রদান করে। উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দ্রবণটির অ্যাবসর্বেন্স (A) মেপে ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে আর্সেনিক নির্ণয় করা পদ্ধতিটির নীতি। সর্বনিম্ন-1 μg পর্যন্ত As পদ্ধতিটির সাহায্যে নির্ণয় করা যেতে পারে। এন্টিমনি (Sb) পদ্ধতিটির জন্য একটি প্রতিবন্ধক; নমুনায় বিজারণীয় ভারি ধাতু (যেমন, Cu, Ni, Co প্রভৃতি) উচ্চমাত্রায় উপস্থিত থাকলে তাতেও কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

বিকারক :

ক. KI দ্রবণ: 15 g KI + পানি = 100 mL;

খ. $SnCl_2$ দ্রবণ : 40 g A.R. $SnCl_2 . 2H_2O$ + 100 mL গাঢ় HCl;

গ. $Pb(CH_3COO)_2$ দ্রবণ: 10 g লবণ + পানি = 100 mL;

ঘ. Zn ধাতু: আর্সেনিকমুক্ত Zn (20-30 মেশ/ দানাদার);

ঙ. As(III) দ্রবণ: 1.320 g As_2O_3 + 10 mL পানি + 4 g Na OH (অক্সাইড দ্রবীভূত হওয়ার পর) + পানি = 1L (1000 ppm As);

চ. সিলভার ডাইইথাইলডাইথাইওকার্বামেট দ্রবণ: পদার্থটি সরাসরি ক্রয় কিংবা ল্যাবে তৈরি করা যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালি : 100mL পানিতে 2.25 g সোডিয়াম ডাইইথাইলডাইথাইওকার্বামেট এবং 100 mL পানিতে 1.7 g $AgNO_3$ এর দুটি দ্রবণ তৈরি কর; উভয় দ্রবণ 8-10°C তাপমাত্রায় রেখে কার্বামেট দ্রবণের মাঝে $AgNO_3$ দ্রবণ একটু একটু করে যোগ কর এবং মিশ্রণটি নাড়তে থাক। $AgNO_3$ দ্রবণ যোগ করা শেষ হলে সিন্টারকৃত গ্লাস ক্রুসিবল-এ অধঃক্ষেপ (লেবু হলুদ রং: সিলভার ডাইইথাইলডাইথাইকার্বামেট কমপ্লেক্স) ফিল্টার কর, 100 mL ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অধঃক্ষেপ ধৌত কর এবং কক্ষ তাপে বায়ুশূন্য ডেসিকেটরে তা শুষ্ক কর। আলো থেকে দূরে ছিপিবদ্ধ কালো বোতলে কমপ্লেক্স সংরক্ষণ করতে হবে।

অ. পিরিডিন দ্রবণ: 1.0 g Ag -কমপ্লেক্স + 200 mL বিশুদ্ধ পিরিডিন;

আ. ক্লোরোফর্ম দ্রবণ : 410 mg এফিড্রিন + 200 mL ক্লোরোফর্ম (এফিড্রিন দ্রবীভূত হওয়ার পর) + 625 mg Ag -কমপ্লেক্স (কমপ্লেক্স দ্রবীভূত হওয়ার পর) + ক্লোরোফর্ম = 250 mL (দ্রবণ বাদামি রঙের বোতলে সংরক্ষণ করতে হবে)।

বিশ্লেষণ প্রণালি :

ক. 25 - 35 mL নমুনা আর্সাইন উৎপাদক (Arsine generator) ফ্লাস্কে (চিত্র ৮.৮) নিয়ে তাতে 5 mL গাঢ় HCl, 2 mL KI দ্রবণ ও 0.5 mL $SnCl_2$ দ্রবণ যোগ কর (প্রত্যেকটি বিকারক যোগ করার পর ফ্লাস্ক ঝাঁকিয়ে তা নমুনায় ভালোভাবে মেশাতে হবে)। মিশ্রণটি 15 মিনিট শান্তভাবে রেখে দাও। নমুনায় As(V) উপস্থিত থাকলে এ সময় তা I^- দ্বারা As(III)-তে এবং Fe(III) উপস্থিত থাকলে $SnCl_2$ দ্বারা তা Fe(II) তে বিজারিত হবে।

খ. গ্লাস উল $Pb(CH_3COO)_2$ দ্রবণে ভিজিয়ে H_2S পরিশোধক নল (H_2S scrubber tube) তা দ্বারা পূর্ণ কর এবং আর্সাইন শোষক (Arsine absorber) নলে 4.0 mL সিলভার কমপ্লেক্স দ্রবণ (অ/আ) লও।

গ. আর্সাইন উৎপাদক ফ্লাস্কের মিশ্রণে (ক) 5 g Zn যোগ কর এবং H_2S-পরিশোধক ও AsH_3 শোষক নল সাথে সাথে যথাযথভাবে যুক্ত কর। প্রায় 40 মিনিট

যাবৎ গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার পর উৎপাদক ফ্লাস্ক গরম পানিতে ডুবিয়ে রেখে আরও 5 মিনিট যাবৎ গ্যাস আর্সাইন-শোষকের ভিতর দিয়ে প্রেরণ কর।

ঘ. শোষক নল থেকে দ্রবণ একটি কোষে (cuvette) স্থানান্তরিত করে 535 - 540 nm (λmax) তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তার অ্যাবসর্বেন্স (A) মাপ। নমুনা বাদে কেবল বিকারকের সাহায্যে একইভাবে প্রস্তুতকৃত একটি শোষক দ্রবণ (blank) রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

ঙ. প্রমাণ As(III) দ্রবণের সাহায্যে (1-10 μg) একই পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি μg (As) বনাম A ক্রমাঙ্কন রেখা অঙ্কন কর এবং উক্ত রেখায় নমুনার A বসিয়ে পানিতে As এর ঘনমাত্রা নির্ণয় কর।

টীকা : নমুনা খুব লঘু হলে, তার প্রতি লিটারে 7 mL 1:1 H_2SO_4 ও 5 mL গাঢ় HNO_3 অ্যাসিড যোগ করে SO_3 এর সাদা ধোঁয়া নির্গমন শুরু না হওয়া পর্যন্ত বাষ্পীভূত কর; এতে জৈব অজৈব উভয় শ্রেণির আর্সেনিক As(V) এ পরিণত হয়। উক্ত গাঢ় দ্রবণ উপরে বর্ণিত প্রণালি অনুসারে বিশ্লেষণ করা হলে সকল শ্রেণি আর্সেনিকের মোট পরিমাণ পাওয়া যায়।

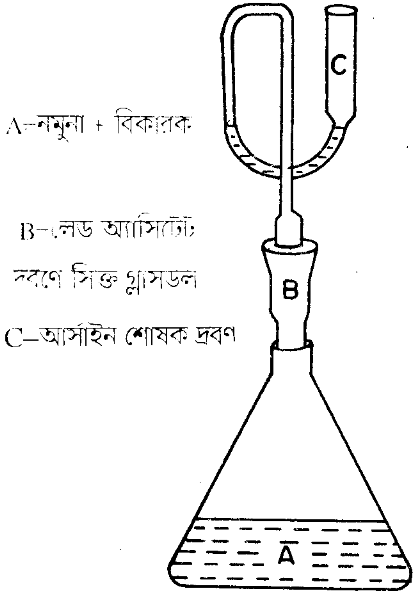

চিত্র ৮.৮ : আর্সাইন উৎপাদন যন্ত্র।

৮.গ.১৬ পানিতে সীসা (pb) **নির্ণয়করণ : আণবিক বর্ণালি বিশ্লেষণ - ডাইথিজোন পদ্ধতি :** সীসা নির্ণয় করার ডাইথিজোন পদ্ধতি সংবেদনশীল একটি পদ্ধতি,

মাইক্রোগ্রাম (μg) পরিমাণ ধাতু পদ্ধতিটির সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব। সীসা (Pb^{2+}) ডাইফিনাইথাইওকার্বাজোন (সংক্ষেপে, ডাইথিজোন) এর সাথে একটি স্থিতিশীল প্রশম কিলেট গঠন করে:

$$pb^{2+} + 2HDz \text{ (ডাইথিজোন)} \rightleftharpoons pb(Dz)_2 + 2H^+$$

(লাল)

কিলেটটি অপোলার জৈব দ্রাবকে (যেমন, CCl_4, CH_3Cl, CH_2Cl_2) দ্রবণীয় এবং 510 - 515 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এটি একটি শোষণ ব্যান্ড প্রদান করে। অপোলার জৈব দ্রাবকে কিলেটটি নিষ্কাশন করে এবং উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স (A) মেপে ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নমুনায় ধাতুটির ঘনমাত্রা নির্ণয় করা ডাইথিজোন পদ্ধতির নীতি। সীসার মতো আরও বহু ধাতু আয়নের সাথে ডাইথিজোন প্রশম কিলেট গঠন করে তবে ডাইথিজোনের সকল বিক্রিয়া pH নির্ভর, এক এক ধাতুর কিলেট এক এক pH এ স্থিতিশীল হয়। উক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে Pb-ডাইথিজোন বিক্রিয়াকে অন্য ধাতুর প্রতিবন্ধকতা থেকে বহুলাংশে মুক্ত রাখা যায়। তবে, প্রতিবন্ধক ধাতু নমুনা থেকে পৃথক করে অথবা আচ্ছাদিত করে নির্ণয় করা অনেক বেশি নিরাপদ। পানীয় পানির জন্য সীসার সহনীয় মাত্রা (USPH স্টান্ডার্ড) 0.05 ppm।

বিকারক :

ক. 1M HNO_3: 6.5 mL গাঢ় HNO_3 + পানি = 100 mL

খ. $NH_3 - NaCN - Na_2SO_3$ দ্রবণ: 350 mL গাঢ় NH_3 + 30 mL 10% NaCN + 1.5 g Na_2SO_3 + পানি = 1L (pH ≅ 11);

গ. Pb $(NO_3)_2$ প্রমাণ দ্রবণ (1000 ppm); 1.6 g $Pb(NO_3)_2$ + পানি = 1L (মজুত দ্রবণ; দ্রবণ লঘু করে সাথে সাথে ব্যবহার করতে হবে)।

ঘ. ডাইথিজোন দ্রবণ : 7.5 g ডইথিজোন + 300 mL CH_2Cl_2 (সর্বদা সদ্য প্রস্তুত দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে)।

প্রণালি :

ক. ক্রমাঙ্কন রেখা অঙ্কন: গ্রাউন্ড গ্লাসের ছিপি যুক্ত 5 টি পৃথককরণ ফানেলে (separatory funnel) অথবা ছিপিযুক্ত 5 টি বোতলে 10-ppm প্রমাণ $Pb(NO_3)_2$ দ্রবণ থেকে 0 (ফাঁকা দ্রবণ, blank), 2, 4, 6 ও 8 mLঘন আয়তনের এক একটি এলিকোট লও এবং পানি দ্বারা 20 mL পর্যন্ত লঘু কর। প্রত্যেকটি দ্রবণে সিলিন্ডারের সাহায্যে 60 mL $NH_3 - NaCN - Na_2SO_3$ বিকারক এবং পিপেটের সাহায্যে 25 mL ডাইথিজোন দ্রবণ যোগ কর। ফানেলের/বোতলের মুখ ছিপিবদ্ধ করে এক মিনিট ভালোভাবে ঝাঁকাও এবং শুষ্ক একটি ফিল্টার পেপারের (হোয়াটম্যান নং: 40)ভিতর

দিয়ে CH_2Cl_2 স্তরটি পৃথক কর; λ_{max} এ (400-600 nm) দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স (A) মেপে একটি $\mu g(Pb)$ বনাম A ক্রমাঙ্কন রেখা তৈরি কর।

খ. নমুনা বিশ্লেষণ : 100 mL নমুনায় 1 mL 1 M HNO_3 যোগ করে তাকে 25 - 30 mL পরিমাণে বাষ্পীভূত কর এবং দ্রবণ ঠাণ্ডা করার পর তাতে 2 M NH_3 ফোঁটায় ফোঁটায় যোগ করে অম্ল প্রশমিত কর (দ্রবণে NH_3-এর গন্ধ পাওয়া যাবে)। উক্ত দ্রবণ পৃথককরণ ফানেলে/বোতলে সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত কর এবং ক্রমাঙ্কন রেখা অঙ্কনের প্রণালি (উপরে ক.) অবিকল অনুসরণ করে CH_2Cl_2 স্তরের অ্যাবসর্বেন্স মাপ। ক্রমাঙ্কন রেখায় উক্ত মান বসিয়ে নমুনায় সীসার পরিমাণ নির্ণয় কর।

টীকা :

১. নমুনায় সীসার যে পরিমাণ, তার সাপেক্ষে নমুনার পরিমাণ গ্রহণ করতে হবে।

২.ডাইথিজোন সর্বোচ্চ মাত্রায় বিশুদ্ধ হতে হবে। পদার্থটি ডাইফেনাইলথাইওকার্বাডায়াজোন এ-জারিত হতে পারে, জৈব দ্রাবকে যা হলুদ অথবা বাদামি রঙ সৃষ্টি করে।

৩. NH_3-NaCN-Na_2SO_3 দ্রবণ প্রতিবন্ধক ধাতুকে আচ্ছাদিত করে। সায়ানাইড একটি তীব্র বিষ; কাজ শেষে সকল দ্রবণে $FeSO_4$ যোগ করে নিরাপদ স্থানে তা ফেলতে/সংরক্ষিত করতে হবে; কখনো এর মধ্যে অম্ল যোগ করা যাবে না।

৮.গ.১৭ পানিতে লৌহ (Fe) নির্ণয়করণ : আণবিক বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ - অর্থোফেনানথ্রোলিন পদ্ধতি : পানিতে লৌহ ফেরাস অথবা ফেরিক আকারে অবস্থান করে। ভূপৃষ্ঠের পানিতে মৌলটির স্বাভাবিক প্রাচুর্য 1-ppm এরও কম। তবে, ভূগর্ভস্থ অথবা খনি বিধৌত পানিতে প্রাচুর্য সাধারণত বেশি হয়। ভূগর্ভস্থ পানির লৌহ ফেরাস অবস্থায় থাকে। উপরে তোলার পর বায়ুর সংস্পর্শে তা কলয়েডীয় ফেরিক হাইড্রোক্সাইড/ফেরিক অক্সাইড হাইড্রেট এ পরিণত হয় যা পানির রঙ হলুদ বা বাদামি করে দেয়। পানীয় পানির জন্য লৌহের অনুমোদিত মাত্রা (USPH স্টাণ্ডার্ড) 0.3 ppm।

ফেরাস আয়নের (Fe^{2+}) সাথে অর্থোফেনানথ্রোলিন(1,10-ফেনানথ্রোলিন) এর বিক্রিয়ায় (pH 3.5 - 6) লাল রঙ এর ট্রিস-অর্থোফেনানথ্রোলিনআয়রন(II), $[Fe(o\text{-}phen)_3]^{2+}$ কমপ্লেক্স উৎপন্ন হয়। কমপ্লেক্সটি 510 - 515 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি তীব্র চার্জ স্থানান্তর (charge transfer) ব্যান্ড প্রদান করে। উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (λ_{max}) কমপ্লেক্স দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স (A) মেপে একটি 'ক্রমাঙ্কন রেখার' ভিত্তিতে নমুনায় লৌহের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয়ে থাকে:

$$Fe^{2+} + 3phenH^+ \rightleftharpoons [Fe(o\text{-}phen)_3]^{2+} + 3H^+$$ ।

পদ্ধতিটির মাপন সীমা (detection limit) প্রায় 0.1 ppm। বেশ কিছু ক্যাট্যায়ন ও অ্যানায়ন (যেমন, Ag^+, Bi^{3+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}, Co^{2+}, CN^-, MnO_4^{2-} ও WO_4^{2-})

পদ্ধতিটির প্রতিবন্ধক। পারক্লোরেট লবণ আকারে কমপ্লেক্সটি নাইট্রোবেনজিনে নিষ্কাশন করা যায়; উক্ত মাধ্যমে কমপ্লেক্সটির অ্যাবসর্বেন্স পরিমাপ করা যেতে পারে।

বিকারক :

ক. 0.1% অর্থোফেনানথ্রোলিন :100 mg অর্থোফেনানথ্রোলিন মনোহাইড্রেট + 100 mL পানি (উষ্ণ) (সদ্যপ্রস্তুত দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে)।

খ. 10% $NH_2OH.HCl$: 10 g লবণ + 100 mL পানি;

গ. অ্যাসিটেট বাফার : 25g CH_3COONH_4 + 70 mL গাঢ় (glacial) CH_3COOH + পানি = 100 mL; অথবা, 16 g $CH_3COONa.3H_2O$ + পানি = 100 mL;

ঘ. লৌহের প্রমাণ (মজুত) দ্রবণ (100 ppm): 0.702 g A.R. $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2.6H_2O$ + 100 mL পানি + 1 mL গাঢ় H_2SO_4 (লবণ দ্রবীভূত হওয়ার পর) + পানি = 1L ।

বিশ্লেষণ প্রণালি :

ক. একটি কনিক্যাল ফ্লাস্কে 50 mL নমুনা নিয়ে তাতে 2 mL গাঢ় HCl ও 1 mL $NH_2OH.HCl$ দ্রবণ (বিকারক-খ) যোগ কর এবং ফুটন্ত অবস্থায় আসা পর্যন্ত মিশ্রণটি তাপ দাও; ফেরিক লৌহ ফেরাসে বিজারিত হবে। মিশ্রণটি ঠাণ্ডা কর।

খ. ঠাণ্ডা মিশ্রণ একটি 100 mL আয়তনমিতি ফ্লাস্কে স্থানান্তরিত করে তাতে 10 mL বাফার (বিকারক-গ) ও 2 mL ফেনানথ্রোলিন দ্রবণ (বিকারক-ক) যোগ কর। মিশ্রণের pH 3.5 - 5.0 এর মাঝে থাকবে। পানি দ্বারা ফ্লাস্ক আয়তনসূচক চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ করে ঝাঁকিয়ে দ্রবণ সমসত্ত্ব কর এবং 10-15 মিনিট শান্তভাবে রেখে দাও; কমপ্লেক্স এর গঠন সাম্যাবস্থায় আসবে।

গ. 510 - 515 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (λ_{max} -এ) কমপ্লেক্স দ্রবণের অ্যাবসর্বেন্স (A) একটি ফাঁকা দ্রবণের (blank) বিপরীতে মাপ।

ঘ. প্রমাণ Fe দ্রবণের সাহায্যে (বিকারক-ঘ) (0.01-1 mg Fe) উপরের প্রণালি অনুসরণ করে একটি μg(Fe) বনাম A ক্রমাঙ্কন রেখা তৈরি কর এবং তাতে নমুনার A বসিয়ে নমুনায় লৌহের ঘনমাত্রা নির্ণয় কর।

লৌহের ঘনমাত্রা হিসাবকরণ (সাধারণ পদ্ধতি) :

নমুনার পরিমাণ = V mL

ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নির্ণীত লৌহের পরিমাণ = w μg

∴ নমুনায় লৌহের ঘনমাত্রা = (w/V) ppm ।

৮.গ.১৮ পানিতে ক্রোমিয়াম(VI) নির্ণয়করণ : আণবিক বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ-ডাইফেনাইলকার্বাজাইড পদ্ধতি : ক্রোমিয়াম(III) এর তুলনায় Cr(VI) অনেক

বেশি বিষাক্ত। Cr(III) শরীরের জন্য অপরিহার্য একটি উপাদান এবং ক্রোমিয়ামের যে বিষক্রিয়া তা কার্যত Cr(VI) এর জন্য ঘটে। বহুদিন যাবৎ ক্রোমেট ধূলির সংস্পর্শে থাকলে ফুসফুসের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে বলে জানা যায়। পানীয় পানির জন্য Cr(VI) এর সহনীয় মাত্রা (WHO স্টাণ্ডার্ড) 0.05 ppm ।

অম্লীয় দ্রবণে Cr(VI) এর সাথে ডাইফেনাইলকার্বাজাইডের বিক্রিয়ায় বেগুনি রঙ এর দ্রবণীয় একটি পদার্থ উৎপন্ন হয়, 540 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যা একটি শোষণ ব্যান্ড প্রদান করে। উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দ্রবণটির অ্যাবসর্বেন্স(A) মেপে ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নমুনায় Cr নির্ণয় করা হয়। মোলিবডেনাম (VI), V(V), Hg(II) ও Fe(III) পদ্ধতিটির এক একটি প্রতিবন্ধক। তবে কাপফেরন (Cupferon) বিকারকের সাহায্যে V(V) ও Fe(III) কে নমুনা থেকে $CHCl_3$ দ্রাবকে নিষ্কাশন করা যায়।

বিকারক :

ক. 1,5-ডাইফেনাইলকার্বাজাইড (0.25%): 0.25 g বিকারক +100 mL50% এসিটোন;

খ. 3 M H_2SO_4: 16 mL গাঢ় H_2SO_4 + পানি = 100 mL;

গ. Cr এর প্রমাণ দ্রবণ (100 ppm): 0.2830 g $K_2Cr_2O_7$ + পানি = 1L (মজুত দ্রবণ)।

বিশ্লেষণ প্রণালি :

ক. একটি বিকারে 30 mL নমুনা* [0.2 – 0.5 ppm Cr(VI)] নিয়ে তাতে 1.7 mL 3M H_2SO_4 ও 2 mL 0.25% ডাইফেনাইলকার্বাজাইড দ্রবণ যোগ কর এবং মিশ্রণটি পানি দ্বারা 50 mL পর্যন্ত লঘু কর। একইভাবে প্রস্তুত একটি ফাঁকা দ্রবণের বিপরীতে মিশ্রণটির অ্যাবসর্বেন্স (A) 540 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মাপ।

খ. প্রমাণ Cr দ্রবণের সাহায্যে (5 – 15 μg Cr) একইভাবে μg(Cr) বনাম A ক্রমাঙ্কন রেখা তৈরি কর এবং তাতে নমুনার A বসিয়ে Cr এর পরিমাণ নির্ণয় কর।

Cr- হিসাবকরণ (সাধারণ পদ্ধতি):

নমুনার পরিমাণ = V mL

ক্রমাঙ্কন রেখার ভিত্তিতে নির্ণীত Cr = w μg

∴ নমুনায় Cr এর ঘনমাত্রা = (w/V) ppm ।

* নমুনা লঘু হলে, বেশি পরিমাণ নমুনা নিয়ে H_2SO_4 সহ তা বাষ্পীভূত করে গাঢ় করা যেতে পারে তবে খেয়াল রাখতে হবে, বিক্রিয়ার সময় মোট দ্রবণে অম্লের ঘনমাত্রা যেন 0.2 M থাকে।

৮.গ.১৯ পরমাণু বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (AAS) **পদ্ধতির জন্য পানির নমুনা প্রস্তুতকরণ :** পরিবেশের নমুনায় ট্রেস-ধাতু (trace metal) নির্ণয় করার জন্য পরমাণু বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার সবচেয়ে ব্যাপক। পদ্ধতিটির বিশেষ একটি সুবিধা, নমুনায় এক ধাতুর উপস্থিতিতে অন্য ধাতু এর সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। তবে,

পরিবেশের নমুনায় নানাবিধ অপদ্রব মিশ্রিত থাকে বলে বিশ্লেষণের পূর্বে তা থেকে অপদ্রব দূর করতে হয়। পরমাণু বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (AAS) পদ্ধতির সাহায্যে পরিবেশের একটি নমুনা বিশ্লেষণ করার জন্য নমুনার যে প্রস্তুতি লাগে তার সাধারণ কিছু প্রণালি প্রদান করা হলো।

শিখা পরমাণু বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (Flame-AAS) : সাধারণত দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতির সাহায্যে নমুনার অপদ্রব দূর করা হয়। নিচের পদ্ধতিটি নর্দমার পানি, সামুদ্রিক লবণাক্ত পানি ও টাটকা পানির নমুনা প্রস্তুত ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

রাসায়নিক দ্রব্য : HNO_3 (sp.gr.1.42), NH_3 (sp.gr. 0.88), অ্যামোনিয়াম পাইরোলিডিন ডাইথাইওকার্বামেট (APDC), ডাইইথাইলডাইঅ্যামোনিয়ামডাইথাইও-কার্বামেট (DDOC), মিথাইলআইসোবিউটাইলকিটোন (MIBK), সোডিয়াম সাইট্রেট ও সাইট্রিক অ্যাসিড।

বিকারক দ্রবণ :

১. বাফার: 1.2 M সোডিয়াম সাইট্রেট + 0.7M সাইট্রিক অ্যাসিড;

২. কিলেটিং এজেন্ট: জলীয় মিশ্রণ - 1% APDC + 1% DDOC ।

নমুনা প্রস্তুতকরার প্রণালি :

১. একটি জেলডল ফ্লাস্কে 500 mL নমুনা নিয়ে তাতে 5 mL HNO_3 যোগ কর এবং মিশ্রণটি ফুটিয়ে 50 mL ঘনআয়তনে নামিয়ে আনো। নমুনা ঠাণ্ডা হলে আয়নমুক্ত পানি দ্বারা তা আবার 500 mL-এ লঘু কর (ক)।

২. নমুনা (ক) থেকে একটি 250 mL এলিকোট একটি পৃথককরণ ফানেলে লও, NH_3 দ্বারা অম্ল প্রশমিত কর (pH=7) এবং পরে তাতে 5 mL সাইট্রেট বাফার যোগ কর (pH = 5.0 প্রায়) (খ)।

৩. দ্রবণ (খ) এর মাঝে 10 mL কিলেটিং এজেন্ট দ্রবণ ও 35 mL MIBK যোগ করে উত্তমরূপে এক মিনিট ঝাঁকাও এবং পরে 5-10 মিনিট শান্তভাবে রেখে দাও; দুটি তরলদশা সুস্পষ্টভাবে পৃথক হবে।

৪. জলীয় দশা ফেলে দাও এবং জৈব দশা একটি ফিল্টার পেপারের ভিতর দিয়ে একটি 50 mL আয়তনমিতি ফ্লাস্কে স্থানান্তরিত কর। দ্রবণটি MIBK দ্বারা ফ্লাস্কের আয়তনসূচক চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে সমসত্ত্ব কর (মজুত দ্রবণ-গ)।

৫. মজুত দ্রবণ -(গ) সরাসরি শিখা AA স্পেকট্রোমিটারে ব্যবহার করে Cd, Zn, Cu, Fe, Pb, ও Ni নির্ণয় করা যেতে পারে। বিশ্লেষ্যের পাশাপাশি একই ধাতুর এক গুচ্ছ প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে একটি ক্রমাঙ্কন রেখা অঙ্কন করে তার ভিত্তিতে বিশ্লেষ্য ধাতু নির্ণয় করতে হয় এবং নমুনার পাশাপাশি একটি ফাঁকা দ্রবণও (blank)একইভাবে পরিমাপ করতে হয়।

গ্রাফাইট চুল্লি পরমাণু বিশোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ (Graphite furnace AAS): পরিবেশের একটি নমুনা শিখা AAS পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করার সময় নমুনা অপদ্রব মুক্ত করতে যেমন দ্রাবক নিষ্কাশনের মতো কঠোর পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, গ্রাফাইট চুল্লি AAS পদ্ধতিতে তেমন প্রয়োজন হয় না। গ্রাফাইট চুল্লি পদ্ধতিতে তাপমাত্রা এতো দ্রুত উঁচুতে (প্রায় 3000°C) উঠে যায় যে, জৈব অপদ্রব সাথে সাথে ভস্ম ও বাষ্পাকারে উবে যায় এবং বিশ্লেষ্য ধাতুও নিমেষে পরমাণুতে পরিণত হয়। তবে, ক্যাটায়নিক অপদ্রব নমুনায় উচ্চমাত্রায় উপস্থিত থাকলে তা কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য গ্রাফাইট চুল্লি - AAS পদ্ধতির সাহায্যে পানির একটি নমুনা বিশ্লেষণ করার পূর্বে ক্যাটায়নিক অপদ্রব অপসারণ করার প্রয়োজন হয়। নিচে এ সম্পর্কিত সাধারণ একটি পদ্ধতি প্রদান করা হলো।

পানি নমুনায় বিশ্লেষ্য ধাতু : Cd, Co, Cu, Fe, Mn, No, Pb ও Zn

ক্যাটায়নিক অপদ্রব : Na, K, Ca, Mg ।

অপদ্রব অপসারণের পদ্ধতি, আয়ন বিনিময় :

১. 100 mL নমুনা একটি বিকারে (সম্ভব হলে, টেফ্লন বিকারে) নিয়ে NH_3/ HCl দ্বারা তার pH 5.5 এ স্থির কর এবং 0.5 mL 8 M CH_3COONH_4 (বাফার) যোগ কর-(ক) ।

২. কিলেক্স -100 রেসিনের (মেশ 200 - 400) স্লারি (slurry: 3-4 mL) দ্বারা একটি কলাম পূর্ণ করে তা 15 mL (5 mL × 3) 2.5 M HNO_3, 10 mL (5 mL × 2) পানি ও 15 mL (5 mL × 3) 2.0 M NH_3 দ্বারা পর্যায়ক্রমে ধৌত কর। কলাম থেকে নির্গত পানি ক্ষারীয় হওয়ার পর আরও 10-15 mL পানি দ্বারা রেসিন ধৌত কর। উক্ত কলাম সামান্য পরিমাণ নমুনা (ক) দ্বারা সিক্ত কর (রেসিনের আয়তন সংকুচিত হবে) এবং 3 - 4 মিনিট পর অবশিষ্ট নমুনা 0.8 mL/মিনিট হারে রেসিনের ভিতর দিয়ে প্রেরণ কর (নমুনা যেন কখনোই রেসিনের শীর্ষ স্তর থেকে নিচে নেমে না যায়)। রেসিন 40 mL (10 mL × 4) 1.0 M CH_3COONH_4 দ্বারা এবং পরে 10 mLপানি দ্বারা ধৌত কর। এতে Na, K, Ca, Mg ও CH_3COONH_4 অপসারিত হবে। সবশেষে রেসিন 7 mL 2.5 M HNO_3 দ্বারা ধৌত কর এবং ইলুয়েট (eluate: রেসিন ধোয়া দ্রবণ) একটি 10 mL সাধারণ পলিথিন বোতলে ধারণ কর। উক্ত দ্রবণে বিশ্লেষ্য ধাতু উপস্থিত থাকবে। সংগৃহীত দ্রবণের ঘনআয়তন মেপে বোতলে ছিপি বদ্ধ অবস্থায় তা সংরক্ষণ কর (মজুত দ্রবণ)। উক্ত দ্রবণের ক্ষুদ্র এক একটি এলিকোট (25 μL) স্পেকট্রোফটোমিটারের গ্রাফাইট চুল্লিতে সরাসরি স্থাপন করে বিশ্লেষ্য ধাতু নির্ণয় করতে হয় [পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট-৬) বিভিন্ন মৌলের বিশ্লেষণীয় λ প্রদান করা হয়েছে]।

৮.গ.২০ পানিতে পেস্টিসাইড নির্ণয়করণ : পেস্টিসাইড কৃষিক্ষেত্র, বনভূমি ও প্রস্তুতকারক কারখানা থেকে ভূপৃষ্ঠের ও ভূগর্ভের পানিতে প্রবেশ করে এবং এক সময় তা আমাদের দৈনন্দিন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়। ডিডিটি, এলড্রিন,

ডাই-এলড্রিন প্রভৃতি ক্লোরিনযুক্ত পেস্টিসাইড পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর কেননা এরা জৈবিক দুর্বিনাশী (biorefractory), পরিবেশে বহুদিন পর্যন্ত এরা টিকে থাকে। জৈব ফসফেট ও কার্বামেট শ্রেণির পেস্টিসাইড জৈবিক বিভাজনীয় (biodegradable)। তবে, জৈবক্লোরিন পেস্টিসাইডের তুলনায় এরা অনেক বেশি বিষাক্ত; স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি এনজাইম, কোলিন স্টিয়ারেজ (choline stearase) এর ক্রিয়ায় এসব পেস্টিসাইড ব্যাঘাত ঘটায়। এনজাইমটির ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এক একটি পেস্টিসাইডের সহনীয় মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে; সারণিতে (সারণি ৮.৪) সাধারণ কিছু পেস্টিসাইডের সহনীয় মাত্রা প্রদান করা হলো।

জৈবক্লোরিন পেস্টিসাইড সাধারণত গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফীর সাহায্যে নির্ণয় করা হয়; নিচে পদ্ধতিটির সাধারণ একটি পরিলেখ (outline) প্রদান করা হলো।

হেক্সেন দ্রাবকে 15% ইথাইল ইথার দ্রবণের সাহায্যে নমুনা বারবার নিষ্কাশন করার পর সম্পূর্ণ নিষ্কর্ষ (extract) জলীয় বাষ্পের উপর 2-3 mL ঘনআয়তনে বাষ্পীভূত কর এবং ঠাণ্ডা করার পর হেক্সেন দ্রবণটি আবার 5 mL-এ লঘু কর। উক্ত দ্রবণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি এলিকোট (5μL) মাইক্রোসিরিঞ্জের সাহায্যে GC কলামে (180°C) স্থাপন করে 60 mL/ মিনিট হারে Ar/CH_4 বাহক গ্যাসের সাহায্যে কলামের ভিতর দিয়ে প্রেরণ কর; গ্যাস আকারে এক একটি পেস্টিসাইড এক এক হারে কলামের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ডিটেক্টরে (Electron Capture Detector) প্রবেশ করে এবং সময়ের সাথে যে ধারাবাহিকতায় এক একটি পেস্টিসাইড ডিটেক্টরে প্রবেশ করে, সে অনুসারে ক্রোমাটোগ্রাম [সময় বনাম বৈশ্লেষিক বার্তা (signal)] তৈরি হয়। একই পরীক্ষণীয় শর্তে বিশ্লেষ্যের প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে প্রাপ্ত ক্রোমাটোগ্রামের সাথে নমুনার ক্রোমাটোগ্রাম তুলনা করে তখন পেস্টিসাইডের প্রকার ও প্রাচুর্য নির্ণয় করা হয়।

সারণি ৮.৪ : পানীয় পানির জন্য প্রচলিত কিছু পেস্টিসাইডের অনুমোদনীয় মাত্রা।

পেস্টিসাইড	অনুমোদনীয় মাত্রা (ppm)	পেস্টিসাইড	অনুমোদনীয় মাত্রা (ppm)
এলড্রিন	0.017	হেপটাক্লোর	0.018
ক্লোরডেন	0.003	লিনডেন	0.056
ডিডিটি	0.042	মেথক্সিক্লোর	0.035
ডাইএলড্রিন	0.017	জৈব ফসফেট/কার্বামেট	0.100
এনড্রিন	0.001	টকসাফেন 2,4-D; 2,4,5-T; 2,4,5-TP (গুল্মনাশক)	0.005 0.001

[সূত্র : J.E. Zajic, 'Water Pollution – Disposal and Reuse' Vol-1, Marcel Dekker, NY, 1971, p-12.]

৮.গ.২১ পানিতে ই.কোলাই (*Escherichia coli*) **নির্ণয়করণ :** জনস্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পানিতে একটি রাসায়নিক মিশালের উপস্থিতি যতখানি উদ্বেগজনক, ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি তার থেকে কম উদ্বেগজনক তো নয়ই, এমনকি কখনো কখনো তা ভয়ঙ্কর মহামারি সৃষ্টিরও কারণ হতে পারে। পানীয় পানিতে রাসায়নিক মিশাল নির্ণয় করার পাশাপাশি তাতে ব্যাকটেরিয়া নির্ণয় করাও তাই অত্যাবশ্যক। ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে; এর কোনো কোনো শ্রেণী রোগব্যাধি সৃষ্টি করে (প্যাথোজেন - pathogen), আবার কোনো কোনো শ্রেণী ক্ষতিকর তো নয়ই বরং উপকারী। ই.কোলাই ব্যাকটেরিয়া স্বাস্থ্যের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়; তা সত্ত্বেও পানিতে ব্যাকটেরিয়াজনিত দূষণ নির্ধারণ করার জন্য সাধারণত ই.কোলাই নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এর কারণ দুটি: এক. ই. কোলাই নির্ণয় করা সহজ এবং দুই. যে পানিতে প্যাথোজেনের বিস্তার ঘটে, তাতে ই.কোলাই এরও বিস্তার ঘটে এবং যেখানে প্যাথোজেনের বিস্তার ঘটতে পারে না, সেখানে ই.কোলাই এরও বিস্তার ঘটে না। তবে, পানির পরিবেশ ই. কোলাই এর জন্য অনুকূল হলেও প্যাথোজেনের জন্য তা অনুকূল নাও হতে পারে।

ই. কোলাই নির্ণয় করার জন্য নমুনা নির্দিষ্ট মাত্রায় লঘু করে তাতে জীবাণুর পুষ্টি উপাদান মিশ্রিত করতে হয় (culture); মিশ্রণটি নির্দিষ্ট একটি তাপমাত্রায় ($37 \pm 1°C$) 24 কিংবা 48 ঘণ্টা শান্তভাবে রেখে দিলে (incubation) জীবাণুর তাতে বিস্তার ঘটে এবং গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে (colony) তারা অবস্থান করে। একটি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে গুচ্ছগুলো গণনা করে, তার ভিত্তিতে পানির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। পানীয় পানির জন্য ই.কোলাই এর সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা প্রতি 100 mL নমুনায় একটি কলোনি [WHO স্টান্ডার্ড]।

ই.কোলাই উৎপাদনের মাধ্যম (culture medium) : 10 g পেপটোন + 10 g ল্যাকটোজ + 2 g KH_2PO_4 + 15 g অগর (agar) + 0.4 g ইওসিন + 0.065 g মিথিলিন ব্লু + 1L পাতিত নির্বীজকৃত (sterilized) পানি (pH 7.1) ।

ই.কোলাই উৎপাদন ও নির্ণয়করণ : নমুনা নির্বীজকৃত পানি দ্বারা লঘু করে (10^3-10^4 গুণ) তা থেকে 0.1 mL ঘনআয়তনের একটি এলিকোট পুষ্টি মাধ্যমে যোগ কর এবং মাধ্যমটি $37 \pm 1°C$ তাপমাত্রায় 48 ঘণ্টা শান্তভাবে রেখে দাও। পুষ্টি মাধ্যমে ই.কোলাই এর বিস্তার ঘটবে এবং ফ্যাকাশে লাল (pink) / লাল রঙ এর গুচ্ছ আকারে (colony) তারা সেখানে অবস্থান করবে। একটি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে গুচ্ছের সংখ্যা গণনা করে 'গুচ্ছের সংখ্যা / 100 mL নমুনা' হিসেবে ফলাফল প্রকাশ কর।

ই.কোলাই লঘু নমুনায় নির্ণয় করার পরিবর্তে ঝিল্লি ফিল্টারের সাহায্যেও নির্ণয় করা যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণের নমুনা সূক্ষ্ম রন্ধ্র ঝিল্লি ফিল্টারের (0.45 μm) সাহায্যে ফিল্টার করা হলে, ব্যাকটেরিয়া ফিল্টারে আটকা পড়ে; ফিল্টার ঝিল্লিটি পুষ্টি মাধ্যমে স্থাপন করা হলে একইভাবে তাতে ই. কোলাই গুচ্ছ সৃষ্টি হয়।

পানির ব্যাকটেরিয়া সংক্রান্ত মান নির্ধারণ করার লক্ষ্যে যে ই.কোলাই কলোনি গণনা পদ্ধতি আলোচনা করা হলো, তার কিছু দুর্বল দিক আছে; যেমন,

১. পানির বৈশিষ্ট্য এমন হতে পারে যে, তা ই.কোলাই এর জন্য অনুকূল কিন্তু প্যাথোজেনের জন্য অনুকূল নয়। ই.কোলাই গণনায় উক্ত পানি দূষিত বলে বিবেচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা দূষিত থাকে না।

২. এমন কিছু কিছু ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া আছে, যারা ই.কোলাই এর তুলনায় বেশিদিন বাঁচে; তাই ই.কোলাই গণনায় কোনো পানি জীবাণুমুক্ত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা জীবাণুমুক্ত নাও হতে পারে।

ই.কোলাই গণনাকরণ পদ্ধতির ঐরূপ দুর্বলতা সত্ত্বেও পদ্ধতিটিকে পানির ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কিত মান নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. J. Bassett *et al.*, Vogels' Textbook of Quantitative Inorganic Analysis', 4th Ed., ELBS/Longman, UK. 1986.

2. G.D. Christian, 'Analytical Chemistry', 4th Ed., John Wiley, NY, USA, 1994.

3. D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, 'Fundamentals of Analytical Chemistry', 6th Ed., Saunders College Publishing, NY, USA, 1992.

4. A.K. De, 'Environmental Chemistry', 3rd Ed, Wiley Eastern, New Delhi, India, 1995.

5. M.N. Rao & H.V. Rao, 'Air Pollution'. McGraw-Hill, New Delhi, India, 1997.

6. J.C. Van Loon, 'Selected Methods of Trace Metal Analysis—Biological and Environmental Samples', John Wiley, NY, USA, 1985.

পরিশিষ্ট ১

শব্দ দূষণ

(Sound Pollution)

বর্তমান সমাজে বিশেষ করে নাগরিক জীবনে, একজন মানুষ প্রতিনিয়ত যেসব দূষণের শিকার হয়, শব্দ দূষণ তাদের একটি। শব্দ দূষণ রাসায়নিক (বস্তুগত) দূষণের মতো শরীরের ক্ষতি যেমন করে তেমনি মারাত্মক মানসিক বিকারও সৃষ্টি করতে পারে।

শব্দের স্থিতিমাপ(parameters) : শব্দ বস্তু-মাধ্যম বাহিত (সাধারণত, বায়ু) এক প্রকার শক্তি। বায়ুতে স্বাভাবিক অবস্থায় শব্দের গতিবেগ 1100 ft/s। শব্দ তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা (frequency) দ্বারা শব্দের তীক্ষ্ণতা (pitch) এবং বিস্তার (amplitude) দ্বারা তার তীব্রতা (intensity) নির্ধারিত হয়। কম্পন সংখ্যার একক CPS (cycles per second) বা হার্জ (Hz= Hertz)। প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ একজন ব্যক্তি যে শব্দ শুনতে পায় তার কম্পনসংখ্যা 20 - 20,000 Hz তবে কম্পনসংখ্যা যখন 200 - 3000 Hz এর মাঝে অবস্থান করে তখন তা সবচেয়ে ভাল শোনা যায়। শব্দ তরঙ্গের কম্পনসংখ্যা যখন 20 Hz এর নিচে এবং 20,000 Hz এর উপরে থাকে তখন তাকে যথাক্রমে অব-শব্দ (infra-sound) এবং অধি-শব্দ (ultra-sound) বলা হয়ে থাকে। শব্দের তীব্রতা (intensity) ওয়াট / মিটার^2 (W/m^2) এককে প্রকাশ করা হয়।

শব্দের প্রবলতা (loundness) : 'প্রবলতা' শ্রোতার অনুভূতি-নির্ভর শব্দের একটি স্থিতিমাপ; 'ডেসিবেল' এককে (decible = dB) এটি প্রকাশ করা হয় (deci অর্থ 10, 'bel' দুটি শব্দের তীব্রতার যে অনুপাত তার 'লগারিদম মান'; আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এর সম্মানার্থে 'বেল' শব্দটি গৃহীত হয়েছে)।

$$\text{শব্দের প্রবলতা, dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{নির্ণেয় শব্দের তীব্রতা}}{\text{রেফারেন্স শব্দের তীব্রতা}}$$

'সবেমাত্র' শোনা যায়' (audible) এমন শব্দকে ডেসিবেল এককে 'রেফারেন্স শব্দ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দুটি শব্দের মাঝে তীব্রতার পার্থক্য বিরাট হতে পারে; যেমন, সবেমাত্র শোনা যায় এমন শব্দের তীব্রতা 10^{-12} W/m^2 এবং রকেট উৎক্ষেপণের সময় যে শব্দ উৎপন্ন হয় তার তীব্রতা 10^6 W/m^2। অতএব,সংজ্ঞানুসারে, 'সবেমাত্র শোনা' যায় এমন শব্দের প্রবলতা 0 dB এবং রকেট উৎক্ষেপণে সৃষ্ট শব্দের প্রবলতা 180 dB।

[সবেমাত্র শোনা যায় যে শব্দ: $dB = 10 \log_{10} \dfrac{10^{-12}\ W/m^2}{10^{-12}\ W/m^2} = 0$

রকেট উৎক্ষেপণে সৃষ্ট শব্দ: $dB = 10 \log_{10} \dfrac{10^{6}\ W/m^2}{10^{-12}\ W/m^2} = 180$]

প্রচলিত কিছু উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দের প্রবলতা (dB এককে) এবং মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া নিচে দেখানো হলো (সারণি প-১)।

সারণি প-১ : বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দের প্রবলতা (dB) এবং মানুষের উপর তার কিছু প্রতিক্রিয়া।

শব্দের উৎস	প্রবলতা, dB	মানুষের উপর প্রতিক্রিয়া	
-	0	সবেমাত্র শোনা যায়	
গাছের পাতা নড়া	10		
বেতার ঘোষণার কক্ষ	20	প্রশান্ত (very quiet)	
কানে কানে কথা	28		
পাঠাগার	35	শান্ত (quiet)	
সাধারণ বৈঠকখানা	45		
অল্প যানবাহন	50	মোটামুটি প্রবল (moderately loud)	
সাধারণ কথোপকথন	60		
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	70		
অ্যালার্ম ঘড়ি	80	খুব প্রবল (very loud)	
শহরে ঘন যানবাহন	85		শ্রুতির জন্য বিপজ্জনক (danger to hearing)
মোটর সাইকেল 25 ফুট দূরে	90		
কৃষি ট্রাক্টর	98		
রক সংগীত	111	কষ্টদায়ক প্রবল (uncomfortably loud)	
বয়ন তাত	115		
বজ্রপাত আকস্মিক	120		
রক সংগীত (সর্বোচ্চ)	125		
জেটবিমান উডডয়ন	150	যন্ত্রণাদায়ক (painful)	
রকেট ইঞ্জিন	180		

মানুষের কাছে শব্দের 'মান' শব্দের তীক্ষ্ণতা (pitch), তীব্রতা (intensity) ও স্থিতিকাল (duration) দ্বারা প্রধানত নির্ধারিত হয়। সবগুলো স্থিতিমাপের সমন্বয়ে শব্দের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ একটি স্কেল নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য একটি কাজ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানে তাই শব্দের মান-প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন স্কেল এবং মান-মাপক কিছু যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে; আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এমনি একটি স্কেল dBA, যা বস্তুত, শব্দের প্রবলতার সময়-ভিত্তিক একটি গড় প্রদান করে; শিল্প কারখানার ও যানবাহন চলাচলজনিত (traffic) শব্দের মান নির্ধারণ করতে স্কেলটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়। মানুষ সচরাচর যেসব স্থানে অবস্থান করে, dBA স্কেলে, তেমনি কিছু স্থানে শব্দের গ্রহণযোগ্য প্রবলতা (acceptable loudness) এবং প্রবলতার বিভিন্ন মাত্রায় শব্দের গ্রহণযোগ্য স্থিতিকাল (acceptable duration) সারণিতে প্রদান করা হলো (সারণি প-২ ও প-৩)।

সারণি প-২ : বিভিন্ন স্থানে গ্রহণযোগ্য শব্দ মাত্রা।

ঘরের ভিতরে	গ্রহণযোগ্য dBA
রেডিও ও টি.ভি স্টুডিও, হাসপাতাল, শ্রেণিকক্ষ	25 - 30
অ্যাপার্টমেন্ট, হোটেল, সম্মেলন কক্ষ	35 - 40
ব্যক্তিগত অফিস ও বিচারালয়	40 - 45
সর্বসাধারণের অফিস, ব্যাংক	45 - 50
ঘরের বাইরে	
গ্রামাঞ্চল	25 - 35
বাসস্থান (শহর)	35 - 45
ব্যবসাকেন্দ্র (শহর)	45 - 50
শহরাঞ্চল	45 - 55
শিল্পাঞ্চল	50 - 60

শব্দ দূষণের প্রভাব: শব্দ যেহেতু বায়ু-বাহিত এক প্রকার শক্তি যা শ্রোতার কানের পর্দায় আঘাত করে তাই তীব্রতা (intensity), তীক্ষ্মতা (pitch) ও স্থিতিকাল (duration) ভেদে শব্দ শ্রোতার কানের পর্দায় তথা শরীর ও মনের উপর স্বাভাবিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং কখনো তা ক্ষতিকর হয়। একটি শব্দ 'দূষক' হিসেবে তখন গণ্য হয় যখন তা গোলমাল' (noise) আকারে প্রকাশ পায়। 'গোলমাল' কথাটির অনন্য একটি সংজ্ঞা হয় না তবে সাধারণভাবে বলা হয়, 'অপছন্দনীয় শব্দ মাত্রই গোলমাল'। পছন্দ/ অপছন্দ ব্যক্তির রুচি-নির্ভর একটি ব্যাপার। তাই, শব্দ-দূষণের ব্যক্তিনিরপেক্ষ অনন্য একটি সংজ্ঞা দেয়া যায় না। সংজ্ঞা প্রদানে জটিলতা যেমনই থাক শব্দের মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায় যা সাধারণভাবে 'অপছন্দনীয়'; শব্দের প্রবলতা (loudness) এমনি একটি বৈশিষ্ট্য। 'প্রবল শব্দ' শ্রোতার শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন করে, এ সম্পর্কে বহু সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

সারণি প-৩ : শব্দের নির্দিষ্ট মাত্রায় তার অনুমোদনীয় (permissible) স্থিতিকাল (duration) (USA স্ট্যান্ডার্ড)।

শব্দের মাত্রা dBA	অনুমোদনীয় স্থিতিকাল (প্রতিদিনে ঘণ্টা)
80	16
85	8
90	4
95	2
100	1
105	½
110	¼
115	1/8

একজন মানুষ যখন সাধারণ কথা বলে তখন এক মিটার দূরত্বে সে শব্দের প্রবলতা থাকে 60 dBA। শব্দ যত প্রবল হয় শ্রোতার কাছে তত তা অস্বস্তিকর হতে থাকে; এমন কি, 70 dB শব্দও শারীরবৃত্তীয় (physiological) কিছু কিছু প্রভাব ফেলে, যদিও তা তাৎক্ষণিক কোনো ক্ষতির কারণ হয় না। শব্দের প্রবলতা যখন 120-150 dB এর মাঝে অবস্থান করে তখন তার প্রভাবে শ্রোতার শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা, বমিভাব, বমি, দিকভুল, শারীরিক নিয়ন্ত্রণলোপ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অসুস্থতা সৃষ্টি হতে পারে এবং 150 dB এর ঊর্ধ্বে শ্রবণশক্তি সাথে সাথে স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রবল শব্দের আঘাতে লালাগ্রন্থি (পিটুইটারি গ্লান্ড) থেকে বেশকিছু হরমোন অতিরিক্ত মাত্রায় নিঃসৃত হয়; ঐসব হরমোনের কোনো কোনোটির প্রভাবে রক্তে শর্করা বৃদ্ধি পেতে পারে, রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হতে পারে এবং যকৃতের রক্ত পরিশোধন দক্ষতা হ্রাস পেতে পারে।

উচ্চ শব্দের শিকার বহুদিন যাবৎ হতে থাকলে (chronic effect) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শ্রবণশক্তি; 500 - 8000 Hz কম্পন সংখ্যায় 92 dB প্রবলতার রক সংগীত শোনে, এমন একদল তরুণের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, এক ঘণ্টা সংগীত শোনার পর তাদের মাঝে শতকরা দশজন তরুণের সর্বনিম্ন শ্রাব্যপ্রান্ত 40 dB উপরে ওঠে (threshold shift) এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে শ্রাব্য প্রান্ত 20-30% উপরে (threshold elevation) উঠে যায়।

শব্দের প্রবলতার মতো তীক্ষ্ণতাও শরীরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে; যেমন, উচ্চ কম্পনসংখ্যার শব্দে কানের অভ্যন্তরীণ পর্দায় এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যাতে বমিভাগ লাগে ও মাথাঘোরে; অন্যদিকে নিম্ন কম্পনসংখ্যার শব্দে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন (heart beat) হ্রাস পায়, রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটে ও শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি হয়।

গোলমাল (noise) মনোবিকারও সৃষ্টি করে এবং তা মৃদু মানসিক চাপ থেকে পুরোপুরি বিকার পর্যন্ত হতে পারে। অবিরাম উচ্চ শব্দে মানুষের শারীরিক ও মানসিক

কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। মানুষ ভুল প্রবণ হয়ে পড়ে যাতে সে দুর্ঘটনারও শিকার হতে পারে। শিশুরা যখন শব্দ-দূষণের শিকার হয় তখন তার আচরণে বিশৃঙ্খলা (behavioral disorder) দেখা দেয় এবং পরবর্তীকালে ঐসব শিশু ধ্বংসাত্মক ও খেপাটে প্রকৃতির হয়।

গোলমালে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য ঘুমের প্রয়োজন। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে তাই মানসিক পীড়া ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। গোলমাল পশুপাখির আচরণের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে।

শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার : শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণের চারটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে; যথা,

১. প্রচলিত কিছু ব্যবস্থা ও পদ্ধতির এমন পরিবর্তন ঘটানো যাতে গোলমাল হ্রাস পায়। উদাহরণ : মোটরগাড়ির সংখ্যা কমানো, সাইরেন বসতি এলাকা থেকে দূরে স্থাপন, হেডফোন ছাড়া স্টোরিও চালানো নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি।

২. শব্দের উৎস ঢেকে দেয়া। উদাহরণ - মোটরের স্থাপনায় শব্দশোষক ব্যবহার, উন্নত স্থাপনা ব্যবহার, মোটরের ঢাকনা ব্যবহার, শব্দের উৎসে (যেমন, মোটরগাড়ি, ডিশ-ওয়াশার প্রভৃতি) শব্দ শোষক ব্যবহার ইত্যাদি।

৩. শব্দ গ্রাহক ঢেকে দেয়া। উদাহরণ- কর্ণছিপি (ear-plug) ব্যবহার।

৪. শব্দের উৎস দূরে সরিয়ে নেয়া। উদাহরণ : বসতি এলাকা থেকে বিমান বন্দর ও শিল্পকারখানা দূরে সরিয়ে নেয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রশাসনিকভাবে বাধ্যতামূলক করা হলে উপরে যে ব্যবস্থাগুলোর কথা বলা হলো তার অনেকগুলোই অতিসহজে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে।

পরিশিষ্ট ২

পানির স্ট্যান্ডার্ড

[EQS : Environmental Quality Standard for Bangladesh, Dept. of Environment, PRB, 1991.

USPHS : United States Public Health Service.

WHO : World Health Organisaiton.

A : অনুমোদিত মাত্রা (recommended level): উন্নত পানির উৎস লভ্য হলে নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করা উচিত নয়;

B : সহনীয় মাত্রা (tolerance limit): উপাদানটি নির্ধারিত মাত্রার উর্ধ্বে উপস্থিত থাকলে, সে পানি পানীয় হিসেবে ব্যবহার না করার পক্ষে সঙ্গত কারণ সৃষ্টি হয়।]

স্থিতিমাপ (para meter)	পানীয় পানির স্ট্যান্ডার্ড					সেচের পানির স্ট্যান্ডার্ড
	EQS, বাংলাদেশ	USPHS		WHO		
		A	B	A	B	
রং, গন্ধ, স্বাদ	আপত্তিকর হবে না	আপত্তিকর হবে না		আপত্তিকর হবে না		-
pH	6 - 8	6.0 - 8.5	-	7 - 8.5	6.5 - 9.2	-
আপেক্ষিক পরিবাহিতা mS/cm	-	-	3.00	-	-	-
অজৈব বস্তু, ppm						
দ্রবীভূত বস্তু	-	500	0	500	1500	-
DO	6	-	-	-	4 - 6	5
সালফেট	-	250	-	200	400	-
সায়ানাইড, CN^-	0.1	0.01	0.2	-	0.01	-
নাইট্রেট, NO_3^-	10(N)	-	-	-	13(N)	-
ফ্লোরাইড F^-	1.0	0.6 - 1.7	-	0.5	1 - 1.5	-
ক্লোরাইড, Cl^-	150 - 600	250	-	-	500	600
বাইকার্বোনেট HCO_3^-	-	-	-	-	339	-
ফসফেট, PO_4^{3-}	0.01(P)	0.1	-	-	0.8(P)	-
আর্সেনিক, As	0.05	0.01	0.05	-	0.05	1.0

ক্যালশিয়াম, Ca	75	100	-	75	200	-
ম্যাগনেশিয়ামMg	30 - 50	30	-	50	150	-
ক্যাডমিয়াম, Cd	0.005	-	0.01	-	0.01	0.01
ক্রোমিয়াম, Cr	0.05	-	0.05	-	0.05	-
পারদ, Hg	0.001	-	0.001	-	0.001	-
সীসা, Pb	0.05	-	0.05	-	0.1	0.1
লোহা, Fe	0.32	-	0.3	0.3	1.0	-
ম্যাঙ্গানিজ, Mn	0.1	-	0.05	0.1	0.5	2.0
বেরিয়াম, Ba	0.5	-	1.0	-	-	-
দস্তা, Zn	-	-	5.5	-	-	-
বোরন, B	1.0	-	-	-	1.0	1
তামা, Cu	1.0	-	-	-	1.0	0.2
খরতা, $CaCO_3$	200 -500	-	-	-	500	-
নিকেল, Ni	0.1	-	-	-	0.2	0.5
জৈব বস্তু, ppm						
BOD	0.2	-	-	-	6.0	10
COD	4	-	4	-	4	-
ফেনল	-	-	0.001	0.001	0.002	-
পেস্টিসাইড	-	-	0.005	-	-	-
PAH , (ppb)	-	-	0.2	-	-	-
ডিটারজেন্ট	-	-	200	-	-	-
জীবাণু						
কোলিফরম /100 mL	-	-	1	-	1	-
মোট ব্যাকটেরিয়া / 100 mL	-	-	200	-	-	-

পরিশিষ্ট ৩

বায়ুর মানের স্টান্ডার্ড

(Air quality Standard): USEPA

[**প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড :** জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য আবহমণ্ডলের বায়ুতে উপাদানটির যে স্তরে উপস্থিতি (পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে) গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড : উপাদানের জ্ঞাত অথবা আশঙ্কিত বিরূপ প্রভাবের আলোকে নির্ধারিত স্তরটি মানুষের আরাম আয়াস এবং উদ্ভিদ ও সম্পদের জন্য নিরাপদ বলে বিবেচিত হয় ।

উপাদান	প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড	সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড
SO_2	i. 80 μg/m³ (0.03 ppm); বার্ষিক গড়। ii. 365 μg/m³ (0.14 ppm); 24 ঘণ্টার গড়; বছরে একবারের বেশি নয়।	i. 60 μg/m³ (0.02 ppm), বার্ষিক গড়। ii. 260 μg/m³ (0.1 ppm); 24 ঘণ্টার গড়; বছরে একবারের বেশি নয়। iii. 1300 μg /m³ (0.5 ppm); 3 ঘণ্টার গড়; বছরে একবারের বেশি নয়।
NO_2	100 μg/m³ (0.05 ppm), বার্ষিক গড়।	প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড-এর মতো।
CO	i. 10 mg/m³ (9 ppm), 8 ঘণ্টার গড়; বছরে একবারের বেশি নয়। ii. 40 mg/m³ (35 ppm); এক ঘণ্টার গড়; বছরে একবারের বেশি নয়।	প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড-এর মতো। প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড এর মতো।
জারক (oxidant)	160 μg/m³ (0.08 ppm), এক ঘণ্টার গড়; বছরে একবারের বেশি নয়।	150 μg/m³ (0.075 ppm) 24 ঘণ্টার গড়।
O_3	i. 235 μg/m³ (0.12 ppm), এক ঘণ্টার গড়; বছরে একবারের বেশি নয়। ii. 157 μg/m³ (0.08 ppm); 8 ঘণ্টার গড়।	-

CH_4 বাদে হাইড্রোকার্বন	160 μg/m³ (0.24 ppm), 3 ঘণ্টার গড় (6-9 a.m.); বছরে একবারের বেশি নয়।	প্রাইমারির মতো
বস্তুকণা (particulates) PM_{10}	i. 50 μg/m³, বার্ষিক গড় ii. 150 μg/m³ ; 24 ঘণ্টার গড়	i.60 μg/m3; বার্ষিক গড়। ii.150 μg/m³; 24 ঘণ্টার গড়, বছরে একবারের বেশি নয়।
বস্তুকণা (particulates) $PM_{2.5}$	i. 25 μg/m³, বার্ষিক গড়। ii. 65 μg/m³ ; 24 ঘণ্টার গড়।	-
Pb	1.5 μg/m³, ত্রৈমাসিক গড় 50 μg/m³ ; 8 ঘণ্টার গড়।	-
Hg	25 μg/m³ ; 8 ঘণ্টার গড়।	-
As (অজৈব)	10 μg/m³ ; 8 ঘণ্টার গড়।	-
Be	2 μg/m³ ; 8 ঘণ্টার গড়।	-
বেনজিন	10 ppm; 8 ঘণ্টার গড়।	-

পরিশিষ্ট ৪

সাধারণ কিছু গ্যাস ও বাষ্পীয় দূষকের TLV (Threshold Limit Value)

[একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাস্থ্যবান শ্রমিক যদি একটি গ্যাস বা বাষ্পের সংস্পর্শে থেকে দৈনিক আট ঘণ্টা করে সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা হিসেবে সারাজীবন কাজ করে তাহলে কর্মস্থলের বায়ুতে গ্যাস/বাষ্পটির গড় ঘনমাত্রা যে মানের ঊর্ধ্বে থাকলে শ্রমিকটির উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে (ঘনমাত্রার) সে মানকে সংশ্লিষ্ট গ্যাস/বাষ্পের TLV বলে। জীবজন্তুর উপর পরিচালিত পরীক্ষা, চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা,রোগ বিস্তার সংক্রান্ত বিদ্যা (epidemeology) এবং পরিবেশ গবেষণার আলোকে বিভিন্ন দূষকের TLV নির্ধারণ করা হয়েছে।]

দূষক (pollutant)	মাত্রা, ppm	মাত্রা, mg/m^3
অ্যাসেটিক এসিড	10	25
অ্যাসেটিক এনহাইড্রাইড	5	20
অ্যাসিটোন	750	1780
অ্যাসিটোনাইট্রিল	40	70
অ্যাক্রোলিন	0.1	0.25
অ্যাক্রাইলামাইড (চর্ম)	-	0.3
এলড্রিন (চর্ম)	-	0.25
এনড্রিন (চর্ম)	-	0.1
এনটিমোনি ও যৌগ	-	0.5
আর্সেনিক ও যৌগ	-	0.5
আর্সাইন	0.05	0.2
অসমিয়াম টেট্রোক্সাইড	0.0002	0.002
ওজোন	0.1	0.2
ইথাইল মারক্যাপট্যান	0.5	1
ইথিলিন ডায়ামিন	10	25
*ইথিলিন ডাইক্লোরাইড	50	-
* ইথিলিন ডাইব্রোমাইড	20	-
ক্যালসিয়াম অক্সাইড	-	5
কপার (Cu)	1.0	-

ক্যামফোর	2	-
* ক্যাডমিয়াম (ধূলি)	-	0.2
* ক্যাডমিয়াম (ধূম)	-	0.1
ক্যাডমিয়াম (লবণ-ধূলি) কার্বন ডাইঅক্সাইড	- 5000	0.05 9000
কার্বন ডাইসালফাইড	10	30
কার্বন মনোক্সাইড	50	55
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড	5	30
কার্বারিল (সেভিন)	-	5
কার্বোনিল ক্লোরাইড (ফসজিন)	0.1	0.4
ক্লোরিন	1.0	3
ক্লোরডেন (চর্ম)	-	0.5
ক্লোরোফর্ম	10	50
ক্লোরোবেনজিন	75	350
কয়লা টার পিচ (উদ্বায়ী)	-	0.2
কোবাল্ট ধূলি ও ধূম	-	0.1
ক্রোমেট, ক্রোমিয়াম	-	0.5
জিংক ক্লোরাইড ধূম	-	1
জিংক অক্সাইড ধূম	-	5
জিরকোনিয়াম যৌগ	-	5
*টলুইন	200	-
টেট্রাইথাইল লেড	-	0.1
ট্রাইনাইট্রোটলুইন (চর্ম)	-	1.5
2, 4-D	-	10
ডিডিটি (DDT)	-	1
ডিমিটোন (চর্ম)	-	0.1
ডাইবোরেন	0.1	0.1
ডাইবিউটাইল ফসফেট	1	5
ডাই-এলড্রিন (চর্ম)	-	0.25
ডাইমিথাইল ফরমামাইড (DMF)	10	30
ডাইমিথাইল সালফেট (চর্ম)	1	5
ডায়াক্সেন	100	360
থেলিয়াম (দ্রবণীয় যৌগ)	-	0.1

নাইট্রিক এসিড নাপথা	2.0 100	5.0 400
ন্যাপথ্যালিন	10	50
নিকেল (ধাতু, দ্রবণীয় যৌগ)	-	1
নিকেল কার্বোনিল	0.001	0.007
নিকোটিন (চর্ম)	-	0.5
নাইট্রোবেনজিন (চর্ম)	1	5
পিরিডিন	5	15
ফ্লোরিন	0.1	0.2
ফ্লোরাইড	-	2.5
ফরমিক এসিড	5	9
ফরমালডিহাইড	2.0	3.0
ফেনল	5	19
ব্রোমিন	0.1	0.7
ব্রোমোফর্ম (চর্ম)	0.5	5
* বেনজিন	10	20
বেরিলিয়াম ধাতু ও যৌগ	-	0.002
ভ্যানেডিয়াম (V_2O_5 ধূলি)	-	0.5
ভ্যানেডিয়াম (V_2O_5 ধূম)	-	0.1
ভিনাইল ক্লোরাইড	5	10
মারকারি	-	0.01 - 0.05
* মারকারি অ্যালকাইল	-	0.01
ম্যালাথিয়ন	-	10
ম্যাঙ্গানিজ ও যৌগ	-	5
মিথাইল মারক্যাপট্যান	0.5	1
মেথানল	200	260
রোডিয়াম ধাতু-ধূলি ও ধূম	-	0.1
রেডিয়াম দ্রবণীয় লবণ	-	0.001
*লেড ধাতু ও অজৈব লবণ	-	0.2
লেড আর্সেনেট	-	0.15
লিনডেন	-	0.5
সায়ানাইড (CN^-)	-	5
সায়ানোজেন	10	20

সালফার ডাইঅক্সাইড	2	5
সালফিউরিক এসিড	-	1
সেলেনিয়াম	-	0.2
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	5	7
হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড	3	2.5
হাইড্রোজেন স্যায়ানাইড (চর্ম)	10	11
হাইড্রোজেন সালফাইড	10	14
হেপ্টাক্লোর	-	0.5
হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড	1	1.4

সূত্র :

1. US Dept. of Labor Occupational Health and Safety Administraton; Federal Registrar, 42, 6273 – 62890 (1977);

2. American Conference of Governmental Industrial Hygienists', US Federal Registrar, V-36, No. 105

* American National Standards.

পরিশিষ্ট ৫

বায়ু ফিল্টারকরণের কিছু ফিল্টার আস্তরণ

ফিল্টার আস্তরণ	গঠন উপাদান	ফিল্টারকরণ দক্ষতা
W & R Balston, England		
হোয়াটম্যান GF/C	কাচ তন্তু	99.9
হোয়াটম্যান নং 32	সেলুলোজ	99.5
হোয়াটম্যান নং 42	সেলুলোজ	99.2
হোয়াটম্যান নং 44	সেলুলোজ	98.6
হোয়াটম্যান নং 50	সেলুলোজ	97.0
Gelman Instrument Co., USA		
অ্যাক্রোপোর, টাইপ AN-3000	অ্যাক্রাইলোনাইট্রিল/ পলিভিনাই কো-পলিমার, নাইলন মিশ্রিত	99.99
Mullipore Filter Corp, USA		
টাইপ HA ও AA	সেলুলোজ ঈস্টার	99.9
Mine Safety Appliance Co., USA		
টাইপ 1106 –B	কাচ তন্তু	99.9
Schleicher and Schull, Germany		
আলট্রাফিল্টার	সেলুলোজ ঈস্টার	99.99

পরিশিষ্ট ৬

পরমাণু শোষণ-বর্ণালি রেখা (Atomic Absorption Spectral Line)

মৌল	তরঙ্গদৈর্ঘ্য, nm	শিখা (flame)	শোষণ সংবেদনশীলতা, μg/mL/1% শোষণ
Ag	338.29	AA	0.22
Al	396.15	NA	3.0
As	197.20	AA	1.3
Ba	553.55	NA	2.6
Bi	223.06	AA/ACg	0.7/0.4
B (as BO_2)	249.77	NA	10.0
Ca	422.67	AA	0.08
Cd	228.80	AA	0.03
Co	240.72	AA	0.02
Cr	357.87	AA/NA	0.22
Cs	455.54/852.10	AP/ACg	10/0.15
Cu	324.75	AA/ACg	0.1
Fe	248.33	AA	0.15
Ga	287.42	AA/ACg	2.3
Hg	253.65	AA	2.0
In (Indium)	325.61	AA	1.0
K	404.41/766.5	AP/ACg	3.7/0.03
Li	670.78	AA/ACg	0.02
Mg	285.21	AA	0.008
Mn	279.48	AA/ACg	0.06
Mo	313.26	NA/AA	0.8
Na	589.0	AP/ACg	0.004/0.02
Nb (Niobium)	405.89	NA	28.0
Ni	232.00	AA/ACg	0.15/0.1
Pd	247.64	AA/ACg	0.3
Pt	265.94	AA	2.2
Rb	780.02	AP/ACg	0.04
Si	251.61	NA	2.0
Sb	217.58	AA/ACg	0.6/1.0
Sn	286.33/224.6	AH/AA	10/2
Sr	460.73	AA/NA	0.06
Tl (Thallium)	276.79	AA	0.1
Te	238.58/214.3	AA/ACg	43/0.3
V	318.40	NA	0.4
Zn	213.86	AA	0.025

[AA = বায়ু-অ্যাসিটিলিন; ACg = বায়ু-কয়লা গ্যাস; AH = বায়ু-হাইড্রোজেন; AP = বায়ু-প্রোপেন; NA=নাইট্রাস অক্সাইড-অ্যাসিটিলিন]

সূত্র : H.H. Willard *et.al.*, Instrumental Methods of Analysis, 6th Ed., D. Van Nostrand, NY, 1981, p-1001.

পরিশিষ্ট ৭

ট্রেস বিশ্লেষণে মজুত প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতকরণ- 1000 ppm 1L (1mg/mL)

১. অ্যালুমিনিয়াম, Al : 1.0000 g Al তার + সামান্য 2M HCl + পানি।

২. এন্টিমোনি, Sb: 1.0000-g Sb + 10 mL HNO_3 + 5mL HCl (Sb দ্রবীভূত হওয়ার পর) + অবশিষ্ট পানি।

৩. আর্সেনিক, As: i. 1.3203-g As_2O_3 +3 mL 8 M HCl (অক্সাইড দ্রবীভূত হওয়ার পর + অবশিষ্ট পানি।

ii. 1.3203 g As_2O_3 + 2-g NaOH + 20 mL পানি (অক্সাইড দ্রবীভূত হওয়ার পর) + 200 mL পানি + গাঢ় HCl (যে পর্যন্ত দ্রবণ অম্লীয় না হয়) + অবশিষ্ট পানি।

৪. ক্রোমিয়াম: Cr: 2.829 g $K_2Cr_2O_7$ + পানি।

৫. তামা, Cu: 2.929-g $CuSO_4.5H_2O$ + পানি।

৬. লৌহ, Fe: 1.000 g Fe + 20 mL 5 M HCl (Fe দ্রবীভূত হওয়ার পর) + অবশিষ্ট পানি

৭. সীসা, Pb: 1.5985 g Pb(NO3)2 + পানি (লবণ দ্রবীভূত হওয়ার পর) + 10 mL HNO_3 + অবশিষ্ট পানি।

৮. ম্যাঙ্গানিজ, Mn: 3.0764-g MnSO4, H_2O (105°C তাপমাত্রায় 8 ঘণ্টা শুষ্ক করা) + পানি (লবণ দ্রবীভূত হওয়ার পর) + অবশিষ্ট পানি।

৯. পারদ, Hg: 1.0000-g Hg + 10 mL HNO_3 (Hg দ্রবীভূত হবার পর) + অবশিষ্ট পানি।

১০. সেলেনিয়াম, Se: 1.4050 g SeO_2 + পানি।

১১. সিলিকন, Si: 2.1393-g SiO_2 + 4.6 g Na_2CO_3 (মিশ্রণ ক্রুসিবলে 15 মিনিট গলিত অবস্থায় রাখার পর ঠাণ্ডা করে) + পানি (মিশ্রণ দ্রবীভূত হওয়ার পর) + অবশিষ্ট পানি।

১২. রৌপ্য, Ag: i. 1.5748-g $AgNO_3$ + পানি।

ii. 1.0000 g Ag + 10 mL HNO_3 (Ag দ্রবীভূত হওয়ার পর) + অবশিষ্ট পানি (অ্যামবার রঙ এর কাচপাত্রে আলো হতে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে)।

১৩. টিন, Sn: 1.0000-g Sn + 15 mL HCl (মিশ্রণ গরম করে Sn দ্রবীভূত করার পর) + অবশিষ্ট পানি।

১৪. ভ্যানেডিয়াম, V: 2.2963-g NH_4VO_3 + 100 mL পানি + 10 mL HNO_3 (লবণ দ্রবীভূত হওয়ার পর) + অবশিষ্ট পানি।

১৫. দস্তা, Zn: 1.0000-g Zn + 10 mL HCl (Zn দ্রবীভূত হওয়ার পর) + অবশিষ্ট পানি।

পরিশিষ্ট ৮

রাসায়নিক দ্রব্যের মান (grade)

মান	বিশুদ্ধতা	মন্তব্য
টেকনিক্যাল / বাণিজ্যিক	অনির্ণীত	পরিষ্কারকরণের দ্রবণ প্রস্তুতকরার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
ইউ-এস.পি (USP)	বিশুদ্ধতার ন্যূনতম মান পূরণ করে	স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মিশালের (contaminant) যে সহনীয় মাত্রা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফারমাকোপিয়া কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুরূপ।
এ-সি-এস, বিকারক (ACS reagent)	উচ্চ বিশুদ্ধতা	আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির বিকারক রাসায়নিক-দ্রব্য কমিটি কর্তৃক ন্যূনতম যে মান নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুরূপ।
মুখ্যমান (primary standard)	সর্বোত্তম বিশুদ্ধতা	নির্ভুল আয়তনমিতি বিশ্লেষণের জন্য (যেমন, প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতি) আবশ্যক।

পরিশিষ্ট ৯

বাণিজ্যিক বিকারক মানের অম্ল ও ক্ষারকের ঘনমাত্রা

বিকারক	ফর্মুলা ওজন (FW)	মোলারিটি, M*	%(w/w)	ঘনত্ব** (d, g/cm^3 বা g/mL), 20°C
H_2SO_4	98.08	17.6	94	1.831
HCl	36.46	12.4	38.0	1.188
HNO_3	63.01	15.4	69.0	1.409
$HClO_4$	100.5	11.6	70.0	1.668
H_3PO_4	98.00	14.7	85.0	1.689
CH_3COOH	60.05	17.4	99.5	1.051
NH_3	17.03	14.8	28.0	0.898

* আসন্ন ঘনমাত্রা-এর ভিত্তিতে প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতকরা যায় না।

$M = d\ (g/mL) \times \%(w/w) \times (1/100) \times (1/FW) \times 1000$ ।

** অনেক সময় বোতলের লেবেল-এ ঘনত্বের পরিবর্তে আপেক্ষিক ঘনত্ব (sp. gravity) দেয়া থাকে; স্থূলভাবে এ দুটি স্থিতিমাপকে অভিন্ন ধরা যেতে পারে।

BANSDOC Library
Accession No. 17789

BANSDOC Library
Dhaka

পারমাণবিক ওজনের সারণি

ভিত্তি : পারমাণবিক ভর $^{12}C = 12$

At No.	Name	Sym	Atomic Weight	At. No.	Name	Sym	Atomic Weight
89	Actinium	Ac	227.0278	42	Molybdenum	Mo	95.94
13	Aluminum	Al	26.9815	60	Neodymium	Nd	144.24
95	Americium	Am	[243]	10	Neon	Ne	20.180
51	Antimony	Sb	121.75	93	Neptunium	Np	237.0482
18	Argon	Ar	39.948	28	Nickel	Ni	58.69
33	Arsenic	As	74.922	41	Niobium	Nb	92.906
85	Astatine	At	[210]	7	Nitrogen	N	14.0067
56	Barium	Ba	137.327	102	Nobelium	No	[259]
97	Berkelium	Bk	[247]	76	Osmium	Os	190.2
4	Beryllium	Be	9.0122	8	Oxygen	O	15.999
83	Bismuth	Bi	208.980	46	Palladium	Pd	105.42
5	Boron	B	10.811	15	Phosphorus	P	30.974
35	Bromine	Br	79.904	78	Platinum	Pt	195.08
48	Cadmium	Cd	112.41	94	Polutonium	Pu	[244]
20	Calcium	Ca	40.078	84	Polonium	Po	[209]
98	Californium	Cf	[251]	19	Potassium	K	39.0983
6	Carbon	C	12.011	59	Praseodymium	Pr	140.9077
58	Cerium	Ce	140.115	61	Promethium	Pm	[145]
55	Cesium	Cs	132.905	91	Protactinium	Pa	231.036
17	Chlorine	Cl	35.453	88	Radium	Ra	226.025
24	Chromium	Cr	51.996	86	Radon	Rn	[222]
27	Cobalt	Co	58.933	75	Rhenium	Re	186.207
29	Copper	Cu	63.546	45	Rhodium	Rh	102.905
96	Curium	Cm	[247]	37	Rubidium	Rb	85.4678
66	Dysprosium	Dy	162.50	44	Ruthenium	Ru	101.07
99	Einsteinium	Es	[252]	62	Samarium	Sm	150.36
68	Erbium	Er	167.26	21	Scandium	Sc	44.956
63	Europium	Eu	151.965	34	Selenium	Se	78.96
100	Fermium	Fm	[257]	14	Silicon	Si	28.085
9	Fluorine	F	18.998	47	Silver	Ag	107.868
87	Francium	Fr	[223]	11	Sodium	Na	22.990
64	Gadolinium	Gd	157.25	38	Strontium	Sr	87.62
31	Gallium	Ga	69.723	16	Sulfur	S	32.066
32	Germanium	Ge	72.61	73	Tantalum	Ta	180.95
79	Gold	Au	196.97	43	Technetium	Tc	[98]
72	Hafnium	Hf	178.49	52	Tellurium	Te	127.60
2	Helium	He	4.0026	65	Terbium	Tb	158.925
67	Holmium	Ho	164.93	81	Thallium	Tl	204.383
1	Hydrogen	H	1.0079	90	Thorium	Th	232.038
49	Indium	In	114.82	69	Thulium	Tm	168.934
53	Iodine	I	126.904	50	Tin	Sn	118.710
77	Iridium	Ir	192.22	22	Titanium	Ti	47.88
26	Iron	Fe	55.847	74	Tungsten	W	183.85
36	Krypton	Kr	83.80	106	Unnilhexium	Unh	[263]
57	Lanthanum	La	138.905	105	Unnilpentium	Unp	[262]
103	Lawrencium	Lr	[262]	104	Unnilquadium	Unq	[261]
82	Lead	Pb	207.2	92	Uranium	U	238.03
3	Lithium	Li	6.941	23	Vanadium	V	50.941
71	Lutetium	Lu	174.967	54	Xenon	Xe	131.29
12	Magnesium	Mg	24.305	70	Ytterbium	Yb	173.04
25	Manganese	Mn	54.938	39	Yttrium	Y	88.90
101	Mendelevium	Md	[258]	30	Zinc	Zn	65.39
80	Mercury	Hg	200.59	40	Zirconium	Zr	91.224

[ ] এর ভিতর সংখ্যা সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ